সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

বিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্‌এ, পিএইচ ডি

২৪৩।১ নং অপার সারকুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

২১।৩ শান্তিরাম ঘোষের ষ্ট্রীট, বাগবাজার

বিশ্বকোষ-প্রেসে

শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

১৩২০

বিংশ ভাগের সূচী

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(বিংশ ভাগ)

সভাপতির অভিভাষণ

১৩১২ সাল হইতে আট বৎসর বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আসন অধিকার করিয়াছি। ৮ বৎসর দীর্ঘকাল,—অনেক সময়ই আমার মনে হইয়াছে যে, এই গৌরবের আসন আমি অনলঙ্কৃত করিতেছি। আমার কর্ত্তব্য পালন করিতে আমি ঈপ্সিত মত সমর্থ হই নাই। বস্তুতঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবিদিগের অগ্রণী না হইয়া এ আসনে উপবেশন করা ধৃষ্টতামাত্র। সুখের বিষয় যে, আমার অযোগ্যতানিবন্ধন পরিষদের কোন ক্ষতি হয় নাই। সম্পাদক, সহকারী সম্পাদকগণ ও সদস্যগণের আন্তরিক যত্ন, পরিশ্রম ও আগ্রহে পরিষদের কার্য্যকারিতা ও যশঃ-সৌরভ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে; ১৩২০ সালে পরিষদের সদস্যগণ সগর্ব্বে বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের সভা পৃথিবীর সভ্যসমাজমাত্রেই আদৃত, সাহিত্যালোচনায় ভারতবর্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আদর্শ-স্বরূপ হইয়াছে। আজ আপনাদের ন্যস্ত-ভার আপনাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেছি, পরন্তু এই আট বৎসরের পুষ্টির বিবরণ আপনাদিগকে সংক্ষেপে জানাইতেছি।

পরিষৎ-মন্দির

১৩০১ সালে ১৭ই বৈশাখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন পরিষদের নিজের মন্দির ছিল না। মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কলিকাতাস্থ ২।২ নম্বর রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদে, তাঁহারই বিশেষ যত্নে, আগ্রহে এবং বিশিষ্ট-সাহায্যে ইহা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ১০৬।১ নম্বর গ্রে-ষ্ট্রীটের প্রাসাদে পরিষৎ কিছুকাল সঞ্চালিত হইয়াছিল। অনন্তর কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ১৩৭।১ নম্বর ক্ষুদ্র ভাড়াটীয়া ঘরে কিছুদিন থাকিয়া, পরিষৎ ১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শুভ শুক্লা-নবমী তিথিতে ইহার বর্ত্তমান সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়াছে। প্রায় পাঁচ বৎসর পরিষৎ এই মন্দিরে সগৌরবে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আসিতেছে। আমার

সভাপতিত্বকালে এই সুঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমিও গৌরবান্বিত হইয়াছি। তৎপরে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ ভবন-নির্ম্মাণের জন্য বদান্যবর মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী পরিষৎ-মন্দিরের পূর্ব্বদিকে প্রায় ৷৷৹ দশ কাঠা জমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য দানপত্র ও নূতন মন্দিরের নক্সাদি প্রস্তুত হইয়াছে। পরিষৎ-মন্দিরের সহিত রমেশচন্দ্র-স্মৃতিভবন একত্রিত হওয়ায় পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। রমেশ-ভবন নির্ম্মাণের নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ চাঁদাও আদায় হইতেছে।

সভ্য-সংখ্যা

১৩১১ সালের শেষে পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৭০৬ ছিল। তৎপরবর্ষে অর্থাৎ আমার সভাপতিত্বের প্রথম বর্ষে সভ্যসংখ্যা মোট ৭৬৪ জন হইয়াছিল। অতঃপর ক্রমশঃ সভ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১৩১৮ সালের বর্ষশেষে উহা ১৮৪২ হইয়াছিল এবং গত বর্ষে মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন সভ্যসংখ্যা ১৯০৬ ছিল। এই আট বৎসরের মধ্যে সভ্যসংখ্যা প্রায় ত্রিগুণ হইয়াছে। ইহা বড়ই আনন্দের বিষয় যে, আট বৎসরে সভ্যসংখ্যার এত বৃদ্ধি হইয়াছে। আরও আনন্দের বিষয় যে, এখন সুধী ও সজ্জনগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পরিষদের সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতেছেন।

আয়-ব্যয়

সভ্যসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত পরিষদের আয়-ব্যয়ের পরিমাণও ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৩১১ সালের মোট আয় ৪৪৪৮৶১৫ ও মোট ব্যয়—৪১০৭৵৫ স্থলে, ১৩১২ সালে ৪০২০৵১০ আয় ও ৪০০১৷৷১৫ ব্যয় হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৩১৭ সালে মোট আয় ৯৫৭৮৷/৫, মোট ব্যয় ৯১৩৮৶৭৷৷, ১৩১৮ সালে মোট আয় ১০৫৬৮৵৶৭৷৷ ও ব্যয় ১০৪১৪৵৶১২৷৷ হইয়াছিল। গতবর্ষে মোট আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—৩১,২২৯৵৶২৷৷ পাই--ও মোট ব্যয় ১৯,২১০৷৶৩ পাই টাকা হইয়াছিল। এরূপ উন্নতি বড়ই আশাজনক।

শাখা-সভা

বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রদেশে বঙ্গ-সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই পরিষদের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। এই সুমহৎ উদ্দেশ্য কেবল একটী মূলসভা দ্বারা সাধিত হইতে পারে না। শাখা-প্রশাখা না থাকিলে, মহীরুহের আদর নাই। তজ্জন্য পরিষৎ প্রথমাবধিই শাখাসভা-সংস্থাপনার্থ চেষ্টিত। প্রথম শাখা-সভা বরেন্দ্রভূমিতে রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শাখাসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর যত্নে ও অকাতর পরিশ্রমে এবং সভ্যগণের বিদ্যোৎ-সাহিতায় বঙ্গসাহিত্যের সমূহ উপকার হইয়াছে এবং তজ্জন্য ঐ শাখাসভার সম্পাদক ও সদস্যগণ আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র। ক্রমশঃ অঙ্গদেশে (ভাগলপুরে), বঙ্গে (বরিশালে), বঙ্গদেশে (চট্টগ্রামে), রাঢ়ে (মুরশিদাবাদে), প্রাগ্জ্যোতিষে (গৌহাটীতে) ও

বারাণসীতে শাখাসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুরে ও বীরভূমিতেও সাহিত্য-সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। মূল-সভার সহিত শাখা-সভার কিরূপ সম্বন্ধ থাকিবে, তৎসম্বন্ধে নিয়মাবলি প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, অন্যত্র শাখাসভা সংস্থাপনের ব্যাঘাত হইয়াছিল। এখন নিয়মাবলি প্রস্তুত হইয়াছে বটে, কিন্তু তৎসম্বন্ধে কতকগুলি আলোচ্য-বিষয় এখনও বিদ্যমান আছে। রঙ্গপুর-শাখাসভার সহিত কতকগুলি বিশেষ আলোচ্য-বিষয় থাকায় মূল ও শাখা-সভার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া তাহা মীমাংসার জন্য প্রস্তাব করিয়াছি। আশা করি, সত্বরই সকল শাখা-সভার সহিত সুসম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্ উন্নতির সরল ও বিস্তৃত সোপান নির্ম্মিত হইবে। শাখা-সভার সংখ্যা ও গৌরব বৃদ্ধির উপরেই বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি নির্ভর করে; তবে আমার এ কথাও বলা আবশ্যক যে, কেবল প্রত্নতত্ত্ব এবং শিলালিপি ও তাম্রফলক আবিষ্কারদ্বারা ও পুরাতন গ্রন্থপ্রকাশদ্বারাই সাহিত্যের বিস্তার হইবে না। শাখাসভা-সমূহের সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞান ও বিদ্যার বহুল প্রচারদ্বারা সাহিত্যক্ষেত্রের সর্ব্altবিধ কার্য্য-বিস্তার জন্য সময়ে সময়ে উৎসাহ প্রদান আবশ্যক এবং কার্য্যের ও কার্য্যপ্রণালীর পরিদর্শনও আবশ্যক। মূল-সভার এই বিষয়ে ক্রমশঃ অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে।

যতদিন না সাহিত্য-পরিষৎ দেশের বিদ্বজ্জন-সমাজের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়-সকল তাঁহার নিকটস্থ করিতে পারিবেন, যতদিন সাহিত্যালোচনায় পরিষদের সাহায্য অপরিহার্য্য হইয়া না উঠিবে, যতদিন ইহার সদস্যশ্রেণীভুক্ত হওয়াকে দেশের কৃতবিদ্য সম্প্রদায় গৌরবের বিষয় বলিয়া অনুভব করিতে না পারিবেন, ততদিন সাহিত্য-পরিষদের অস্তিত্বের সার্থকতা হইবে না। সাহিত্য-সম্বন্ধে যে কোন সন্ধান, যে কোন উপদেশ, যে কোন গবেষণা আবশ্যক হইবে, তাহাই যখন সাহিত্য-পরিষৎ প্রার্থনামাত্র পূরণ করিতে পারিবেন, তখনই বুঝা যাইবে, সাহিত্য-পরিষদের জন্ম সার্থক হইয়াছে। দেশের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থায়, পাঠ্যপুস্তক রচনায়, পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচনে, সাহিত্যের সমালোচনায়, সাহিত্যের গতিনির্দ্দেশে সাহিত্য-পরিষদের সাহায্য লোকে উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, যখন না লইয়া চলিতে পারিবে না, তখনই বুঝা যাইবে, সাহিত্য-পরিষদের জন্ম সফল, অস্তিত্ব সার্থক।

এই উচ্চ আশায় লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য-পরিষৎকে কার্য্য করিতে হইলে, ইহাকে দেশের অভ্যন্তরে, প্রতি সভ্যসমাজকেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া দৃঢ়ভাবে উপবেশন করিতে হইবে এবং দেশের লোককে নিজ প্রতিভাদ্বারা আকর্ষণ করিয়া আপনার উদ্দেশ্য-পরিচালনে ব্যাপৃত করিতে হইবে। জেলায় জেলায়, বিভাগে বিভাগে, শাখাপরিষৎ সংস্থাপন এই সুমহৎ উদ্দেশ্য-সাধনের একটি বিশেষ উপায় বলিয়া বিবেচনা করি। যাঁহারা মনে করেন, শাখা-প্রশাখা অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে, মূলের রস শুষ্ক হইবে, তাঁহারা সামান্য গুল্মের সহিত পরিষদের তুলনা করিয়া অমূলক শঙ্কায় শঙ্কিত হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত মহান্ বটবৃক্ষের ন্যায় মহান্ মহীরুহের স্বধর্ম্মই এই যে, যেমন শাখাপ্রশাখা প্রভৃতির বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি হইতে থাকে, ততই তাহার মূলের বৃদ্ধি ও বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল মূল

মৃত্তিকার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সকল ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন করিয়া থাকে। সাহিত্য-পরিষৎ বঙ্গদেশের প্রতি সজ্জনকেন্দ্রে আপনার উপকারিতা যদি অনুভব করাইয়া দিতে পারে তাহা হইলে, তাঁহার শক্তিবিকাশের সুযোগ বাড়িবে বৈ কমিবে না। যে দিন বুঝিব, দেশের সর্ব্বত্র শাখাপ্রশাখা ছড়াইয়া মূল-পরিষৎ ফলফুল ও ছায়াদানে নিজের কেন্দ্রগত শক্তি-পরিচালনে সমর্থ হইয়াছেন, সে দিন বুঝিব, আমাদের এই পরিশ্রম, এই আকিঞ্চন, এই অধ্যবসায় প্রকৃত সফলতা লাভ করিয়াছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, স্বাধীন চেষ্টার দোহাই দিয়া একক্রিয়তা হারাইলে, উচ্ছৃঙ্খলতারই বৃদ্ধি হয়; ভেদ-জ্ঞান বাড়িয়া যায়, কর্ম্মকুশলতার মাদকতায় আত্মম্ভরিতা ও অন্যায় স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা আবির্ভূত হয়। একে ত আমরা একক্রিয়তায়, পরস্পরের সহকারিতায় অপটু, তাহাতে আবার স্বাধীনচেষ্টার মোহকর প্রলোভন সম্মুখে ধরিলে, হয় ত আমাদের এই "বার রাজপুত তের হাঁড়ীর" দেশে বিভিন্ন কেন্দ্রসভা হইতে বিচ্ছিন্নভাবে স্বাধীন বিভাগীয় সভা, মহকুমা-সভা, থানা-সভা, গ্রাম-সভা জন্মিতে বড় বিলম্ব হইবে না। শেষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সংস্রব বা সাহায্য কাটাইতে গিয়া স্বাধীনতার দোহাই দিয়া গ্রামের বিভিন্ন পল্লীতে পল্লী-পরিষদের কল্পনাও যে উত্থিত হইবে না, তাহা কে অঙ্গীকার করিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক ভাষারও প্রভেদ হইবে।

এই বিপদ্ নিবারণের জন্য মূল-পরিষৎ হইতে দেশের সর্ব্বত্র কিরূপে সাহিত্য-পরিচালনার সুব্যবস্থা করিতে পারা যায়, কিরূপে দেশের সর্ব্বত্র শাখা-পরিষৎ স্থাপিত হইয়া দেশে অন্ততঃ সাহিত্যের শক্তিপরিচালনে একক্রিয়তা আনিতে পারে, কিরূপে নবীন শাখা-গুলিকে কর্ম্মক্ষম এবং স্বচ্ছন্দে (মূল-পরিষদের নেতৃত্বের তিক্তাস্বাদ অনুভব না করিয়া) কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে পরিষদের পরিচালকবর্গের অবহিত হইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

গ্রন্থ-প্রকাশ

পরিষদের যশঃ ও উপকারিতা অনেকটা গ্রন্থ-প্রকাশের উপর নির্ভর করে। গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির কার্য্যক্ষেত্রও ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছে। লালগোলার বদান্যবর রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুরের বার্ষিক দান ৮০০৲ টাকাই গ্রন্থ-প্রকাশের ভিত্তি এবং পরিষদের সদস্য-গণ ও বঙ্গসাহিত্য-সেবিগণ তাঁহার নিকট চিরঋণী। অন্যান্য মহোদয়গণ, বিশেষতঃ দিঘা-পতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। গতবর্ষে বাঙ্গালার গভর্মেণ্ট গ্রন্থপ্রকাশার্থ ১২০০৲ টাকা বার্ষিক দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সুতরাং গত আট বৎসরের অপেক্ষা ভবিষ্যতে আরও অধিক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা। গত ৮ বৎসরে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, ছুটীখাঁর মহাভারত, ব্রজপরিক্রমা, বিদ্যাপতির পদাবলী, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নব্য-রসায়নীবিদ্যা,

শ্রীযুক্ত নিখিলনাথের প্রতাপাদিত্য, রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ, ঐতরেয়-ব্রাহ্মণের অনুবাদ, রায়-বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতার অনুবাদ, শতপথব্রাহ্মণের অনুবাদ, শ্রীভাষ্যের প্রথমাংশের অনুবাদ, মিলিন্দপঞ্‌হো, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বৃত্তান্ত ও শ্রীযুত সতীশচন্দ্র ঘোষের চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য চাক্‌মাজাতির বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। গত বর্ষে পরিষদের প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সংখ্যা ৪০ হইয়াছে। এই গ্রন্থসমূহের পর্য্যালোচনাদ্বারা সম্যক্ প্রতীতি হইবে, পরিষৎ নিজ-প্রবর্ত্তিত কার্য্যে কিছুমাত্র শিথিল নহেন; গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির সদস্যগণ অতিযত্ন ও আগ্রহের সহিত প্রকাশকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট সকলেই ঋণী।

পরিষৎ-পত্রিকা

গ্রন্থপ্রকাশ অপেক্ষা পত্রিকার কার্য্য গুরুতর। পুরাতন গ্রন্থের প্রকাশ বা অনুবাদ অপেক্ষা মৌলিক প্রবন্ধ যে অধিক আয়াস ও চিন্তাসাধ্য এবং সাহিত্যের পরিপোষক, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন; সুতরাং পত্রিকার উপর পরিষদের গৌরব বিশিষ্টরূপে ন্যস্ত। প্রত্যেক মাসিক সভায় প্রবন্ধ পঠিত ও সময়ে সময়ে আলোচিত হয়, কিন্তু সকল প্রবন্ধ বিশেষ কারণে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় না। তাহাদের ভিতর বাছিয়া বাছিয়া মৌলিক প্রবন্ধগুলিই পত্রিকায় স্থান পায়। এক্ষণে ইউরোপে ও আমেরিকায় পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের আদর হইয়াছে এবং আমার আশা আছে যে, অচিরে পরিষৎ-পত্রিকা সাহিত্যজগতের 'জার্নেল্'সমূহের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান প্রাপ্ত হইবে। ইহার বর্ত্তমান অবস্থাতেই আকৃষ্ট হইয়া বঙ্গদেশীয় গভর্মেণ্ট বার্ষিক ২০০ সংখ্যা লইবার জন্য ৬০০৲ টাকা প্রদানের আদেশ দিয়াছেন। এই আট বৎসরে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহকে ভাষাতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস, কাব্য ও বিজ্ঞান এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম কয়েক বৎসর ভাষাতত্ত্বের আলোচনাই অধিক হইয়াছিল। বঙ্গদেশের বিবিধ প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দাদির প্রচুর সঙ্কলন হইয়াছে। রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, পাবনা, নদীয়া, বগুড়া, চাক্‌মাদেশ, রাঢ়প্রদেশ প্রভৃতির গ্রাম্য বা প্রচলিত শব্দ ও সাহিত্যের ভাষায় বিদেশী-শব্দ-সঙ্কলনে শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুত নরেশচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার মজুমদার, শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুত কৃষ্ণনাথ সেন বিশেষ যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে শব্দ চয়ন করিয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যাকরণ সম্বন্ধেও আমাদের সুযোগ্য খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীযুত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত ব্যোমকেশ মুস্তফী প্রভৃতি প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মৌলিক অনেকগুলি প্রবন্ধ শেষের কয়েক বৎসর প্রকাশিত হইয়াছে। তাম্রশাসন ও খোদিতলিপি, বৌদ্ধ মূর্ত্তি ও দেবমূর্ত্তি এই সকলে আমাদের সুযোগ্য সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ, শ্রীযুত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সজ্জনগণ বিশেষ মনোযোগ প্রদানদ্বারা পুরাতন ঐতিহাসিক

রহস্যের আবিষ্কার করিয়া পরিষদের নাম জগদ্‌বিখ্যাত করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। ঐতিহাসিক শ্রেণীর প্রবন্ধ এবং গ্রন্থও অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছে। অনেকগুলি প্রদেশের ও জাতির ইতিহাস হইতে সারসংগ্রহ করিলে, বঙ্গবাসীদের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারে। রাজাদের জন্মমৃত্যু, সন্ধিবিগ্রহ, রাজ্যাধিকার বা রাজত্ব-লোপের বিবরণ প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসের একমাত্র উপকরণ নহে ; দেশবাসীদের সভ্যতার ও সাহিত্যের ইতিহাসই বঙ্গের ইতিহাস। বাঙ্গালার বীরপুরুষগণের জীবন চরিত বাঙ্গালার পুরাবৃত্তের অঙ্গ। শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি মনীষিগণ পুরাবৃত্তক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

কাব্যক্ষেত্রেও আমাদের কৃতিত্ব সগৌরবে উল্লেখযোগ্য। পুরাতন লুপ্তপ্রায় অনেক সুকবির লেখার উদ্ধার হইয়াছে। কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চট্টগ্রামের ছেলে-ঠকান ধাঁধাঁ ও ছড়া, নারায়ণদেবের পাঁচালী, নিরক্ষর কবি মাণিকগাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রদেশের গ্রাম্যগীতি, সুপ্রসিদ্ধ পুরাতন কবিদিগের কাব্যসমালোচনা-বিষয়ক প্রবন্ধে এই আট বৎসরের পত্রিকা সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। দুইশত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা কবিদের গ্রন্থের মধ্যে অধিকাংশই গভীর কালসলিলগর্ভে নিহিত হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিসনারী কেরী প্রভৃতি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষার মানরক্ষা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। বটতলায় কবিকঙ্কণের "চণ্ডী" প্রথম এক রকমে প্রকাশিত হয় ; পরে সুকবি স্বর্গীয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কবিকঙ্কণের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহার রুচির পরিচয় দিয়াছিলেন। বটতলার মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারিগণ বৈষ্ণবকবিদিগের গ্রন্থ ও পদ, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যমঙ্গল এবং পদকল্পতরু ও পদকল্পলতিকা প্রকাশ, বৈষ্ণব-কবিদিগের রসাত্মক রচনা প্রকাশ করিয়া এক শ্রেণীর বঙ্গীয় কবির গৌরবের সোপান দেখাইয়াছেন। পরিষদের প্রবন্ধ-লেখকগণ সকল প্রদেশের, সর্ব্বশ্রেণীর কাব্য ও রচনা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গসাহিত্যের আদর বৃদ্ধি করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। লেখকগণের নামের তালিকা সুদীর্ঘ, কিন্তু তাঁহারা সকলেই সুরুচির ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন।

বিজ্ঞানাধিকারে অধ্যাপক শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, শ্রীযুত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ও শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক শব্দচয়ন ও শব্দ সৃষ্টি-সম্বন্ধে আমার সহিত মতভেদ থাকিলেও প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন। তিনি জগদ্‌বিখ্যাত ও বাঙ্গালীর গৌরবের স্থল। হেমচন্দ্রও বৈজ্ঞানিক-কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। শ্রীযুত দুর্গানারায়ণ সেন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদক্ষেত্রে অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কারের ফল প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধও অনেক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার তালিকা পাঠ করিয়া আপনাদের মূল্যবান্ সময় নষ্ট করিব না।

আপনাদের নিকট বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে শোক-সূচক কথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না। এই আট বৎসরের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য সাহিত্যসেবী আমাদিগকে কাঁদাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের মানবদেহ-ত্যাগে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। কতকালে সে ক্ষতির পূরণ হইবে, বলা যায় না। কখন হইবে কি না, তাহাও বলা যায় না। তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তির সমকক্ষ কীর্ত্তিমান্ পুরুষ নিশ্চয়ই দুর্লভ হইবে। যাহা যায়, তাহা প্রায়ই ফেরে না; বিশেষতঃ রাজনৈতিক ঘটনা-পরম্পরায় কবিত্বের নির্ঝর শুষ্ক-প্রায়। কেবল তাহাই নহে, লোকের অর্থের প্রয়োজন ক্রমশঃ বেশী হইতেছে, সুতরাং অর্থ-লিপ্সাও বাড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যারই আদর বাড়িতেছে; বঙ্গের নিঃস্বার্থ উপ-কারার্থ স্বার্থহীনতার হ্রাস হইতেছে। চরক ও সুশ্রুতের প্রচারক আমার বন্ধুবর অবিনাশ চন্দ্রের অথবা বদান্যবর মহাচিকিৎসক মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ ও বিজয়রত্নের ন্যায় স্বনাম-ধন্য পুরুষ কি আর বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিবে; আরাধ্য মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ন্যায় আর দার্শনিক পণ্ডিত কি বঙ্গদেশ অলঙ্কৃত করিবে? মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহন ও ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের ন্যায় মহাত্মাগণ ও আনন্দমোহন বসুর ন্যায় স্বদেশহিতৈষী ফিরিয়া পাওয়া আশাতীত! বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী যোগেন্দ্রনাথের ন্যায় পুরুষের অকাল-মৃত্যুতে যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পূরণ সহজ নহে। সদ্ভাব-শতক-রচয়িতা কবিবর কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, উপন্যাস-রচয়িতাগ্রগণ্য দামোদর মুখোপাধ্যায়, খ্যাতনামা কবিকুলতিলক নবীনচন্দ্র সেন, সুলেখক স্বদেশহিতৈষী রমেশচন্দ্র দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর, অদ্বিতীয় পরিহাস-রসিক ইন্দ্রনাথ, কবিবর রজনীকান্ত সেন, চিন্তাশীল বীরেশ্বর পাঁড়ে, ভক্তশ্রেষ্ঠ শিশিরকুমার, কবিশ্রেষ্ঠ গিরীশচন্দ্র, কবিবর মনোমোহন বসু, অঙ্কশাস্ত্রবিশারদ গৌরীশঙ্কর, কবিকুলতিলক দ্বিজেন্দ্রলালের সমকক্ষ ব্যক্তির শীঘ্র পুনরভ্যুদয়-প্রত্যাশার অবকাশ নিতান্তই কম। এই সাহিত্য ও কর্ম্মবীরগণের মধ্যে অনেকেই অকালে আমাদিগকে ছাড়িয়া এবং বঙ্গদেশকে তমসাবৃত করিয়া গিয়াছেন। আমরা যথাসাধ্য এই মহাত্মাদিগের স্মৃতিরক্ষার্থ উদ্যোগ করিয়াছি, তবে তাঁহারা তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষার কার্য্য নিজেরাই করিয়া গিয়াছেন; আমাদের কাজ কেবল শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তৈলচিত্র ও বাৎসরিক বৃত্তি এবং পারিতোষিকের প্রায়ই ব্যবস্থা হইয়াছে।

পরিষদের ছাত্রসভ্যগণ বেশ কাজ করিতেছেন। ছাত্রসভ্য-সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছে এবং তাঁহারা অনতিপরেই তাঁহাদের যোগ্যস্থান অধিকার করিয়া বঙ্গসাহিত্যের সম্যক্ পুষ্টিসাধনে যোগ দিবেন। তাঁহারাই দেশের ভরসা।

সাহিত্যকলা এবং সূক্ষ্মশিল্পই ভারতবর্ষের অতীত জ্যোতির মূল-কারণ। সেকেন্দর, হানিবল বা নেপোলিয়ানের ন্যায় দিগ্বিজয়ীদিগের নরশোণিতারক্ত প্রতিভা ভারতবর্ষীয় কোন মহারথীর অদৃষ্টে ছিল কি না, জানি না ও এক্ষণে জানিবার উপায়ও নাই, আবশ্যকতাও নাই। চেঙ্গিজ বা তাইমর-লঙ্গের সদৃশ মানবরুধিরাসক্ত ব্যক্তি যত কম হয়, ততই ভাল। অশোকাদি

বিজয়িগণ ধর্ম্মবিস্তার করিয়াছিলেন মাত্র; কেবল অধিকার-বিস্তার তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। পরন্তু বেদ, উপনিষৎ, কাব্য ও পুরাণাদিতে এবং আয়ুর্ব্বেদ ও দর্শনাদিতে ভারতবর্ষ সভ্যজগতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু এখনও সেই পূর্ব্বস্থান অধিকারের উপায় আছে। যে মহাকবি "মন্দঃ কবিযশঃ প্রার্থী" ও "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ" মনে করিয়া "রঘুবংশ" মহাকাব্য রচনা করিয়া উপহাস্যতা প্রাপ্ত হইবেন, আশঙ্কা করিয়াছিলেন; তাঁহারই "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" জর্ম্মান্ দেশীয় মহাপণ্ডিত শ্লেগেল ভ্রাতৃদ্বয়ের মনোযোগ মহাবলে প্রথম আকর্ষণ করায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। "মহাদেবাদিদেবাদ্ অধিগত" অ ই উ ঋ ৯ ক্ প্রভৃতি মহাসূত্রই বর্ত্তমান ভাষা বিজ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি। কিরূপ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া মহর্ষি পাণিনি এই মহাসূত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তার অতীত। বেদই এখন পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া অনুমিত হই-য়েছে। ন্যায়দর্শন ও বেদান্ত-দর্শন এখন সর্ব্বত্র আদৃত। আয়ুর্ব্বেদের প্রভাব পাশ্চাত্য আসিয়ায় খলিফাদিগের রাজধানীতে আদৃত হইয়া ইউনানি চিকিৎসা-শাস্ত্রকে পরাভূত করিয়া-ছিল। দশমিক অঙ্ক প্রণালী আপাততঃ অকিঞ্চিৎকর মনে হইলেও, উহা অঙ্কশাস্ত্রের আদি এবং উহাও ভারতবর্ষসম্ভূত। কলাবিদ্যায় ভারতবর্ষের গৌরব সর্ব্বদেশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। অরফিয়াস (Orpheus) নিশ্চয়ই গীতিবিদ্যার শিক্ষা ভারতবর্ষ হইতে গ্রহণ করিতে পারিতেন। ঢাকার সূক্ষ্মবস্ত্র এককালে রোমের রাজধানীতে বিশেষ আদৃত ছিল। প্রধানতঃ কার্পাসই ইউরোপীয় বণিক্‌দিগকে ভারতবর্ষে আকর্ষণ করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের উচ্ছেদের কারণীভূত হইয়াছিল। পূর্ব্বে লাল ও নীল রং আর কোথাও হইত না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার বিশ্বাস, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের সেই অদ্ভুত কীর্ত্তিজ্যোতিঃ "ন পুনরাবৃত্তয়ে" অন্তর্হিত হয় নাই। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার সত্বরই দূরীভূত হইবে; অরুণোদয় দূরবর্ত্তী নহে। সাবিত্রীদেবী পূর্ব্বদিক্ হইতে আমাদিগকে ঘন ঘন উৎসাহিত করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ভারতবর্ষের সাহিত্যের পুনরুজ্জীবনের প্রথম শ্বাসপ্রশ্বাস। পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে সন্ন্যাসী মহাযোগী হরিদাস যেরূপ দশমাস কাল শ্বাসপ্রশ্বাস-বিরহিত হইয়া ভূগর্ভে নিহিত ছিলেন, প্রাচ্য আর্য্যসন্তানগণও সেইরূপ দশ শত বর্ষকাল প্রকৃত মনুষ্যোচিত মানসিক বৃত্তিসমূহ হইতে স্খলিত হইয়া মৃতপ্রায় নিহিত ছিলেন। এই তমসাবৃত যুগে নিদ্রাভঙ্গের সময়ে সময়ে উদ্যোগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে চৈতন্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। পরিষৎ সেই ক্ষণস্থায়ী চৈতন্যোদ্রেক কালের (Renaisance) বঙ্গসাহিত্যসম্বন্ধীয় মনুষ্যজীবনোচিত কার্য্যের আবিষ্কার করিতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে বটে, কিন্তু পরিষদের প্রধান-উদ্দেশ্য প্রাচ্য আর্য্যজাতির অনন্ত কীর্ত্তি ধারাবাহিকরূপে অনন্তকাল-ব্যাপী করা, সভ্যজগতে ভারতবর্ষ যাহাতে ইহার পুরাতনস্থান পুনরধিকার করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা। সেই চেষ্টাই বলবতী হওয়া আবশ্যক।

অতীত গৌরবের স্মৃতি, পিতা-পিতামহাদির চিন্তাশীলতা ও চিন্তার ফলস্বরূপ কীর্ত্তিকলাপ,

আমাদের অনুকরণ-স্পৃহার উৎসাহবর্দ্ধক। "বড় বাপের বেটার" পিতৃসদৃশ বড় হইবার ইচ্ছা প্রায়ই স্বভাবসিদ্ধ; যদিও হতভাগ্য ভারতে সেরূপ ইচ্ছা থাকিলেও প্রকৃত আগ্রহ বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু স্মৃতি ও উৎসাহ থাকিলেই কাজ হইবে না; কেবল পুরাকালের বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিতপ্রায় অতীত কীর্ত্তির চিহ্ন-আবিষ্কারদ্বারা বর্ত্তমান ভারতবর্ষের প্রতিভা সভ্যজগতে পুনর্ব্বার উদ্ভাসিত হইবে না। বর্ত্তমান পুরুষের কীর্ত্তি আবশ্যক; পূর্ব্বপুরুষগণের নাম ও নিশান রক্ষার উপযোগী আমাদেরও ক্রিয়াকলাপ আবশ্যক। আমরা প্রফুল্লচন্দ্র এবং জগদীশের ন্যায় আরও জগদ্বিখ্যাত বঙ্গদেশীয় বৈজ্ঞানিক চাই। আমরা আবার সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস ও শ্রীকণ্ঠ ভবভূতির ন্যায় কবির আবির্ভাব চাই। বাল্মীকি ও ব্যাস প্রকৃত পূর্ব্বসূরী। তাঁহাদের ন্যায় কবির বর্ত্তমানকালে আবির্ভাব আশাতীত হইলেও হোমার, দান্তে, গেটেহের ন্যায় কবিগণের আমরা এখনও ভারতভূমিতে আবির্ভাব চাই। ভারবি, মাঘ বা শ্রীহর্ষের কেনই বা পুনরাবির্ভাব হইবে না? আমরা নিউটন ও লাপ্লাসের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বর্ত্তমানকালে চাই; আর্য্যভট্ট ও ভাস্করাচার্য্যের পুনর্জ্জন্ম বর্ত্তমান-কালে চাই। ডারউইন প্রভৃতি অজ্ঞানতিমিরনাশক দার্শনিকের সমকক্ষ মহাপুরুষ বিরল হইলেও, নব্যভারতে নূতন অবস্থায় ভারতবর্ষীয় ডারউইনের আবির্ভাবের প্রার্থনা অসঙ্গত নয়। সাহিত্য-পরিষৎ সাহিত্য-ক্ষেত্রের এই সকল মহারথীদিগের স্মৃতি সম্মুখে পথপ্রদর্শক-স্বরূপ রাখিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত। আসুন, সকলে সাহিত্যসংসারে আর্য্যভূমির লুপ্তপ্রায়-প্রতিষ্ঠা রক্ষার জন্য এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকেই অবলম্বন করিয়া আগ্রহ-সহকারে চেষ্টা করি।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

বাঙ্গালা-ভাষায় দ্রবিড়ী উপাদান

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির উৎপত্তির এবং বিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষের সভ্যতা আর্য্য এবং দ্রবিড়-সভ্যতার মিশ্রণে বিকাশলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাসে এই দ্রবিড়-প্রভাব কতখানি, তাহা বুঝিয়া লইতে হইলে, বাঙ্গালা-ভাষার উপর দ্রবিড় জাতীয়দিগের ভাষার প্রভাব কতখানি, তাহা দেখিয়া লইবার প্রয়োজন। কেবলমাত্র বঙ্গভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের জন্যও এই অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্ব্বে "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় "দেশী শব্দ" (একাদশ ভাগ, ৩৯ পৃঃ) এবং "পালি ও বাঙ্গালা" (পঞ্চদশ ভাগ, ১ পৃঃ) প্রবন্ধদ্বয়ে এ কালের ভাষার উৎপত্তির দুইটি দিকের কথা সংক্ষেপে সূচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। ঐ দুইটি দিক্ হইতেই যে অনেক অনুসন্ধান করিবার আছে, এইটুকু বুঝানই আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য-পরিষদের একটি সভায় এ বারের বক্তব্য বিষয়ে কিছু বলিবার সুবিধা পাইয়াছিলাম। ভাষার উৎপত্তি-বিচারসংকল্পে এ দিকেও সুধীগণের বিশেষ দৃষ্টি পড়িবে, আশা করি।

আর্য্য সভ্যতা-বিস্তারের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সকল দ্রবিড়জাতীয়েরা বাস করিত, তাহাদের ভাষা এখন বাঙ্গালা। কাজেই পূর্ব্বকালে কোন্ জাতির কি ভাষা ছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। অন্ধ্র দেশের রাজারা এক সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজাধিরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং তখন নিশ্চয়ই সমগ্র আর্য্যভাষার উপর তাঁহাদের ভাষার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। অন্ধ্রদিগের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ আন্ধ্রভাষায় যে "বৃহৎ-কথা" রচিত হইয়াছিল, তাহা লুপ্ত না হইলে, হয় ত এ বিষয়ের অনেক তথ্য পাওয়া যাইতে পারিত। কালিদাস-বর্ণিত ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে দ্রবিড়কুলের পাণ্ড্যরাজকে আর্য্যকুমারীর পাণিগ্রহণের উপযুক্ত বলিয়া দেখিতে পাই। তামিল ভাষা এখন মান্দ্রাজ সহর এবং উহার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভূভাগে প্রচলিত আছে; কিন্তু এক সময়ে তামিল-ভাষীরা তমলুকে ছিলেন বলিয়া, একটি মতবাদ প্রচলিত আছে। যাহাই হউক, ভাষার বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, এক সময়ে তেলেগু, তামিল প্রভৃতি আর্য্যেতর ভাষা বঙ্গদেশে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

অনেক সময়ে এরূপ ঘটিয়াছে যে, যে সকল আর্য্যেতর প্রচলিত শব্দের অর্থ আমরা বুঝিতে পারি নাই, চেষ্টা করিয়া সে সকল শব্দের অর্থ দিবার জন্য আমরা আদিম শব্দগুলিকে বিকৃত করিয়া, সংস্কৃত শব্দের কাছাকাছি করিয়া তুলিয়াছি। ওড়িশায় সকল শ্রেণীর অনার্য্যজাতি আপনাদের প্রাচীন ভাষা পরিত্যাগ করে নাই; অনেক ভৌগোলিক নামও সম্পূর্ণরূপে প্রাচীনতা-রক্ষা করিয়া প্রাচীন কালের অনার্য্য-প্রভাবের ইতিহাস রক্ষা করিতেছে। বঙ্গদেশে এমন অসংখ্য গ্রামের নাম পাওয়া যায়, যাহা একালে আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অর্থশূন্য। সকল

নামেরই যে অর্থ ছিল, তাহা নিশ্চিত ; কিন্তু যে সকল ভাষা হইতে ঐ নামগুলির উৎপত্তি, এখন তাহার সন্ধান পাওয়া সহজ নয়।

দ্রবিড় জাতির সহিত অত্যধিক পরিচয়ের পর সংস্কৃত ভাষাতেও উহাদের অনেক শব্দ কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছিল। দৃষ্টান্তস্থলে, J. R. A. S. (Bombay Branch) পত্রে এ বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা হইতে কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি। (১) প্রাচীন সংস্কৃতে অশ্বের "ঘোটক" নাম ছিল না। তেলেগু ভাষার "গুর্রম্-মু" ("মু" সকল বিশেষ্য শব্দেই প্রায় লাগে) সম্ভবতঃ অন্ধ্র রাজাদের আমলে "ঘোড়ো" হইয়াছিল ; কেন না, গুজরাটে সংগৃহীত "দেশী নামমালা"য় "ঘোড়ো" পাওয়া যায়। দেশী শব্দকে সংস্কৃত করিতে হইলে, একটু অতিরিক্ত ব্যঞ্জন সমাবেশ করিতে হয় ; তাই অনার্য্যের তৃণমাত্রভোজী "ঘোড়ো" আর্য্যের মন্দুরায় আসিয়া, অতিরিক্ত ব্যঞ্জন ও দানার জোরে "ঘোটক" হইয়া উঠিয়াছিল। এখনও বরিশাল-অঞ্চলে "ঘোড়া"র উচ্চারণ তেলেগুর "গুর্রা"র অনুরূপ। (২) মলয়ালম্ এবং তামিল ভাষায় পাহাড়ের নাম হইল "মলৈ"। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ দেশের সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয়ের পর আমরা যখন আর্য্যের দেশে মলয়-সমীরণ প্রবাহিত করাইয়াছিলাম, তখন দক্ষিণ প্রদেশের একটা অনির্দ্দিষ্ট "মলৈ"কে (উহার "গিরি" অর্থ থাকা সত্ত্বেও) "গিরি" শব্দের যোগে "মলয়গিরি" করিয়া তুলিয়াছিলাম। (৩) "মীন" পাণ্ড্যজাতিদিগের কুলদেবতা। বৈদিক যুগেরও বহু পরবর্ত্তী সময়পর্য্যন্ত মৎস্যের "মীন" নাম পাওয়া যায় না ; তাহার পর কিন্তু মৎস্য-অবতারের নাম একেবারে "মীন-অবতার", এ স্থানে সে ইতিহাস অপ্রযুক্ত। ওড়িশার কন্ধদিগের ভাষাতেও মাছের নাম "মীন" এবং কানাড়ার ভাষাতেও ঐ অর্থে "মীনু"রূপ পাওয়া যায়। (৪) "কর্পূর" জিনিসটা যে দক্ষিণ দেশে উৎপন্ন এবং সেখান হইতে আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। তামিলের "করপ্পু" সংস্কৃতে "কর্পূর" হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে Ktesias ভারতবর্ষ হইতে আমদানি এই পদার্থকে ঠিক "করপ্পু" বলিয়াই লিখিয়াছিলেন।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সকল প্রদেশের ভাষাতেই তামিলের "কু" প্রত্যয় "কা," "কে," "কু" প্রভৃতিরূপে হিন্দি, বাঙ্গালা এবং ওড়িয়ায় প্রচলিত হইয়াছে। এ স্থলে কেবল শব্দকোষের কথায় নয়, ভাষার বিশেষত্ব যে ব্যাকরণে, তাহাতেও দ্রবিড়ী প্রভাব দেখিতে পাইতেছি। ওড়িয়া এবং বাঙ্গালায় এই প্রভাব যত অধিক পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়, এমন অন্য কোন ভাষায় নয়।

এ প্রবন্ধে আমার উদ্দিষ্ট বিষয়ের পরিপূর্ণ অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ করিতেছি না ; কেবল অনুসন্ধানপদ্ধতি সূচিত করিতেছি। কাজেই এখানে বিষয়টির সহজ বিবৃতির জন্য বঙ্গভাষায় প্রচলিত অল্পসংখ্যক কতকগুলি আর্য্যেতর শব্দের একটি তালিকা দিব।

১। আকালি (তামিল) = ক্ষুধা = আকাল (বাঙ্গালা) = দুর্ভিক্ষ (শব্দটির) "কাল" কথার সহিত কোনই সম্পর্ক নাই।

২। কোকা ও কোকি (ওরাঁও)—ছোট ছেলে ও মেয়েকে বলে; যথা—কোকাই-হাড়ু, কুক্‌কি-হাড়ু=খোকা ও খুকী (বাঙ্গালা); পূর্ব্ববঙ্গে কোকা ও কুকি ঠিক্ অবিকল প্রচলিত আছে।

৩। গোড়া (তেলেগু)=ঘরের ভিত ও দেওয়াল—বাঙ্গালায় ঘরের ভিত অর্থে ব্যবহার না থাকিলেও ভিত্তি বা মূল অর্থে 'গোড়া' কথার ব্যবহার আছে, যথা—আগা-গোড়া; দ্বিতীয় অর্থাৎ দেওয়াল অর্থের "গোড়া", "গোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খায়" কথায় পাওয়া যায়।

৪। চাপা (তেলেগু)—তেলেগু এবং তামিল ভাষাতে "চ" এবং "শ"এর এক উচ্চারণ; তাহা ছাড়া "চপ" লিখিলে "চাপা" উচ্চারণ করিতে হয়। বাঙ্গালায় উহা "শপ" উচ্চারিত হইবে; ইহার অর্থ "মাদুর"। ঠিক্ এই অর্থে বাঙ্গালায় "শপ" প্রচলিত।

৫। চক্কনি (তেলেগু)—সুন্দর অর্থে, যেমন, সুন্দরী স্ত্রী তেলগুতে হইবে "চক্কনি" স্ত্রী। এই "চক্কনি" হইতে বাঙ্গালার চিকণ; দৃষ্টান্ত—"চিকণ কালা"। সুন্দর অর্থে "চিকণ" বাঙ্গালায় খুব ব্যবহৃত।

৬। "ঝিঙ্গা" (মুণ্ডা)—এই তরকারির ফলের সংস্কৃত নাম "জ্যোৎস্নী"; বাঙ্গালা ঠিক ঝিঙ্গা।

৭। তা-লা (তেলেগু)—তালৈ (তামিল)=মাথা; বাঙ্গালায় "মাথার তেলো"তে এই "তা-লা" রহিয়াছে। এতদিন সংস্কৃত 'তালু' হইতে 'তোলা' আসিয়াছে, মনে হইত। 'তালু' কিন্তু বদনবিবর মধ্যগত 'টাক্‌রা' নামক স্থান।

৮। তাল্লি (তেলেগু)—তায় (তামিল)=মা; বাঙ্গালার "তালই" ("তাওয়ই") সম্পর্কে এই পিতৃ-মাতৃবৎ শব্দের চিহ্ন আছে।

৯। তোটা (তেলেগু)—তোঁট্টম্ (তামিল)=বাগান; অনেক গাছ একসঙ্গে থাকিলে, ওড়িয়াতে "তোটা" বলে, যেমন "আমতোটা"। এই "তোটা" শব্দ প্রাচীন বাঙ্গালায় পাওয়া যায়।

১০। নালু, নালুকা (তামিল)=জিভ্; বাঙ্গালায় "নোলা" কথায় রহিয়া গিয়াছে।

১১। নি-জ (তামিল)=সত্য; বাঙ্গালা নিজ্জস্ (সত্য ও ঠিক্)। মালদহের "নিচ্চোড়" ইহার সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতেও পারে।

১২। পালু (তেলেগু)—পাল্ (তামিল)=দুধ; বাঙ্গালার "পালান" কথায় উহার চিহ্ন রহিয়াছে।

১৩। পট্টু (তেলেগু ও তামিল)=রেশম ও রেশমের কাপড়। আমাদের "পাট" এবং সংস্কৃতের "পট্টবস্ত্র" এই পট্টু হইতে।

১৪। পিল্লই (তামিল)—পিল্লা (তেলেগু)=ছেলে; ওড়িয়াতে ঠিক্ "পিলাই" আছে; পূর্ব্ববঙ্গে "পোলা" ব্যবহৃত; বাঙ্গালায় "ছেলে-পিলে" শব্দে উহার অস্তিত্ব রহিয়া গিয়াছে।

১৫। পুনই বা বুনই (তামিল)—বিল্‌লি (তেলেগু)—বিলেই (ওড়িয়া)—প্রাচীন পালিতে, বৈদিক ও প্রাচীন সংস্কৃতের "মার্জ্জারকে" "বিলার" এবং "বিড়াল"রূপে পাই, "বিড়াল"শব্দ অর্ব্বাচীন সংস্কৃতেই ব্যবহৃত।

১৬। পৈয়ন্‌ (তামিল)—পৈয় (তেলেগু)—পুঅ (ওড়িয়া)=পো (বাঙ্গালা)

১৭। বানা (তেলেগু)=বৃষ্টি; ইহা হইতে আমাদের বৃষ্টি বা বৃষ্টিজনিত জলবৃদ্ধি বা "বান" হইয়াছে।

১৮। বানা (তামিল)=ধ্বজা; ওড়িয়াতে ঠিক্‌ এই অর্থেই ব্যবহৃত, চণ্ডীদাসেও এই অর্থের ব্যবহার পাই।

১৯। বেদুরু (তেলেগু)=বাঁশ; এই বাঁশের রঙ্গ্‌ হইতে সংস্কৃত "বৈদুর্য্য"।

২০। বঁটি (মুণ্ডা)—মুণ্ডাদের কেবল এই দ্রব্য নামটি বাঙ্গালা দেশে গৃহকর্ম্মের অস্ত্রবিশেষে পাওয়া যায়।

২১। বিটি (তামিল)—অন্তস্থ "ব"এর উচ্চারণ করিতে হইবে; ইহার অর্থ ঘর"; ইহা হইতে আমাদের "ভিটে"।

২২। মাখন্‌ (তামিল)=পুত্রের আদরের ডাক; বাঙ্গালার আদরের "মাখনলাল" প্রভৃতি কথায় ঐ অর্থই মনে পড়ে।

২৩। মো-ট (তামিল)—উচ্চারণ "মোটা"=বোঝা বা তল্‌পি; ঠিক্‌ এই অর্থে ঐ শব্দটি বাঙ্গালায় ব্যবহৃত। সম্বলপুর অঞ্চলে ঠিক্‌ তামিল ধরণের "মোটা" উচ্চারিত হয়।

২৪। য়িটু (তামিল)—ইটু—ঠিঁটু=বাজ্‌; পূর্ব্ববঙ্গে "বাজ" শব্দে কোথাও কোথাও "ঠা-ঠা" ব্যবহার আছে ("সধবার একাদশী")।

২৫। গুল্‌ (তামিল)—এটি শব্দ নহে; এই "গুল্‌" বহুবচন বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হয়। যে বাঙ্গালা এবং ওড়িয়া ভাষায় অনেক দ্রবিড় শব্দের ব্যবহার আছে, সেই দুইটি ভাষাতেই তামিলের গুল্‌ (গুলি) বহুবচন বুঝাইবার জন্য "গুলি" "গুলা" প্রভৃতি রূপে ব্যবহৃত হয়। এটা শব্দকোষের কথা নয়; ব্যাকরণের কথা। কাজেই বিশেষ মনোযোগ দিবার প্রয়োজন; বাঙ্গালার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে অর্থাৎ আসামের সীমানার কাছে এই "গুলা" "গিলা"রূপে ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের কাছাকাছি আসামের ভিতরে এই "গিলা" আবার "গিলাক" হইয়াছে। খাঁটি আসামে "গিলাক" পাওয়া যায় না; কিন্তু "বিলাক্‌" পাওয়া যায়। আসাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের এই প্রত্যয়ব্যবহারের কথা শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বেজ বড়ুয়া মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি।

উপরের তালিকায় যে সকল উদাহরণ দিলাম, তাহাতে আর্য্যেতর শব্দের উৎপত্তির একটা মূল নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল; কিন্তু এমন অনেক দেশী বা আর্য্যেতর শব্দ বাঙ্গালায় এবং ওড়িয়ায় তুল্যরূপে ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য।

শব্দগুলি কেবল ওড়িশা এবং বাঙ্গালায় ব্যবহৃত বলিয়া ঐ আর্য্যেতর শব্দগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন। প্রথমতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে এমন সকল শব্দ তুলিব, যেগুলি বাঙ্গালায় বড় বেশি ব্যবহৃত নাই, কিন্তু ওড়িয়ায় সম্পূর্ণ ব্যবহৃত আছে।

(চণ্ডীদাসের গ্রন্থ হইতে)

১। উসাস্—হাল্‌কা
২। ওলা—নামা
৩। কাড়ে—বাহির করে
৪। কাঁথ—দেওয়াল
৫। কেরোয়াল—বৈঠা, দাঁড়
৬। কোয়ালি—গান
৭। খুরি—ছোট বাটী
৮। গোহারি—দোহাই দেওয়া
৯। ছেলি—ছাগল
১০। টাবা—লেবুবিশেষ
১১। নেউটিয়া—ফিরিয়া
১২। পাছুড়া—উত্তরীয়
১৩। বাট—পথ
১৪। বুলা—বেড়ান
১৫। বানা—ধ্বজা
১৬। বাহুড়া—ফেরা
১৭। ব্যাজ—সুদ
১৮। বাদা—বোঝাই করা

(সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "ধর্ম্মমঙ্গল" হইতে)

১। উছর—বিলম্ব
২। কাছাড়—এখনকার আছাড় অর্থে; ওড়িয়াতে "কচারি হেবা" রূপে আছে।
৩। খাড়া—ডাঁটা
৪। জোহার—প্রণাম
৫। পেলাপেলি—ঠেলাঠেলি

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি উভয় ভাষায় প্রচলিত দেশী বা অনার্য্য শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে, যথা—(১) আঁটকুড়িয়া—বাঙ্গালা আঁটকুড়ে; (২) কিরিয়া—বাঙ্গালা দিব্যি, শপথ, কিরা; (৩) ও—প্রত্যুত্তরজ্ঞাপক; (৪) ওগো, গো—সম্বোধনজ্ঞাপক; (৫) খরা (সূর্য্যের তাপ)—এই অর্থে প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত ছিল; এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে; (৬) গছ—বাঙ্গালা, গাছ; (৭) গড়ু—বাঙ্গালা গাড়ু; (৮) গুণ্ডা—বাঙ্গালা গুঁড়া; (৯) গোটা—এক; বাঙ্গালা, অখণ্ড এক; (১০) কছার—যেখানে বন বেশি নাই, কিন্তু অল্প অল্প আছে, অথচ চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের নাম; অনেক স্থলে উদ্ভিদ্ বিশেষের ঝোপ জঙ্গলকে 'কসাড় বন' বলে। এই অর্থে আসামের প্রান্তস্থিত "কছার" বা কাছাড় দেশের নামের উৎপত্তি; (১১) পাতিল—ছোট হাঁড়ি; (১২) পিণ্ডা—পিঁড়ে, দাওয়া; (১৩) বেঁওং—সাবধান করিয়া ধরার নাম; পল্লীগ্রামে স্ত্রীলোকের ভাষায় বাঙ্গালায় ব্যবহৃত আছে; (১৪) পেঁঠি—পাঁঠার স্ত্রী; কিন্তু "পাঁঠা" শব্দ ওড়িয়ায় নাই; (১৫) পোক্—বাঙ্গালা পোকা; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে ঠিক্ "পোক্" ব্যবহৃত; (১৬) হুড়ুম—বাঙ্গালায় রাঢ় অঞ্চলে এক শ্রেণীর চা'ল-ভাজাকেই "হুড়ুম" বলে। ইহার আদিম অর্থও তাই। শব্দটি অনেক স্থলে প্রচলিত আছে। পূর্ব্ববঙ্গে "মুড়িকেই" "হুড়ুম" বলে।

আর একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার জিনিস আছে। কতকগুলি অত্যন্ত ব্রীড়াব্যঞ্জক অশ্লীল শব্দ ওড়িশায় এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত দেখিতে পাই। কোন কোন ঐরূপ অশ্লীল ওড়িয়া শব্দ নিকটবর্ত্তী বঙ্গদেশ ডিঙ্গাইয়া মালদহে অথবা পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত আছে। পরিষদের সভ্যেরা কেহ প্রয়োজনের জন্য পত্র লিখিলে, আমি ঐ শব্দগুলি লিখিয়া দিতে পারি। অত অশ্লীল শব্দ কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা চলে না। অত্যন্ত নিকট প্রতিবেশী না হইলে, যে সকল শব্দ কেহ কাহাকে সহসা বলে না, ভাষায় সেরূপ শব্দের এ প্রকার তুল্যরূপ ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারে না।

যে সকল দেশী বা অনার্য্য শব্দ একদিকে ওড়িশায় প্রচলিত আছে এবং অন্যদিকে আবার একেবারে আসামে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ শব্দের দৃষ্টান্ত পূর্ব্বে অন্যত্র দিয়াছি। আউ (চালদা), জুঁই (আগুন) প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। শুনিয়াছি, জুঁই কথাটি নাকি কাশ্মীরেও ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গভাষায় প্রচলিত দেশী শব্দগুলির কাল্পনিক সংস্কৃত ব্যুৎপত্তি গড়িয়া না লইয়া, যদি সযত্নে দেশী শব্দকোষ সংগ্রহ করা হয়, এবং প্রতিবেশী জাতির ভাষা শিক্ষা করিয়া যথার্থ ব্যুৎপত্তি স্থির করা যায়, তাহা হইলে অনেক উপকার সাধিত হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

গণিত-পরিভাষা

নিম্নে এই তালিকার অন্তর্গত পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি-সংক্রান্ত পারিভাষিক শব্দ সকল ভাস্করাচার্য্য-বিরচিত লীলাবতী, বীজগণিত ও গোলাধ্যায়, ব্রহ্মগুপ্ত-প্রণীত ব্রহ্মস্ফুট-সিদ্ধান্ত এবং চতুর্ব্বেদ পৃথূদক স্বামি-বিরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত-ভাষ্য হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। যে শব্দটি যে গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা প্রত্যেক শব্দের পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে প্রতি গ্রন্থের নামের প্রতীকদ্বারা সূচিত হইয়াছে; যথা—লী=লীলাবতী, বী=বীজগণিত, গো=গোলাধ্যায়, ব্র=ব্রহ্মস্ফুটসিদ্ধান্ত, চ=চতুর্ব্বেদ-বিরচিত ব্রহ্মসিদ্ধান্তভাষ্য।

Addition	সঙ্কলিত, সঙ্কলন, যুক্তি, (লী)
Algebra	বীজ (বী)
Alligation	সুবর্ণগণিত (লী)
Arc of a circle	চাপ, ধনুঃ (লী)
Arc, chord of	জীবা, জ্যা (লী)
Arc, height of	শর, বাণ (লী)
Area	ফল, সমকোষ্ঠমিতি, গণিত (লী)
Arithmetic	পাটী (লী)
Barter or Exchange	ভাণ্ডপ্রতিভাণ্ডক (লী)
Base	ভূমি, ভূ, কু, মহী (লী)
Base, segments of	অববাধা, আবাধা, অবধা (লী)
Billion	মহাপদ্ম (লী)
Billions, ten	শঙ্কু (লী)
Billions, hundred	জলধি (লী)
Billions, thousand	অন্ত্য (লী)
Billions, ten thousand	মধ্য (লী)
Billions, hundred thousand	পরার্দ্ধ (লী)
Centre	কেন্দ্র (গো)
Circle	বৃত্ত (লী)
Circumference	পরিধি (লী)
Coefficient (in general)	অঙ্ক (বী)
Coefficient of square of unknown quantity	প্রকৃতি (বী)
Combination	ব্যক্তি (লী)

Cone	সূচীখাত (লী)
Cosine	কোটিজ্যা (গো)
Cross-multiplication	বজ্রাভ্যাস (বী), বজ্রবধ (ব্র)
Cube (third power)	ঘন (লী)
Cube root	ঘনমূল, ঘনপদ (লী)
Cyclic order	চক্রবাল (বী)
Demonstration	উপপত্তি (বী)
Diagonal	কর্ণ, শ্রুতি (লী)
Diameter	ব্যাস, বিষ্কম্ভ (লী)
Difference	অন্তর (লী)
Difference between an integer and a fraction	ভাগাপবাহ (লী)
Dividend	ভাজ্য (লী)
Division	ভাগহার, হরণ (লী)
Divisor	ভাজক, হার (লী)
Equation	সমীকরণ (বী)
Equation, side of	পক্ষ (বী)
Equation, root of	মান, মিতি, উন্মিতি (বী)
Equation, simple, involving one unknown quantity	একবর্ণ-সমীকরণ (বী)
Equation, quadratic	অব্যক্তবর্গ-সমীকরণ, মধ্যমাহরণ (বী)
Equations, simultaneous, involving two or more unknown quantities	অনেকবর্ণ-সমীকরণ (বী)
Expression, binomial	দ্বিপদ (চ)
Expression, trinomial	ত্রিপদ (চ)
Factor	ভেদ (ব্র)
Fraction	ভিন্ন (লী)
Fraction, numerator of	লব, অংশ (লী)
Fraction, denominator of	হর, হার (লী)
Fraction, reduction to lowest terms of	অপবর্ত্তন (লী)

Fraction, compound	প্রভাগ (লী)
Fraction, compound, reduction to simple fraction of	প্রভাগজাতি (লী)
Fraction, reduction of mixed number to improper	ভাগানুবন্ধ (লী)
Fraction, reduction to common denominator of	ভাগজাতি, অংশসবর্ণন (লী)
Geometry	ক্ষেত্রব্যবহার (লী)
Hypotenuse	কর্ণ, শ্রুতি (লী)
Intersect	কলান্তর (লী)
Intersection of two lines	পাত, সম্পাত (ব্র)
Intersection of two circles	সম্পর্ক (ব্র)
Million	প্রযুত (লী)
Millions, ten	কোটি (লী)
Millions, hundred	অর্বুদ (লী)
Millions, thousand	অব্জ, পদ্ম (লী)
Millions, ten thousand	খর্ব্ব (লী)
Millions, hundred thousand	নিখর্ব (লী)
Multiplicand	গুণ্য (লী)
Multiplication	গুণন, হনন (লী) ; প্রত্যুৎপন্ন (ব্র)
Multiplier	গুণক (লী)
Multiplier by which a given number being multiplied and the product added to another given number, the sum is exactly divisible by a given number	কুট্টক
Number	রাশি (লী)
Number, whole	রূপ (লী)
Permutation	প্রস্তার (লী)
Permutation of digits	অঙ্কপাশ (লী)
Perpendicular	কোটি, লম্ব (লী)
Power, fourth	চতুর্গত (ব্র)

Power, fifth	পঞ্চগত (ব্র)
Power, sixth	ষড়্গত (ব্র)
Prime to each other	নিচ্ছেদ, নিরপবর্ত্ত (ব্র)
Principal	মূল (লী)
Product	ঘাত (লী)
Product of two or more unlike quantities	ভাবিত (বী)
Product, continued	তদ্গত (ব্র)
Progression	শ্রেঢ়ী (লী)
Progression, geometrical	গুণোত্তর (লী)
Progression, first term of	মুখ, আদি (লী)
Progression, number of terms of	পদ, গচ্ছ (লী)
Progression, common difference of	চয়, উত্তর (লী)
Progression, common ratio of	চয়োগুণ (লী)
Quadrant	তুর্য্য (গো)
Quadrilateral	চতুরস্র (লী)
Quadrilateral having two equal sides	দ্বিসমচতুরস্র (চ)
Quadrilateral having three equal sides	ত্রিসমচতুরস্র (চ)
Quadrilateral, projection of side of, on adjacent side	সন্ধি (লী)
Quadrilateral, diagonal of, on base	পীঠ (লী) ; স্বযুতি (ব্র)
Quadrilateral, circumscribed circle of	কোণস্পৃগ্‌বৃত্ত, বহির্বৃত্ত (ব্র)
Quadrilateral, radius of circumscribed circle of	হৃদয়রজ্জু (ব্র)
Quantity, positive	ধন, স্ব (বী)
Quantity, negative	ঋণ, ক্ষয় (বী)
Quantity, known	রূপ (বী)
Quantity, unknown	অব্যক্ত, যাবৎ তাবৎ (বী)
Quantity, infinite	অনন্তরাশি (বী)
Radius	ব্যাসার্দ্ধ (গো)
Rectangle	আয়ত চতুরস্র (লী)
Regular solid, cavity in the form of	সমখাত (লী)
Rule of Three, direct	ত্রৈরাশিক (লী)

Rule of Three, inverse	ব্যস্ত ত্রৈরাশিক (লী)
Rule of Three, double	পঞ্চরাশিক (লী)
Semicircle	চাপ (গো•)
Side of a figure	ভুজ, বাহু, দোষ্ (লী)
Sides, opposite	বাহুপ্রতিবাহু, ভুজপ্রতিভুজ (ব্র)
Sine	জ্যা (গো)
Sine of sum of two angles, rule for finding	সমাসভাবনা (গো)
Sine of difference of two angles, rules for finding	অন্তরভাবনা (গো)
Sphere	গোল (লী, গো)
Sphere, surface of	পৃষ্ঠফল (লী, গো)
Sphere, volume of	ঘনফল (লী, গো)
Square (second power)	বর্গ, কৃতি (লী)
Square root	বর্গমূল, বর্গপদ (লী)
Square	সমচতুর্ভুজ, সমচতুরস্র, (লী)
Substitution	উত্থাপন (বী)
Subtraction	ব্যবকলিত, ব্যবকলন, শোধন (লী)
Subtrahend	শোধক (ব্র)
Summand	ক্ষেপ (ব্র)
Surd	করণী (বী)
Surd, binomial	মহতী করণী (বী)
Terms, like	সমানজাতি (বী)
Terms, unlike	বিভিন্ন জাতি (বী)
Thousand, ten	অযুত (লী)
Thousand, hundred	লক্ষ (লী)
Transposition	সমশোধন, তুল্যশুদ্ধি (বী)
Trapezium	সমানলম্বচতুর্ভুজ (লী)
Triangle	ত্র্যস্র (লী)
Triangle, right-angled	জাত্য ত্র্যস্র (লী)
Triangle, equilateral	সমত্রিভুজ (চ)
Triangle, isosceles	দ্বিসম-ত্রিভুজ (চ)

Triangle, Scalene	বিষম ত্রিভুজ (চ)
Unity	রূপ (লী, বী)
Versed sine	উৎক্রমজ্যা (গো)

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চান্দর

নামান্তর—ছোট চান্দর

কি প্রাচীন, কি আধুনিক, কোনও আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে এই উদ্ভিদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রক্স্‌বার্গ ইহার যে সকল সংস্কৃত পর্য্যায় দিয়াছেন, সেগুলি ঠিক নহে। চন্দ্রিকা, পশুমেহনকারিকা প্রভৃতি পর্য্যায়গুলি হালিমের। চান্দরের গুণ ও ক্রিয়া এবং চন্দ্রিকার দ্রব্য-গুণোক্ত গুণ তুল্য নহে। সুতরাং রক্স্‌বার্গের মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

প্রচার

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ না থাকিলেও প্রচার বড় কম নহে। বঙ্গদেশের অনেক কবিরাজ মহাশয় ইহার ব্যবহার করেন এবং ইহার গুণবত্তাও বিশেষভাবে স্বীকার করেন।

ভাগলপুরে প্রথমানুসন্ধান

ছোট চাঁদরের প্রথম অনুসন্ধান পাই ভাগলপুরে। সেখানে একজন বাবাজী উন্মাদের ঔষধরূপে ইহা প্রয়োগ করিতেন এবং চিকিৎসকগণের নিকট মূল বিক্রয় করিতেন। এ আজ প্রায় ১৬ বৎসরের কথা। এই সংবাদ পাইয়াছিলাম বরারি হরিমোহন স্কুলের তাৎকালিক প্রধান শিক্ষক ব্রজেন্দ্র বাবুর নিকট। এই ঔষধের গুণব্যাখ্যায় উক্ত ভদ্রলোক বলেন—মাথায় রক্ত উঠিয়া যাহারা উন্মাদ-গ্রস্ত হয়, তাহাদের জন্য এই ঔষধটি অত্যন্ত উপাদেয়। ইহা অত্যন্ত নিদ্রাকর ও উত্তেজনা নাশক; এই ঔষধ-সেবনে পাগলের সুনিদ্রা হয় এবং উন্মত্ততার হ্রাস হয়।

চিকিৎসক-সমাজে নামকরণ

তৎপর আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, কতকগুলি প্রসিদ্ধ উন্মাদের ঔষধের এইটি প্রধান উপাদান। অনেকে অনেক প্রকার নামকরণ করিয়া ইহার প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন। আমি দুই এক স্থল হইতে আনিয়া মিলাইয়া দেখিলাম, ভাগলপুর হইতে আনীত মূল হইতে উহা অভিন্ন।

এইরূপে ৫।৬ বৎসর গত হইল, মূল সংগ্রহ হইত। কিন্তু কি গাছের মূল, তাহা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। একদিন এক ভদ্রলোকের সহিত প্রসঙ্গক্রমে জানিলাম, রাঢ়দেশে চান্দর ও ছোট চান্দর নামে এক প্রকার উদ্ভিদ আছে, তাহার গুণও এইরূপ। তাঁহার কথামতে উক্ত উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া দেখিলাম, মূলের বাহ্যদৃশ্য তুল্য। তখন কতকগুলি মূল চূর্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলাম। ফলেও মিলিয়া গেল।

জ্বরে ছোট চান্দর

ছোট চান্দরের ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রায়ই করিতাম। এক ব্যক্তির নিকট জানিলাম, ইহার চূর্ণ প্রবল জ্বরেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রবল জ্বর, চক্ষু রক্তবর্ণ, মোহ, প্রলাপ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে এইটি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

আমার একজন শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক বন্ধুর নিকট জানিলাম, ইহা কামোত্তেজনা-নাশক। তিনি নানাস্থলে প্রয়োগ করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কামজ উন্মাদগ্রস্ত রোগীকে এই ঔষধ-সেবনে আরোগ্য লাভ করিতে দেখিয়াছি।

কামোত্তেজনা-হ্রাসে চান্দর

চান্দর একজাতীয় ক্ষুপ। সচরাচর দুইটি গাছ এক স্থানে জন্মে; এইজন্য দুইটি মূল জড়ান-ভাবে থাকে। গাছ প্রায়শঃ ১ হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ব্রহ্মযষ্টির পাতার মত পাতা, কিন্তু আকারে ছোট। পুষ্প গুচ্ছাকারে হয়। ফুল এক ইঞ্চি অপেক্ষা বড় হয় না। ফুলের বাহিরের বর্ণ ঈষৎ বেগুনে। পুষ্প ও পুষ্পগুচ্ছের আকার অশোকের মত। ফল ফল্সার মত, পাকিলে কাল হয়। পুষ্পকাল শীতের শেষ ও বসন্তের প্রারম্ভ। মূল কাণ্ড অপেক্ষা স্থূল, ভঙ্গপ্রবণ, দীর্ঘ, জটা-বর্জ্জিত, কোমল-কাষ্ঠগর্ভ। ইহা প্রায়শঃ সরল হয় না। ধুইলে পাণ্ডুবর্ণ হয়। ভাঙ্গিলে অভ্যন্তর পাণ্ডুবর্ণ দেখায়। অহৃদ্যগন্ধযুক্ত ও তিক্তরস-বিশিষ্ট।

মূল ও গাছের বর্ণনা

প্রয়োগবিধি—ব্যবহারার্থ মূলের চূর্ণ লওয়া হয়। মাত্রা ২০ হইতে ৮০ রতি। অনুপান শৃত শীত দুগ্ধ ও চিনিসহ চূর্ণ মিলাইয়া সেবন করিতে দেওয়া হয়। জ্বরে শীতল জল ও চিনি। সময়, প্রায়শঃ কেবল প্রাতে একবার দেওয়া হয়। রোগের অত্যন্ত প্রাবল্যে দিনে ২ বারও দেওয়া যায়।

ব্যবহার-বিধি ও মাত্রা

গুণ—ইহার গুণ তিক্তরস, বিকাশী, শীতবীর্য্য, বাতপিত্তানুলোমক, অবসাদক, নিদ্রাকারক, শারীর ও মানস উত্তেজনানাশক।

ক্রিয়া—প্রয়োগের পর ইহার ক্রিয়া প্রথমতঃ মস্তিষ্কে প্রকাশ পায়। পরে জ্ঞান ও চেষ্টা-বহ নাড়ীতে ক্রিয়া ব্যাপ্ত হইতে থাকে। ক্রমে ইহা প্রধানতঃ হৃদয়যন্ত্রের চেষ্টাবহ নাড়ীসমূহকে দুর্ব্বল করে। ইহার ফলে রক্তসঞ্চার ক্রমে মৃদু হইয়া আসে। উল্বন বায়ু ও উল্বন পিত্ত প্রশমিত হয়। অতিমাত্র সেবিত হইলে রোগী অত্যন্ত অবসন্ন হয়, নাড়ীর গতি শিথিল ও মৃদু হইয়া থাকে এবং রোগীর কর্ম্মায়তনসমূহ নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় থাকে।

উন্মাদ—অকারণে হাস্য, রোদন, ক্রোধ, অস্থিরতা ও কথা বলা, অনিদ্রা, অশুচি-জ্ঞান-হীনতা, সতত চিন্তাশীলতা, স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ প্রভৃতি উন্মাদলক্ষণে এই ঔষধটি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে। লক্ষণ যত তীব্র হয়, ঔষধের ক্রিয়াও তত শীঘ্র প্রকাশ পায়। পরিমাণ ঠিক হইলে এই ঔষধ প্রথম মাত্রা সেবনের পরই ক্রিয়া প্রকাশ করে। এই ঔষধের ক্রিয়াপ্রকাশের প্রথম লক্ষণ রোগীর চাঞ্চল্য কমিয়া আসে এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়। নিদ্রার পর চাঞ্চল্য-ভাব থাকে না। এমনও দেখিয়াছি যে, যে রোগী সর্ব্বদা চীৎকার করিয়া গান করিত, গালাগালি দিত ও মারিতে চাহিত, সে একমাত্রা ঔষধ সেবনের পর ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল। জ্ঞান ছিল; চেষ্টা কিছুই ছিল না। এই অবস্থাটা ক্রমে তিরোহিত হইয়া রোগী নিরাময় হয়। অপর একটী

রোগে প্রয়োগ

ছোট চান্দরের গাছ ও মূল

গাছের পত্র ও পুষ্পগুচ্ছ দেখা যাইতেছে। কাণ্ডের মধ্যাংশ শিশিটীর মধ্যে আছে। পার্শ্বে মূলটীর সর্ব্বাবয়ব দেখা যাইতেছে।

রোগীর এই নিষ্ক্রিয় ভাবটা প্রায় ছয় মাস পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। ঔষধ সেবনের পর হঠাৎ অবস্থার বৈপরীত্য দেখিয়া রোগীর জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। দুই একটি বাতব্যাধির লক্ষণও দেখা গিয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বাঙ্গগত কম্প আরম্ভ হইলেই ঔষধ কার্য্যকর হইল, বুঝিতে পারা যায়।

ঔষধটির এইরূপ তীক্ষ্ণত্ববশাৎ সেবন-মাত্রা স্থির করা বড় কষ্টকর। এজন্য মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে হয়। শারীর বলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই ঔষধের মাত্রা কল্পনা করিতে গেলে, অনেক সময় বিশেষ ভুল হয়।

জ্বরে ইহার মাত্রা ৫ হইতে ১৫ রতি। জ্বরে এই ঔষধ সেবন করিলে, প্রথমতঃ রোগীর অশান্তভাব দূর হয়। বিকল করণায়তনসমূহ ক্রমে স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মোহ দূর হইয়া সুনিদ্রা হয় এবং প্রলাপ তিরোহিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের বেগ কমিয়া আসে। চক্ষুর বর্ণ স্বাভাবিক হয়।

অকারণে প্রহর্ষবশতঃ যাহাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ও শিরঃপীড়া হয়, যাহাদের পূয়মেহের পরিণামে অত্যন্ত প্রহর্ষবশতঃ শিশ্ন বক্র হয়, তাহাদের জন্য এইটি উপাদেয় ঔষধ। এইরূপ অবস্থায় ইহার প্রথম ক্রিয়া সুনিদ্রানয়ন। স্ত্রী ও পুরুষে ইহার ক্রিয়া তুল্য। মাত্রা ৫—২রতি।

এ পর্য্যন্ত যে গুণ বর্ণিত হইল, তাহা মূলচূর্ণের। অতঃপর আলোচ্য বিষয়—মূলের ক্ষার-সত্ব। এই ক্ষারসত্ব এখনও সম্যক্ পরীক্ষিত হয় নাই; সুতরাং ইহার উপকারিতাও অপরিজ্ঞাত। ইহা পরীক্ষার জন্য আমি আমার চিকিৎসক বন্ধুগণকে আহ্বান করিতেছি।

ক্ষারসত্বের প্রয়োজন ও ক্রিয়া

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন।

ছোট চান্দরের উপক্ষার

রাসায়নিক গবেষণার ফল বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যক্ত করা কষ্টকর। অনেকেই সহজ ও সরল ভাষায় সাধারণের বুঝিবার উপযোগী রাসায়নিক প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদি লিখিয়া, রসায়নের সহজ ও সরল তত্ত্বগুলি বাঙ্‌লায় ব্যক্ত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু জটিল রাসায়নিক গবেষণা সুচারুরূপে ব্যক্ত করিবার উপযোগী ভাষা বঙ্গজননী এখন পর্য্যন্তও আমাদিগকে শিখিবার অবসর দেন নাই। অদূর-ভবিষ্যতে দিবেন কি না, বলিতে পারি না। তবে ইহাই সুখের বিষয় যে, তাঁহার সুসন্তানগণ ভাষার এই অভাব-পূরণের জন্য

বিশেষ চেষ্টিত হইয়াছেন। আমি যে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাহাও তাঁহারা টানিয়া আনিয়াছেন বলিয়া, আমার এই প্রথম চেষ্টা।

বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিকতায় প্রবন্ধ সাধারণের দুর্ব্বোধ্য হইতে পারে। এজন্য বক্তব্য বিষয়টিকে বলিবার পূর্ব্বে উপক্রমণিকাস্বরূপে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। এই প্রবন্ধে যে সকল নূতন পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাদেরও বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন, অপিচ এতৎসহ ভেষজরসায়নের আলোচনাপ্রসঙ্গে কয়েকটি অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইবে। এই জন্য আমি বিশেষজ্ঞ মহাশয়গণের নিকট তাঁহাদের মূল্যবান্ সময়ের একটু মাত্র অংশ প্রার্থনা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন।

যে কোন বনৌষধি নানাপ্রকার উপাদানে গঠিত এবং নানাপ্রকার ভৈষজ্যগুণবিশিষ্ট। ইহা প্রায়শঃ দেখা যায় যে, কোনও একটি বিশিষ্ট উপাদানের অস্তিত্ব-বশতই বনৌষধি বিশিষ্ট-গুণের অধিকারী হইয়া থাকে।

ইহার উদাহরণস্বরূপ অহিফেণের নাম করা যাইতে পারে। অহিফেণ অবসাদক, বেদনা-নিবারক, মূত্রাতিসার ও অতিসারনাশক ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকেরা অহিফেণের উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, উহার যে অংশ অবসাদক ও বেদনানিবারক, তাহা মূত্র-রোধক নহে। অহিফেণের একতম উপাদান morphine যেমন অবসাদক ও বেদনানিবারক, তেমনই অন্যতম উপাদান Codeine মূত্ররোধক।

অসার অংশ সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, যে স্থলে বেদনা-নিবারক আবশ্যক, সেখানে এই অসার অংশ ও মূত্ররোধক অংশ সেবনের আবশ্যক কি? এজন্য তাঁহারা ভেষজ-স্বত্ব ব্যবহার সঙ্গত মনে করেন।

বনৌষধির যে অংশে ভৈষজ্যগুণ নিহিত আছে, তাহাকে ভেষজ-স্বত্ব বলা যাইতে পারে। এই সকল এক প্রকার নহে। এতন্মধ্যে কতকগুলি স্বত্বে এমন একটি বিশেষ ধর্ম্ম দেখা যায় যে, ঐ ধর্ম্মবশতঃ ঐগুলিকে ক্ষারবর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমি সুশ্রুতোক্ত ক্ষারকর্ম্মের উল্লেখ করিতেছি। ভগবান্ ধন্বন্তরি বলিয়াছেন, "ক্ষরণাৎ ক্ষণনাৎ বা ক্ষারঃ।" যাহা ক্ষরণ অর্থাৎ মলিনতা দূর করে এবং ক্ষণৎ অর্থাৎ ক্ষত উৎপাদন করে, তাহাই ক্ষার। উহা তীক্ষ্ণাদি ভেদে তিন প্রকার। এই ক্ষার উদ্ভিদের ভস্ম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চক্রদত্ত ক্ষার-পরীক্ষায় বলিয়াছেন যে, ক্ষারমধ্যে এরণ্ড-নাল দিলে একশতটি কথা বলা পর্য্যন্ত যদি তাহা গলিত হয়, তবে তীক্ষ্ণ ক্ষার প্রস্তুত হইয়াছে জানিবে।

আমি অদ্য যে স্বত্বের কথা বলিব, উহার প্রস্তুত-বিধি পূর্ব্বোক্তমত নহে এবং পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা দ্বারাও আমরা আলোচ্য বিষয়ের ক্ষারত্ব প্রমাণ করিতে পারি না। এই ক্ষার অত্যন্ত মৃদু।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ক্ষারের অন্যবিধ পরীক্ষা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষাদ্বারা অত্যন্ত মৃদু ক্ষারও পরীক্ষিত হইতে পারে।

১ম। ক্ষার (Alkali) যে কোনও অম্লের (Acid) সহিত সংযুক্ত হইয়া দ্রবণীয় লবণে (Salt) পরিণত হয়। আমাদের আলোচ্য ভৈষজ্যস্বত্বগুলি অম্লের সহিত মিলিত হইয়া লবণসারূপ্য প্রাপ্ত হয়। বস্তুতঃ ঐ স্বত্বগুলি ক্ষার-ধর্ম্মবিশিষ্ট না হইলে এরূপ হইত না।

২য়। বর্ণের রূপান্তর দ্বারাও ক্ষারের সত্তা পরীক্ষিত হইতে পারে। এই বিষয়ে একটি প্রচলিত উদাহরণ দিতেছি।

জবাফুল একটি ছুরির ফলায় ঘষিলে উহা ঈষৎ নীলাভ হয়। এই ছুরি দিয়া একটি লেবু কাটিলে লেবুর অম্লরসের সহিত উক্ত বর্ণ মিলিত হইয়া রক্তবর্ণ ধারণ করে। এইরূপে লেবু কাটিয়া রক্ত বাহির করিবার বাজী অনেকে দেখাইয়া থাকে। উহা পুনরায় ক্ষারোদকে দিলে, রক্তবর্ণ পদার্থ পুনরায় নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি বর্ণ আছে, যাহারা অম্লের সহিত মিশ্রিত হইলে একরূপ হয় এবং ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করে। কতকগুলি ভেষজস্বত্বের সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে, এইরূপ বর্ণ-পরীক্ষায় উহারা ক্ষারধর্ম্ম প্রকাশ করে। ইহারা Amonia বা গন্ধক্ষারের (বা বায়বীয় ক্ষারের) মত মৃদুক্ষার। পরন্তু ইহারা বায়বীয় ক্ষারের প্রতিরোপিত পদার্থ। বায়বীয় ক্ষার একটি যবক্ষারযান-পরমাণু ও তিনটি জলযান পরমাণুর সমষ্টি বা যৌগিক। ইহার গঠন পার্শ্বোক্ত উপায়ে প্রদর্শিত হইতে পারে এবং জৈবী রসায়নের একটি মৌলিক নিয়মানুসারে, বায়বীয় ক্ষারের মূলীভূত প্রত্যেক জলযান-পরমাণুটিই একটী অঙ্গারকমূলক যৌগিক তন্মাত্র বা Compound radical দ্বারা প্রতিরোপিত হইতে পারে। এই প্রকার প্রতিরোপিত-গন্ধ-ক্ষারের গুণ অনেকটা গন্ধক্ষারের মত। বিশেষতঃ যখন এই তন্মাত্র অপেক্ষাকৃত সুগঠিত হয়, তখন উহা গন্ধক্ষারের অধিকাংশ ধর্ম্মগুলিই বেশী বা কম পরিমাণে পাইয়া থাকে। এই প্রতিরোপিত তন্মাত্রের গঠন যতই জটিল হয়, ততই প্রতিরোপিত গন্ধক্ষার, মূল গন্ধক্ষারের অপেক্ষা বিসদৃশ হইয়া থাকে। এই সকল ভেষজস্বত্ব মৃদু ক্ষারের সমানধর্ম্মী বলিয়াই ইংরাজিতে ইহাকে alkaloid বলে, সেইরূপ বাঙলায় আমরা ইহাদিগকে উপক্ষার বলিতে পারি। এতদর্থে উপক্ষার শব্দটির ব্যবহার আমি প্রথম ডাক্তার করের ভৈষজ্যরত্নাবলীতে দেখিতে পাই। এই শ্রেণীর ভেষজস্বত্বকে যবক্ষারের প্রতিরোপিত যৌগিক হইতেই হইবে। তবে সমস্ত প্রতিরোপিত যবক্ষারই উপক্ষার নহে। উপক্ষারগুলির কতকগুলি সাধারণ ধর্ম্ম আছে। কোন ভেষজস্বত্বে এই ধর্ম্মগুলি সাধারণ ভাবে প্রকাশিত থাকিলে এবং উহা গন্ধক্ষারের প্রতিরোপিত পদার্থ বলিয়া প্রমাণিত করিতে পারিলেই, আমরা উহাকে উপক্ষার বলিয়া গ্রহণ করিব। এই সকল ধর্ম্মের দুই একটির কথা আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

Mayerএর পরীক্ষাজলের সহিত উপক্ষারের লবণের জল মিশ্রিত হইলে গৌরবর্ণের (ছেক্‌রা ছেক্‌রা) সিক্থ অধঃস্থ হইতে থাকে। Draggendorf-এর পরীক্ষণোদক, Iodine-এর

জল, Picric acid-এর জলেও নানা প্রকার বর্ণের দানাদার এবং সিকৃথসদৃশ পদার্থ অধঃস্থিত হয়।

Draggendorf-এর দ্রব, উপক্ষারের দ্রবের সহিত মিশ্রিত হইয়া গাঢ় পাটলবর্ণের পদার্থ অধঃস্থ করে। Iodine-এর দ্রবের সহিত গাঢ় খদির বর্ণের সিকৃথ অধঃস্থ হয়। Picric দ্রবের সহিত দানাদার পীতাভ সিকৃথ অধঃস্থ হয়। যে সকল ভেষজ-স্বত্ব এই সকল পরীক্ষা-দ্রবের সহিত মিশ্রিত হইলে, অদ্রবণীয় পদার্থ অধঃস্থ করে এবং যাহারা গন্ধক্ষারের প্রতিরোপিত পদার্থ, তাহাদিগকেই আমরা উপক্ষার বলিতে পারি। এই বিষয়টী প্রমাণ করিবার জন্য সাধারণতঃ দুইটি পরীক্ষার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

(১) প্রথম পরীক্ষণীয় দ্রব্যের সহিত ক্ষারসুধা (Soda lime) মিশ্রিত করিয়া একটি পরীক্ষা-নলের ভিতর স্থাপন করিতে হয়। উহার উপরিভাগে পুনরায় পরিশুদ্ধ Soda lime স্তরীভূত করিয়া এই পরীক্ষানলটি অত্যন্ত উত্তপ্ত করিতে হয়। ক্ষারসুধার (Soda lime) স্তরের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিম্নভাগে উত্তাপ দিতে হয়। এই-রূপে উত্তপ্ত হইয়া জটিল যৌগিক পদার্থটি বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার সুগঠিত যৌগিক উপাদানে পরিণত হয়। এইরূপে বিশ্লিষ্ট হইয়া উপক্ষারগুলিও উহার যৌগিক উপাদানে পরিণত হয়। তন্মধ্যে গন্ধক্ষার একটি। ক্ষার অবস্থায় গন্ধক্ষার বায়বীয়; সৈন্ধবক্ষার এবং চুণের সহিত থাকিলে, উহা ক্ষার অবস্থায় থাকে বলিয়াই এই বায়বীয় গন্ধক্ষার অন্যান্য বায়বীয় উপাদানের সহিত পরীক্ষানলের উত্তপ্ত নিম্নভাগ হইতে অনুতপ্ত মুখের দিকে আসিয়া উহার বিশিষ্ট গন্ধ এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা নিজের অস্তিত্ব বুঝাইয়া দেয় এবং ইহার অস্তিত্ব হইতেই আমাদের জ্ঞাতব্য উপক্ষার যে গন্ধক্ষারের প্রতিরোপিত, তাহা বুঝিতে পারি।

২য় পরীক্ষা—অঙ্গারকমূলক যবক্ষারযানের যৌগিক পদার্থ সৈন্ধবীনের (Sodium) সহিত উত্তপ্ত করিলে উহা যবক্ষারযান ও অঙ্গারকের সহিত যুক্ত হইয়া Sodium cyanideএ পরিণত হয়। উহা ক্রমে সুরাসার জলে দ্রব করিয়া লৌহক (Ferros) এবং লৌহিক (ferric) লাবণের সহিত মিশাইয়া তাহাতে সৈন্ধব দ্রাবক ঢালিলে অতি সুন্দর Prussian নীল অধঃস্থ হয়। এইরূপ হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, জিজ্ঞাস্য যৌগিকের মৌলিক উপা-দানের মধ্যে যবক্ষারযানও একটি।

এক্ষণে উপক্ষারের সাধারণ ধর্ম্মের বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলিয়া প্রকৃত বিষয়ের অবতারণা করিব। উপক্ষারগুলি সাধারণতঃ জলে অত্যন্ত কম দ্রবণীয়, উহারা Ether বা amyl alcoholএ দ্রবণীয় হয়। কোনও উপক্ষারের লাবণের সহিত সৈন্ধব ক্ষারোদক মিশ্রিত করিলে উহা বিমুক্ত হইয়া অধঃস্থ হয়। উহাতে Ether ঢালিয়া ভালরূপে ঝাঁকিলে Ether বিমুক্ত উপক্ষারকে দ্রবে পরিণত করিয়া নেয় এবং Ether দ্রব স্বতন্ত্রভাবে ক্ষারোদকের উপরে ভাসিতে থাকে। এইরূপে আমরা উপক্ষারের Ether দ্রব পাইতে পারি; কিন্তু দেখা যায়, উপক্ষারের লবণগুলি Etherএ অদ্রবণীয় এবং জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। অতএব

যখন উপরোক্ত উপক্ষারের Ether দ্রব কোনও অম্লোদকের সহিত মিশাইয়া ঝাঁকাইয়া নেওয়া যায়, তখনই উহা লবণরূপে পরিণত হইয়া, Ether হইতে পৃথক্ হইয়া জলে দ্রব হয়।

উপক্ষারের পরীক্ষায় সময় এই ধর্ম্ম দুইটি বিশেষভাবে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হয়। এজন্য পূর্ব্বেই ইহার উল্লেখ করা গেল।

এখন প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণা করিব। চান্দরের মূল অনেক চিকিৎসকই প্রকাশ্যভাবে বা গোপন করিয়া নানাপ্রকার রোগে ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত সুফল পাইয়া থাকেন। পূজনীয় মধ্যমাগ্রজ মহাশয় উন্মাদ-রোগে ব্যবহার করিয়া এই ফল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি তাঁহারই বিশেষ আদেশে বিগত নভেম্বর মাসে ইহার বিশ্লেষণে নিযুক্ত হই এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ইহার উপাদানগুলি বিশ্লিষ্ট করি; কিন্তু অন্য নানা কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ায় মাসেকের মধ্যেও বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। পরে বিগত জানুয়ারী মাসে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছি, তাহাই আজ আপনাদের নিকটে উপস্থিত করিলাম।

চান্দরের মূল, পত্র ও গাছ পরীক্ষা করিয়া Bangabasi college এর উদ্ভিদ্‌বিদ্যাগারের (Botanical Laboratory) কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাকে Ophioxylon serpentenum সংজ্ঞায় পরিচিত করিয়াছেন। Roxburgh-এর Flora Indicaতেও উহা ঐ সংজ্ঞায়ই পরিচিত। আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণ ইহার শুষ্কমূলচূর্ণই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

চান্দরের মূলের ৪০নং চূর্ণ শতকরা ৯৪ ভাগ সুরায় ভিজাইয়া অরিষ্ট প্রস্তুত করা হয়, উহা দেখিতে ঈষৎ রক্তবর্ণ। উহাতে জল মিশাইলে একটি রজনজাতীয় পদার্থ অধঃস্থ হয়। ইহা হইতেই অবশ্য বুঝিতে পারিবেন যে, এই অরিষ্টের মধ্যে চান্দরের মূলের উপক্ষার ছাড়া আরও অনেক উপাদান আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে।

উপাদানগুলির প্রত্যেকটির সম্যক্ পরীক্ষা করিতে হইলে, অন্যোন্য হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া আবশ্যক। যাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে, রজনজাতীয় উপাদানটি সুরাসারে দ্রব হইলেও জলে অদ্রবণীয়। যতক্ষণ না সমস্ত সুরাসার বায়ুভূত হইয়া যায়, ততক্ষণ এই অরিষ্ট জলযন্ত্রে উত্তপ্ত করা হয়। উহা সুরাসারমুক্ত হইলে, একটু জল দিয়া গরম করিয়া ছাঁকিয়া নিলে, জলে দ্রবণীয় উপাদানগুলি জলে অদ্রবণীয় রজনজাতীয় উপাদান হইতে পৃথক্ হইয়া যাইতে থাকে। এই প্রকারে যে দ্রব পাওয়া যায়, উহা পূর্ব্ববৎ গাঢ় রক্তবর্ণ। উহা হইতে কতটুকু Lead acetate উদকে মিশ্রিত করিলে কোনও প্রকার পদার্থই অধঃস্থ হয় না। এই পরীক্ষায় বেশ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত জলে tanium জাতীয় কোনও পদার্থ নাই, tanium জাতীয় পদার্থ lad acetates উদকের সহিত মিশ্রিত করিলে এক প্রকার সিক্‌থকের সৃষ্টি হইয়া থাকে। Mayer's reagent, Draggendorf's reagent, iodine solution, picric acid solution প্রভৃতি উপক্ষারজ্ঞাপক উদকদ্বারা উপরোক্ত রক্তবর্ণ দ্রবটি পরীক্ষিত হইলে, নানাবর্ণের সিক্‌থ অধঃস্থ হইয়া উহাতে উপক্ষারের সত্তা বুঝাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়,

উপক্ষার ও তাহাদের লাবণ সকল বর্ণহীন। উপরোক্ত উদকটির বিশিষ্ট বর্ণ উহাতে উপক্ষার ব্যতীত অন্য প্রকার উপাদানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। এই অবস্থায় Ether Benzoic এবং chloroform দিয়া ঝাঁকাইয়া দেখা যায় যে, উহারা উপক্ষার বা বর্ণযুগ উপাদানের কোনটিকেই আকৃষ্ট করিয়া নিতে পারে না। পরন্তু আরও দেখা যায়, এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার উপাদানও এই তিনটি দ্রবে আকৃষ্ট হয় নাই। কোনও প্রকার ক্ষার মিশ্রিত করিয়া লাবণ হইতে উপক্ষারটিকে বিযুক্ত করিলে, উহা আর জলে দ্রব হইয়া না থাকিয়া সিক্‌থরূপে অধঃস্থ হইয়া পড়িবে, ইহা পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি। আলোচ্য দ্রব্যেও ক্ষার-জল মিশ্রিত করা মাত্র একটা রক্তাভ পীতবর্ণের সিক্‌থ অধঃস্থ হয়। এই সিক্‌থটি অন্য উপক্ষারের ন্যায় etherএ দ্রবণীয়। এই সিক্‌থযুক্ত ক্ষারোদক ether দিয়া ঝাঁকাইয়া নিলে ether সিক্‌থটিকে দ্রব করিয়া জলের উপরে ভাসিতে থাকে। ইহা দেখিতে পীতবর্ণ ও নিম্নস্থ জল রক্তবর্ণ। উপক্ষারে ইথারোদকের ন্যায় এই ether উদকও সৈন্ধবদ্রাবকের উদকের সহিত ঝাঁকাইলে ether দ্রব সিক্‌থটি লাবণরূপে পরিণত হইয়া ether হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া জলে দ্রব হইয়া যায় এবং এই সময়ে নিম্নস্থ জলের বর্ণ ঈষৎ পীত হয়। উপক্ষার-জ্ঞাপক পরীক্ষণোদক দ্বারা ইহাতেও উপক্ষারের সত্তা প্রমাণিত হয়। এই উপক্ষারের ether উদক, ক্ষার-জলের সহিত মিশ্রিত করিলে দেখা যায় যে, উপক্ষারের কতক অংশ এই ক্ষার-জল আকর্ষণ করিয়া নিয়াছে; অতএব বুঝিতে হইবে, বিযুক্ত উপক্ষারটি জলে দ্রবণীয় না হইলেও ক্ষার-জলে দ্রবণীয়। উহা যে জলে দ্রবণীয় নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি এই ether উদককে মিশ্রিত করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে উত্তমরূপে ঝাঁকিয়া দিয়া ২৪ ঘণ্টাকাল রাখিয়াও নিম্নস্থিত জলে পরীক্ষা দ্বারা কোনও প্রকার উপক্ষারের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি নাই। উপরোক্ত পীতবর্ণ সৈন্ধবাম্লোদকটি পরীক্ষা করায় উপক্ষারের সমস্ত সাধারণ ধর্ম্মই প্রকাশ করে এবং উহা গন্ধক্ষারের প্রতিরোপিত যৌগিক বলিয়া প্রমাণ করার জন্য পূর্ব্বোক্ত দুইটি পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হই। এইরূপে প্রমাণিত হওয়ায় উহার উপক্ষারত্বের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে।

প্রথমবারের ether উদকের নিম্নস্থ ক্ষারযুক্ত রক্তবর্ণ উদক চারিবার ether-এর সহিত ঝাঁকিয়া পৃথক্ করতঃ উপক্ষার হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহাতে একটি স্থায়ী রক্তিমবর্ণ আছে। উপক্ষারের সহিত যে অম্ল সংযুক্ত ছিল, তাহাও এই উদকেই বিদ্যমান।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, চান্দনের অরিষ্টে অন্ততঃ এই চারিটি উপাদান আছে :—

(১) রঞ্জনজাতীয় পদার্থ।
(২) স্থায়ী বর্ণ।
(৩) উপক্ষার।
(৪) উপক্ষার-সংযুক্ত অম্ল।

এই কয়টি উপাদানেরই রাসায়নিক আলোচনা করিবার সংকল্প আছে। এখন আমি উপক্ষারের আলোচনাতেই ব্যস্ত আছি। নানাকারণে উহাও আশানুরূপ তৎপরতার সহিত হইতেছে না। তবে যতটুকু আলোচনা করিতে পারিয়াছি, তাহাই বলিয়া অদ্যকার প্রবন্ধ শেষ করিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধারণতঃ উপক্ষার এবং তাহার লাবণ শ্বেতবর্ণ হয়; কিন্তু চান্দরের উপক্ষার এবং তাহার লাবণের যে উদক এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে, উহা ঈষৎ পীতবর্ণ। এই বর্ণ যে উপক্ষার বা তাহার লাবণের নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ঐ প্রমাণের বিষয় ক্রমে আপনাদের গোচর করিব। উদক বর্ণহীন করিবার সাধারণ উপায়টি ব্যবহার করিতে কতকগুলি প্রতিবন্ধক আসিয়া পড়ে। জৈব অঙ্গার দ্বারা সৈন্ধবায়োদক বর্ণহীন করিতে গিয়া উপক্ষারের অধিকাংশই কোনও অজ্ঞাত কারণে নষ্ট হইয়া যায় এবং অঙ্গারের phosphoric acid ঐ সৈন্ধবাম্লের জলে দ্রব হইয়া উপক্ষার পরীক্ষার বিঘ্নীভূত হয়।

জৈব অঙ্গার সৈন্ধবাম্লদ্বারা ধৌত করিয়া phosphoric acid মুক্ত করিয়া নিলেও, উপক্ষারকে কোনও অজ্ঞাত কারণে অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া দেয়। এই জন্য বর্ণহীন করিতে অন্য উপায়ে চেষ্টা করিয়াছি। তবে বর্ণের অংশ অত্যন্ত কম থাকায় উপক্ষারের আলোচনায় উহা বিশেষ ক্ষতি করিবে না বলিয়া সাধারণ পরীক্ষার জন্য ঐ পীতাভ উদকই ব্যবহার করিতে হয়। এই জলের এক ফোঁটা একখানা কাচখণ্ডের (slide) উপর রাখিলে কতক্ষণ পরে জলটুকু উড়িয়া যায় এবং দ্রবিত উপক্ষার লাবণ একটি অস্বচ্ছ স্তররূপ কাচখণ্ডের উপর থাকিয়া যায়। অণুবীক্ষণযন্ত্রসাহায্যে দেখিলে এই অস্বচ্ছ স্তরটি উপক্ষারলাবণের দানার গুচ্ছ বলিয়া উপলব্ধি হয়। এই দানাগুলি fern এর মত। দানার আকার লম্বা ও সমচতুষ্কোণ। স্বল্পমাত্র আলোকে আলোকিত করিয়া দেখিলে এই অস্বচ্ছ পদার্থের মধ্যে বিশেষতঃ একেবারে সীমাদেশে উপক্ষার ব্যতীত পীতবর্ণ আর একটি পদার্থ দেখা যায়। উহা উপক্ষার-লাবণের দানা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিষ। উপক্ষার-লাবণের দানা স্বচ্ছ এবং বর্ণহীন। অপর পদার্থটি অস্বচ্ছ এবং পীতবর্ণবিশিষ্ট। উপক্ষার লাবণোদকের এক ফোটার সহিত উগ্র যবক্ষার-দ্রাবকের দুই তিন ফোটা মিশাইলে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হয়। এই রক্তবর্ণ Brucineএর রক্তবর্ণ অপেক্ষা উজ্জ্বল, অনেকটা salicinএর ন্যায় রক্তাভ। Potassius decromate এইরূপ রক্তবর্ণ হয়। এই রং বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঐ উদকে ব্রমিনোদক মিশ্রিত করিলে রক্তাভ সিক্থ অধঃস্থ হয়। Draggendorf-এর উদকে মিশ্রিত করিলে প্রথমে বসন্ত রং-এর সিক্থক্ অধঃস্থ হইয়া, পরে উহা গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করে। উদিনোদকের সহিত ঘন খদিরবর্ণের সিক্থ অধঃস্থ হয়। উহা hypoর জলে পুনঃ দ্রবণীয়।

ইথায়োদক হইতে উদ্ধৃত উপক্ষার দিয়া ক্ষারসুধা পরীক্ষা করিবার সময় গন্ধক্ষারের গন্ধের সহিত qunolineএর গন্ধও পাওয়া যায়। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ইহা qunolineএর প্রতিরোপিত পদার্থ। তবে ইহা ঠিক কি না, এখনও বলা যায় না।

প্রবন্ধ শেষ করিবার পূর্ব্বে সত্বটির উপক্ষারতার আরও একটি বিশেষ প্রমাণ দিয়া আপনা-

দিগকে তদ্বিষয়ে নিঃসন্দেহ করিব। কখন কখন কোনও কোনও glucoside অথবা মাধবেয় পদার্থেও উপক্ষারের সাধারণ ধর্ম্মগুলি দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহা যদি যবক্ষারযানমূলক হয়, তবে উপক্ষার বলিয়া বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মাধবেয় কোনও তীক্ষ্ণাম্লের উদকের সহিত অনেকক্ষণ ফুটাইলে মধু অপর উপাদানে বিশ্লেষিত হইয়া যায় এবং উপক্ষারের ধর্ম্মগুলি নষ্ট হইয়া মধুর ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। উক্তরূপ ক্রিয়া দ্বারা প্রকৃত উপক্ষারের কোনও রূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না। চান্দরের সত্বটি ঐরূপে তীক্ষ্ণাম্লোদকের সহিত ½ ঘণ্টা হইতে ১ ঘণ্টাকাল ফুটাইয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উপক্ষারের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই এবং শর্করার ধর্ম্মও পায় নাই। অতঃপর এই সত্বটি যে একটি উপক্ষার, সেই সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ বুঝিতে পারিবেন যে, আমি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, এই প্রবন্ধ তাহার বিজ্ঞাপনী মাত্র। চান্দরের মূলের একটি উপক্ষারের অস্তিত্বের কয়েকটি প্রমাণ দেখাইয়া আমি এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি। কাজ অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। ঐ উপক্ষার যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক্ এবং বিশুদ্ধ করিয়া উহার বিষয় এবং গঠনের আলোচনা করিতে হইবে। মূলীভূত উপাদানগুলি সম্যক্ নির্ণয় করিতে হইবে। উহার নিজের এবং উহার লাবণ-সকলের ধর্ম্ম বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইবে। এই সকল নির্ণয় করিয়া উহা উপক্ষারের কোন্ শ্রেণীভুক্ত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আরও দেখিতে হইবে, উহাই চান্দর-মূলের প্রধান উপাদান বা স্বত্ব কি না এবং ইহা বিশেষ গুণশালী ওষধি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে কি না। এই সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ফল এই বিদ্বন্মণ্ডলীর সমক্ষে অদূর-ভবিষ্যতে উপস্থিত করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উদিনোদক	Iodine solution
উদক, জল	Solution
মাধবেয় পদার্থ	Glucosidic substance
মধু	Glucose
যবক্ষার দ্রাবক	Nitric acid
সিক্থ	Precipitate, gelatinous precipitate
লবণ, লাবণ	Salt
ক্ষারসুধা	Soda lime

শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং তাঁহার রচিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা

১। প্রেমের অমিয়-মন্দাকিনী শ্রীচৈতন্যভাগবত-প্রণেতা শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং জন্মস্থান সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-জীবনী-লেখকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, "শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস-গৃহে যে ব্যাসপূজা করিয়াছিলেন, সেই ব্যাসপূজার নৈবেদ্য মহাপ্রভু ভোজন করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট নারায়ণীকে প্রদান করেন, সেই প্রসাদ ভোজন করায় নারায়ণীর গর্ভে ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়।" কেহ কেহ অনুমান করেন, "নারায়ণী গর্ভবতী হইলে, তিনি বিধবা হন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে আর সুবিধা না হওয়ায় বাসুদেব দত্তের ঠাকুর-বাটীতে তিনি কাযদারী (পরিচারিকা-বৃত্তি) স্বীকার করেন।" বর্দ্ধমান জেলায় মামগাছী গ্রামে বাসুদেব দত্তের ঠাকুর-বাটী ছিল; সুতরাং তাঁহাদের মতে মামগাছী গ্রামই বৃন্দাবনদাসের জন্মভূমি। আবার কেহ কেহ বলেন, "শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপে শ্রীবাসের গৃহেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;" কিন্তু আমি বিশেষ অনুসন্ধানে তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি, নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

মহাপ্রভুর তাম্বুলের চর্ব্বিতাবশেষ-ভোজনে বিধবা নারায়ণীর গর্ভ হয়। যথা,—

কামোদ।

শ্রীপ্রভু চর্ব্বিত পান, স্নেহবশে কৈলা দান,
নারায়ণী ঠাকুরাণী-হাতে।
শৈশব-বিধবা ধনী, সাধ্বী সতীশিরোমণি,
ভোজন করিল সে চর্ব্বিতে॥
প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা,
লোকমাঝে কলঙ্ক নহিল।
দশমাস পূর্ণ যবে, মাতৃগর্ভ হৈতে তবে,
সুন্দর তনয় এক হৈল॥
সেই বৃন্দাবনদাস, ত্রিভুবনে সুপ্রকাশ,
চৈতন্য-লীলায় ব্যাস যেই।
উদ্ধব দাসেরে দয়া, করি দিবে পদছায়া,
প্রভুর মানস-পুত্র সেই॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর নবদ্বীপ বা মামগাছীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই; কুমারহট্ট হালিসহর নতিগ্রাম তাঁহার জন্মস্থান। যথা,—

হালিসহর নতিগ্রামে নারায়ণী-সুত।
ঠাকুর বৃন্দাবন নাম ভুবনবিদিত ॥
নতিগ্রাম জন্মভূমি স্থিতি দেন্দুরাতে।
শ্রীচৈতন্য-ভাগবত কৈল প্রচারিতে ॥

(শ্রীঅভিরামদাসকৃত পাটপর্য্যটন)

২। বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের মহাগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের রচনাকাল লইয়াও বিস্তর মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ-চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন, ১৪৫৭ শকে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত রচিত। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ১৪৭০ শক শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচনার কাল স্থির করিয়াছেন; কিন্তু আমার মতে ১৪৫৭ শক কোন মতেই শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচনার কাল হইতে পারে না, কারণ, ১৪৬৪ শকে কবি কর্ণপূর তাঁহার সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্য-চরিত মহাকাব্য রচনা করেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত শ্রীচৈতন্য-চরিত মহাকাব্য রচনার পরে রচিত, এ কথা সর্ব্বজনসম্মত। শ্রীচৈতন্য-চরিত মহাকাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"বেদা রসা শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে, শাকে তথা খলু শুচৌ সুভগে চ মাসি। বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়া-তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য ॥" বেদ—৪, রস—৬, শ্রুতি—৪, ইন্দু—১। অঙ্কস্য বামা গতিঃ; সুতরাং ইহার অর্থ এই যে, ১৪৬৪ শকে, আষাঢ় মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই গ্রন্থ-রচনা শেষ হয়। কাইগ্রামের জমীদার পরমবৈষ্ণব ৺বিশ্বম্ভর বসু মুন্সী মহাশয়ের গৃহে একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পুঁথি আছে, তাহার শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "১৪৯৭ শকে এই মহাগ্রন্থ-রচনা শেষ হইল।" সুতরাং রামগতি বাবুর মতও ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

৩। প্রাচীন কালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন না থাকায় অনেক অমূল্য গ্রন্থরত্ন আমরা হারাইয়াছি; অবশিষ্ট যেগুলি আছে, তাহারও কতকগুলির আংশিক বিলোপ হইয়াছে। কলিকাতা সিমুলিয়ানিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মবক্তা প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাবগত গ্রন্থের যে অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টের এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন,—"আজকাল আমাদের দেশে যে সকল শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাওয়া যায়, আমাদের বিশ্বাস, তাহার কিয়দংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। * * * * শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার বলিতেছেন—শ্রীমৎ অদ্বৈতা-চার্য্যের পুত্র গোপাল যে মহাপ্রভুর আদেশে নৃত্য করিতে করিতে অচেতন হইয়া যান এবং প্রভুরই আদেশে আবার চৈতন্য লাভ করেন, এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাস বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং আমি তাহা সংক্ষেপেই কীর্ত্তন করিলাম। যথা—

"এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন।
অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন ॥"

কিন্তু আমাদিগের অবলম্বিত কি মুদ্রিত, কি হস্তলিখিত, কোন একখানি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতেই এই লীলার উদ্দেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় নাই; সুতরাং বলিতে হয় যে, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের কিয়দংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের উক্ত লুপ্তাংশ কোন হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায় কি না, অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি প্রায় ২০০ শত বৎসরের হস্তলিখিত তিনখানি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পুঁথি প্রাপ্ত হই। সেই তিনখানি প্রাচীন পুঁথিতেই অন্ত্যখণ্ডে, মুদ্রিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবত অপেক্ষা তিন অধ্যায় বেশী আছে। উক্ত পুঁথি তিনখানির মধ্যে যেখানি সম্পূর্ণ আছে, সেইখানি গত সন ১৩১৬ সাল ৪ মাঘ তারিখে শ্রীযুক্ত কামিনীনাথ রায় দ্বারা সাহিত্য-পরিষৎ-পুস্তকালয়ে প্রদান করিয়াছি; সাহিত্য-সেবী বন্ধুগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা একবার দেখিবেন, ইহাই আমার বিশেষ অনুরোধ।

মুদ্রিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে—

"এ ভক্তের নাম লই শ্রীগৌরসুন্দর।
পুণ্ডরীক নাম ধরি কান্দেন বিস্তর॥
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চরিত্র শুনিলে।
অবশ্য তাহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে॥"

এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। নবদ্বীপ হইতে যে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে উপরোক্ত উদ্ধৃতাংশের পরই নিম্নলিখিত দুই ছত্র বেশী পাওয়া যায়, যথা;—

"এইরূপে নীলাচলে করেন বিহার।
পশ্চাত সকল লীলা করিব প্রচার॥"

এক্ষণে সকলে ভাবিয়া দেখুন, কবি স্বয়ং "পশ্চাত সকল লীলা করিব প্রচার" বলিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলার অবশিষ্টাংশ রচনা করিবার বাসনা জ্ঞাপন করিয়া অসম্পূর্ণ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত গ্রন্থই প্রথমে জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই জন্য তাঁহার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের শেষাংশের রচনা জনসমাজে তাদৃশ প্রচার হয় নাই। আমি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অপ্রকাশিত শেষাংশ কাল্নার "পল্লীবাসী" পত্রের সন ১৩১৭ সালের উপহারের জন্য "পল্লীবাসি"-সম্পাদক শশীবাবুকে প্রদান করি; তিনি তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। শুনিয়াছি, "অমৃতবাজার" আফিস হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণের তত্ত্বাবধানে শীঘ্র শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইবে। আশা করি, রসিক বাবু আমার সম্পাদিত "পল্লীবাসী"র উপহারের জন্য প্রকাশিত শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের অধ্যায়ত্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের অসম্পূর্ণতা-দোষ বিদূরিত করিবেন।

শ্রীঅম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন

আসাম-ভ্রমণ*

(৩)

জোড়হাট ও শিবসাগর

১৩১৪ সালের শারদীয়া পূজার বন্ধে জোড়হাট এবং খ্রীষ্টমাসের ছুটিতে শিবসাগর গিয়াছিলাম। জোড়হাট পর্য্যন্ত একটি সরকারী রেলপথ আছে। আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের টিটাবর ষ্টেশনে নামিয়া ঐ ষ্টেট্‌রেলওয়ে-যোগে জোড়হাটে অনায়াসে পৌঁছা যায়।

জোড়হাট আসামের নবদ্বীপ; আসামের শেষ রাজারা এইখানেই অবস্থান করিতেন। তবে তখন আহোম-প্রভাব ধ্বংসোন্মুখ; জোড়হাটে আসিয়া রাজগণ অতি অল্পকালই ছিলেন—অর্দ্ধ শতাব্দীরও অনেক কম। তাই ঐতিহাসিকের দর্শনীয় জিনিস এখানে কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। রাজার আমলের একটি দীর্ঘিকা আছে; ইহার জল অতি নির্ম্মল। সহরের অধিবাসিগণ এখান হইতেই পানীয় জল নিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দীঘির চতুষ্পার্শ্বে আফিস-আদালত আছে, উত্তরদিকে সব্‌ডিভিশনাল অফিসারের বাংলো; তৎসম্মুখে বাঁধান ঘাট। এই ঘাটের উপর দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিলাম; একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি, অপরটি বরুণদেবের মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। দীর্ঘিকার মধ্যভাগে একটি সজীব বৃক্ষ আছে, ইহা না কি প্রতিষ্ঠাকালে প্রোথিত দারুস্তম্ভের পুনরুজ্জীবিত প্রকটাবস্থা।

রাজধানীর চিহ্নস্বরূপ আর একটি জিনিষ আছে—উহা মৃত্তিকার প্রাকার। এক স্থলে যদৃচ্ছাক্রমে মাপ লইয়াছিলাম—উচ্চতা ৭ হাত, উপরিভাগের প্রস্থ ৪ হাত, নীচের প্রস্থ ২০ হাত হইবে।

জোড়হাট একটি সব্‌ডিভিশনের হেড কোয়ার্টার; কিন্তু স্যর্ ব্যামফিল্‌ড ফুলার মহোদয়ের কৃপায় ইহা জেলার রাজধানীরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে।†

আহোমরাজগণের শেষরাজধানী বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ইহাকে 'আসামের নবদ্বীপ' বলিয়াছি। নবদ্বীপ সংস্কৃতবিদ্যার কেন্দ্রভূমি; ইহা তেমন নয় বটে, তথাপি ইহা ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষার কেন্দ্রস্থল; কেন না, ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর সাহেবের ইহাই হেডকোয়ার্টার এবং আসামের একমাত্র নর্ম্মাল স্কুল এইখানেই প্রতিষ্ঠিত। এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপ যেমন বাঙ্গালা-সমাজের ও ভাষার আদর্শ স্থান, জোড়হাটও আসামের বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ভদ্রসমাজের শীর্ষস্থান এবং অধুনা ইহার ভাষাই আসামের আদর্শ-ভাষা।

---

* গৌহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভার উনবিংশ অধিবেশনে (চৈত্র ১৩১৭) পঠিত।

† বিগত ১লা এপ্রিল হইতে শিবসাগর হইতে আফিস আদালত উঠিয়া আসিয়া জোড়হাট জেলার হেডকোয়ার্টার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিবসাগর সহরে যাইতে হইলে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের নামতিআলি ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পদব্রজে বা গো-শকটে ১০ মাইল যাইতে হয়। ভোরে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া গো-যানে প্রায় ৭ মাইল অতিক্রম করিয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার উচ্চ তীর দেখিতে পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইহাই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'জয়সাগর'। সসম্ভ্রমে গাড়ী হইতে নামিয়া ইহার উত্তর তীর দিয়া পথ চলিতে লাগিলাম। পশ্চিমতীরে কতকগুলি ইষ্টকালয় দেখিতে পাইলাম— তন্মধ্যে একটি খুবই বড়। এই সকল গৃহ প্রায় সমস্তই জনপ্রাণিশূন্য। তখন স্নানের সময় হয় নাই; তথাপি ঘাটে গিয়া কিঞ্চিৎ জল মস্তকে সেচন করিলাম। দীর্ঘিকার নির্ম্মল সলিল আমার নিকট তীর্থোদকের ন্যায় পরমপবিত্র বোধ হইল। এই স্থানেই আহোমরাজবধূ সতীকুল-ললামভূতা জয়মতী দীর্ঘকালব্যাপী অমানুষিক অত্যাচার ভোগ করিয়াও স্বামী গদাধরসিংহের উদ্দেশবার্ত্তা প্রকাশ করেন নাই—প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তথাপি পতির যাহাতে অনিষ্ট হয়, তাহা করেন নাই।* সেই পুণ্যভূমিতে উক্ত সতী-পুত্র প্রবলপ্রতাপান্বিত "আহোম-আকবর" মহারাজ রুদ্রসিংহ এই দীর্ঘিকা খননপূর্ব্বক ইহাকে জননীর পবিত্র নামে উৎসর্গ করিয়া সাধ্বীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। আসামে এতাদৃশ প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা আর নাই—ভারতের অন্যত্রও বোধ হয়, বড় বেশী নাই। ইহার পরিমাণফল ৩৯৭ বিঘা। আজ এই স্থানে লোকবসতি নাই – দেবমন্দিরগুলিও বিগ্রহাদি-বিরহিত। এই স্থানটি যদি আসামে না হইয়া রাজপুতানায় হইত, তাহা হইলে ইহার অবস্থা আজ কি হইত, আপনারা একবার কল্পনার তুলিকায় মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেখিতে পারেন।

মহারাজ রুদ্রসিংহ ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; এই মাতৃস্মৃতি-রক্ষিণী দীর্ঘিকাটির নির্ম্মাণকার্য্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্পাদিত হইয়াছিল। "জয়-সাগর" এত বড় যে, কেবল উহার পূর্ব্বপারটি দ্রুতপাদবিক্ষেপে অতিক্রম করিতে ৭ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। উত্তরপারের বৃহত্তম মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির ছিল,—ইহার ভিত্তি অষ্টকোণ, এক এক বাহুর পরিমাণ ১৪ হাত। মন্দির খুব উচ্চ—কিন্তু চূড়াটি সোনার ছিল, আসাম-আক্রমণকারী ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক উহা অপহৃত হইয়াছে। মন্দিরের গাত্রে রামায়ণাদির ঘটনার এবং লৌকিক ব্যাপারের নানা দৃশ্য খোদিত রহিয়াছে। মন্দিরের নিকটে দীর্ঘিকার পার্শ্বে তিনটি ইষ্টকালয় দো-চালা ঘরের আদর্শে নির্ম্মিত। বোধ হয়, এই ঘরগুলি মন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক ব্রাহ্মণাদির আবাসগৃহ ছিল এবং অধুনা অন্তর্হিত দেববিগ্রহের সেবার্থ ভোগ-রন্ধনাদিও এই সকল গৃহেই সম্পাদিত হইত।

এই প্রধান মন্দিরের পশ্চিমদিকে আর একটি ক্ষুদ্র দেবালয় আছে—ইহা 'বৈদ্যনাথের'

* গৌহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ দে মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত "জয়মতী" শীর্ষক প্রবন্ধ নব্যভারত ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক বিস্তারিত বিবরণ তাহাতেই দেখিবেন।

মন্দির বলিয়া জানা গেল। ইহার সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র গৃহে ভগবতীর অর্চ্চনা হইত। এতদ্ব্যতীত এই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার চারিপার্শ্বে এখন আর কিছু নাই—আছে কেবল জঙ্গল।

অতঃপর প্রায় দুই মাইল আন্দাজ গিয়া বামদিকে সড়কের খুব নিকটেই রঙ্গঘর এবং ডানদিকে সড়ক হইতে অল্প ব্যবধানে আহোম-রাজগণের প্রাচীন রাজধানী 'রঙ্গপুরে'র ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই রঙ্গঘর বা 'রংচোয়া ঘর' দোতালা। ইহারই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে বসিয়া আহোমরাজগণ শ্যেনপক্ষীর এবং হস্তিমহিষাদির 'লড়াই' দেখিতেন। এই ঘরের কাজকর্ম্ম বেশ মজবুত—এখনও ঘরটি বাস করিবার উপযোগী অবস্থায়ই আছে; কিন্তু উপরের তলায় উঠিবার সিঁড়িটি ভগ্নাবস্থায় পরিণত হইয়াছে। ঘরের দৈর্ঘ্য ৫০ হাত এবং প্রস্থ আন্দাজ ২৫ হাত। ইহার আলোকচিত্র প্রদত্ত হইল।

ডানিদিকে দূর হইতে সহসা কোনও গৃহাদি দেখা যায় না, উচ্চ প্রাকারের ন্যায় কতকটা দেখা যায়। নিকটে গিয়া দেখিলে মাটীর নীচে গৃহের প্রকোষ্ঠাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়; সমগ্র জমিটা ক্রমশঃ এমন ঢালু করা হইয়াছে যে, নিকটে না গেলে গৃহটি সম্যক্ পরিদৃষ্ট হয় না। ইহাই রঙ্গপুর রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ; অসমীয়া ভাষায় ইহাকে 'কারেংঘর' (অর্থাৎ প্যালেস্) বলে। এই স্থানের নামানুসারে অদ্যাপি অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন লোকে শিবসাগর অঞ্চলকে 'রঙ্গপুর' বলিয়া থাকেন।

এই স্থান হইতে মাইল খানেক গিয়া 'দিখৌ' নদী পার হইয়াই শিবসাগর সহরে পৌঁছা যায়। ইহা যে একদিন সমৃদ্ধিশালী ছিল, প্রবীণ বৃক্ষরাজি-পরিশোভিত বৃহৎ পুরাতন পাকা রাস্তা দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজ রুদ্রসিংহের পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ শিবসিংহ এই নগর স্থাপন করিয়া যে সকল ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা পুণ্য ও প্রতিষ্ঠার ভাজন হইয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে তন্নামযুক্ত "শিবসাগর" দীর্ঘিকাটি অন্যতম। ইহারই নামে সহর ও জেলার নাম "শিবসাগর" হইয়াছে।

"শিবসাগর" দীর্ঘিকা এই স্থানের দর্শনীয় জিনিসগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহারই চারিদিকে আফিস আদালত, জেলখানা, সাহেব ও সরকারী কর্ম্মচারিগণের বাসা এবং সেই পুণ্যশ্লোক স্বর্গদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবালয় প্রভৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিবসিংহ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৪৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন; অতএব এই দীর্ঘিকা পৌনে দুই শত বৎসর হইল খোদিত হইয়াছে; কিন্তু ইহার জল অদ্যাপি একটি নবপ্রতিষ্ঠিত সরোবরের জলের ন্যায় টল্‌টল্ করিতেছে।

এই শিবসাগরের কল্যাণে সহরের স্বাস্থ্য বেশ থাকে। ইহারই সুনির্ম্মল জল পানীয়রূপে প্রায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই দীর্ঘিকার চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণপূর্ব্বক নির্ম্মল বায়ু সেবন করা সহরবাসিগণের এক নিত্যকর্ম্ম। ফলতঃ এমন আরামজনক স্থান অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কি নিয়তি! জেলার রাজধানী এখান হইতে পরিবর্ত্তিত হইল।

শিবসাগরের পরিমাণফল ৩৮৩ বিঘা; অতএব ইহা জয়সাগর অপেক্ষা অল্প ছোট।

পূর্ব্বে ইহা অষ্টকোণ ছিল, সম্প্রতি ঈশান ও নৈঋত ভাগে দুই কোণ মারিয়া এক এক কোণ করা হইয়াছে ;—তাই এখন দীর্ঘিকাটি ষট্‌কোণ আকার ধারণ করিয়াছে।

তীরস্থ দেবমন্দিরগুলির মধ্যে মুক্তিনাথ মহাদেবের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শিবসাগরের দিকে ইহার পৃষ্ঠভাগ ; সুতরাং ইহার সম্মুখভাগের একটি আলোকচিত্র এতৎসহ দেওয়া গেল। এই সুবৃহৎ মন্দিরের চূড়াটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত। মন্দিরের অত্যুচ্চতা-নিবন্ধন মগেরা ইহা পাড়িয়া অপহরণ করিতে পারে নাই—কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, চূড়ার উপর গুলিবর্ষণের চিহ্ন দেখিয়া তাহা বুঝা যায়। ঐ চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে। এই স্বর্ণচূড়া যখন সূর্য্যরশ্মিসম্পাতে ঝক্‌মক্ করিয়া শিবসাগরের নির্ম্মল সলিলে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন কি অনির্ব্বচনীয় শোভাই হইয়া থাকে !

তীরস্থিত দেবমন্দিরসমূহ দর্শনান্তে আফিস আদালতের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে রক্ষিত পাঁচটি প্রাচীন কামান দেখিতে গিয়াছিলাম। এই কামানগুলির আলোকচিত্রও দেওয়া হইল। বর্ণনা-সৌকর্য্যার্থে যথাক্রমে এইগুলিতে ১, ২, ৩, ৪, ৫ এই চিহ্ন প্রদত্ত হইল। ১নং কামানটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—দৈর্ঘ্য (সপুচ্ছ) ১২।০ হাত, পরিধি ৩॥০ হাত ; মধ্যে ছিদ্রটির ব্যাস ৯ অঙ্গুলি। পশ্চাদ্ভাগে পুচ্ছের নিকটে রৌপ্যখচিত কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য ছিল ; এখন অতি সামান্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাতে কোন লিপি নাই ; তাই এই প্রকাণ্ড তোপ—আসামের এই "জাহান-কোষা" কাহার সময়ে কাহাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারা গেল না।

১নং তোপের পার্শ্বেই ২নং ছোট কামানটি অবস্থিত ; ইহার দৈর্ঘ্য ৮ হাত, বেড় ২।০ হাত। ইহাতে নানারূপ কারুকার্য্য পরিলক্ষিত হয়। ইহার গাত্রলিপি হইতে জানা যায় যে. আহোমরাজ গদাধর সিংহ (রুদ্রসিংহের পিতা) স্বর্গদেবের সময়ে ১৬১৫ শকাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়। লিপিটি এইরূপ :—

পংক্তি (১) শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব গদাধর সিংহ
" (২) মহারাজাধিরাজচরণামলকমলসেবক-
" (৩) শ্রীযুতগরগঞা সন্দিকৈর্ব্বরফুকনেন নির্ম্মিতং
" (৪) গুরাহাটান্ত * * * (অস্পষ্ট) গেঞ্জেলাগরিয়া শকে ১৬১৫
" (৫) মাসে আশ্বিন রিপুঞ্জয়সিংহনামাস্ত্রং

৩নং কামানটির দৈর্ঘ্য ৮ হাত, পরিধি ২॥০ হাত। ১৫৯০ শকাব্দে ইহা আহমরাজ উদয়াদিত্যের সময়ে নির্ম্মিত। ইহার মুখের দিকে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় কিঞ্চিৎ শুণ্ডাকার। তোপটির গাত্রলিপি এই :—

(১) শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব সৌমারেশ্বর উদয়া
(২) দিত্যসিংহস্য শাকে ১৫৯১ তামুলি দলৈর পো

(৩) ত্র জয়ানন্দ বরুয়া এতাজুয়া বকৃতিয়াল কৃষ্ণাই
(৪) জিয়ুধন মাধব পিতাম্বর এই খেতে গরে।

৪নং কামানটির দৈর্ঘ্য ও পরিধি ৩নং তোপেরই ন্যায়। ইহা গদাধর সিংহের সময়ে ১৬১৪ শকাব্দে নির্ম্মিত—গাত্রলিপি এবং কারুকার্য্য অবিকল ২নং তোপটির সদৃশ।

৫নং কামানটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট; ইহার দৈর্ঘ্য ৭ হাত এবং বেড় ১৷৷০ হাত হইবে। ইহার অগ্রভাগের আকৃতি ৩নং তোপের ন্যায় এবং সেইটিরই মত ইহাও উদয়াদিত্যের সময়ে নির্ম্মিত। ইহার গাত্রলিপি যাহা ছিল, তাহা প্রায় অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। নির্ম্মাণের শকাব্দা ১৫৯৫ হইবে। লিপির পাঠ বোধ হয়, ৩নং কামানের যেরূপ, ইহাতেও তাহাই ছিল।

এই পাঁচটি কামান দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ইহাই আহোমরাজগণের সম্বল ছিল। বস্তুতঃ এতদ্বিষয়ে আহোমগণ অতিশয় উন্নতাবস্থ ছিলেন; এমন কি, সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক টেবর্ণিয়ার বলেন যে, সর্ব্বপ্রথম এই আসামেই কামান-বারুদের ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছিল। অনেকের ধারণা যে, চীনদেশেই বারুদের সর্ব্বাগ্রে আবিষ্কার হয়; কিন্তু চীনেরা সম্ভবতঃ প্রতিবেশীসূত্রে আহোমগণ হইতেই ইহার বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। কামান আসামে এত সাধারণ যে, এই গৌহাটী সহরেই যত্র তত্র ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আসামের নানা স্থানেত আছেই। এই প্রদেশের বহির্ভাগেও অহোমরাজগণের বিজয়ঘোষণা-কারক দুই একটি কামান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ভাগীরথীর মোহানায় "ফল্‌স পয়েণ্ট" নামক স্থানে একটি কামান পাওয়া গিয়াছিল। উহা আহোমরাজ জয়ধ্বজসিংহ গৌহাটীতে মুসলমানদিগকে পরাস্ত করিয়া ১৫৮০ শকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠিক এইরূপ একটি কামান ভাগলপুরসহরেও আছে বলিয়া শুনিয়াছি; তাহাতেও নাকি লেখা আছে—"শ্রীশ্রীস্বর্গদেব জয়ধ্বজসিংহমহারাজেন যবনং জিত্বা গুবাকহাট্যামস্ত্রমিদং প্রাপ্তং।" মুসলমান-বিজয়পুরঃসর কামানপ্রাপ্তি এই জয়ধ্বজ রাজার সময়েই যে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে, মহারাজ চক্রধ্বজ সিংহ (১৫৯০ শকে) এবং মহারাজ গদাধর সিংহ (১৬০৪ শকে) এইরূপ শত্রুপক্ষের একাধিক কামান অধিকার করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।* কোনও কোনও কামানে মোসলমানদের লিপিও আছে। উদাহরণচ্ছলে লক্ষ্মীম্পুর জেলার দিকোম নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি সুবৃহৎ কামানের কথা বলিতেছি; ইহাতে পারস্য ভাষায় লেখা আছে—আজ্‌ বাবতে ফতে আশাম্‌ দর্‌ ইহ্‌তি মাসে সৈয়দ আহমদল হুসেন আরজ দাদ শুদ্‌ দর সন্‌ ১০৭৪ হিজরি মোয়াফিক্‌ সন্‌।† ইহার অর্থ এইরূপ,—

* ফল্‌স্‌পয়েণ্টেপ্রাপ্ত কামানটির বিষয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই, মহোদয় প্রায় ২০ বৎসর হইল, এশিয়াটিক সোসাইটিতে আলোচনা করিয়াছিলেন। ভাগলপুরের কামান ও এই কামান কি অভিন্ন? গৌহাটীতে মোসলমানদের ২০টি কামান জয়ধ্বজের হস্তগত হইয়াছিল, এ কথা ইতিহাসে আছে।

† از بابت فتح آشام در اهتمام سید احمد الحسین عرض دادہ شد در سنه ١٠٧٩ هجري موافق سنه

'আসাম-বিজয়ের নিমিত্ত সৈয়দ আহমদল হুসেনের অধিকারে ইহা ১০৭৪ হিজরি সালে প্রদত্ত হইল'। ইহার উপর চক্রধ্বজের বিজয়-লিপি এইরূপ লিখা হইয়াছে ;—

"শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণদেব মহারাজাধিরাজ-চক্রধ্বজসিংহেন
জয়লব্ধাস্ত্র * সংগ্রামে যবনানাং ক্ষয়ে পুনঃ।
প্রাপ্তমস্ত্রমিদং ভূপযশোহরিহননং ধ্রুবং॥ শক ১৫৯০। †

তখন মোগলসম্রাট্‌গণ মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ভারতাকাশে দেদীপ্যমান;—তাঁহাদের অপ্রতিহত প্রতাপ এই আহোমগণের নিকট খর্ব্বীকৃত হইয়াছিল, ইহা কি কম গৌরবের কথা? ফলতঃ আসামবাসীর ইহাতে শ্লাঘা করিবার কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে।

সংক্ষেপে শিবসাগর সহরটিতে পরিভ্রমণ ও পরিদর্শনকার্য্য শেষ করিয়া গো-যানে আহোমগণের প্রাচীন রাজধানী গড়গাঁও অভিমুখে রওনা হইলাম। শিবসাগর হইতে যে পথ নাজিরার দিকে গিয়াছে, সেই সড়কেই গড়গাঁও যাইতে হয়। চারি মাইল আন্দাজ গিয়াই গড় পাওয়া যায়,—এখানে একটি সিংহদ্বারও আছে। নাগাদের উপদ্রব হইতে রাজ্য-রক্ষার নিমিত্তই না কি এই গড় নির্ম্মিত হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে এইরূপ 'গড়' দ্বারা বেষ্টিত থাকায় রাজধানীর নাম "গড়গাঁও" হইয়াছিল। প্রায় ৮৸ মাইল গিয়া বামদিকে একটি ক্ষুদ্রতর রাস্তা ধরিয়া অল্প গিয়াই গড়গাঁও রাজধানীর ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। যে ভগ্নাবশিষ্ট ইষ্টকপ্রাসাদটি আজিও দাঁড়াইয়া আহোমরাজগণের অতীত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তাহার আলোকচিত্র এতৎসহ প্রদত্ত হইল।

এই প্রাসাদটি চারিতলা, দেখিতে দোলমঞ্চের মত। নীচের তলার মাপ ৪৫ হাত দীর্ঘ, ৩৫ হাত প্রস্থ; চারিটি কুঠরী, বারান্দাও আছে। দ্বিতীয় তলে একটি বড় সভাগৃহ আছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি কুঠরীর পশ্চিমদিক্ ব্যতীত অপর তিনদিকে বারান্দাও আছে। তৃতীয় তলেও একটি সভাগৃহ এবং বারান্দা আছে। চতুর্থ তলটিতে ছয় হাত দীর্ঘ, ছয় হাত প্রস্থ একটি মঞ্চাকার স্থান আছে, তাহাতে দাঁড়াইয়া বহুদূর পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা অনেকক্ষণ ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিলাম। চতুর্দ্দিকে গাছপালায় জঙ্গলাবৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি ভিন্ন আর কিছু এখন দেখিবার নাই। পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র খিড়কির পুকুর গর্ত্তমাত্রাবশিষ্ট অবস্থায় রহিয়াছে দেখিলাম।

ছোট রাস্তায় আসিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন অভিমুখে চলিলাম; কিয়দ্দূরেই পথটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে,—একটি 'নাজিরা' গিয়াছে; ঐ পথে গেলে নদী পার হইতে হয়। তাই অপর শড়ক ধরিয়া 'ধোদর আলি' ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী ধরিলাম।

* "জয়লব্ধাস্ত্র" স্থলে 'জয়ং লব্ধা। তু' হইবে।

† Vide p. 29 of Mr. Gait's Report on the Progress of Historical Researches in Assam (1897).

এই 'ধোদর আলি' ষ্টেশনটি সম্প্রতি নামান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'শিবসাগর রোড ষ্টেশন' এই সম্ভ্রান্ত আখ্যা লাভ করিয়াছে। অতএব উপসংহারে ইহার পূর্ব্বনামটির কথা প্রত্নতত্ত্বের বিষয়ীভূত বলিয়া আলোচনা-যোগ্য মনে করিতেছি।

যাহারা অকর্ম্মণ্য অলস (অসমীয়াভাষায় 'ধোদ' বলে), তাহাদিগকে পূর্ব্বে জনৈক সদয়-হৃদয় আহোমরাজ প্রতিপালন করিতেন, সুতরাং রাজ্যের যত অলস তাঁহার সময়ে রাজধানীতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল। তাঁহার মন্ত্রী দেখিলেন, ইহা এক মহা অনর্থকর ব্যাপার। তিনি রাজাকে বলিলেন যে, ইহারা সকলেই ত প্রকৃত অলস নয়, ইহাদের পরীক্ষা করা যাউক। এই বলিয়া একটা খড়ের ঘর তৈয়ার করাইয়া ইহার মধ্যে সকলকে পুরিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। তখন দেখা গেল যে, কেবল দু'একটি মাত্র লোক ব্যতীত যাবৎ লোক প্রাণভয়ে দৌড়িয়া পলাইতেছে। মন্ত্রিবর তখন প্রকৃত অলসদিগের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করিলেন এবং পলায়মানদিগকে ধরিয়া আসিয়া এই দণ্ড দিলেন যে, যেহেতু উহারা যথার্থ 'ধোদ' না হইয়াও রাজার নিকটে আসিয়া তদ্রূপ ভাণ করিয়াছে তজ্জন্য উহাদিগকে হাতে কোদাল লইয়া মাটী কাটিয়া পথ বাঁধিতে হইবে। এইরূপে এই 'ধোদর আলির' সৃষ্টি হইয়াছিল। এই উপাখ্যানটির কতটা সত্য ও কতটা অহিফেণ-ধূমসঞ্জাত, তাহা অনুসন্ধেয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

পরিশিষ্ট

পরিভ্রমণের প্রায় দুই বৎসর পরে এই তৃতীয় প্রবন্ধ লিখিত হয়। নোটবহি ও স্মৃতির সাহায্যে যাহা লিখিত, তাহাতে ভুলভ্রান্তি থাকিতে পারে, এই আশঙ্কায় প্রবন্ধটি গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত হইবার পরে শিবসাগরনিবাসী অস্মচ্ছাত্র শ্রীমান্ ইন্দ্রেশ্বর বড়ঠাকুর বি এ-সমীপে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হয়। তাঁহার প্রদর্শিত দুই একটি ভুলভ্রান্তি অধুনা সংশোধিত হইয়াছে; কিন্তু আমি যাহা স্বয়ং দেখিতে পারি নাই, এমন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় তাঁহার পত্রে জানিতে পারিয়াছি, ভবিষ্যৎ পরিভ্রমণকারীর বিদিতার্থ তাহা এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১। জয়সাগরের পশ্চিম পারের গড়খাইর অপর পার্শ্বে দক্ষিণদিকে একটি ছোট মন্দির আছে, এই মন্দিরের নাম "নাতি-গোসাঁই"র মন্দির। ইহাতে নাতি-গোসাঁই পূজার্চ্চনা করিতেন। প্রবাদ আছে যে, নাতি-গোসাঁইকে দিবার পূর্ব্বে এই মন্দিরটি ঘনশ্যাম মিস্ত্রির আবাসগৃহ ছিল। ইহার কারুকার্য্য অতি সুন্দর। জয়সাগরের তীরবর্ত্তী মন্দিরাদির আদর্শ

চিত্রাকারে এই মন্দিরের ভিত্তিতে অঙ্কিত আছে। ঘনশ্যাম মিস্ত্রীর যাবতীয় শিল্পকার্য্যের মূল আদর্শ প্রথমতঃ সেই মন্দিরেই অঙ্কিত করা হইত, লোকে এইরূপ বলে। জয়সাগরের তীর হইতে এই মন্দির দেখা যায় না; বনজঙ্গলে ঢাকা পড়িয়াছে।

২। জয়সাগর হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে পশ্চিমদিকে একজোড়া বড় পুকুর আছে। জয়সাগরের তীর হইতেই উহার পাড় দেখা যায়। প্রবাদ আছে, উত্তরদিকের পুকুরটি আগে খোদিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে উচ্ছিষ্ট পত্র ও রন্ধনের খুঁটি ভূগর্ভ হইতে বাহির হওয়াতে পুষ্করিণীটিকে পরিত্যক্ত করা হয়—সেই পুকুর এখন ভটিয়াপারর পুখুরী" (ভাটিপারের পুকুর) নামে বিখ্যাত। নূতন কল্পে খোদিত অপর পুষ্করিণীর নাম "ন-পুখুরী" (নূতনপুকুর)। ইহার পারে একটি মন্দিরও আছে। * * * "ন-পুকুরী" হইতে প্রায় চারিমাইল গিয়া গৌরীসাগর * পাওয়া যায়।

৩। জয়সাগর ও কারেং-ঘরের মধ্যবর্ত্তী স্থলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি মন্দির আছে;—তাহারই একটির নাম "রঙ্গনাথীয় দ'ল" (রঙ্গনাথের দেউল); ইহাতে মহাদেবের পূজাপাট অদ্যাপি হইয়া থাকে। মহাদেবের জটা ও ফণিসহ সুন্দর মূর্ত্তি ইহাতে বিরাজমান। একটি "ফল্গু-দেবালয়"ও (দোলমঞ্চ) ইহার নিকটে অবস্থিত।

৪। কারেংঘরের মাটীর তলে আরও একটি তলা ছিল বলিয়া প্রাচীন লোকেরা বলিয়া থাকেন। তথা হইতে দিখৌ নদী পর্য্যন্ত মাটীর নীচে দিয়া একটা রাস্তা ছিল বলিয়াও বোধ হয়। এখন সেই মাটীর নীচের পথ মৃত্তিকা ও ইষ্টকে সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কারেংঘরের লম্বা ঘরটির পূর্ব্বভাগে তিন কুঠরীবিশিষ্ট একটি 'বাড়া' ঘর আছে, তাহাতে যাইবার রাস্তা নাই। প্রবাদ আছে, এই ঘরটিই রাজভাণ্ডার ছিল এবং মাটীর তলে যে তালা ছিল, তাহা হইতেই এই কুঠরীতে যাতায়াত করা যাইত।

৫। এই পত্রে উল্লিখিত "নাতি-গোসাঁই" এবং "ঘনশ্যাম মিস্ত্রী" উভয়েই বাঙ্গালী—ইঁহাদের পরিচয় জানিবার নিমিত্ত বঙ্গবাসিমাত্রই কৌতূহলাক্রান্ত হইবেন, তাই সংক্ষেপে ইঁহাদের কথা একটু অবান্তর হইলেও লিখিত হইতেছে।

মহারাজ রুদ্রসিংহ শাক্তধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বঙ্গদেশে লোক পাঠাইয়া নদীয়া-শান্তিপুর মালিপোতা গ্রামনিবাসী কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামক একজন সাধককে আসামে আনয়ন করেন।† ৺কামাখ্যাপর্ব্বতে তদীয় অবস্থানহেতু তিনি "পর্ব্বতীয় গোসাঁই" নামে খ্যাত হন। রুদ্রসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজ শিবসিংহ ইঁহার নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করেন। তাঁহার চতুর্থ ভ্রাতা রাজেশ্বরসিংহ যাঁহার কাছ হইতে মন্ত্রদীক্ষা পান, তিনিই "নাতি-গোসাঁই"

* ইহা পুণ্যশ্লোক মহারাজ শিবসিংহের কীর্ত্তি। বোধ হয় শিবসাগরে মহাদেবের নাম থাকাতে তচ্ছক্তি গৌরীর নামে এই দীর্ঘিকার নাম হইয়াছে।

† যাঁহারা এতদ্বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে চান, তাঁহারা মল্লিখিত "প্রবন্ধাষ্টকে" "পূর্ণানন্দগিরি ও কামাখ্যা মহাপীঠ" প্রবন্ধ পড়িতে পারেন।

নামে অভিহিত ; তিনি আদি "পর্ব্বতীয় গোঁসাই" কৃষ্ণরামের দৌহিত্র বলিয়া এই আখ্যা পান ; কৃষ্ণরামের পুত্রপৌত্রেরা "পর্ব্বতীয় গোঁসাই" নামেই পরিচিত।

রুদ্রসিংহ ইষ্টাপূর্ত্ত কার্য্যের সৌষ্ঠবসম্পাদানার্থ কোচবিহার অঞ্চল হইতে ঘনশ্যামকে আনয়ন করেন। রাজমিস্ত্রী ঘনশ্যাম যে ভাবে তদীয় কর্ম্ম সম্পাদিত করিয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল হইয়াছে, কিন্তু তাহার পরিণাম অতি শোকাবহ। যখন আহোমরাজের কার্য্য সাধনপূর্ব্বক প্রভূত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া ঘনশ্যাম স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন তাহার নিকটে আসামের অধিবাসী ও স্থানাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ সংবলিত কাগজ-পত্র পাওয়া গেল ; মুসলমানদের নিকট আহোমগণের গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিবার জন্যই এই সংগ্রহ, এইরূপ অভিযোগে ঘনশ্যামের প্রাণদণ্ড হইল।*

এই পরিশিষ্টের উপসংহারে আরও একটি কথা বলা উচিত মনে করি। এই প্রবন্ধে রঙ্গপুর গড়গাওঁ ইত্যাদির ঐতিহাসিক বিবরণ দেওয়া হয় নাই। তাহা দিতে হইলে, আসামের ইতিহাসের এক বিশিষ্ট অংশ এখানে লিখিতে হইত ; তবে সংক্ষেপে এই স্থানে আহোম রাজধানীগুলির সংস্থাপন-বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে।†

আহোমগণ রাজা সুকাফার (১২২৮—১২৬৮) পরিচালনাধীনে ১২২৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আগমন করিয়া নানা স্থানে অবস্থান করেন। তৎপর ১২৫৩ অব্দে 'চরাইদেও' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ইহাই আহোমদের প্রথম রাজধানী বলা যাইতে পারে। অন্যত্র রাজধানী স্থাপিত হইলেও আহোমরাজগণকে রাজ্যাভিষেকের সময় "চরাইদেও"এ একবার আসিতে হইত।

তারপর আহোম-বংশের অষ্টম রাজা সুদাংফা (১৩৯৭-১৪০৭) 'চরগুয়া' নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন ; কিন্তু শতাব্দীকাল মধ্যেই চতুর্দ্দশ আহোমরাজ সুহুংমুং (১৪৯৭-

* Vide Mr. Gait's History of Assam p. 165 শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব ঘনশ্যামের আগমনের হেতু নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলেন,—Rudra Singh was anxious to build a place and city of brick, but there was no one in his kingdom who knew how to do this." যখন দেখি যে, এই সময়ে আহোমরাজ্য কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং কাছাড়ীরা বহুপূর্ব্ব হইতেই ইষ্টকের কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়া আসিতেছিল, তখন মহামতি গেইট্ সাহেবের এই কথা একটু অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। গৌহাটী সহরের দুই মাইল দক্ষিণে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে রুদ্রসিংহের ৩০ বৎসর পূর্ব্বে আহোম বড়গোহাঁই কর্তৃক একটি ইষ্টক-প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল (Vide Assam District Gazetteers Vol. iv Kamrup p 23 foot-note) । রঙ্গপুর পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চম ভাগ প্রথম সংখ্যায় "রুদ্রসিংহের তাম্রশাসন" প্রবন্ধে সুহৃদ্বর প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় গেইট সাহেবেরই অনুসরণ করিয়া বলিয়াছেন, "রুদ্রসিংহের রাজত্বের পূর্ব্বে আসামে ইষ্টকের ব্যবহার ছিল না।" এতটা কিন্তু গেইট সাহেবও বলেন নাই।

† মহামতি শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের "আসামের ইতিহাস" হইতে এই বিবরণের অধিকাংশ কথা সঙ্কলিত হইয়াছে

১৫৩৯) দিহিং নদীর তীরবর্ত্তী ‘বকটা’ নামক স্থানে নূতন রাজধানীর পত্তন করেন। এই নিমিত্ত ইহাঁকে সাধারণে ‘দিহিঙ্গীয়া’ বিশেষণে অভিহিত করিয়াছিল।

তাঁহার পুত্র সুক্লেনমুং পিতার প্রাণনাশ করাইয়া রাজ্য লাভ করিয়া রাজধানী গড়গাওঁএ আনয়ন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার উপাধি "গড়গাঁয়া” হইয়াছিল। এই রাজার পূর্ব্বেও গড়গাওঁ নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়; অতএব গড়গাওঁ ইহাঁর স্থাপিত নহে। আহোম-রাজকুলশিরোমণি রুদ্রসিংহ (১৬৯৬-১৭১৪) ‘রঙ্গপুর’ নগরের নির্ম্মাতা এবং তিনি এই স্থানেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। রঙ্পুরের ‘কারেংঘর’ তাঁহাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু গড়গাওঁ একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এইরূপ বোধ হয় না; কেন না, তাঁহারই দ্বিতীয় পুত্র প্রমত্তসিংহ (১৭৪৫—১৭৫১) গড়গাওঁয়ের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাসাদটি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন—ইহারই ধ্বংসাবশেষের চিত্র প্রবন্ধমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে। ইনিই রঙ্গপুরের রঙ্গঘরটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহের কনিষ্ঠ পুত্রের (লক্ষ্মীসিংহের) পুত্র গৌরীনাথ সিংহ (১৭৮০—৯৬) কুক্ষণে সিংহাসনারূঢ় হইয়াছিলেন; তাঁহারই সময়ে আহোম-রাজ্য অন্তর্ব্বিদ্রোহে (মোয়ামারিয়াদের* অভ্যুত্থানে) জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। বিদ্রোহী মোয়ামারিয়ারা গড়গাওঁএর রাজ-প্রাসাদ জ্বালাইয়া দেয় এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম-নগরাদিরও ধ্বংস সাধন করে। মোয়ামারিয়াগণের জ্বালায় রঙ্গপুরে তিষ্ঠান কঠিন হওয়ায়, গৌরীনাথ সিংহ (১৭৯৪ অব্দে) মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে ‘যোড়হাটে’ পাত্রমিত্রগণসহ অবস্থান করিতে আইসেন এবং তদবধি ইহা আহোমরাজগণের রাজধানী বলিয়া গৌরব লাভ করে; কিন্তু এই রাজধানীতে অত্যল্পকালমাত্র পতনোন্মুখ আহোমগণের শক্তিহীন নৃপতিগণ বিষম অশান্তিতে অবস্থান করিয়া গিয়াছেন, তাই ইষ্টাপূর্ত্তের নিদর্শন এ স্থলে একটি সামান্য সরোবর ভিন্ন আর কিছুই নাই।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* মোয়ামারিয়ারা এক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব;—প্রায়শঃ নীচজাতীয় ব্যক্তিরা এই সম্প্রদায়ভুক্ত। শিবসিংহের সময়ে ইহাদের উপর বিষম অত্যাচার হয়। পরে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া উঠিলে, লক্ষ্মীসিংহের সময়ে ইহাদের বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; কিন্তু তখন আহোম-রাজকর্ম্মচারীরাই তাহা কতক দমন করিয়াছিলেন। গৌরীনাথসিংহের সময়ে যে বিদ্রোহ হয়, তাহার দমন আহোমরাজের অসাধ্য হয়, ব্রিটিশ সৈন্যের সাহায্যে উহা দমিত হইয়াছিল।

পারদ-শোধন-প্রণালী*

আয়ুর্ব্বেদে পারদ-শোধন বিষয়ের বহু উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে রসুন দিয়া যে পারদ-শোধনের ব্যবস্থা আছে, তাহাই সকলগুলি অপেক্ষা সহজ। এই বিষয় নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত আছে;—

রসোনস্য রসৈঃ সূতো নাগবল্লীদলোত্থিতৈঃ।
ত্রিফলায়াস্তথা কাথৈরসো মর্দ্যঃ প্রযত্নতঃ॥
ততস্তেভ্যঃ পৃথক্ কৃত্বা সূতং প্রক্ষাল্য কাঞ্জিকৈঃ।
সর্ব্বদোষবিনির্ম্মুক্তং যোজয়েৎ রসকর্ম্মসু॥

রসুনের রস, পানের রস এবং ত্রিফলার কাথে পারদ মর্দ্দন করিবে। প্রত্যেক রসে মর্দ্দন করিবার পর প্রত্যেকবার উহা কাঁজিতে ধৌত করিয়া লইবে। ইহাতে পারদের সকল প্রকার দোষ নষ্ট হয়।

রসুন দিয়া পারদ-শোধন অনায়াসসাধ্য, এই কারণে ইহাই সর্ব্বস্থানে প্রযোজ্য এবং ইহাতে বস্তুতই পারদ নির্ম্মল হইয়া একেবারে দোষবিমুক্ত হয়। এই বিষয়টি বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা দেখা হইয়াছে।

রসুনের উপাদান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। এলেন সাহেব (Allen) তাঁহার Commercial Organic Analysis (Vol. II, Part III, p. 386) নামক পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন—রসুনে ওলিল প্রপিল দ্বিশুল্বিদ (allyl propyl disulphide, $C_6 H_{12} S_{12}$), দ্ব্যলিল দ্বিশুল্বিদ (diallyl disulphide) এবং অন্যান্য সমবায়ী পদার্থ যেমন $C_6 H_{10} S_3$, $C_6H_{14}S_4$ বর্ত্তমান আছে, ইহাতে ওলিল শুল্বিদ (allyl sulphide) বা কোন তারপিন (Terpene) নাই। এলেনের মত অবশ্য আধুনিক এবং ইহাই এখন প্রশস্ত; কারণ প্রসিদ্ধ রাসায়নিক সেম্লার (F. W. Semmler) তাঁহার মৌলিক গবেষণাদ্বারা ইহা সপ্রমাণিত করিয়াছেন যে, রসুনে ওলিল শুল্বিদ (allyl sulphide) মোটে নাই। (Arch. der Pharm cl, XXX, p. 454) তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, রসুন (garlic, allium sativum), পেঁয়াজ (onion, thlaspi arvensi) প্রভৃতি পদার্থে অনেকের মতে ওলিল শুল্বিদ (allyl sulphide) বর্ত্তমান আছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নাই এবং ওলিল শুল্বিদএর (allyl sulphide)

* এই প্রবন্ধে যে সকল ইংরাজি রাসায়নিক শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইল, তাহার ব্যাখ্যা :—

Allyl sulphide—ওলিল শুল্বিদ, ওলিল (ওল+ইলচ্)

ওল—শূরণঃ ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, কন্দঃ ইতি রত্নমালা

Allyl—from L. allium, bulb tube (কন্দঃ)

শুল্বিদ—শুল্ব (শুল্বারির অংশ—"শুল্বারি গন্ধক" ইতি হেমচন্দ্রঃ) + ইদঃ

অক্সিদ্—অক্ষ (অক্ষজন, Oxygen, শব্দের অংশ) + ইদ

অধ্বর (ether) আকাশঃ ইতি নিরুক্তম্, দ্বি—Di, ইত্যাদি।

সচরাচর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। এই বিষয় সম্বন্ধে আমাদের নিজের পরীক্ষার ফলে যাহা পাইয়াছি, তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ হইল। রসুনকে জলীয় বাষ্পের সাহায্যে কয়েকদিন যাবৎ পরিশ্রুত করিয়া (steam distillation) আমরা কতকটা তৈল পাই। এই তৈলে দুই প্রকার বিভিন্ন প্রকার তৈল পাওয়া যায়। একটি স্বচ্ছ, হাল্কা ও অল্প গন্ধযুক্ত; অপরটি হরিদ্রাভ বা গাঢ় হরিদ্রাভ, ভারি এবং তীব্র গন্ধবিশিষ্ট। ইহা ছাড়া আমরা রসুনে শ্বেতসার, গঁদ (mucilage), চিনি, অণ্ডলাল (albumen) ইত্যাদি পাই। বিশ্লেষণের ফল নিম্নে দেওয়া হইল :—

হলদে ময়লা তৈল (crude oil) স্বচ্ছ তৈল (white oil)	... ৪৫·৩৪৫
শ্বেতসার (starch) গঁদ (mucilage)	... ৫০·১২৩
চিনি (sugar) অণ্ডলাল (albumen) ইত্যাদি	... ৪·৫৩২
	১০০·০০০

উল্লিখিত পরীক্ষাদি দ্বারা যাহা পাওয়া গিয়াছে এবং এ বিষয়ে যে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ আছে ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে যাহা স্থির হইতে পারে, সেই সকলের সাহায্যে অবিশুদ্ধ পারদের বা নাগ (lead) ইত্যাদি সংযুক্ত পারদের উপর রসুনের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা এক্ষণে সম্যক্ প্রকারে দেওয়া যাইতে পারে।

বিশুদ্ধ পারদের উপর রসুনের কোন ক্রিয়া নাই। ইহা পারদকে পারদ শুল্বিদ (mercury sulphide) পদার্থে পরিণত করিতে অসমর্থ। উচ্চ এল্‌কিল্‌বর্গের গন্ধক (alkyl sulphur) বা শুল্বারি সংযুক্ত দ্রব্যাদি যেমন দ্বলিল দ্বিশুল্বিদ (diallyl disulphide, $(C_3 H_5)_2 S_2$) যাহা রসুন-নিঃসৃত তৈলে বর্ত্তমান থাকে, নাগ অর্থাৎ সীসকের সহিত একত্রে মিলিত হইলে বৈধর্ম্ম বা রাসায়নিক সংযোগে সমবায়ী পদার্থের, নাগ শুল্বিদের (PbS), সৃষ্টি করে। ইহা ধূম্রবর্ণ এবং ইহার কোন আকার বা গঠন দেখা যায় না; ইহা চূর্ণের ন্যায় দেখায়। এই চূর্ণের সহিত রসুনস্থ গঁদ ইত্যাদি লাগিলেই সেই আঠা থলের চারিধারে জড়াইয়া বা লেপিয়া যায়। এই কাদার ন্যায় পদার্থে রসুনের তীব্রগন্ধ পাওয়া যায় না, কারণ দ্বলিল দ্বিশুল্বিদের (diallyl disulphide) একটি শুল্বারি পরমাণু (sulphur atom) কমিয়া নাগের সহিত সংযুক্ত হয় এবং দ্বলিল দ্বিশুল্বিদ (diallyl disulphide) সাধারণ ওলিল শুল্বিদে (allyl sulphide) পরিণত হয় মাত্র। অবশ্য এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, এই সময়ে দ্বলিল দ্বিশুল্বিদ এর (diallyl disulphide) পারদাক্ষিদের (mercurous oxide) সহিত একত্র সমবায়ে ওলিল অধবরএর (allyl ether $(C_3H_5)_2O$)

উৎপত্তির সম্ভাবনা, কিন্তু তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে; কারণ, নিম্ন রাসায়নিক সমকরণ লিখন-দ্বারা বুঝা যায় যে, ওলিল অধ্বর (allyl ether) প্রস্তুত হয় না।

$$(C_3H_5)_2S_2 + Hg_2O = (C_3H_5)_2O + 2\ HgS.$$
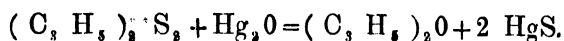
যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে খলমধ্যস্থ গুঁড়া অত্যন্ত কাল দেখাইত এবং গন্ধও বিভিন্ন হইত; ঘোঁড়ামূলার গন্ধের ন্যায় গন্ধ পাওয়া যাইত (smell like horse-raddish, Zander Ann. Chem. Pharm. CCXIV, 146)। হয় ত দুইটি প্রক্রিয়াই একই সময়েই যুগপদ্ভাবে ঘটিয়া থাকে এবং তাহা হইলেও স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইবে যে, শেষের প্রক্রিয়াটি অতি অল্প পরিমাণেই হয়। পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে রাসায়নিক সমকরণ লিখনাঙ্ক অনুযায়ী নিম্নলিখিত-রূপ বর্ণনা করা যাইতে পারে। যথা:—

$$(C_3H_5)_2S_2 + Pb = (C_3H_5)_2S + PbS$$

এবং $(C_3H_5)S_2 + Hg_2O = (C_3H_5)_2O + 2\ HgS.$
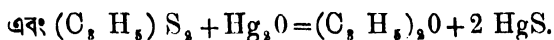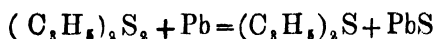
উল্লিখিত ধূম্রবর্ণের কাদামত পদার্থটির সহিত জল মিশ্রিত করিলেই কাল গুঁড়া উৎপন্ন হয়, কারণ, ওলিল শুল্বিদে (allyl sulphide, যাহার প্রস্তুত বিষয় দেখান হইল, তাহাতে) জল দিলেই উহা ধীরে ধীরে বিশ্লেষিত হইয়া ওলিলসুরা (allyl alcohol) হয় এবং শুল্বারিতাদ্র জন (H_2S বা sulphuretted hydrogen) জন্মায় এবং এই জিনিষ (H_2S) পরক্ষণেই দূষিত পারদস্থ সরের (Hg_2O) mercury oxide পারদাক্ষিদ) অর্থাৎ মলের সহিত বৈধর্ম্ম্যসংযোগে জলের ও পারদ শুল্বিদের (HgS) সৃষ্টি করে। যথা—

$$H_2S + Hg_2O = Hg_2S\ (HgS + Hg) + H_2O.$$

এই পারদ শুল্বিদ (HgS), পূর্ব্ববর্ণিত নাগ শুল্বিদএর (PbS, Lead sulphide) সহিত মিশিয়া খলের তলায় গুঁড়াকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করে এবং পারদবিন্দুর সৃষ্টি করে। এই পারদকে রূপার বাটীতে গরম করিয়া তাড়াইতে পুনরায় ঈষৎ ধূম্রবর্ণ দেখায়, কারণ, পারদ শুল্বিদকে রূপার পাত্রে ঘসিলে ইহা পারদ ও শুল্বারিতে পরিণত হয়, ক্রমে পারদ ও শুল্বারি জ্বলিয়া গেলে কেবলমাত্র নাগ শুল্বিদ (PbS) পড়িয়া থাকে। নিম্নলিখিত লিখন-প্রণালীতে প্রক্রিয়াটি একেবারে দেখান যাইতে পারে।

$$(C_3H_5)_2S_2 + Pb = (C_3H_5)_2S + PbS.$$

$$(C_3H_5)_2 + 2H_2O = 2C_3H_5OH + H_2S.$$

$$H_2S + Hg_2O = Hg_2S(HgS + Hg) + H_2O.$$
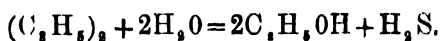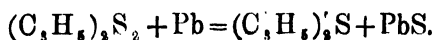
[পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, Semmlerএর মৌলিক অনুসন্ধানই রশুন সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাখ্যাই এই মতের বিশেষ অনুকূল।]

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাচীন পুথির বিবরণ

(বৈদ্যক-পুথি)

পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষিত

(১)

রত্নাবলী

পুথি—আকার দৈর্ঘ্য ১৯ × প্রসার ৪″

পত্রসংখ্যা—২৬২ × পংক্তি ২৪ × অক্ষর ৬০

শ্লোকসংখ্যা—৫৮৭২

বিবরণ—মধ্যে খণ্ডিত, আদি ও অন্ত আছে।

মধ্যে ১৫, ১৬৭, ১৭০, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ২০৫ ও ২২৫ পত্র নাই এবং ১৪, ৭৭, ১৫৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৬, ১৭১, ১৭৬, ১৮০, ২০৬, ২০৭ ও ২২২ পৃষ্ঠা ছিন্ন। এতদ্ব্যতীত ২২৩, ২২৪ ও ২২৬ পাতার কতকাংশ ছিন্ন হইলেও লেখার কোনও ক্ষতি হয় নাই।

পুথি তুলট-করা কাগজে লিখিত। প্রতি পৃষ্ঠায় ছয় পংক্তি করিয়া আছে। দুই পৃষ্ঠাই লিখিত, লেখা অতি সুন্দর ও সুখবোধ্য। পুথির বিষয় কালীতে এবং ঔষধ ও অধ্যায়ের নাম লালে লিখিত। লেখা বিশুদ্ধ নহে। পুস্তক কীটদষ্ট বা গলিত নহে। এখনও যত্ন করিয়া রাখিলে বহুকাল যাইতে পারে। গ্রন্থে কোনও প্রকার অব্দের উল্লেখ অথবা লেখারীর নাম নাই।

বিষয়—চিকিৎসাগ্রন্থ। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

কষায়রসতন্ত্রাণাং সারং সারং সমালোক্য।
প্রকাশ্যতে সহপত্র্যা রত্নাবলী বৈদ্যরত্নেন ॥

এই গ্রন্থে রুগ্‌বিনিশ্চয়ের (মাধবনিদান) ক্রমানুসারে রোগের সংক্ষিপ্ত নিদান এবং তাহার বৈদিক ও তান্ত্রিক চিকিৎসাক্রম সংগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক চিকিৎসাক্রমে গ্রন্থকারের অভিমত, কোথাও সংস্কৃত টিপ্পনীতে এবং কোথাও বাঙ্‌লামিশ্রিত সংস্কৃতে পত্রী-প্রণালীতে (তালিকার আকারে বা পাতরার আকারে) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত অধ্যায় ও ঔষধগুলি আছে।—

অধ্যায়

শাস্ত্রাবতার-বৈদ্যোৎপত্তিজ্ঞানাধ্যায়	নাড়ীপরীক্ষা সাধ্যনিরূপণাধ্যায়
দূতজ্ঞানাধ্যায়	জিহ্বাদি-মূত্রপরীক্ষানিরূপণাধ্যায়

বাতাদি-স্থাননিরূপণাধ্যায়
বাতাদি-পঞ্চাত্মকনিরূপণাধ্যায়
বাতাদি-প্রকোপহেতুনিরূপণাধ্যায়
বাতাদি-রুজ নিরূপণাধ্যায়
বাতাদি চেষ্টাশাস্তিযোগ-নিরূপণাধ্যায়
দেশদোষ-নিরূপণাধ্যায়
কালনিরূপণাধ্যায়
বয়োনিরূপণাধ্যায়
আহার-পাকনিরূপণাধ্যায়
গর্ভোৎপত্তি-জ্ঞান
রোগোৎপত্তিজ্ঞানাদি রসানাং সাত্ম্যনিরূপণাধ্যায়
সপ্তপ্রকৃতিনিরূপণাধ্যায়
ভেষজনিরূপণাধ্যায়
দেহনিরূপণাধ্যায়
সত্ত্বনিরূপণাধ্যায়
বলনিরূপণাধ্যায়
দেশকালাদি-ব্যাধিনিরূপণাধ্যায়
জ্বরাবলিবিধাননিরূপণাধ্যায়
আরোগ্যস্নানদিননিরূপণাধ্যায়
অগ্নিস্থাপন
তৈলমূর্চ্ছন
পশুনিঃসারণ
ঔষধ-ভক্ষণবিধি
পথ্যাচার-নিরূপণাধ্যায়
ভোজনবিধি
বিরুদ্ধাহারাদিনিরূপণাধ্যায়
জ্বরচিকিৎসিতাধ্যায়
জ্বরাতিসার-চিকিৎসিতাধ্যায়
অতিসারচিকিৎসিতাধ্যায়
প্রবাহিকা-চিকিৎসিতাধ্যায়
গ্রহণী-সংগ্রহগ্রহণীচিকিৎসিতাধ্যায়
অর্শশ্চিকিৎসিতাধ্যায়
অগ্নিমান্দ্যাজীর্ণ-বিসূচিকা-বিলম্বিকা-
চিকিৎসিতাধ্যায়
ক্রিমিচিকিৎসিতাধ্যায়
পাণ্ডুরোগ-কামলা-হলীমক-চিকিৎসিতাধ্যায়
রক্তপিত্তচিকিৎসিতাধ্যায়
রাজযক্ষ্ম-ক্ষতক্ষয়চিকিৎসিতাধ্যায়
কাসচিকিৎসিতাধ্যায়
হিক্কাশ্বাসচিকিৎসিতাধ্যায়
স্বরভেদচিকিৎসিতাধ্যায়
অরোচক-চিকিৎসিতাধ্যায়
ছর্দ্দিচিকিৎসিতাধ্যায়
তৃষ্ণাচিকিৎসিতাধ্যায়
মূর্চ্ছা-চিকিৎসিতাধ্যায়
মদাত্যয় চিকিৎসিতাধ্যায়
দাহচিকিৎসিতাধ্যায়
অপস্মারচিকিৎসিতাধ্যায়
বাতব্যাধি-চিকিৎসিতাধ্যায়
বাতরক্তচিকিৎসিতাধ্যায়
উরুস্তম্ভচিকিৎসিতাধ্যায়
আমবাতচিকিৎসিতাধ্যায়
শূলপরিণামশূলচিকিৎসিতাধ্যায়
উদাবর্ত্ত-চিকিৎসিতাধ্যায়
গুল্মচিকিৎসিতাধ্যায়
হৃদ্রোগ-চিকিৎসিতাধ্যায়
মূত্রাতিসারচিকিৎসিতাধ্যায়
অশ্মরীচিকিৎসিতাধ্যায়
স্থৌল্যাদি-চিকিৎসিতাধ্যায়
শোথচিকিৎসিতাধ্যায়
শ্লীপদচিকিৎসিতাধ্যায়
বিদ্রধি-চিকিৎসিতাধ্যায়
শারীর-ব্রণচিকিৎসিতাধ্যায়
সদ্যোব্রণ-চিকিৎসিতাধ্যায়

ভগন্দরচিকিৎসিতাধ্যায়
উপদংশচিকিৎসিতাধ্যায়
শূকদোষ-চিকিৎসিতাধ্যায়
ভগ্নচিকিৎসিতাধ্যায়
কুষ্ঠ-চিকিৎসিতাধ্যায়
উদর্দ্দ-কোঠ শীতপিত্ত-চিকিৎসিতাধ্যায়
অম্লপিত্তচিকিৎসিতাধ্যায়
বিসর্প-বিস্ফোট-চিকিৎসিতাধ্যায়
কফপিত্তচিকিৎসিতাধ্যায়
মসূরিকাচিকিৎসিতাধ্যায়
ক্ষুদ্ররোগচিকিৎসিতাধ্যায়
মুখরোগচিকিৎসিতাধ্যায়
কর্ণরোগচিকিৎসিতাধ্যায়
নাসারোগচিকিৎসিতাধ্যায়
নেত্ররোগ-চিকিৎসিতাধ্যায়
শিরোরোগ-চিকিৎসিতাধ্যায়
অসৃগ্দরচিকিৎসিতাধ্যায়
যোনিব্যাপৎচিকিৎসিতাধ্যায়
সূতিকা চিকিৎসিতাধ্যায়
স্ত্রীরোগচিকিৎসিতাধ্যায়
অকালদন্তচিকিৎসিতাধ্যায়
বালরোগচিকিৎসিতাধ্যায়
বিষদোষচিকিৎসিতাধ্যায়
রসায়নাধিকার

ঔষধ

ষড়ঙ্গপানীয়ং
নাগরাদি
গুড়ুচ্যাদি
ক্ষুদ্রাদি
কিরাতাদি
যবপটোল
কলিঙ্গাদি
ঘনচন্দনাদি
মুদ্গপটোল
নবাঙ্গ
গুড়ুচ্যাদি

পটোলাদি
কণ্টকার্য্যাদি
অমৃতাষ্টক
ধান্যপটোলাদি
পঞ্চকোল
পিপ্পল্যাদি
কণাতোয়ং
দশমূলং
হিঙ্গুলেশ্বর
নবজ্বরান্তকরস
নবজ্বরহর রস
সিংহনাদ রস (মূলে নবজ্বরেভসিংহ)
নবজ্বরান্তক
নবজ্বরাঙ্কুশ রস
প্রচণ্ড রস
স্বল্পমৃত্যুঞ্জয়
জ্বরকেশরী
স্বল্পপ্রতাপ-লঙ্কেশ
বৃহৎ প্রতাপলঙ্কেশ্বর
জ্বরাঙ্কুশ রস
জ্বরারি অভ্র
বালুকাস্বেদ
সৈন্ধবাদ্য নস্য
মধুকসার নস্য

নিষ্ঠীবনং
অষ্টাঙ্গাবলেহ
পঞ্চমুষ্টিক
ত্রিবৃতাদি
মাতুলুঙ্গাদি
বৃহন্নবাঙ্গ
দশমূল
দ্বাদশাঙ্গ
চতুর্দ্দশাঙ্গ
পঞ্চদশাঙ্গ
পঞ্চকোল দশমূল
অষ্টাদশাঙ্গ
বাতশ্লেষ্মান্তকাষ্টাদশাঙ্গ
মুস্তাদ্যষ্টাদশাঙ্গ
দূর্ব্বাদ্য তৈল
চন্দ্রশেখর রস
সিংহনাদ রস
সান্নিপাতসূর্য্য রস
কালাগ্নিরুদ্র রস
পঞ্চরুদ্র রস
স্বচ্ছন্দভৈরব রস
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্র রস
লক্ষ্মীবিলাস রস
ভৈরবেশ্বর রস
মহাসূর্য্য রস
অঞ্জনভৈরব রস
ত্রিদোষনীহার-সূর্য্য
সূচিকাভরণ রস
বেতাল রস (১)
বেতাল রস (২)
ত্রিবেতাল রস
জয়াবটী
বড়বানল রস
মৃতসঞ্জীবনী রস
আনন্দভৈরব রস
জ্বরকেশরী
সৌভাগ্যবটী
স্বজ্বরীভৈরব রস
ভৈরব রস
মৃত্যুঞ্জয় রস (১)
বৃহন্মৃত্যুঞ্জয়
মৃত্যুঞ্জয় রস (২)
চিন্তামণি রস
নবজ্বরসন্নিপাত-চিকিৎসাধ্যায়
নিদিগ্ধিকাদি
ভার্গ্যাদি
মুস্তকাদি
মধুকাদি
দার্ব্ব্যাদি
দাস্যাদি
রসোনতৈল
তালবটী
জীর্ণজ্বর-চিকিৎসাধ্যায়
ভূতজ্বরারি বটী
নিদ্রাকর যোগ
বিশ্বেশ্বর রস
বিজয় ধূপ
স্বল্পলাক্ষাদি তৈল
বৃহল্লাক্ষাদি তৈল
অঙ্গারক তৈল
পিপ্পল্যাদি তৈল
ষট্‌কট্‌র তৈল
সুদর্শন চূর্ণ
বৃহৎসুদর্শন চূর্ণ

জ্বরভৈরব চূর্ণ
বৃহৎ জ্বরভৈরব চূর্ণ
সর্ব্বজ্বরহর লৌহ (১)
সর্ব্বজ্বরহর লৌহ (২)
বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহর লৌহ
বিষমজ্বরান্তক লৌহ
চন্দনাদ্য লৌহ
বৃহচ্চন্দনাদি লৌহ
জীর্ণজ্বরাঙ্কুশ রস
জ্বরাশনি রস
চিরজ্বরাঙ্কুশ রস
বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ
ক্রোড়পত্র—মহাজ্বরাঙ্কুশ
মহামৃত্যুঞ্জয় রস
ভূরিদুর্ল্লভ রস
জ্বরপ্রতাপ রস
মেঘনাদ রস
বৃহন্মেঘনাদ রস
রসরাজ বটী
প্লীহাজ্বর—
মানগুড়িকা
গুড়পিপ্পলী
লম্বুষকাঞ্জিক
রোহিতক লৌহ
যকৃদরি লৌহ
লোকনাথ রস
সর্ব্বতোভদ্র রস
অভয়ালবণ
রসায়নামৃত লৌহ
মহাদ্রাবক রস
ইতি　সর্ব্বজ্বর

উৎপলষট্‌ক
হ্রীবেরাদি
বৃহৎ হ্রীবেরাদি
উশীরাদি
পয়স্যাদি
কুটজাদি
বৃহদ্‌গুড়ূচ্যাদি
পঞ্চমূল্যাদি
দশমূলশুণ্ঠী
ব্যোষাদিচূর্ণ
পাঠাদিচূর্ণ
গঙ্গাধরচূর্ণ
লোকনাথ রস
আনন্দভৈরব রস
কনকসুন্দর
মহাগন্ধক বটিকা
ইতি　জ্বরাতিসার

ধান্যপঞ্চক
কঞ্চটাদি
বৎসকাদি
নাগরাদি
কুটজপুটপাক
কুটজপ্রাশ
ইতি　অতিসার

জাতিফলাদিচূর্ণ
কুটজাবলেহ
কুটজাষ্টক
জাতিফলাদ্যা বটী
জাতিফলাদ্যা

স্বল্পজাতিফলাদ্যা
লবঙ্গচতুঃসম
রসাঞ্জনাদি
কলিঙ্গাদিবটী
বিজয়ভৈরব রস
বৈদ্যনাথগুড়িকা
চূর্ণাদিচূর্ণ
শুণ্ঠীচূর্ণ
আনন্দভৈরব রস
গঙ্গাধরচূর্ণ
কনকসুন্দর

ইতি অতিসার

ধান্যকাদি
নাগরাদি
গঙ্গাধরচূর্ণ
নায়িকাচূর্ণ
লবঙ্গাদিচূর্ণ
মধ্যমলবঙ্গাদিচূর্ণ
বৃহল্লবঙ্গাদ্যচূর্ণ
বৃহৎকুটজাবলেহ
কঞ্চটাবলেহ
মদনমোদক
বৃহৎকঞ্চটাবলেহ
বৃহৎশতাবরীমোদক
বৃহন্মদনমোদক
ঘোলমণ্ডূর
কামেশ্বরমোদক
মেথীমোদক
নারিকেলজলের ঔষধ (শোথে)
পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডূর
জীরকাদিমোদক
কামচার মণ্ডূর
অকালমৃত্যুহরণ বটী
নৃপবল্লভ রস
গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা
গ্রহণীকপাট রস
বৃহজ্জাতীফলাদ্যবটিকা
চিত্রাম্বর রস
কল্যাণ গুড়
কুষ্মাণ্ডকল্যাণ গুড়
পঞ্চামৃতা পর্পটী
সৌভাগ্যশুণ্ঠী মোদক
গ্রহণী-মিহির তৈল
শ্রীরস-পর্পটী
বিজয়-পর্পটী
স্বর্ণ-পর্পটী
দশমূল গুড়
চতুঃসম তাম্র
লবঙ্গাদ্যং চূর্ণং গর্ভিণ্যাং

ইতি গ্রহণী

কুটজাবলেহ
শ্রীবাহুশালগুড়
প্রাণদা গুড়িকা
শূরণ মোদক
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা
চক্রবদ্ধ রস
পর্প্পটী-বিধি
বৃহৎ শূরণ মোদক
কাঙ্কায়ন মোদক
লৌহামৃত
পিপ্পল্যাদি তৈল

সমঙ্গাদি দুগ্ধ
অপামার্গাদি লেপ
ইতি অর্শঃ

ধান্যশুণ্ঠী
হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ
অগ্নিমুখ চূর্ণ
বৃহদগ্নিমুখ চূর্ণ
অগ্নিবৃদ্ধা বটী
শার্দ্দূল-কাঞ্জিক
হরীতক্যমৃত
শঙ্খ বটী
মহাশঙ্খ বটী
বৃহংশঙ্খ বটী
বৃহৎশঙ্খ বটী
মহোদধি রস
বৃহন্মহোদধি রস
অজীর্ণকণ্টক
মহাজীর্ণকণ্টক
হুতাশন রস
অগ্নিকুমার রস
মহাগ্নিকুমার রস
রামবাণ রস
অগ্নিতুণ্ডী বটী
ক্রব্যাদ রস
কুষ্ঠাদ্য তৈল
ইতি

বিড়ঙ্গাদ্য ঘৃত
বিড়ঙ্গাদ্য লৌহ

ক্রিমিহা রস
কীটমর্দ্দ রস
ইতি ক্রিমি

পুনর্ণবা মণ্ডুর
বজ্রবটক মণ্ডুর
কামলাপহ লৌহ
ত্রিকত্রয়াদি লৌহ
নবায়স লৌহ
প্রাণবল্লভ রস
পাণ্ডুসূদন রস
মুর্ব্বাদ্য তৈল
পুনর্ণবাদ্য তৈল
ইতি পাণ্ডু-কামলা

বাসাঘৃত
কুষ্মাণ্ডখণ্ড
বাসাখণ্ড
শতাবরীঘৃত
খণ্ডামলকপ্রাশ
এলাদি গুড়িকা
শর্করাদ্য লৌহ
খণ্ডখাদ্য লৌহ
সুধানিধি রস
ইতি রক্তপিত্ত

ধান্যাদি
অশ্বগন্ধাদি
সিতোপলাদি লেহ
বীদ্ধ্যবাসিযোগ
বাসাখণ্ড

এলাদি মন্থ

তালীশাদি মোদক

সর্পিগুড়

লবঙ্গাদি মোদক

চ্যবনপ্রাশ

ছাগলাদ্য ঘৃত

বাসাবলেহ

বলাগর্ভ ঘৃত

বৃহৎকণ্টকারি ঘৃত

চন্দনাদ্য তৈল

রাস্নাদি লৌহ

চন্দ্রামৃত রস

স্বল্পমৃগাঙ্ক রস

মৃগাঙ্ক রস

ইতি রাজযক্ষ্মা

মরিচাদি চূর্ণ

পথ্যাদি গুড়িকা

ক্ষারগুড়িকা

লবঙ্গগুড়িকা

কোষাস্তিকা গুড়িকা

অমৃতার্ণব রস

ব্যাঘ্রী হরীতকী গুড়

স্বল্পরসেন্দ্র গুড়িকা

বৃহৎরসেন্দ্র গুড়িকা

হরীতক্যাদি মোদক

অগস্ত্য-হরীতকী

দশমূল ঘৃত

কণ্টকারি ঘৃত

বৃহৎকণ্টকারি ঘৃত

বৃহদ্বাসাবলেহ

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড

বৃহদ্বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড

কাসসংহার রস

রাস্নাদি লৌহ

শৃঙ্গারাভ্র

ইতি কাস

ভার্গী গুড়

কুলত্থ গুড়

ভার্গী শর্করাবলেহ

শ্বাসারি লৌহ

শ্বাসকুঠার রস

সূর্য্যাবর্ত্ত রস

ইতি শ্বাস

চব্যাদ্য চূর্ণ

কল্যাণ লেহ

ব্রাহ্মী ঘৃত

(স্বারস্বত ঘৃত)

পঞ্চবক্ত্র রস

ইতি স্বরভেদ

পানীয় ভক্ত

ভাস্কর রস

ইতি অরোচক

ছর্দ্দিবারক যোগ

ইতি ছর্দ্দি

বিষ্ণুধর্ম্ম রস

ইতি তৃষ্ণা

রসায়ন

ইতি মূর্চ্ছা

যোগবাহক রস

পুনর্ণবাদ্য ঘৃত

অকল্ক ঘৃত

ইতি মদাত্যয়

কুশাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ

কৃপানিধি রস

ইতি দাহ

কল্যাণ ঘৃত

মহাকল্যাণ ঘৃত

শিবাঘৃত

ত্রিকত্রয়াদি তৈল

পর্পটী রস

ইতি উন্মাদ

ব্রাহ্মী ঘৃত

চৈতস ঘৃত

হেমসাগর রস

কুষ্মাণ্ডক ঘৃত

ইতি অপস্মার

মাষবলাদি

স্বল্পরসোনপিণ্ড

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্‌গুলু

বাতারি গুগ্‌গুলু

বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত

নকুলাদ্য ঘৃত

মাষ তৈল

বৃহন্মাষ তৈল

সপ্তপ্রস্থ মহামাষ তৈল

কুব্জপ্রসারণী তৈল

স্বল্পবিষ্ণু তৈল

মহাবিষ্ণু তৈল

মধ্যমনারায়ণ তৈল

বৃহন্নারায়ণ তৈল

হিমসাগর তৈল

ত্রিগুণাখ্য রস

চতুর্ম্মুখ রস

ইতি বাতব্যাধি

গুড়ূচী ঘৃত

অমৃতাদ্য ঘৃত

মধ্যমগুড়ূচী তৈল

স্বল্পগুড়ূচী তৈল

বৃহদ্‌গুড়ূচী তৈল

ব্রহ্ম তৈল

পিণ্ড তৈল

বৃহৎ পিণ্ড তৈল

কৈশোরগুগ্‌গুলু

বজ্র গুগ্‌গুলু

গুড়ূচ্যাদি লৌহ

অর্কেশ্বর রস

মহাতালেশ্বর রস

বাতরক্তান্তক রস

ইতি বাতরক্ত

অষ্টকটূর তৈল

কুষ্ঠাদ্য তৈল

অমৃতাগুগ্‌গুলু

চতুরাননাভ্র
স্বয়মগ্নিরস
ইতি উরুস্তম্ভ

কাপাসাস্থিস্বেদ
রাস্নাপঞ্চক
রাস্নাস্বত্ব
রাস্নাদশমূল
বৈশ্বানর চূর্ণ
শুণ্ঠীখণ্ড
অজমোদাদ্য বটক
যোগরাজ গুগ্‌গুলু
বৃহৎ রসোনপিণ্ড
বাতারি গুগ্‌গুলু
ব্যাধিশার্দ্দূল গুগ্‌গুলু
দণ্ডপাণি উক্ত—
সিংহনাদ গুগ্‌গুলু
বৃহৎ সিংহনাদ গুগ্‌গুলু
বৃহৎ সৈন্ধবাদি তৈল
আমবাতারি বটিকা
ইতি আমবাত

শতাবরী মণ্ডূর

তারামণ্ডূর
বিড়ঙ্গাদি মোদক
পথ্যাদি লৌহ
নারিকেলামৃত খণ্ড
শুণ্ঠীখণ্ড
নারিকেলখণ্ড
বৃহন্নারিকেল খণ্ড
পানীয়ভক্ত বটিকা
খণ্ডামলকী
শঙ্খদ্রাবক বটী
শূলবজ্রিণী রস
বিদ্যাধরাভ্র (১)
শর্করালৌহ
বিদ্যাধরাভ্র (২)
ধাত্রী লৌহ
ইতি শূল-পরিণামশূল

ত্রিবৃদ্‌গুড়িকা
নারাচচূর্ণ
অবিপত্তিকর চূর্ণ
মণ্ড-লাজাবলেহ
ত্রিবৃতা বটী
শুষ্কমূলাদ্য ঘৃত
ইতি উদাবর্ত্ত

কাঙ্কায়ন গুড়িকা
হিঙ্গাদি চূর্ণ
নারাচক ঘৃত
ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত
ধাত্রীষট্‌পলক ঘৃত
দন্তীহরীতকী গুড়
শিখিবাড়বরস
ভল্লাতক ঘৃত
বিদ্যাধর রস
ইতি গুল্ম

বল্লভ ঘৃত
অর্জ্জুন ঘৃত
ইতি হৃদ্রোগ

(এই স্থানে মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসায় পত্র ছিন্ন।)

চিত্রকাদ্য ঘৃত
গোক্ষুর ঘৃত
ধাত্রীঘৃত

ইতি মূত্রাতিসার

শুণ্ঠ্যাদি
কুষ্মাণ্ডাদি ঘৃত
বরুণ ঘৃত
বরুণ গুড়

ইতি অশ্মরী

দাড়িমাদ্য ঘৃত
বৃহদ্দাড়িমাদ্য ঘৃত
চন্দ্রপ্রভা গুড়িকা
(এই স্থানে ১৭০ পৃষ্ঠা নাই। ১৭১ পত্র ছিন্ন।)
লৌহরসায়ন

ইতি স্থৌল্য

(এই স্থানে ১৭৩। ১৭৪। ১৭৫ পত্র নাই। ১৭৬ পত্র ছিন্ন।)

পুনর্ণবাবলেহ
ক্ষারগুড়িকা
দশমূল হরীতকী
কটুকাদ্য লৌহ
শোথশার্দ্দূল রস
শোথারি রস
শোথারি লৌহ

ইতি শোথ

পুনর্ণবা তৈল
(এই স্থানে ১৮০ পত্র ছিন্ন, ১৮১ ১৮২। ১৮৩ পত্র নাই।)
শূরেশ্বর ঘৃত
নিত্যানন্দ রস

ইতি শ্লীপদ

প্রিয়ঙ্গাদ্য তৈল

ইতি বিদ্রধি

চতুর্দ্দশাঙ্গ

ইতি শারীরব্রণ

জীরকাদ্য ঘৃত

ইতি শল্যব্রণ

ত্রিফলাগুগ্‌গুলু
বটিকাগুগ্‌গুলু
জাতীকাদ্য ঘৃত
রোমজললেপ
সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু
ভল্লাতকাদ্য তৈল
নবকার্ষিক গুগ্‌গুলু
সপ্তবিংশতি গুগ্‌গুলু
সৈন্ধবাদ্য তৈল
ভগন্দরহর রস
বনিতার্ণব রস

ইতি ভগন্দর

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত
আগারধূমাদ্য তৈল

ইতি উপদংশ

লেপযোগ

তৈল

পৃথক্ পথ্যাদি

ইতি শূকদোষ

চক্রতৈল

লাক্ষাগুগ্‌গুলু

আভা গুগ্‌গুলু

গন্ধ তৈল

ইতি ভগ্ন

বাস্তিকৃৎ পঞ্চকষায়

উন্মত্তক তৈল

করবীরাদ্য তৈল

বায় গুড়িকা

পঞ্চনিম্ব

পঞ্চতিক্ত ঘৃত

গুগ্‌গুলু পঞ্চতিক্ত ঘৃত

মরিচাদ্য তৈল

বৃহন্মরিচাদ্য তৈল

বিষ তৈল

(এই স্থানে ২০৫ পত্র নাই, ২০৬। ২০৭ পত্র ছিন্ন।)

মহাভল্লাতক

অমৃতাঙ্কুর লৌহ

ইতি কুষ্ঠ

অমৃতাদি

জয়াবটী

ইতি উদর্দ্দকোঠ শীতপিত্ত

সিংহাস্যাদি

স্বল্পপিপ্পলী খণ্ড

শুণ্ঠীখণ্ড

পিপ্পলী ঘৃত

অম্লপিত্তান্তক রস

লীলাবিলাস রস

রসেন্দ্র বটিকা

ইতি অম্লপিত্ত

অমৃতাদি

মহাপদ্ম ঘৃত

ইতি বিসর্প-বিস্ফোট

নারিকেলামৃত

ইতি কফপিত্ত

নিম্বাদি

ইতি মসূরিকা

চাঙ্গেরী ঘৃত

মূষিকাদ্য তৈল

কুঙ্কুমাদ্য তৈল

বর্ণক ঘৃত

হরিদ্রাদ্য তৈল

ত্রিফলাদ্য তৈল

গুঞ্জাদ্য তৈল

ভৃঙ্গরাজ তৈল

মালত্যাদ্য তৈল

পটোলাদ্য ঘৃত

ইতি ক্ষুদ্ররোগ

গণ্ডূষ ধারণ

কনকচূর্ণ

স্বল্পখদির বটিকা
বৃহৎখদির বটিকা
ইতি মুখরোগ

ক্ষারতৈল
অপামার্গ তৈল
শম্বূকাদ্য তৈল
বৃহৎশম্বূকাদ্য তৈল
ইতি কর্ণরোগ

ব্যোষাদ্য চূর্ণ
পাঠাদ্য তৈল
ব্যাঘ্রাদ্য তৈল
চিত্রকাদ্য তৈল
চিত্রক-হরীতকী
ইতি নাসারোগ

লোধ্র পোট্টলিকা
বিল্বাঞ্জন
ষড়ঙ্গ ঘৃত গুগ্‌গুলু
বাসকাদি
বৃহদ্বাসকাদি
চন্দ্রোদয় বর্ত্তি
কুমারিকা বর্ত্তি
চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি
সপ্তামৃত লৌহ
মহাত্রিফলাঘৃত
হরিদ্রাদ্যঞ্জন
ইতি নেত্ররোগ

বৃহজ্জীরকাদ্য তৈল
ষড়্‌বিন্দু তৈল
অপামার্গ তৈল
ময়ূরাদ্য ঘৃত
রসাভ্র বটিকা
দশমূল তৈল (১)
দশমূল তৈল (২)
বৃহদ্দশমূল তৈল
ইতি শিরোরোগ

দার্ব্ব্যাদি
পুষ্যানুগচূর্ণ
শীতকল্যাণ ঘৃত
শতাবরী ঘৃত
অশোক ঘৃত
ইতি অসৃগ্‌দর

শল্লক্যাদি তৈল
মূষিকাদ্য তৈল
পঞ্চপল্লবাদ্য ঘৃত
ফল ঘৃত
অশ্বগন্ধা ঘৃত
বৃহদশ্বগন্ধা ঘৃত
আরগ্বধাদ্য তৈল
ক্ষারতৈল
ইতি যোনিব্যাপদ্

বজ্রকাঞ্জিক
পঞ্চজীরক গুড়
ইতি সূতিকা

শ্রীপর্ণী তৈল
কাশীশাদ্য তৈল
যমকঘৃত
ইতি স্ত্রীরোগ

স্বর্ণমারণ
বালচাতুর্ভদ্রিকা
অশ্বগন্ধাঘৃত
কুমারকল্যাণক ঘৃত
অষ্টমঙ্গল ঘৃত
লাক্ষাদি তৈল

কতিপয় মন্ত্র

ইতি বালরোগ

অর্করস
কালরুদ্র রস
ভীমরুদ্র রস

ইতি বিষদোষ

মধুহরীতকী

ইতি রসায়ন

গ্রন্থকার ও তাঁহার পরিচয়

গ্রন্থকার রাধামাধব বৈদ্যরত্ন কবিরাজ স্বীয় গ্রন্থে পরিচয়স্থলে বলিতেছেন,—

আসীৎ সেনকুলে গদাধরসুতো দেবীবরো বিশ্রুতঃ,
তৎসূনুর্ম্মধুসূদনঃ সুবিদিতস্তৎপুত্রগৌরীবরঃ।
তদ্বীর্য্যোদ্ভবচারুযশসশ্চিন্তামণেঃ (?) সূনুনা
রাধামাধব-বৈদ্যরত্ন-কবিনা রত্নাবলী গুম্ফিতা॥

গ্রন্থকারের এই সেনকুল বিনায়কবংশ। মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে এই সেনকুলের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

[পর পৃষ্ঠায় বংশলতা দ্রষ্টব্য]
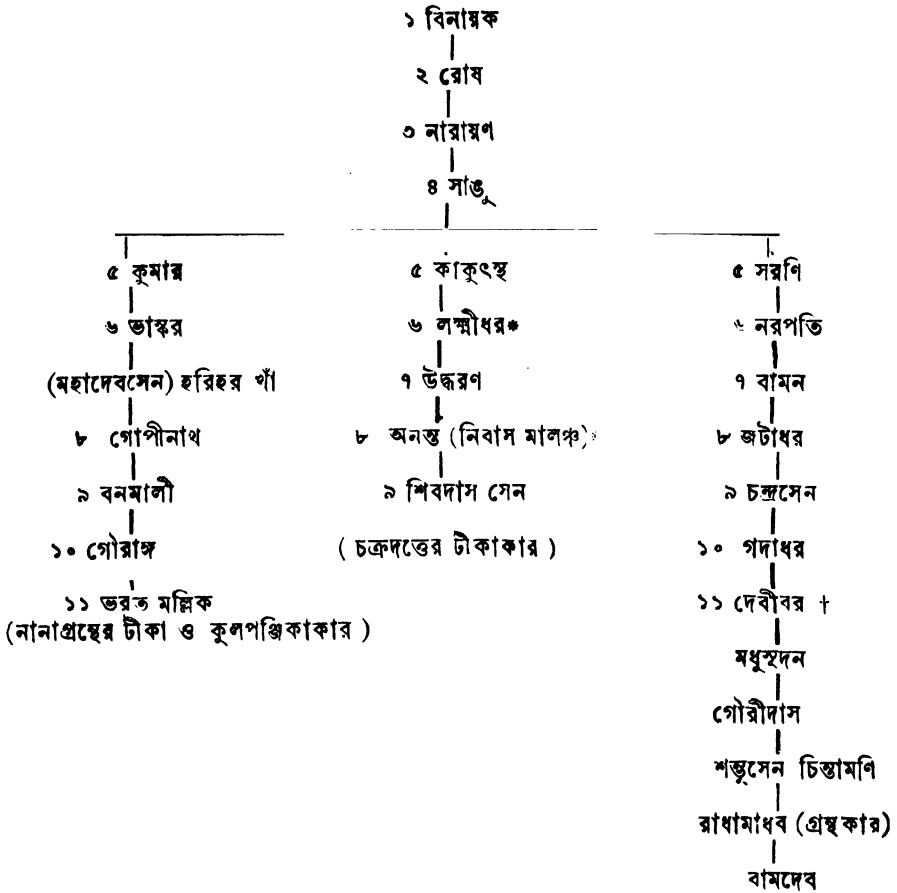
ভরত মল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভায় (৪৫ পৃ) রাধামাধব সেনের এবং তৎপুত্র বামদেবের নাম দৃষ্ট হয়। ভরত মল্লিকের সময় শকাব্দ ১৫৯৭, সুতরাং আমরা এই প্রমাণবলে বলিতে পারি যে, আলোচ্য গ্রন্থ উক্ত অব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

গ্রন্থারম্ভ—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নত্বাথ কৃষ্ণং কৃতকর্ম্মসারং
নানামুনীনাং বচনাবতারম্।
যোগং সমাহৃত্য সুসিদ্ধসারং
তেনে ময়া পত্রিকা (?) প্রচারম্॥

* ভরতের মতে লক্ষ্মীধরের পুত্র অনন্ত। অনন্ত সেন হইতে কুল নষ্ট হয় এবং শিবদাস সেন মালঞ্চ ত্যাগ করিয়া উত্তরগঙ্গ রাঢ়া রন্দীপুরে গমন করেন। দূরদেশস্থ বলিয়া ভরতের ভুল হইয়াছে।

† ইনি মালঞ্চ ত্যাগ করিয়া, রুক্মিণী ভোট গাঁ নামক স্থানে মাতামহ-আশ্রয়ে বাস করেন। (ভরত)

শেষ—সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

জ্বরোঽতিসারগ্রহণী অর্শোঽজীর্ণো বিসূচিকা।

*　　*　　*　　*

*　　*　　*　　*

বিষঞ্চেতি সমুদ্দিষ্টং রুগবিনিশ্চয়সংগ্রহে ॥

ইতি শম।

(২)

পরিভাষা

(বৈদ্যক)

আকৃতি ১৩″×৩½″। পত্রসংখ্যা ২২। পংক্তি ২০। অক্ষর ৪২। শ্লোক ২৮৬।

বিবরণ—পুথি দেশীয় তুলট-করা কাগজে লিখিত। পুথির অবস্থা বেশ ভাল আছে। অক্ষর সুন্দর, স্পষ্ট ও পরিষ্কার। জামনানিবাসী শ্রীরামজী সেনের হস্তাক্ষর। একটি সূচীপত্রও আছে।

বিষয়—বৈদ্যক-পরিভাষা। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি প্রস্তুত ও প্রয়োগের নিয়ম লিখিত। গোবিন্দ সেন, শ্রীকান্তদাস প্রভৃতির পরিভাষা হইতে ইহাতে নূতন কথা দু-একটি আছে এবং এতদ্ব্যতীত পাঠান্তর অনেক স্থানেই আছে।

আরম্ভ,— শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।

অব্যক্তামুক্তলেশোক্ত-সন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।

পরিভাষাঃ প্রকাশ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ ॥

সমাপ্তি,—ইতি পরিভাষা পুস্তক সমাপ্তঃ॥ এই পুথি নিজ ঘরে রহিল ॥।০ ।৫০ শকাব্দা ১৭২২ ॥ তারিখ ৬ বৈশাখ স্বাক্ষর শ্রীরামজী সেন সাং জামনা।

(৩)

সারতৈলিক

(অসম্পূর্ণ)

আকৃতি ১৪″×৩″। পত্র ১৩। পংক্তি ১০।

বিবরণ—পুঁথি দেখিয়া বোধ হয়, গ্রন্থের সামান্য অংশই আছে। অবস্থা মধ্যম। লিপি অশুদ্ধ হইলেও স্পষ্ট।

বিষয়—রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সংগ্রহ-গ্রন্থ।

আরম্ভ,—নমো গণেশায় ॥

দেবান্ শ্রীকৃষ্ণ-গৌরীশং বিরিঞ্চিপ্রমুখান্ গুরূন্।
নত্বা শ্রীপ্রীতিরামেণ ক্রিয়তে সারতৈলিকম্ ॥

সমাপ্তি,—নাই।

(৪)

রত্নমালাধ্যায়

(আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান)

(খণ্ডিত)

আকৃতি ১৪″×৩¼″। পত্রসংখ্যা ২৯। সূচীপত্রসংখ্যা ৪।

প্রতিপত্রে ১০ পংক্তি। প্রতি পংক্তিতে অক্ষর ৪০। শ্লোক ৩০০।

বিবরণ—পুঁথির প্রথম পত্রখানা নাই। এতদ্ব্যতীত সমুদায় পত্রগুলি ও সূচীপত্রগুলি বেশ ভাল অবস্থায় আছে। লিপি সুখপাঠ্য, সুন্দর ও বিশুদ্ধ।

একটি কারণে এই পুঁথিখানা বড়ই মূল্যবান্। এ পর্য্যন্ত আমি যতখানা হস্তলিখিত ও মুদ্রিত রত্নমালা দেখিয়াছি, তাহাতে কোথাও গ্রন্থকারের নাম পাই নাই। শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত-সম্পাদিত বৈদ্যক-শব্দসিন্ধুতে যে গ্রন্থবিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও কোন নামের উল্লেখ নাই। এই পুঁথিখানার সমাপ্তিতে গ্রন্থকারের নামের উল্লেখ আছে। এই কারণে এই গ্রন্থখানা মূল্যবান্ বোধ করি।

এই গ্রন্থের লেখক জামনানিবাসী রামজী সেন। ১৭২১ শকাব্দে গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার—রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণাস্তরঙ্গ। ইনি বীজী পদ্মদাসের অনন্তরবংশীয়। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ও শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষদ নরহরিদাস সরকার ঠাকুরের পিতা। শ্রীযুক্ত দীনেশ-

চন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রথম সংস্করণে (১৭৫ পৃঃ) নরহরিদাস সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার মহাপ্রভুর একজন অনুচর ছিলেন ; ইনি নীলাচলে চৈতন্যদেবের অতি অনুরক্ত সঙ্গী ছিলেন। কথিত আছে, নরহরি চিরকৌমারব্রত পালন করেন। নরহরি সরকার প্রসিদ্ধ লোচনদাসের গুরু ও "চৈতন্যমঙ্গল"-রচনার উপদেষ্টা ছিলেন। একটি সংস্কৃত বন্দনায় জানা যায়, নরহরির বর্ণ বিশুদ্ধ গৌর ও তাঁহার পিতার নাম নারায়ণ ছিল। নরহরি গৌরলীলার পদরচনার প্রবর্ত্তক বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে আদৃত ; ইহাঁর পদ অনুসরণ করিয়া বাসুদেব ঘোষ যশস্বী হইয়াছেন। নরহরি সরকার ১৫৪০ খৃঃ অব্দে গুপ্ত হন।" আমরা ভরত মল্লিকের চন্দ্রপ্রভা হইতে জানিতে পারি, ঠাকুর নরহরিদাস সরকার বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চারিটি কন্যাও হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে যথাসময়ে সৎপাত্রস্থও করা হইয়াছিল। (চন্দ্রপ্রভা ৩৪৫।৫০।৩৫৫ পৃষ্ঠা)

নরহরিদাসতনুজাশ্চত্বার এতে (? কুলোজ্জ্বলা জাতাঃ।
বৈতড়বংশসমুদ্ভবগরুড়ধ্বজসেন-কন্যকাকুক্ষৌ ॥
মালঞ্চবংশজনুষে দত্তৈকা সুপ্রভাতায়।
অপরে দ্বে থানায়াং তয়োস্তু মল্লীকমাধবায়াগ্র্যা ॥
অন্যা অপি যা চরমা দত্তা মল্লীকবিষ্ণুসেনায়।
অন্যা বরাহনগরে শ্রীলরামকান্তায় সেনায় ॥

রাজবৈদ্য অন্তরঙ্গ নারায়ণের একখানা কুলজী গ্রন্থও ছিল। ভরত মল্লিক চন্দ্রপ্রভার স্থানে স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। (পৃষ্ঠা ৪।৯।২১।২২)

আমরা এই গ্রন্থের নাম পাইলাম "রত্নমালাধ্যায়ঃ।" আমাদের বোধ হয়, ইহা কোনও এক বিরাট গ্রন্থের অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থসমাপ্তি পাঠ করিয়া আমাদের এরূপ ধারণা হইতেছে। সে যাহা হউক, এই গ্রন্থ যে ১৫৪০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে রচিত, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

সমাপ্তি—

ইতি চিকিৎসাকে * * মৃত্যুংরাজং বৈদ্য শ্রীনারায়ণান্তরঙ্গবিরচিতায়াং রত্নমালাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥*॥ যত্নেন লিখিতং গ্রন্থং যশ্চোরয়তি মূঢ়ধীঃ। মাতা চ শূকরী তস্য পিতা তস্য চ কুক্কুরঃ ॥ শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমো নমঃ ॥ * ॥ শ্রীশ্রীগুরুচরণে মম ভক্তিরস্তু ॥। সপার্ষদশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ জয়তাং ॥। * ॥ শ্রীশ্রীহরিঃ ॥ শকাব্দা ১৭২১ ॥ তারিখ ৭ চৈত্র অষ্টমি মঙ্গলবার। লিখিতং শ্রীরামজী সেন সাং জামনা পুস্তক নিজঘরে রহিল ॥।০॥।*॥।

এতৎসহ থানান্তরঙ্গের বংশপত্রী প্রদত্ত হইল।

নারায়ণ ও নরহরিদাসের বংশপত্রী

পদ্মদাস (বীজী)
|
ভিষগু মুনি, দেবলী
|
শূলপাণি
|
ডোমন
|
হরিদাস
|
ঈশান

কন্যা বিঃ রবিসেন মহামাণ্ডলিক — কন্যা বিঃ মালঞ্চীয় সাঙ্ সেন — নায়ক (নাক)

বামন

কালিদাস — বাসুদেব — কার্ত্তিক (স্ববংশপঙ্কেরুহ চণ্ডধামা)
|
নারায়ণখান অন্তরঙ্গ কবিরাজ

মুকুন্দ রাজবৈদ্য ইনি পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর পার্শ্বচর — মাধব বিশ্বাসরত্ন — নরহরিদাস সরকার কৃষ্ণপদার্চ্চনবিহিতবিলাসঃ, মুনিরিব ভিষজাং মধ্যে জাতঃ।

(৫)

ভিষগুৎসব
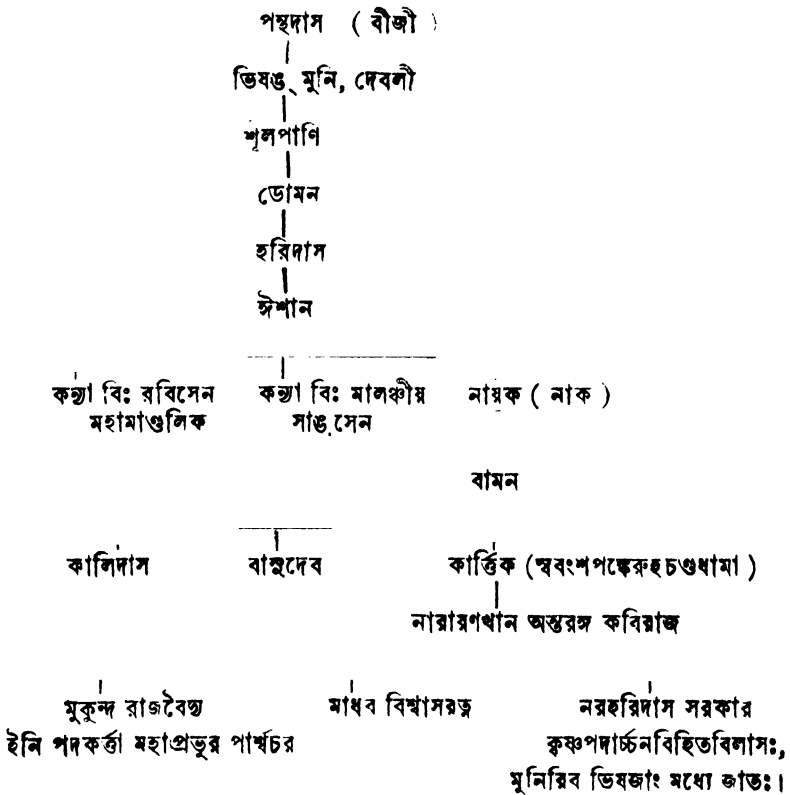
আকৃতি ১৩´×৪´´। পত্রসংখ্যা ৫। শ্লোক ১১৭।

বিবরণ—দেশীয় তুলট-করা কাগজে লিখিত। লেখা অপরিষ্কার ও অশুদ্ধ। রামমোহন পালের অন্য পুথির মতই লেখা। ইহাতে অনুমান হয়, এইখানাও তাঁহারই লিখিত। গ্রন্থের অবস্থা ভালই আছে।

বিষয়—কয়েকটি রোগের নিদান। মাধব-নিদানে কতকগুলি রোগের বিবরণ পাওয়া যায় না অথচ নামগুলি বড় প্রচলিত; তাহাদের বিবরণ ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নিম্নলিখিত রোগের নিদান আছে। যথা—

১। প্লীহা ৩। গুদভ্রংশ
২। মৃগী ৪। দাদা

৫।	ঐকাহিক	৯।	মূত্রাতিসার (বহুমূত্র)
৬।	সোমরোগ	১০।	মূত্রকৃৎ (বহুমূত্র)
৭।	ঊর্দ্ধাধোরোগ (ওলাউঠা)	১১।	ধ্বজভঙ্গ
৮।	আমরক্ত	১২।	ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতিক লক্ষণ

এই নিদান-লক্ষণে কিছু নূতনত্ব আছে। গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভে "চরকমতং প্রেক্ষ্য দর্শৈতে রোগা লিখ্যন্তে," এইরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থকার যে ভাবে নিদান লিখিয়াছেন, এমন কথা চরকে নাই। বিশেষতঃ "সন্নিপাতাস্ত্রয়োদশ কথ্যন্তে যথা চরকে" বলিয়া "সন্ধিকস্তন্দ্রিকশ্চৈব ত্বসাধ্যঃ চিত্তবিভ্রমঃ" ইত্যাদি যে নাম করিয়াছেন, এরূপ নাম চরকে নাই। চরক দোষের উল্বণ-ভেদে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পৃথক্ নাম করেন নাই। অথবা লক্ষণগুলিও সন্ধিক-তন্দ্রিকাদির মত নহে। যাহা হউক, যখন চরক ও সুশ্রুত ঘরে ঘরে থাকিত না, তখন ঐরূপ নাম করিয়া স্বীয় লিপির গৌরব বৃদ্ধি করিবার যে একটা বিশেষ চেষ্টা প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝা যায়।

আরম্ভ— নারায়ণং নমস্কৃত্য শ্রীনাথং পুরুষোত্তমং।
নানাশাস্ত্রাণি চালোক্য ক্রিয়তে ভিষগুৎসবঃ॥

শ্রীমাধবকরধৃতমতানুলম্বেন চরকমতং প্রেক্ষ্য কেনাপি দর্শৈতে রোগা লিখ্যন্তে।

সমাপ্তি,— শাকে খমণি কোরক (?) বেদে রাধাষ্টমীতিথৌ।
সঙ্কিতঃ কেন বিপ্রেণ সম্পূর্ণো ভিষগুৎসবঃ॥

ইতি যোগিনীতন্ত্রমতে ভিষগুৎসবঃ সমাপ্তঃ। শ্রীরস্তু মহি লেখকে॥ শিবায় নমঃ॥

গ্রন্থকার ও লেখক—গ্রন্থকার বা লেখকের নাম নাই। লেখা দেখিয়া গ্রন্থখানা রামমোহন পালের মনে হয় এবং শকাঙ্ক ১৭৪১ দেখিয়া গ্রন্থখানা "কুজাপেড় বিপ্রের" শ্রমসম্ভূত বলিয়া বোধ হয়।

---

(৬)

নাড়ী-প্রকাশ

(শঙ্কর সেন-কৃত)

আকৃতি ১৩″×৪″। পত্র ১২। প্রতিপত্রে পংক্তি ২০। অক্ষর ৪৮। শ্লোক ৩৫০।

বিবরণ—দেশীয় তুলট-করা কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখিয়া দুইটি পাতা আঠা দিয়া জুড়িয়া এক পত্র করা হইয়াছে। পুথির অবস্থা ভাল আছে। লিপি অপরিষ্কার ও অশুদ্ধ। ছেদচিহ্ন ও টিপ্পনী দেখিয়া পঠিত গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থের লেখক—লেখকের নাম নাই। তবে আদর্শ পুথির লেখকের পরিচয় অনুসারে ও লিপি দেখিয়া ইহা রামমোহন পালের হস্তলিপি বলিয়া বোধ হয়।

কালীকৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ভজতা তত্ত্ববোধিনা।
নাড়ীপ্রকাশঃ পঠিতো লিখিতো বিপ্রসূনুনা॥

শ্রীরামলোচন শর্ম্মণা তস্য পুস্তকং দৃষ্ট্বা

বিষয়—নাড়ী ধরিয়া ও শ্বাসের গতি দেখিয়া রোগনির্ণয়। গ্রন্থে চারিটি অধ্যায় আছে। সচরাচর যে সমুদায় মুদ্রিত নাড়ীপ্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তিনটি মাত্র অধ্যায় আছে। ভবানীপুর হইতে শ্রীনন্দলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত নাড়ীপ্রকাশে চারিটি অধ্যায় আছে। মুদ্রিত পুস্তকের সহিত এই গ্রন্থের অনেক পাঠান্তর আছে। এই পুস্তকে শঙ্কর সেনের পরিচয়জ্ঞাপক শ্লোকগুলি নাই।

আরম্ভ— শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।
শিবং প্রণম্য সশিবং শিবদং শিবকীর্ত্তনং।
গুণাতীতং গুণময়ং ব্যক্তমব্যক্তমব্যয়ং॥
সানন্দ-কবিরাজস্য সুহৃদঃ প্রিয়কাময়া।
নাড়ীপ্রকাশং তনুতে সেনশ্রীযুতশঙ্করঃ॥

সমাপ্তি,—ইতি শঙ্করসেনকৃতো নাড়ীপ্রকাশে চতুর্থোদ্যতঃ ॥০॥০॥ ইতি শ্রীযুচ্ছঙ্কর সেন কবিরাজকৃতো নাড়ীপ্রকাশঃ সমাপ্তঃ॥ ০ ॥ শ্রীগুরবে নমঃ। ০। শ্রীদুর্গা॥

শঙ্কর সেন কবিরাজের বংশপত্রী

শক্তি গোত্র
শ্রীবৎস (শক্তিধর)
|
পুণ্ডরীক
|
হুহি (হুমী)
|
কুশলী
|
হিঙ্গু
|
অনন্ত
|
উমাপতি
|
জগন্নাথ
|
লক্ষ্মীপতি
|
শ্রীপতি
|
শঙ্কর সেন কবিরাজ

(৭)

চিরতা ও চিতা-শোধন

বিবরণ—ইহা একখানা গ্রন্থের ১৪৯ সংখ্যক পত্র।

বিষয়—গুগ্‌গুলু, ধুস্তুরবীজ, চিরতা ও চিতা-শোধন এবং গুগ্‌গুলুর স্বরূপবর্ণনা। এই পত্রখানা চিরতা ও চিতা-শোধন-বিধির জন্যই আবশ্যক হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য—পত্রখানায় শোধন-বিধি বাঙ্গালা ও সংস্কৃতে লিখিত। বাঙ্‌লা অংশে শ, স, ু, ূ, ি, ী র যথেচ্ছ ব্যবহার দৃষ্ট হয়। সংস্কৃত অংশ বিশুদ্ধ। অথচ একই লোকের হস্তাক্ষর। নিম্নে পত্রখানার অনুলিপি প্রদত্ত হইল।

১ম পৃষ্ঠা

১ ॥ অথ গুগ্‌গুল শোধন ॥। হরীতকী আমলা বহেড়া গুলঞ্চ এষাং প্রতি দুই তোলা জল ৪ সের শেষ ১ সের গুগ্‌গুল খণ্ড খণ্ড

২ কাটীয়া ঘৃত কিঞ্চিত মাখিয়া অগ্নিতে কলাপাতা তাতাইয়া বস্ত্রে বান্ধিয়া পাতনা যন্ত্রে দোলা যন্ত্রে পাক করিয়া তবে গুগ্‌গু

৩ ল দিবে শিলায় বাটিয়া দিবে ॥০ ॥। ইতি গুগ্‌গুল সুদ্ধিঃ ।। * ॥। অথ ধুস্তুরবীজ শোধন॥। ধুস্তুরবীজ /।০ এক পোয়া

৪ দুগ্ধ /৵০ অর্দ্ধ পোয়া জল /॥০ অর্দ্ধ সের শেষ দুগ্ধ অবশেষ রাখীবে ধুস্তুরবীজ জলে ধুইয়া লইবে ॥।০ ॥। ইতি ধুস্তুরবীজ

৫ শোধন ॥। * ॥। অথ চিরাতা শোধন ॥। চিরতা /।০ এক পোয়া গোময় /।০ এক পোয়া জল ২ দুই সের শেষ ১ এক সের

২য় পৃষ্ঠা শ্রীহরি ১৪৯

৬ জলে ধুইয়া লইবে বদ্ধকোষ্টে শোধন করিবে না ॥।০ ।। ইতি চিরাতাশোধন ॥। * ।॥ অথ চিতা শোধন মাহ ॥। চিতা বস্ত্রে বান্ধিয়া

৭ /।০ এক পোয়া গোময় /।০ এক পোয়া জল ২ দুই সের শেষ ১ সের জলে ধুইয়া লইবে বদ্ধকোষ্টে শোধন করিবা না ॥।০ ।। ইতি চিতা

৮ শোধন ॥। * ।॥ অথ গুগ্‌গুলু শুদ্ধিঃ ॥। জায়ন্তে বরপাদপা মরুভুবি গ্রীষ্মেঽর্কতাপার্দ্দিতাঃ। শীতার্ত্তাঃ শিশিরেঽপি গুগ্‌গুলু রসং মুঞ্চ

৯ ন্তি তে পঞ্চধা। হেম—মহিষাক্ষিতুল্যমপরং সৎপদ্মরাগোপমং ভ্রঙ্গাভং (ভৃঙ্গাভং) কুসুম দ্যুতঞ্চ বিধিনা শোধ্যং ততো যত্নতঃ ॥০ ॥। উষ্ণে

১০ উষ্ণে দশমূল ক্বাথে পূতে গুগ্‌গুলুং প্রক্ষিপ্য আলোড্য বস্ত্রপূতং বিধায় পরি শোধ্য ঘৃতং দত্বা পিষ্টিতং গ্রাহ্যং ॥ ত্রিফলা ক্বাথে কশ্চিৎ ॥। ০ ॥।

১১ ধূস্তূরাদেশ্চ যদ্বীজং অন্যচ্চোপবিষঞ্চ যৎ। ক্ষীরেণ পাচয়েৎ দোলাযন্ত্রেণ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥

ইতি ধূস্তুরবীজশুদ্ধিঃ ॥। * ।॥

গ্রন্থনাম ও গ্রন্থকার—গ্রন্থ-নাম বা গ্রন্থকারের নাম নাই।

(৮)

জারণ-মারণপ্রয়োগ

(গ্রন্থকারের নাম নাই)

একখানি পত্র (১৩″ × ৪½″)

ধাতুসমূহের জারণ-মারণ এবং বিষ উপবিষসমূহের শোধন-প্রণালী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

আরম্ভ—শ্রীরামঃ। অথ জারণমারণপ্রয়োগঃ।

সমাপ্তি,—ইতি সংক্ষেপেণ জারণমারণাদিপ্রয়োগঃ সংকলিতঃ কেন। ১ ॥ শ্রীরামঃ ॥

লিপি অনুসারে পত্রখানা রামমোহন পালের লেখা বলিয়া বোধ হয়।

( )

কাল-নির্ণয়

দৈর্ঘ্য ১৪″ × ৩½″। পত্রসংখ্যা ৬। শ্লোকসংখ্যা ১৩১।

বিষয়—এই গ্রন্থে কতকগুলি অরিষ্ট-লক্ষণের উল্লেখ আছে। নাড়ীর গতির সহিত কতকগুলি বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যেরূপে ভাবি মৃত্যু বুঝিতে পারা যায়, তাহাই এই গ্রন্থে সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার—বিপ্র কুজাপেড় বা ভূস্থতাপেক্ষ। কুজাপেড় ও ভূস্থতাপেক্ষ এই দুইটি কষ্ট-কল্পিত নাম। গ্রন্থকার "গুড়ব্যাঘ্র" ন্যায়ে নিজের এই নাম সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁর প্রকৃত নাম রামলোচন। কুজাপেড় শব্দের টিপ্পনীতে এইরূপ লিখিত আছে—কঃ পৃথ্বী তস্যাং জাতা কুজা তাং পাতি কুজাপো রামঃ, তস্য ইট্ ইক্ষণং। কুজাপেট্।

এই টিপ্পনী হইতেও গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম জানা যায় না। কিন্তু ইহার পরই গ্রন্থশেষে "ভূস্থতাপেক্ষশাতেন" পদের টিপ্পনীতে লিখিত হইয়াছে—"রামলোচনশর্ম্মণা"। এতদ্ব্যতীত রামমোহন পাললিখিত "নাড়ীপ্রকাশে"র টিপ্পনীতে এইরূপ একটি শ্লোক আছে যথা;— "কালীকৃষ্ণপদদ্বন্দ্বং ভজতা তত্ত্ববোধিনা। নাড়ীপ্রকাশঃ পঠিতো লিখিতো বিপ্রসূনুনা ॥" "বিপ্র-সূনুনা" পদে × এই চিহ্ন দিয়া লেখা হইয়াছে—শ্রীরামলোচনশর্ম্মণা। তৎপর লেখক—"তস্য

পুস্তকং দৃষ্ট্বা” এইটুকু লিখিয়া মুছিয়াছেন। গ্রন্থকারের এইরূপ নাম গোপনের কি উদ্দেশ্য, বুঝা গেল না। সে যাহা হউক, কুঞ্জাপেটু শর্ম্মার শিষ্য রামমোহন পালের পঠিত নিদান আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা হইতে গ্রন্থকারের আরও পরিচয় জানিতে পারা গিয়াছে। গ্রন্থকার রামলোচন শর্ম্মার নিবাস কুলীনগ্রাম এবং তাঁহার উপাধি কণ্ঠাভরণ।

রামলোচন কণ্ঠাভরণের সময়নির্ণয় সম্বন্ধেও আমরা কিছু উদ্দেশ পাইয়াছি। উক্ত রামমোহন পাল-লিখিত ভিষগুৎসব গ্রন্থের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোক ও টিপ্পনী আছে ; যথা—

শাকে থমণি কোরেক (?) বেদে রাধাষ্টমীতিথৌ।
সঙ্কিতঃ কেন বিপ্রেণ সম্পূর্ণো ভিষগুৎসবঃ ॥

এই স্থলে শাকের পর √ এই চিহ্ন ব্যবহার করিয়া নিম্নে ১৭।৪১ লিখিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামলোচন কণ্ঠাভরণ প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গজননীর ক্রোড়-শ্রী বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রামমোহন পালের নিদানসংলগ্ন টিপ্পনীপত্রে এক ব্যক্তির মৃত্যুর সাল লিখিত আছে। যথা—১২২৫ সালে ১১ অগ্রাহয়ণ কাশীনাথ পালের ৬প্রাপ্তি হইয়াছে।

(১০)

রোগ-বিনিশ্চয়

(রুগ্‌বিনিশ্চয়——মাধব-নিদান)

আকৃতি ১৪´´×৩´´। পত্রসংখ্যা ১২২। শ্লোকসংখ্যা ১৭৫০।

বিবরণ—তুলট-করা কাগজে প্রতি পত্রের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। হস্তাক্ষর সুন্দর ও স্পষ্ট। পুথির অবস্থাও ভাল আছে। গ্রন্থের সহিত স্বতন্ত্র সূচীপত্র রহিয়াছে।

লেখকের পরিচয়—এই পুথির লেখক জামনাগ্রামনিবাসী বৈদ্য রামজী সেন। লেখক পরিচয় দিতেছেন—

শাকাব্দে শরজন্মতুণ্ডশশভৃৎ সুরার্ব্ব সর্ব্বংসহা
স্যাতে ব্যাধিবিনিশ্চয়ং লিখিতবান্ ঔরস্য পাঠাদরং।
সেনো বৈদ্যকরামজীবনসমাখ্যানোঽর্জ্জুনে পক্ষকে
মাষে (?) ফাল্গুনিকে মহীজদিবসে যাম্নানিবাসী মুদা॥

শরজন্মতুণ্ড=৬, শশভৃৎ=১, সুরার্ব্ব—সূর্য্যাশ্ব=৭, সর্ব্বংসহা—পৃথ্বী=১। লেখক রামজী সেন ১৭১৬ শাকে এই পুথি লিখিয়াছেন। এই পুথিতে আদর্শ-পুথিরও পরিচয় রহিয়াছে। যথা—

চন্দ্রবাণতিথৌ শাকে স্বকীয়ো লিখিতো ময়া।
ভিষক্‌শ্রীরামচন্দ্রেণ রুগ্‌বিনিশ্চয়সংগ্রহঃ ॥

১৫৫১ শাকে ভিষক্ রামচন্দ্র আদর্শ-পুথি লিখিয়াছিলেন। সেই পুস্তক দেখিয়া রামজী সেন পুথি লেখেন। এই পুথির সূচীপত্রে লিখিত আছে—

ইতি নিদান সমাপ্তঃ॥ শকাব্দা ১৭১৬ সন ১২০১ সাল তারিখ ১৫ ফাল্গুন স্বাক্ষর শ্রীরামজী সেন সাং জামনা পং রাণিহাটী এই পুস্তক নিজ ঘরে রহিল।

লেখক রামজী সেনের লিখিত নিম্নলিখিত গ্রন্থ দুইখানি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যথা—

পরিভাষা, ১৭২২ শকে লিখিত। রত্নমালাধ্যায়, ১৭২১ শাকে লিখিত।

বিষয়—রোগের নিদান-সংগ্রহ। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। সুতরাং বিশেষ বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। পাঠান্তর কচিৎ দৃষ্ট হয়।

আরম্ভ—　　প্রণম্য জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণং।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং ত্রৈলোক্যশরণং শিবং॥
নানামুনীনাং *　　*　　*

নিবধ্যতে রোগবিনিশ্চয়োহয়ং॥

সমাপ্তি,—　　সুভাষিতং যত্র যদস্তি কিঞ্চিৎ
তৎ সর্ব্বমেকীকৃতমত্র যত্নাৎ।
বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরাণাং
শ্রীমাধবেনেন্দ্রকরাত্মজেন॥
যৎ কৃতং সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃত্বেমং রুগ্বিনিশ্চয়ং।
মুঞ্চন্তু জন্তবস্তেন নিত্যমাতঙ্কসন্ততিং॥ শ্রীঃ॥

ইতি শ্রীমহামহোপাধ্যায় মাধবকবিরাজবিরচিতো রুগ্বিনিশ্চয়সংগ্রহঃ সমাপ্তঃ॥
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ॥

চন্দ্রবাণেত্যাদি শ্লোক।

শাকাব্দে শরেত্যাদি শ্লোক।

সমদোষঃ সমাগ্নিশ্চ সমধাতুমলক্রিয়ঃ।
প্রসন্নাত্মেন্দ্রিয়মনাঃ স্বস্থ ইত্যভিধীয়তে॥
যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লেখকে নাস্তি দোষকঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥
লিখিতং বহুযত্নেন যশ্চোরয়তি পুস্তকং।
শূকরী তস্য মাতা স্যাৎ পিতা তস্য (চ) গর্দ্দভঃ॥*॥

(১১)

রোগ-বিনিশ্চয়

(রুগ্‌বিনিশ্চয়—মাধব-নিদান)

আকৃতি দৈর্ঘ্য ৩১/২"×প্রসার ৪১/২। পত্রসংখ্যা ৮১। শ্লোক ১৭৫০।

লেখকের পরিচয়—এই পুস্তকের লেখক ও পাঠক ভূস্থতাপেক্ষ শর্ম্মার শিষ্য রামমোহন পাল। গ্রন্থশেষে লেখক নিজের পরিচয় দিতেছেন। যথা—

নিদানং সর্ব্বরোগাণাং মাধবেন প্রকাশিতং।
কণ্ঠাভরণতো নেত্রাম্নেত্রেণ পঠিতং মুদা॥
রামমোহনপালেন কুলীনগ্রামতো ময়া।
নিদানং পঠিতং শ্রীমদ্‌ভূস্থতাপেক্ষশর্ম্মণঃ॥

শ্রীরামঃ॥ শ্রীদুর্গা॥ শ্রীরস্তু ময়ি লেখকে। দ্বিজাতিকৃপয়া তদাশিষশ্চ॥ ১॥ ১। *॥

শ্রীগুরবে নমঃ॥ *॥ *॥ *॥ ০॥

বিষয়—রোগের নিদানসংগ্রহ। এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে। এই জন্য বিশেষ বিবরণ দেওয়া অপ্রয়োজন। মুদ্রিত গ্রন্থের সহিত ইহার স্থানে স্থানে পাঠান্তর আছে।

আরম্ভ—

প্রণম্য জগদুৎপত্তিস্থিতিসংহারকারণং।
স্বর্গাপবর্গয়োর্দ্বারং ত্রৈলোক্যশরণং শিবং॥
নানামুনীনাং বচনৈরিদানীং
সমাসতঃ সদ্‌ভিষজাং নিয়োগাৎ।
সোপদ্রবারিষ্টনিদানলিঙ্গো
নিবধ্যতে রোগবিনিশ্চয়োঽয়ং॥

সমাপ্তি,—

স্বরভাষিতং (?) যচ্চ (?) যদস্তি কিঞ্চিৎ
তৎ সর্ব্বমেকীকৃতমেব যত্নাৎ।
বিনিশ্চয়ে সর্ব্বরুজাং নরাণাং
শ্রীমাধবেনেন্দ্রকরাত্মজেন॥
যৎ কৃতং সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃত্বৈনং রুগ্‌বিনিশ্চয়ং।
মুঞ্চন্তু জন্তবস্তেন নিত্যমাতঙ্কসন্ততিং॥

ইতি শ্রীমাধবকরবিরচিতঃ সমাপ্তোঽয়ং রুগ্‌বিনিশ্চয়গ্রন্থঃ।

শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

শ্রীহট্টের পঁই

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় হেঁয়ালীর আলোচনা হইতেছে দেখিয়া শ্রীহট্টদেশপ্রচলিত হেঁয়ালীর কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া দিলাম। আশা করি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ এইরূপ অন্যান্য জেলার হেঁয়ালী-সমস্যা ও প্রবাদবাক্য উদ্ধার ও রক্ষাকল্পে যত্নপর হইবেন। নিম্নলিখিত হেঁয়ালীর মধ্যে অনেকগুলি শব্দ অর্থসঙ্গতির সহায় না করিয়া কেবল ছন্দ বা পদপূরণের জন্যই ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। শ্রীহট্টে হেঁয়ালীর নাম পঁই।

(১)

তিন অক্ষরে নাম যার সর্ব্বঘরে আছে।
পাছের অক্ষর ছাড়ি দিলে কেহ না যায় কাছে॥
আগের অক্ষর ছাড়ি দিলে সর্ব্বলোকে খায়
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে রাম-গুণাগুণ গায়॥

(উত্তর—বিছানা)

(২)

তিন অক্ষরে নাম যার ভাজা হয় ভালা।
মাঝের অক্ষর ছাড়ি দিলে নাম হয় কলা॥

(উঃ—করলা)

(৩)

এক অক্ষরে নাম যার ঐকার দিয়া পাছে।
কর্ণমূলে ভর করিয়া অলের উপর নাচে॥

অলের=মাটীর (উঃ—কৈ-মাছ)

(৪)

তলে মাটী উপরে মাটী মধ্যে সুন্দরী বেটী।

(উঃ—হলুদ)

(৫)

দশশির নয় রাবণ ধরে আষাঢ় শ্রাবণ।

(উঃ—ঝিঙ্গা)

(৬)

ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির ছানি।
কোন্ দেশে দেখিয়াছ গাছের আগায় পানি॥

(উঃ—নারিকেল)

(৭)

রাজার বাড়ীর মেনাগাই* মেন্‌মেনাইয়া চায়।
হাজার টাকার মরিচ খাইয়া আরো খাইতে চায়॥

(উঃ—মসলাবাটা শিল)।

(৮)

আল ঝন্‌ঝন্ আল কন্‌কন্ আল নিল চোরে।
অনিল† পর্ব্বতের আগুন কে নিবাইতে পারে॥

(উঃ—রৌদ্র)

(৯)

রাজার বাড়ীর ঘোড়ী এঠৈ বিয়ানে বুড়ী।

(উঃ—কলাগাছ)

(১০)

ইকড়ের তলে তলে ভিকমতির গাছ।
ফুল নাই গুটা নাই ধরে বারমাস॥

(উঃ—পান)

(১১)

ইরি ইরি বিন্না তিরি তিরি পাত।
বাড়ীর বিন্না চব্বিশ হাত॥

(উঃ—সুপারীগাছ)

* মেনাগাই—যে গাভীর সিং কোকড়াইয়া মস্তকের দুই দিকে সংলগ্ন হইয়া থাকে। মেন্‌মেনাই—চক্ষু অর্দ্ধেক বুজিয়া। (১) চায়—দৃষ্টি করে। (২) চায়—ইচ্ছা করে।

† অনিলপর্ব্বত—অতিদূরবর্ত্তী গহনবন; উদয়গিরি।

(১২)

তিন তেরেঙ্গা ধানের ভেঙ্গা।
গুটা মধুর পাত রাঙ্গা॥

(উঃ—শিঙ্গাইর)

(১৩)

এই ঘরের বুড়ীগুলি* সেই ঘরে যায়।
টাক্‌কুর টুক্‌কুর গুয়াখিনি খায়॥

(উঃ—ছরুতা)

(১৪)

উঠান ঠন্ ঠন্ বৈঠক মাটী।
কোন্ কুমারে গড়ছে ঘটী॥
বিনা দুধে হৈছে দৈ।
এমন কুমার পাইমু কৈ॥

(উঃ—চূণ)

(১৫)

গাঙ্গপারের বুড়ীগুলি নবধান কুটে।
কাঁকালিত পাড়া দিলে কেক্কাত করি উঠে॥

(উঃ—ঢেকী)

(১৬)

কালীয়ানা† বুড়ীগুলি নাক তাইর নথ।
পিন্দু নিয়ারা কাপড় তালুবায় তাইর পথ॥

(উঃ—সিন্দুক)

(১৭)

এই দেখ্‌লাম এই নাই,
কি কইমু রাজার ঠাঁই।

(উঃ—বিদ্যুৎ)

* বুড়ীগুলি—বুড়ীটি।

† কালীয়ানা—কৃষ্ণবর্ণা। বুড়ীগুলি—বুড়ীটি। নাক—নাকে। তাইর—তাহার। পিন্দু—পিন্ধনে পৈরণে। নিয়ারা (স্ত্রীলিঙ্গে)—গাঢ়। তালুবায়—উপরের দিকে। নথ-এ স্থলে বড় তালা।

(১৮)

দলে থাকে দলকুমারী দলে তাইর বাসা।
হাড় নাই গুড় নাই মাঙ্গল লুসা লুসা॥

(উঃ—পোক)

(১৯)

কুঠা কুঠা নব কুঠা বেত লাগে আশীমোটা।
শুন রে কামলাভাই, একটি বেতের বান্ধ নাই॥

(উঃ—দালান)

(২০)

পেট পৃষ্ঠ মাথা,
দুই হাত কুড়ি আঙ্গুল নাক্‌টা।
চক্ষুকর্ণ নাই* এমন জন্তু কোথায় পাই॥

(উঃ—মানুষ)

(২১)

মাছের নাই মাথা, গাছের নাই পাতা,
পক্ষীর নাই ডিম।
এরে যে ভাঙ্গাইতে পারে হাজার টাকা দিমু॥

(উঃ—কাকড়া—সিজগাছ—বাদুর)

(২২)

মৎস্য নয় মাংস নয় সর্ব্বলোকে খায়।
সভাতো† খাইলে বড় লজ্জা পায়॥

(উঃ—আছাড়)

(২৩)

একগুজা, গুজায় ধরে মরা, মরায় ধরে জিতা।

(উঃ—বড়শী)

(২৪)

লালবরণ ছয় চরণ পেট কাটিলে হাটে।
মূর্খে কি ভাঙ্গাইবা পণ্ডিতেরই ফাটে॥

(উঃ—আমপিপড়া

* নাই—নাভি।

† সভাতে—লোকের সাক্ষাতে।

(২৫)

মামায় দিলা পুখুরী ভাগীনায় দিলা পার।
টীয়াপাখীরে পানি খাইতে দেখায় সংসার॥
(উঃ—আয়না)

(২৬)

গাঙ্গপার মরিচগাছ হালু ঢুলু করে।
কোন্ মাইর পুতে তার কানি* লইতে পারে॥
[কেহই নিজের ছায়া মাড়াইতে পারে না।]
(উঃ—ছায়া)

(২৭)

উঠ্‌তে টেকা। (উঃ—ঢেকিশাক)

(২৮)

হুইতে টেকা। (উঃ—কেড়াপোকা)

(২৯)

টুন্নুত গুজা। (উঃ—খৈ)

(৩০)

ঘুমৃত উঠি তাতে হাতে।
(উঃ—দরজার খিল)

(৩১)

মাটীর তলে থাকে বেটী,
তেনা† পিন্ধে আটি আটি।
নাপিতে না ছয় ধুপায় না ধয়,
তেও বেটী ছাপ রয়॥
(উঃ—পিঁয়াজ, রসুন)

(৩২)

নাকদন্তের ধন আঙ্গুলদন্তে পাইলা।
অধিক যতনে তারে বেড়ে তুলি থইলা‡॥
(উঃ—নাকের শ্লেষ্মা)।

* কানি লইতে পারে—নিকটে যাইতে পারে।
† তেনা—নেকড়া। ছয়—স্পর্শ করে। তেও—তবু।
‡ থইলা—রাখিলা।

(৩৩)

নিকাইল পুছাইল ঘরখিনি তাত না পাড় কাই।
সোনার কটরা ভাঙ্গিলে গড়াই দেওয়া নাই॥
(উঃ—ডিম)

(৩৪)

পঁই দিলু পঁই হাত।
কোন্ পাখীর পোন্দে দাঁত॥
(উঃ—বোলতা)

(৩৫)

রাজার বেটা মরিয়া রইছে কান্দিবার নাই।
রাজার উঠান পড়িয়া রইছে ঝাড়িবার নাই।
মালী ফুল ফুটিয়া রইছে তুলিবার নাই॥
(উঃ—চন্দ্র—আকাশ—নক্ষত্র)।

(৩৬)

এইখানে কাটিলাম গাছ।
গাছ গেল ভানুগাছ*॥
(উঃ—সড়ক)

(৩৭)

উঠান ঠন্ ঠন্ বাড়ী ত নাই।
খাই বস্তুর বাকল নাই॥
(উঃ—লবণ)

(৩৮)

সাগ্‌তনে† পড়িল লাটম্ ভুইতে আগুন জ্বলে।
আমার ঠাকুর যে দিকে চায় সে দিকে জোকাড় পড়ে॥
(উঃ—ভূমিকম্প)

* ভানুগাছ—কোন দূরবর্ত্তী স্থানের নাম।
† সাগতনে—স্বর্গ হইতে। ভুইতে—ভূমিতে।
জোকাড় পড়ে—উলুধ্বনি হয়।

(৩৯)

একখানে দুইখানে তিনখানে জোড়া।
তার উপর বসাইল আনি ফুরি আংটার গোড়া*
(উঃ—হুকা-কল্কী)

ফুরি আংটার গোড়া—আগুন ধরা কয়লার টুকরা।

(৪০)

এই পাড়ে খাগড়া সেই পারে খাগড়া।
দুই খাগড়ায় ঝগড়া॥
(উঃ—চক্ষের পাতার লোম)

(৪১)

হাতীর দাত কদম্বের পাত।
(উঃ—মূলা)

শ্রীদ্বারকানাথ চৌধুরী

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-বিবরণী

ঊনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ২৫শে মে, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সদস্য-নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ ও শ্রীযুক্ত বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কতিপয় প্রাচীন মুদ্রা। ৫। পুরস্কার ও পদক-বিতরণ, ৬। সভাপতির অভিভাষণ, ৭। ঊনবিংশ সাংবৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠ, ৮। ১৩২০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়-ব্যয়। ৯। সহায়ক-সদস্য নিয়োগ, ১০। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োগ, ১১। ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহকসমিতি গঠন, ১২। শোক-প্রকাশ—৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, ৺অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে এম্ এ, বি এল, ৺অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, ৺অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র বসু এম্ এ, ৺আশুতোষ বাগচী এম এ, ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৺গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি এল্ ও ৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পরলোকগমনে, ১৩। বিবিধ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ (সভাপতি)

মাননীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এম, এ, বি, এল, এল্ এল্ ডি,

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এইচ ডি,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এমএ, বিএল
" হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
" পঞ্চানন নিয়োগী এম এ
" চারুচন্দ্র মিত্র এম এ, বি এল
" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
" অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ
" বিপিনবিহারী গুপ্ত এম এ
" কুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ
" মন্মথমোহন ঘোষ এম এ
" মন্মথনাথ বসু এম এ
" পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
" হেমেন্দ্রনাথ সিংহ এম এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" গৌরহরি সেন
" চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
" বাণীনাথ নন্দী

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ
" ডাঃ বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি
" সুরেশচন্দ্র নন্দী
" মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" কুঞ্জলাল রায় সরস্বতী
" অমৃতগোপাল বসু
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র
" মণীন্দ্রনাথ বসু
" তারাচরণ চক্রবর্ত্তী
" অঘোরনাথ অধিকারী
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
" সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
" জিতেন্দ্রনাথ সেন
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
" তারাপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাবিনোদ
" শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
" সুরেশচন্দ্র সেন এম এ
" যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" হেমেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
" যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি এ
" রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
" রাজেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
" বঙ্কুবিহারী রায়
" তারকনাথ বিশ্বাস
" সন্তোষকুমার দাস
" চারুচন্দ্র দত্ত
" অশ্বিনীকুমার চক্রবর্ত্তী বি এল
" কানাইলাল সেন

শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
" কৃপারাম সেনগুপ্ত
" সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়
" উপেন্দ্রনাথ দে
" নৃপেন্দ্রনাথ বসু
" মধুসূদন চক্রবর্ত্তী
" বীরেন্দ্রলাল নন্দী
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" কিশোরীমোহন সিংহ
" পূর্ণচন্দ্র সিংহ বি এ
" সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
" মতিলাল সিংহ
" মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
" শিবেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
" শশধর ঘোষ
" ললিতমোহন ঘোষ
" সিদ্ধেশ্বর দাস
" নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
" কবিরাজ বিজয়কৃষ্ণ দাসগুপ্ত
" করুণাচন্দ্র মজুমদার
" সরলকুমার বসু
" যামিনীকান্ত রায়
" কালিদাস রায় চৌধুরী
" সারদাচরণ সেন
" সিদ্ধেশ্বর ঘোষ দাস
" নবকৃষ্ণ রায় চৌধুরী
" সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
" নিরাপদ্ বন্দ্যোপাধ্যায়
" যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্
" শ্যামলাল দে
" আশুতোষ দাসগুপ্ত মহলানবিশ
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায়	শ্রীযুক্ত সুবোধকৃষ্ণ দেব
„ অনন্তনারায়ণ সেন	„ বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
„ অমৃতলাল দাসগুপ্ত বিএ	„ রামকমল সিংহ
„ প্রতাপচন্দ্র রায়	„ বিনোদবিহারী গুপ্ত
„ যতীন্দ্রনাথ সিংহ	„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ মণীন্দ্রনাথ ঘোষ	„ ভোলানাথ কোঁচ
„ দেবেন্দ্রনাথ সেন	

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত — সহকারী সম্পাদকগণ

কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

১। সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। সভারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের দৈবদুর্ঘটনায় আকস্মিক জীবনসঙ্কট বিপদ্ হইতে ঈশ্বরকৃপায় অতি আশ্চর্য্যজনক উদ্ধার লাভ করায় ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া আনন্দ প্রকাশপূর্ব্বক প্রস্তাব করিলেন যে, এই আনন্দ-প্রকাশ-সংবাদ মহারাজকে জানান হউক। উপস্থিত সদস্যগণের সম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী	শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম্ এ সাহাজাদপুর, পাবনা।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	„	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ৩০ তালপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা।
শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র	„	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ ১৭৭ রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া।
কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম্ বি, ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
		ডাঃ শ্রীমৃগেন্দ্রলাল মিত্র ২১২।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ, এম্ বি, সি এম্, ৮৬ মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট।
”	”	কবিরাজ শ্রীরাখালচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ ২১২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ	শ্রীচারুচন্দ্র সিংহ এম্ এ, অধ্যাপক কৃষ্ণনাথ-কলেজ, বহরমপুর।
	”	কবিরাজ শ্রীরাখালদাস সেনগুপ্ত কাব্যতীর্থ কবিভূষণ, সঞ্জীবন ঔষধালয়, ১০৪ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	শ্রীনারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২১ তোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	”	ডাঃ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দাস ১৬ গোলোক দত্তের লেন, হাটখোলা।
শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায় ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ১৯ যুগলকিশোর দাসের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্এ, ২৮ ষষ্ঠীতলা রোড।
”	”	শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ বেহালা, ২৪ পরগণা।
”	”	শ্রীশরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ ২৬ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
”	”	শ্রীশশিভূষণ বসু, ৫২ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	”	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন এম্এ, পি আর এস্ অধ্যাপক, পুণা।
”	”	শ্রীসচ্চিদানন্দ দত্ত ৩।১ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট।
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী	”	শ্রীপঞ্চাননদাস মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৩৬ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীকালবরণ ঘোষ ১৭৬ রামকৃষ্ণপুর লেন, শিবপুর, হাওড়া।
শ্রীতারকচন্দ্র রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীঅক্ষয়ভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পোষ্টমাষ্টার, ময়মনসিংহ।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৩৯ মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট।
শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীযোগেশচন্দ্র ভৌমিক পশুপতিগঞ্জ কাছারী, অরঙ্গাবাদ, গয়া।
"	"	শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত ৫৪ চুণাপুকুর লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	ডাঃ শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ডি, এল এম্ এস্, ৬ মদনমিত্রের লেন।
"	"	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২ শাঁখারীটোলা লেন।
শ্রীদুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅনন্তকুমার দাসগুপ্ত এম এ, বি এল্, উকীল, কটক।
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম্ এ, বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ৬৫ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীবিমলচন্দ্র দাসগুপ্ত বি এল্, হাইকোর্টের উকীল, ২৩ নেবুতলা লেন।
"	"	শ্রীমন্মথনাথ রায় এম্ এ, বি এল্, হাঃ উঃ, ২ বলরাম বসুর ফাষ্ট লেন, ভবানীপুর।
"	"	শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দে এম্ এ, বি এল্, ১২৮।২ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট।
"	"	শ্রীঋষীন্দ্রকুমার সরকার এম্ এ, বি এল্, হাঃ উঃ, ২০ শাঁখারিটোলা ইষ্ট লেন।
"	"	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি এল্, হাঃ উঃ, ৯৯ কাঁশাড়ীপাড়া রোড।
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস বি এল্ হাইকোর্ট উকীল, ১১০ রসারোড, নর্থ ভবানীপুর।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীসুশীলকুমার বসু বি এল্, হাঃ উঃ, ৩৮ অপারসারকুলার রোড।
"	"	শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র সরকার এম এ, বি এল, হাঃ উঃ, ৭ ডক্টার লেন, তালতলা।
"	"	শ্রীরমেশচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল, হাঃ উঃ, ৬২।৪ রসারোড, নর্থ।
"	"	মাননীয় শ্রীমহেন্দ্রনাথ রায় এম্ এ, বি এল, হাঃ উঃ, বলরাম বসুর ফার্ষ্ট লেন, ভবানীপুর।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	ডাঃ শ্রীপ্রিয়লাল ঘোষ মেডিকাল অফিসার, ডি, এস, রেলওয়ে, মাকুম, ডিব্রুগড়, আসাম।
	কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসত্যানন্দ বসু এম্ এ, বি এল্, ৭৮ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট।
শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	শ্রীনৃপেন্দ্রলাল রায় সুপাঃ রাজষ্টেট, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
শ্রীসিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষ		শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রায় ৪৫ গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন।
		শ্রীপ্রিয়নাথ দত্ত চৌধুরী বি এল্, এড্‌ভোকেট, নাগপুর।
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীআশুতোষ ঘোষ বি এল্, সাব-জজ, ১০ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	শ্রীঅঘোরনাথ অধিকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, শিলচর নর্ম্মালস্কুল, শিলচর, আসাম।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীকুমুদরঞ্জন রায় শিক্ষক স্কটিস কলিঃ স্কুল, ৪০ দুর্গাচরণ মুখার্জ্জির ষ্ট্রীট।
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ এম এ, বি এল, ৭৯ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীহীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম্ এ,বি এল্, ১৩ পদ্মনাথ লেন, শ্যামবাজার।
	"	শ্রীকুমারশঙ্কর রায় বি এল্, ৪৪ ইউরোপিয়ান এসাইলাম লেন।

কার্য্য-বিবরণী

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমোহিনীনাথ বসু এম্ এ, বি এল্, ৬৯ বিডন ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল, ৭।১ হরিঘোষের ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার বি এল্, ১৮ রসারোড, নর্থ।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়		শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এল্, ৭২ রসারোড, ভবানীপুর।
		শ্রীসরসীমোহন রায় এ্যাটর্ণি, ৬৬ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।
		মিঃ এন্ এন্ ঘটক, ব্যারিষ্টার এট-ল, ৬৬ পাথুরেঘাটা ষ্ট্রীট।
শ্রীব্যোমকেশ	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীগোপালচন্দ্র সোম এম্ এ, বি এল্ ২৯ হোগলকুড়িয়া গলি।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্, ৩৪।১ এলগিন রোড, ভবানীপুর।
শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত	শ্রীবোধিসত্ত্ব সেন	শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ বি এল্, ২৫ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোড, ভবানীপুর।
শ্রীসারদাচরণ মিত্র	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী এম্ এ, বি এল, ৪৭ বসুপাড়া লেন, বাগবাজার।
শ্রীবাণীনাথ নন্দী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীকুমুদবন্ধু দাসগুপ্ত প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, ১০ সুকিয়া ষ্ট্রীট।
„	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ৩।১।১ বৃন্দাবনমল্লিক লেন।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	মৌলবী আতাহার রহমাণ কলোনাইজেসন অফিসার, সুন্দরবন, বরিশাল।
		শ্রীশেখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বজজ, আগরা।
		শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র নাগ এম্ এ, অধ্যাপক আগরা কলেজ, আগরা।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীবেণীমাধব সরকার এম্ এ, অধ্যাপক আগড়া কলেজ, আগরা।
	„	শ্রীহরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম্ এ ঐ ঐ
	„	শ্রীগঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, অধ্যাপক সেণ্ট জন্স কলেজ, আগরা।
	„	শ্রীবিনোদলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, আজমীর।
	„	মিঃ জে, সি, সেন বি এ, অধ্যাপক মেয়র কলেজ, আজমীর।
	„	শ্রীরাজকৃষ্ণ কুমার, ভারতবর্ষীয় জাতীয় সমিতি ও লায়ানলাইব্রেরীর সভাপতি, আলিগড়।
	„	শ্রীউদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জজ আদালতের মুনসারিম, (Munsarim) আলিগড়।
	„	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, উকীল, আলিগড়।
	„	শ্রীপিয়ারীলাল গুপ্ত একাউণ্টাণ্ট, মিলিটারী ওয়ার্ক, এলাহাবাদ।
	„	শ্রীবিধুভূষণ চট্টোপাধ্যায় একাউণ্টাণ্ট, পি, ডব্লিউ, ডি, এলাহাবাদ।
	„	শ্রীবঙ্কবিহারী চক্রবর্ত্তী সাব-ওভারসিয়ার ঐ ঐ।
		ওভারসিয়ার ঐ ঐ।
	„	রায় বাহাদুর বি, বি, চক্রবর্ত্তী একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার ঐ ঐ।
	„	রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ, এল এল বি, ইন্সপেক্টার অব স্কুলস্, ঐ ঐ।
	„	মিঃ এ, সি, মুখোপাধ্যায় এম্ এ, অধ্যাপক মুরসেন্ট্রাল কলেজ, এলাহাবাদ।
	„	শ্রীঅভয়চরণ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ঐ ঐ।

কার্য্য-বিবরণী

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীকুমুদবিহারী মিত্র এম্ এ, অধ্যাপক মুরসেন্ট্রাল কলেজ, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ পাল এম্ এ, ঐ ঐ
"	"	ডাঃ অন্নদাপ্রসাদ সরকার বি এ, বি এস্সি, ঐ ঐ
"	"	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্ এ, ঐ ঐ
"	"	শ্রীউমাচরণ মুখোপাধ্যায় ১২ এলবার্ট রোড, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীমথুরানাথ মুখোপাধ্যায় ঐ ঐ
"	"	শ্রীনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় হেডক্লার্ক, ক্যান্টনমেণ্ট, এলাহাবাদ।
"	"	শ্রীহরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় হেডক্লার্ক, মিলিটারী মেডিকাল আফিস, জলন্ধর বিগেড, আম্বালা।
"	"	ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এল এম্ এস, আঙ্গুল, উড়িষ্যা।
"	"	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাব-ইঞ্জিনিয়ার, ঐ ঐ।
"	"	শ্রীউমেশচন্দ্র সেন হেডক্লার্ক, খাসমহল, ঐ।
"	"	শ্রীসীতানাথ ঘোষ ঐ ঐ।
"	"	শ্রীগৌরচরণ সেন ডেপুটী কমিশনারের আফিস, ঐ ঐ।
"	"	শ্রীনীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, আসানসোল।
"	"	শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র ঘোষ মুন্সেফ, আসানসোল।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীঅভয়নারায়ণ মিত্র সব ডেঃ কলেক্টর, আসানসোল।
"	"	ডাঃ এন্, এন, সেন গুপ্ত এম্ বি, এসিঃ সার্জ্জন, ঐ
"	"	শ্রীশীতলচন্দ্র বসু, হাইকোর্ট, লিষ্টডিপার্টমেণ্ট।

৪। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
যুক্ত চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়	১। শ্রীসচ্চিদানন্দগীতা
" বিজয়লাল দত্ত	২। মহানিদ্রায় মহাপ্রাণ
" শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়	৩। কুসুমহার (১ম খণ্ড)
" সুরেন্দ্রনাথ দত্ত	৪। সরলগীতা
" ললিতচন্দ্র মিত্র	৫। শ্রীশ্রীগোপাল চম্পু (পূর্ব্বচম্পূ ১ম খণ্ড হইতে ৮ম খণ্ড)
" যোগীন্দ্রনাথ সরকার	৬। ছেলেদের মহাভারত
	৭। মহাভারতের গল্প
	৮। উপকথা
	৯। খুকুমণির ছড়া
	১০। হাসিখুসি
	১১। হাসিরাশি
	১২। শকুন্তলা
	১৩। হরিশ্চন্দ্র
	১৪। নূতন ছবি
	১৫। সাবিত্রী-সত্যবান্
	১৬। পশুপক্ষী
	১৭। হাসি ও খেলা
	১৮। রাঙাছবি
	১৯। খেলার সাথী
	২০। আষাঢ়ে স্বপ্ন

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার	২১। ছবির বই
	২২। লঙ্কাকাণ্ড
	২৩। টুকটুকে রামায়ণ
	২৪। পূজায় রং-চং
	২৫। শ্রীবৎস
শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিএ	২৬। উজানি
	২৭। বন-তুলসী
	২৮। শতদল
„ কালীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৯। দেবব্রত
ডাঃ „ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	৩০। শ্রীশ্রীযুতের পদ (২য় ভাগ)
	৩১। সহজানন্দ-পদাবলী
	৩২। ভাবলহরী (১ম ভাগ)
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৩। উদয়সিংহ (নাটক)
„ মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী	৩৪। কাশীধাম
	৩৫। ঠাকুর-মা
„ সচ্চিদানন্দ দত্ত	৩৬। কবিতামঞ্জরী
ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ এম্ ডি	৩৭। স্বাস্থ্যতত্ত্ব (১ম ও ২য় ভাগ)
শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮। ব্রাহ্মণগণ হিন্দু কি না ?
„ সতীশচন্দ্র সরকার	৩৯। আলুর চুড়ী (১ম ভাগ, ৪ কপি)
	৪০। কার্য্যকরী শিল্পপ্রস্তুত প্রণালী (৩ কপি)
„ রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম এ	৪১। ভাষাপরিচ্ছেদ (২য় খণ্ড)
„ রাজকৃষ্ণ দত্ত	৪২। 'মা' (গান)
„ জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৪৩। ধ্যানলোক
„ কুমারনাথ মুখোপাধ্যায়	৪৪। মধুময়ী চণ্ডী
„ দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৪৫। শিবাখ্যাকিঙ্কর কাব্য
„ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়	৪৬। পল্লীসেবক (প্রবন্ধ)
„ মন্মথনাথ নাগ	৪৭। ভক্তের ভগবান্
„ সতীশচন্দ্র দত্ত	৪৮। জ্যোতিঃ
	৪৯। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকাদি
শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত	৫০। তপোবন
" প্রমথভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫১। নরেন্দ্রনাথ
" প্রবোধচন্দ্র দে	৫২। সব্জী-বাগ
" প্রমথভূষণ চট্টোপাধ্যায়	৫৩। ইতিহাস-শিক্ষাপ্রণালী
	৫৪। পল্লীসেবক
	৫৫। সাধনা
" সতীশচন্দ্র দেব বি এল্	৫৬। নীতিসন্দর্ভ
" অঘোরনাথ অধিকারী	৫৭। প্রকৃতি প্রবেশ পদার্থ-পরিচয়
	৫৮। বিবিধ বিধান
" চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯। কীর্ত্তিগাথা
" সিদ্ধেশ্বর দাস ঘোষ	৬০। চিকিৎসা-শাস্ত্রসম্বন্ধীয় পুথি

ইংরাজি পুস্তক

The Supdt. Govt. Press, Madras	1. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. in the Govt. Oriental Manuscript Library, Madras, Vol. XV.
The Supdt. Govt. Printing, India Calcutta.	2. Report on the Progress of Agriculture in India for 1911-12.
	3. The Indian Forest Code,
Govt. of India, Commercial Dept, Calcutta	4. Accounts relating to the trade by land of British India with foreign Countries for April to Dec. 12.
Govt of India Commercial Intelligence Dept.	5. Statistics of cotton spinning & weaving in Indian Mills. Feb. 13.
Asst. Secv. to the Govt. of Bengal(Marine)	6. Annual Report of the Health Officer of the Port of Calcutta during the year 1912.
	Annual Report of the Health Officer of the Port of Chittagong, for 1912.
Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot.	8. Reports on the working of the District Boards in Bengal for 1911-12.
	9. Reports on the working of Municipalities in Bengal 1911-12.

Supdt. Govt. Press, Madras. — 10. A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras. Vol. XVI.

Director, Geological Survey of India. — 11. Memoirs of the Geological Survey of India Vol. XI Part 1.

৫। তৎপরে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বিশ্বাস তর্কবাগীশ মহাশয়ের প্রদত্ত দুইটি প্রাচীন কাশ্মীর-রাজ্যের রৌপ্যমুদ্রা এবং শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রদত্ত কয়েকটি বৈদেশিক তাম্রমুদ্রা প্রদর্শিত হইলে প্রদাতৃগণকে যথারীতি কৃতজ্ঞতা জানান হইল।

৬। অতঃপর পরিষদের হস্তে যে সকল পুরস্কার-প্রবন্ধের ব্যবস্থা-ভার অর্পিত আছে, তৎসম্বন্ধে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ বিবরণ জ্ঞাপন করেন,—

(১) বীরেশ্বর পাঁড়ে বৃত্তি,—৺বীরেশ্বর পাড়ে মহাশয়ের স্মরণার্থ তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় কোনও শাস্ত্রীয় গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য এই বৃত্তি বার্ষিক দিয়া থাকেন। ইহার পরিমাণ নগদ ১০০৲ টাকা। এ বৎসর "বেদের সংহিতা-ভাগে অদ্বৈতবাদ" নামক প্রবন্ধের জন্য উক্ত বৃত্তি ঘোষিত হইয়াছিল। এই পুরস্কার-প্রবন্ধ ৮টি পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ গোস্বামী মহাশয় তুল্যাংশে এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি, মহাশয় প্রাপ্ত প্রবন্ধগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

(২) কৃষ্ণবিনোদিনী-স্মৃতিপদক,—শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ মিত্র মহাশয় তাঁহার মাতার স্মরণার্থ কোনও মৌলিক গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য এই স্বর্ণপদক প্রতি বর্ষে দান করেন। ইহার মূল্য ১০০৲ টাকা, এ বৎসর "বাঙ্গলার বাউল সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত" সম্বন্ধে প্রবন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই পুরস্কার-প্রবন্ধ তিনটি পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ায় তিনি উক্ত পদক লাভ করিয়াছেন। ইহার পরীক্ষক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহাশয়।

(৩) প্রভাবতী-পুরস্কার,—শ্রীযুত রাজবল্লভ মিত্র মহাশয় তাঁহার মৃতা কন্যার স্মরণার্থ এই বৎসরের জন্য নারীজাতির শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোনও গবেষণামূলক প্রবন্ধের জন্য কতকগুলি পুস্তক উপহার দিতে চাহেন। পুস্তকগুলির মূল্য অন্যূন ৪০৲ চল্লিশ টাকা। এ সম্বন্ধে "প্রচলিত বাঙ্গালা ব্রতকথা অবলম্বনে নারী জাতির গার্হস্থ্যধর্ম্ম" প্রবন্ধ লেখা ছিল। এই প্রবন্ধ দুইটি মাত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাশীনিবাসিনী শ্রীমতী কনকলতা গুপ্তা পুরস্কার পাইয়াছেন। পুস্তকের মূল্য ৪৭৲ টাকা হইয়াছে এবং একটি টীনের বাক্সে

সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল মহাশয়।

(৪) শিশিরকুমার ঘোষ-বৃত্তি,—৺ভক্তপ্রবর সাধু শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের স্মরণার্থ শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম এ, বি এল্ মহাশয় কোনও ভক্ত-জীবন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখার জন্য প্রতি বর্ষে ২৫৲ টাকা বৃত্তি দিবেন। এ বৎসর "ভক্ত গদাধর পণ্ডিতের জীবনী" সম্বন্ধে প্রবন্ধ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ চারিটি পাওয়া গিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যকিঙ্কর কুণ্ডু কাব্যকণ্ঠ মহাশয় পুরস্কৃত হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়।

(৫) রাধেশচন্দ্র স্মৃতিপদক,—৺রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়ের স্মরণার্থ শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার এম্ এ মহাশয় প্রতি বৎসর সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধের জন্য এই পুরস্কার দান করিয়া থাকেন; ইহার মূল্য ২০৲, ১১৲ টাকা। এ বৎসর "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিরূপিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঁচটি পাওয়া গিয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার ঘোষ বি এল্ মহাশয় এই পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ মহাশয়।

(৬) নবীনচন্দ্র-স্মৃতিপদক,—স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্রের স্মরণার্থ তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মল-চন্দ্র সেন মহাশয় প্রতি বৎসর এই পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। আলোচ্য বর্ষে "কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের কাব্যে কৃষ্ণচরিত্র" বিষয়ক প্রবন্ধ নির্দ্ধারিত ছিল। এই প্রবন্ধ চারিটি পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রীমতী সরোজবাসিনী গুপ্তা এই পদক পাইয়াছেন। পরীক্ষক ছিলেন শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্ মহাশয়।

আলোচ্য বর্ষে আরও দুইটি পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল। একটি কবি হেমচন্দ্রের স্মৃতির জন্য তদীয় উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার হইতে একটি স্বর্ণপদক দান করা হইয়া থাকে। এ বৎসর "কবিবর হেমচন্দ্রের কবিতায় ছন্দ ও অলঙ্কার" নামক প্রবন্ধ নির্দ্ধারিত ছিল। এই সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। পরীক্ষক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের বিচারে প্রবন্ধ-লেখকগণের যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় কেহই উক্ত পুরস্কার লাভ করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়টি প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তি-পুরস্কার। সাধু প্রিয়নাথের ভক্তগণ এই পুরস্কার দান করিয়া থাকেন। এ বৎসর "জীবনের ধর্ম্ম ও প্রতিভার লক্ষণ" প্রবন্ধ নির্দ্ধারিত ছিল। এই প্রবন্ধ ৮টি পাওয়া যায়, পরীক্ষক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের বিচারে কেহই পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় উক্ত পুরস্কারও কেহ লাভ করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় পুরস্কারদাতা ও পরীক্ষকগণকে পরিষদের পক্ষ হইতে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

(৭) অতঃপর বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যিক গবেষণা শিক্ষা দিবার জন্য যে ছাত্র-শাখা আছে, তৎসংস্রবে যে সকল ছাত্র-সভ্য এবার প্রবন্ধ-রচনা এবং গবেষণার নিমিত্ত পুরস্কার পাইয়াছেন, সভাপতি মহাশয় তৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিবরণ পাঠ করিলেন,—

১। শ্রীযুক্ত কমুদবন্ধু রায় গুপ্ত ২০৲

প্রবন্ধ— (ক) পল্লীপ্রবাদ
(খ) মাছ ঘরে নওয়া

২। শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

প্রবন্ধ— (ক) লক্ষ্মীর পাঁচালী
(খ) গোরক্ষনাথের পাঁচালী

৩। শ্রীকালীদয়াল ভট্টাচার্য্য ১৫৲

প্রবন্ধ— (ক) চৌপূজা
(খ) স্থলবসন্তপুরের ইতিহাস
(গ) সিরাজগঞ্জের গ্রাম্য মসজিদ
(ঘ) কান্দাপাড়া মসজিদ
(ঙ) হরিপুরের ৺মঙ্গলচণ্ডী
(চ) পাবনা জেলার ক্রীড়াকৌতুক

৪। শ্রীরসিকলাল সেন ১২৲

প্রবন্ধ— (ক) খুলনার ধাঁধাঁ
(খ) পিল্লিকে
(গ) জামাই আনার কথা
(ঘ) একটি চৌতিশা
(ঙ) চটিকথা প্রবন্ধ

৫। শ্রীশশিভূষণ পাল ১০৲

প্রবন্ধ— (ক) সারিগান
(খ) বারমাসী গান

৬। শ্রীশিবেশচন্দ্র পাকড়াশী ৮৲

প্রবন্ধ— (ক) পূর্ব্ববঙ্গে-প্রচলিত প্রবচন
(খ) গ্রাম্য কবিতা

৭। শ্রীদ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৲

প্রবন্ধ— (ক) মুর্শিদাবাদ জেলার অধীন বেলডাঙ্গার গ্রাম্য ও সাধুভাষা

৮। শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার ৫৲

প্রবন্ধ— (ক) চাঁদরায়

৯। শ্রীসন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায় ৫৲

প্রবন্ধ— (ক) পতঙ্গদের অনুকরণ-ক্ষমতা
(খ) হাফ আখড়াই

১০। শ্রীমোহিনীমোহন রায় ৫৲

প্রবন্ধ— (ক) বিষ্ণুপুরের প্রাচীন দর্শনীয় বিষয়

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় ইহাঁদের রচনাবলীর পরীক্ষা করিয়া দিয়া পরিষদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই বিভাগে একুনে ২৮টি প্রবন্ধ পাওয়া গিয়াছিল।

৮। অতঃপর ঊনবিংশ বর্ষের কার্য্যবিবরণ পঠিত হইল। (এই বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

৯। তৎপরে কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় ১৩১৯ বঙ্গাব্দের আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ করেন। (এই বিবরণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।)

১০। অতঃপর চিত্রশালাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় চিত্রশালার বিবরণ এবং ছাত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু মহাশয় ছাত্রশালার বিবরণ পাঠ করেন। (এই বিবরণদ্বয়ও পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

১১। তৎপরে সভাপতি মহাশয় তদীয় অভিভাষণ পাঠ করেন। (এই অভিভাষণ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)

১২। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২০ সালের জন্য কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

১। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি, আই, ই,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র

২। সহকারী সভাপতিগণ—

(ক) শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্, এ, বি, এল্

(খ) বিচারপতি " আশুতোষ চৌধুরী এম, এ, এল এল্ বি.

(গ) " অক্ষয়চন্দ্র সরকার বি এল্

(ঘ) " কুমার শরৎকুমার রায় এম্ এ

প্রস্তাবক—মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

সমর্থক—শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

৩। সম্পাদক—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল,

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

৪। সহকারী সম্পাদকগণ—

(ক) শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী

(খ) " হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ

(গ) " কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী

(ঘ) শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ

(ঙ) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত গৌরহরি সেন

৫। ধনাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সমর্থক—শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার

৬। পত্রিকাধ্যক্ষ—

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি এচ্ ডি

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি এ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ বি এল্

৭। ছাত্রাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ

সমর্থক—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী

৮। গ্রন্থাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বি এ

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

৯। চিত্রশালাধ্যক্ষ—

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব

প্রস্তাবক—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়

১০। আয়-ব্যয়-পরীক্ষক—

১। শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল বি, ই

২। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ

সমর্থক—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

১৩। অতঃপর গত ৪ঠা ফাল্গুন তারিখের ৮ম মাসিক অধিবেশন-বিজ্ঞাপন-পত্রে ১৩২০ সালের জন্য বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য-প্রার্থনার বিজ্ঞাপন অনুসারে গত ১৭ই চৈত্র ১০ম মাসিক অধিবেশন বিজ্ঞাপনকালে সহর ও মফস্বলের ৩৯ জন

সদস্যের নাম উক্ত পদপ্রার্থী বলিয়া বিজ্ঞাপিত করা হয় এবং সমস্ত সদস্যগণের নিকট ভোটের জন্য উক্ত পত্র প্রেরিত হয়। এই পত্রের উত্তরে ৩১৫ খানি ভোটপত্র পাওয়া যায় এবং ভোটের সংখ্যা অনুসারে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৩২০ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
২। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এচ্ ডি
৩। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
৪। ,, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম্ এ
৫। ,, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
৬। ,, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী
৭। ,, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
৮। ,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
৯। ,, শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
১০। ,, হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
১১। ,, অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
১২। ,, মৃণালকান্তি ঘোষ
১৩। ,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪। ,, অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এম এ
১৫। ,, প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম এ, এম্ এস্ সি আই (লণ্ডন)
১৬। ,, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএ

উক্ত ১৬ জন সভ্য যথাক্রমে নির্ব্বাচিত হইলেও ইহাঁদিগের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় পত্রিকাধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় যে তিনটি সভ্যের পদ শূন্য হয়, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভোটের সংখ্যানুসারে উহাঁদের স্থানে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন,—

১। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু
২। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী

১৪। পরিষদের ৩১ (খ) নিয়মানুসারে সমস্ত শাখা-সভার পক্ষের প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের জন্য শাখা-পরিষদের সম্পাদকগণকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। আটটি শাখার মধ্যে সাতটি শাখার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়া প্রতিনির্ব্বাচনে ভোটের সংখ্যানুসারে নিম্নলিখিত চারিজন মূল-সভায় ১৩২০ সালের কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইল,—

১। শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল)
২। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী (রংপুর)
৩। ,, বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্ (মুরশিদাবাদ)
৪। ,, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় এম এ (গৌহাটী)

আয়-ব্যয়-পরীক্ষক ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত ২০ জন সভ্য এবং কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে লইয়া ১৩২০ বঙ্গাব্দের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি গঠিত হইল।

১৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সমবেত সদস্যগণের সমর্থনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ পাঁচ বৎসরের জন্য পরিষদের সহায়ক-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

১। শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়
২। ,, জীবেন্দ্রকুমার দত্ত
৩। ,, মৌলবী রওশন আলি চৌধুরী

১৬। অতঃপর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী মহাশয় ১৩২০ বঙ্গাব্দের আনুমানিক আয়ব্যয়-বিবরণী পাঠ করিলেন।

১৭। তৎপরে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ৺গৌরীশঙ্কর দে, ৺বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, ৺প্রভাসচন্দ্র বসু, ৺আশুতোষ বাগচী এম্ এ, ৺সুরেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ৺গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহোদয়গণের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহোদয় জানাইলেন যে, অতি সত্বরেই স্বর্গীয় কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের জন্য শোকপ্রকাশার্থ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, অদ্যকার সভাপতি মহাশয় আজ আট বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অদম্য উৎসাহে এবং আন্তরিক স্নেহে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব করিয়া ইহাকে যে উন্নত-দশায় উপনীত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। আজ বর্ষশেষে সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আমি বিশেষভাবে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আমার এই প্রস্তাব সকলেই একবাক্যে গ্রহণ করিবেন, সন্দেহ নাই। মহামহোপাধ্যায় ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণপ্রমুখ সকলেই এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি

বিংশ বার্ষিক,—প্রথম মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—৮ই আষাঢ়, ২২শে জুন, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

আলোচ্য বিষয়—

১। গত উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। ৪। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ। ৫। প্রদর্শন—রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের প্রদত্ত (ক) স্বর্গীয় কবিরাজ গঙ্গাধর সেন কবিরত্নের তৈলচিত্র এবং (খ) ১২টি প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রা। ৬। চিত্র-প্রতিষ্ঠা—শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত স্বর্গীয় প্রাচীন কবি কেদারনাথ দত্তের তৈল-চিত্র। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ"; (খ) শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভাওয়ালের গাজীবংশ"; (গ) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয়ের "নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান" এবং (ঘ) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের "বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং তাঁহার রচিত চৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা।" (৮) বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ, সি আই ই (সভাপতি)

" শ্রীযুক্ত ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পিএচ ডি

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার
" শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিএ
" পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
" বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
" চারুচন্দ্র বসু
" খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ
" অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" সচ্চিদানন্দ দত্ত
" সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ
" ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
" ধীরেন্দ্রনাথ বসু
" ললিতকুমার চক্রবর্ত্তী
" চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" অক্ষয়কুমার মিত্র

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার মুখোপাধ্যায় বিএ
" গৌরহরি সেন
" বিজয়কৃষ্ণ দাসগুপ্ত
" বাণীনাথ নন্দী
" পুলিনবিহারী দত্ত
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
" যতীন্দ্রমোহন ঘোষ
" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
" মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
" রাজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়
" ললিতমোহন পাল
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" অমৃতগোপাল বসু
" যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
" গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষ
" প্রফুল্লকুমার সরকার এম্ এ
" সুধীরচন্দ্র সেন
" মণীন্দ্রনাথ বসু
" মহেন্দ্রচন্দ্র দাস
" হেমচন্দ্র ঘোষ
" বামাচরণ মজুমদার
" হারানেন্দ্রনাথ ঘোষাল

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই
" ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
" জিতেন্দ্রনাথ সোম
" ফণীন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" স্মরমোহন বসু
" প্রসন্নকুমার সেন
" খগেন্দ্রকৃষ্ণ বসু
" দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ
" সতীশচন্দ্র দত্ত
" যতীন্দ্রমোহন রায়
" কুলদানাথ বিশ্বাস
ডাঃ " বারিদবরণ মুখোপাধ্যায় এম্ বি
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
" মতিলাল দাস
" আনন্দমোহন বিশ্বাস
" প্রকৃতচাঁদ বসু
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" সূর্য্যকুমার পাল
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম এ, বি এল্ (সম্পাদক)

শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ

১। সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীসুরেন্দ্রভূষণ সেনগুপ্ত এম এস্‌সি ৯০ মাণিকতলা মেনরোড।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীকুমুদনাথ চট্টোপাধ্যায়	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী	শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামপুর।
শ্রীকালীপ্রসন্ন ভাদুড়ী	"	শ্রীরামরেণু চট্টোপাধ্যায় বি এ, বি এল্ বক্সার, সাহাবাদ।
শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	"	শ্রীমলিনচন্দ্র মণ্ডল বিএ শিক্ষক এইচ ই স্কুল, ঠাকুর গাঁ, দিনাজপুর।
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মল্লিক	"	শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র এডভোকেট, উত্তরব্রহ্ম, ভামো।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	"	পণ্ডিত শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ১৫৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।
শ্রীঅসিতকুমার মুখোপাধ্যায়	"	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এমএ বি এল ৩৮ পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন।
শ্রীপ্রমথনাথ দে	শ্রীযোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ১৪।১ গিরিশ বিস্থারত্নের লেন।
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীঅনন্তচরণ ভট্টাচার্য্য ১৪৭ অপার চিৎপুর রোড।
শ্রীমন্মথমোহন বসু	"	শ্রীরজনীকান্ত দে এম এ, বি এস্‌সি অধ্যাপক, স্কটিসচার্চ্চ কলেজ।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীমণীন্দ্রনাথ সরকার বি এল্ উকীল, বিলাসপুর।

৩। তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল :—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত সমণ পুন্নানন্দস্বামী	১। বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধ অনুসন্ধানসমিতির নিয়মাবলী
,, প্রবোধচন্দ্র দে	২। উদ্ভিদ-খাদ্য
,, "ত্রিশূল"-সম্পাদক	৩। অপ্রিয় প্রশ্নাবলী
,, বিক্রমকুমার বসু	৪। সত্যনারায়ণ-কথা
,, যতীন্দ্রনাথ সমাদ্দার	৫। অভিশাপ (নাটক)
,, রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ	৬। আরবজাতির ইতিহাস (২য় খণ্ড)
The Brotherhood	৭। Will the Brahmo Somaj last

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
Govt. of Bengal	৮। Report on the Administration of Bengal for 1911-12
Govt. of India	৯। Fourteenth annual Report of Chief Inspector of Explosives for the year ending 31st. March 1913.
Maharajkumar Sailendra krishna Deb	১০। Social Problem

৪। অতঃপর পরিষদের বিভিন্ন বিভাগীয় কার্য্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ব্যোমকেশ বাবু পাঠ করেন। এই বিষয়টির ব্যবস্থা এ বৎসর হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি নূতন করিয়াছেন। পরিষদের কার্য্য কোন্ দিকে কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহা এতদিন পরিষদের সদস্যগণ ও সাধারণে বৎসরান্তে একবারমাত্র পরিষৎ-পত্রিকা হইতে জানিতে পারিতেন। এই নূতন ব্যবস্থায় পরিষদের গতি, পুষ্টি ও উন্নতি সম্বন্ধে প্রতি মাসে মাসে কোন্ বিভাগের কার্য্য কিরূপ অগ্রসর হইতেছে, তাহা সকলেই জানিতে পারিবেন। এবার তুইটি মাত্র বিভাগের কার্য্যবিবরণ প্রস্তুত ছিল (পরিশিষ্ট ক ও খ দ্রষ্টব্য)। এই বিবরণ হইতে জানা যায় যে, পরিষদের কার্য্য বেশ অগ্রসর হইতেছে এবং গত তুই মাসে ৪খানি অশ্রুতপূর্ব্ব পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

৫। অতঃপর সভাপতি মহাশয় পরিষদের বান্ধব, লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর-প্রদত্ত ১৩টি প্রাচীন স্বুবর্ণমুদ্রা প্রদর্শন করিলেন এবং এই মুদ্রা-গুলি অযাচিত ভাবে দান করার জন্য পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

৬। অতঃপর সভাপতি মহাশয় বিখ্যাত কবিরাজ স্বর্গীয় গঙ্গাধর সেন কবিরত্নের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ছবিখানিও দানশৌণ্ড রাজাবাহাদুরের প্রদত্ত। প্রসঙ্গক্রমে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গঙ্গাধর কবিরাজের নাম সকলেই জানেন। তিনি যেমন একজন বিচক্ষণ কবিরাজ ছিলেন, তেমনি তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে জ্ঞানও অতি বিপুল ছিল। তিনি বহু সংস্কৃত শাস্ত্রের টীকাকারক। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ ৺দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহাঁর ছাত্র ছিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত তদীয় পিতা স্বর্গীয় প্রাচীন কবি কেদারনাথ দত্তের তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ সংক্ষেপে কবি কেদারনাথের জীবন-চরিত বিবৃত করিলেন। বাবু কেদারনাথ ১২৪৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিশ্চন্দ্র

দত্ত। দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহারা হন। ওরিএণ্টাল সেমিনারিতে বিদ্যালাভ-কালে ইনি "ধন ও বিদ্যা" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া রৌপ্যপদক প্রাপ্ত হন। ৺কৃষ্ণদাস পাল, ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, ৺রমেশচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া "প্রিয়ম্বদ" নামক একখানি উপন্যাস রচনা করেন। অতঃপর "চমৎকার-মোহন" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। তৎকালে তিনি ক্রমশঃ নলিনীকান্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। অতঃপর কেদারনাথ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় গত ১৩১৮ সালের ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার বেলা ৮ ঘটিকার সময় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর ব্যোমকেশ বাবু জানাইলেন যে, স্বর্গীয় কেদারনাথের স্মরণার্থ, মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে কোন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য তদীয় পুত্র প্রতি বৎসর ১০৲ টাকা মূল্যের ১টি রৌপ্যপদক দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সভার পক্ষ হইতে এই দানের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় "নূতন ও পুরাতন বিজ্ঞান" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধের সার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া হইল,—

পদার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতবিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ; কিন্তু এতদিনে সেই বিরোধের সমাধান হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রাচীন বিজ্ঞানের সহিত নূতন বিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব সমন্বয় কিরূপ ভাবে সাধিত হইতেছে, তাহাই প্রদর্শন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সার উইলিয়ম ক্রুক্স্‌প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের মতে ক্যাথোড রশ্মি (cathode ray) আলোকের ন্যায় ইথার তরঙ্গমাত্র নহে, পরন্তু অতি ক্ষুদ্র জড়কণা দ্বারা ইহা গঠিত। এই কণাগুলির নাম করপাস্‌ল্ বা ইলেক্‌ট্রন বা তাড়িতাণু। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে পদার্থের ক্ষিতি বা কঠিন (solid), অপ্ বা তরল (liquid) ও তেজ বা বাষ্প (gas) এই তিন অবস্থা মাত্র স্বীকৃত হইত। এক্ষণে ইলেক্‌ট্রন আবিষ্কৃত হওয়াতে আমরা মরুতের (fourth state of matter of Crookes) সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু ইহাও পদার্থের চরম অবস্থা নহে, ইহাও সূক্ষ্ম পদার্থের বিকার (modification), কারণ, ইথার বা ব্যোমপদার্থে কোনরূপ টান বা মোচড়ের ফলে তাড়িতাণু সৃষ্ট হয়। এইরূপে পাশ্চাত্য জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণ ক্রমশঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বিভিন্ন মূলভূতের পরমাণু বিভিন্ন প্রকার বটে, কিন্তু তাড়িতাণুর মধ্যে কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তাড়িতাণুগুলি পরমাণুর সাধারণ উপাদান। একই মূলভূত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বহু হইয়াছে। প্রাচীন ঋষিগণ বহুপূর্ব্বে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বিরাট বিশ্বে প্রকৃতি-পুরুষের যে লীলা দেখা যায়, ক্ষুদ্রতম অণুতেও তাহা দৃষ্ট হয়। এক একটি

পরমাণু বাস্তবিকই এক একটি ব্রহ্মাণ্ড, অপিচ মহাব্রহ্মাণ্ড যে ছাঁচে ঢালা, অণুব্রহ্মাণ্ডও সেই ছাঁচে ঢালা। কেবল তাহাই নহে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন যে, এক একটি পরমাণু এক একটি ব্রহ্মাণ্ড নহে, পরন্তু বহু ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়। উপনিষদের ভাষায় বলিতে গেলে, অণুব্রহ্মাণ্ড বিশ্ব, মহাব্রহ্মাণ্ড বিরাট। অতঃপর প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় রণ্টেন রশ্মি, আহৃত-দীপ্তিবিচ্ছুরক পদার্থগণের (phosphorescent and fluorescent substances) বিষয় বলিয়া রশ্মিবিকীরক (radio-active) রেডিয়মের অবতারণা করিলেন। রেডিয়ম হইতে কি ভাবে হিলিয়ম প্রভৃতি মূলভূতের উৎপত্তি, উহার বিবিধ প্রকার রশ্মি এবং নিঃস্রবের (emanation) বর্ণনা করিলেন। রেডিয়ম পরমাণু ভাঙ্গিয়া হিলিয়ম, রেডিয়মছ (যাহা সীসক নামে পরিচিত) ইত্যাদি হয়। যখন এইরূপে একটি মূলভূত হইতে অন্য একটি বা ততোধিক মূলভূতের উৎপত্তি হইতে দেখা গেল, তখন মূলভূতের অপরিবর্ত্তনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্ববিশ্বাস বৈজ্ঞানিকেরা পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহারা যাহাকে পরমাণু বলেন, তাহা যে বাস্তবিক চরম অণু নহে, ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এক মূলভূত অন্য এক মূলভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, এই আবিষ্কার কিমিয়া বিদ্যার সত্যতা সমর্থন করে। এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এক পরমাণু ভাঙ্গিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী পরমাণু উৎপন্ন হইতে পারে, সুতরাং বলিতে হইবে, একদিকে যেমন ধ্বংস হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই সৃষ্টি-স্থিতির কার্য্য চলিতেছে, অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রত্যেক পরমাণুতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তিতে বিরাজমান রহিয়াছেন। পরমাণু জন্মিতেছে, পুষ্ট হইতেছে এবং অবশেষে খণ্ড খণ্ড হইয়া মহত্তর পরমাণু সৃষ্ট হইতেছে। মহাব্রহ্মাণ্ডে যাহা ঘটিতেছে, প্রত্যেক অণুব্রহ্মাণ্ডে ঠিক তাহাই ঘটিতেছে। বস্তুতঃ জগতের পরিণাম ধ্বংস নহে—ক্রমোন্নতি (evolution)। সকল জড়পদার্থ এক মূল-প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা বলিয়াই আধুনিক বিজ্ঞান ক্ষান্ত হন নাই। বিজ্ঞান আর জড় পদার্থকে কঠিন জড় বলিয়াই স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাহার মতে যাহাকে আমরা জড়পদার্থ বলি, তাহা শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহা অবশ্য আমাদিগের পুরাতন ঋষিগণের পুরাতন কথারই প্রতিধ্বনি। সাংখ্য বলেন, মূল প্রকৃতি সত্ব, রজঃ ও তম এই তিনগুণ বা শক্তির সমবায় মাত্র। যতক্ষণ এই তিন গুণ সাম্যাবস্থায় থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি অব্যক্ত, সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলেই প্রকৃতি ব্যক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে। জড়পদার্থ মাত্রেই প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যাহাকে জড় বলা যায়, তাহা প্রকৃতির উপাদানশক্তিত্রয়েরই বিকার বা পরিণতি মাত্র। বেদান্তের মতেও সমস্ত জগৎ শক্তির লীলা মাত্র।

এইবার আমরা সাংখ্যোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত পদার্থ-সৃষ্টি সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত সিদ্ধান্তের তুলনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সাংখ্যবাদীর মতে সৃষ্টি নিম্নলিখিত ক্রমে হইয়া থাকে,—(১) মূল প্রকৃতি, (২) মহৎ, (৩) অহঙ্কার, (৪) তন্মাত্রা,

(৫) ভূত। অব্যক্ত মূলপ্রকৃতি জগতের মূল উপাদান। তাহার পরিণাম হইয়া প্রথমে মহতের সৃষ্টি হয়, মহতের পরিণাম অহঙ্কার, অহঙ্কারের বিকারের ফলে তন্মাত্রের উৎপত্তি হয়, তন্মাত্র ভূতে পরিণত হয়। প্রথমে অব্যক্ত শক্তি ছিল, তাহা ব্যক্ত হইয়া দৃশ্যমান বিশ্বের অবয়বশূন্য উপাদান সৃষ্ট হইল। অতঃপর সেই অবিশেষ উপাদান বিভক্ত ও পৃথগ্‌ভূত হইয়া বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির স্বতন্ত্র উপাদানে পরিণত হইল। এই উপাদানের বিকারে স্থূলভূতের অবিশেষ উপাদান শব্দস্পর্শাদি তরঙ্গসমূহ সৃষ্ট হইল ও তাহাদের সংহননে বিভিন্ন স্বতন্ত্র স্থূলভূতসমূহ উৎপন্ন হইল।

সভাপতি মহাশয় কঠোর বৈজ্ঞানিক বিষয় সরল ভাবে অবতারণা করার জন্য প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীযুক্ত কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "ভাওয়ালের গাজীবংশ" ও পণ্ডিত অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের "বৃন্দাবনদাস ঠাকুর ও তাঁহার রচিত চৈতন্যভাগবত সম্বন্ধে দুই একটি কথা" প্রবন্ধদ্বয় সভাপতি মহাশয়ের আদেশে পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। উপস্থিত সভ্য-বর্গের অনুরোধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্তৃগণ" নামক প্রবন্ধ পরবর্তী সভায় পাঠের জন্য স্থগিত রহিল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জনৈক মুখপাত্র, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, বহু প্রবন্ধের লেখক, প্রাচীন সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জ্ঞাপন করিলেন। যথারীতি স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানাইয়া পত্র লিখিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতা জানাইলে এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সমর্থন করিলে রাত্রি ৮৷৷০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

পরিশিষ্ট

(ক) গ্রন্থ-প্রকাশের কার্য্যবিবরণ

১৩২০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগের কার্য্য আশানুরূপ অগ্রসর হইয়াছে।

১। প্রথমেই সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার কথা বলিতে হয়। গত বৎসর উনবিংশ ভাগের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশিত হইতে পারে নাই। বৈশাখ মাসেও ইহার বিশেষ কোন কার্য্য আরম্ভই হয় নাই। প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসমধ্যে পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা সমস্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে।

২। উনবিংশ বর্ষের সমস্ত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ, কয়েকটি বিশেষ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ এবং অষ্টাদশ বর্ষের বার্ষিক সভার কার্য্যবিবরণ—একটিও গত বর্ষে প্রকাশিত হয় নাই। উহাও গত জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে সমস্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে এবং উনবিংশ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা পত্রিকার সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।

৩। ২০শ বর্ষের প্রথম সংখ্যা.—ইহার প্রবন্ধ-নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং উহার মুদ্রণ-কার্য্যও চলিতেছে। আশা করা যায়, আষাঢ়ের শেষেই বিংশ ভাগ প্রথম সংখ্যা পত্রিকা বাহির হইতে পারিবে।

৪। শ্রীভাষ্য,—১৯শ বর্ষে মুদ্রিত হইয়া ২য় খণ্ড গত বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে এবং ৩য় ভাগের ছাপা আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে প্রতি মাসে এই বৃহৎ গ্রন্থের অন্যূন ছয় ফর্ম্মা ছাপা হইতে পারে, প্রেসের সহিত তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা গিয়াছে।

৫। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তন,—ইহার ছাপা দ্রুত নিষ্পন্ন হইতেছে। বার্ষিক অধিবেশনে বিজ্ঞাপিত মুদ্রণ-বিবরণের পর ইহার মূলভাগের ছাপা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। অতঃপর ইহার পরিশিষ্টাংশ ছাপা আরম্ভ হইবে। এই পরিশিষ্টে দুরূহ শব্দের অর্থাদি, অপ্রচলিত শব্দ-তালিকা, ভাষাবিচার, পুথিখানির হস্তাক্ষর-বিচার প্রভৃতি বহু বক্তব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৬। বাঙ্গালা শব্দকোষ,—গত বৈশাখ মাসে ইহার ১ম কাণ্ড ৩৩ ফর্ম্মায় ক-বর্গ পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে। অতঃপর জ্যৈষ্ঠমাসে ৪৮ ফর্ম্মা পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছে। সঙ্কলয়িতা যোগেশ বাবু কটকে থাকেন, ছাপাখানার সমস্ত কার্য্য তাঁহার নিজের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়, বিদেশ হইতে প্রুফ যাতায়াতের এবং প্রতি ফর্ম্মার ৪টী করিয়া প্রুফ দেখিবার বন্দোবস্ত করিয়াও যে ইহার মুদ্রণকার্য্য এত দ্রুত সম্পন্ন হইতেছে, ইহা সম্পাদক যোগেশবাবু এবং ভারতমিহির প্রেসের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার গুণেই হইতেছে বলিতে হইবে।

৭। বোধিসত্ত্বাবদান-কল্পলতা,—ইহার ১ম খণ্ড গত বৎসর বাহির হইবার পর ২য় খণ্ড ছাপা আরম্ভ হয়। গত বৈশাখ পর্য্যন্ত মাত্র ৪ ফর্ম্মা ছাপা হইয়াছিল। গত জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহার আরও ৩ ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে। ইহার অনুবাদক ও সম্পাদক রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর দার্জ্জিলিঙ্গে থাকেন। তাঁহার নিকট হইতে প্রুফ যাতায়াতে এবং ছাপাখানার গণ্ডগোলে এই গ্রন্থের মুদ্রণে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছিল। সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করায় ইহা অধিকতর দ্রুত ছাপা হইতেছে। ইহার ৩২ পল্লব পর্য্যন্ত ছাপা হইয়া গিয়াছে।

৮। চণ্ডীদাসের পদাবলী,—গত বৎসর ইহার ৫ ফর্ম্মা মাত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও ৪ ফর্ম্মা হইয়াছে। ইহার সম্পাদকও বিদেশে থাকেন। প্রুফ যাতায়াতে ও ছাপাখানার ব্যবস্থায় বিশেষ বিশৃঙ্খল ছিল। সম্প্রতি সে সকল মিটাইয়া লওয়া হইয়াছে। আশা করা যায়, অতঃপর এই গ্রন্থ আরও দ্রুততর মুদ্রিত হইবে।

৯। "বাঙ্গলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা"—ইহার মুদ্রণ গত বৎসর স্থগিত ছিল। সম্পাদক

অমূল্যবাবু কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একজন সহকারী বেতনভুক্ কর্ম্মচারী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। গত বৈশাখ মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি সেই কর্ম্মচারি-নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতঃপর ইহার মুদ্রণকার্য্য যথাসম্ভব শীঘ্র পুনরায় আরম্ভ হইবে।

১০। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের দুর্গামঙ্গল,—ইহা পূর্ব্বে প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী-পর্য্যায়ে প্রকাশিত হইত। চারি ফর্ম্মা ছাপা হইবার পর ঐ পর্য্যায় বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সাঙ্ঘাতিক পীড়াবশতঃ ইহার মুদ্রণকার্য্য বন্ধ ছিল। বর্ত্তমান আষাঢ় হইতে পুনরায় মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায়, শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে এই বৎসরেই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।

১১। উৎকীর্ণ লিপিমালার ১ম খণ্ড—ইহার সঙ্কলন-কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে। উহাতে ৯৯৭টি উৎকীর্ণ লিপির পরিচয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি অনুমান করেন, ৬০ হইতে ৬৫ ফর্ম্মায় এই প্রথম খণ্ড মুদ্রিত হইতে পারিবে। কিন্তু এই বৎসরে ইহার সমস্ত ছাপা হইবার সুযোগ হইতে পারিবে না বলিয়া ইহা দুই ভাগে প্রকাশিত করিবার কল্পনা করা হইয়াছে। ১ম ভাগের মুদ্রণকার্য্য আগামী শ্রাবণের শেষভাগে আরম্ভ হইতে পারে। ইহার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনবসরবশতঃ ইহার মুদ্রণকার্য্যের আরম্ভে এই অনিবার্য্য বিলম্ব ঘটিবে।

এতদ্ভিন্ন কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীরামদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী, অশ্বঘোষের বুদ্ধদেবচরিতের বঙ্গানুবাদ, সয়রুল মোতাখরীনের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি প্রকাশের নিম্নলিখিতরূপ উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে।—

১। কৃত্তিবাসের রামায়ণ,—এই গ্রন্থের অযোধ্যাকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের কতকাংশের আদর্শলিপি প্রস্তুত হইয়াছে। অন্যান্য কাণ্ডের প্রাচীনতম পুথি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এ পর্য্যন্ত ইহার যত পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সকল কাণ্ডের সমানকালের পুথি পাওয়া যায় নাই। যে পুথিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে আদি-কাণ্ডের ১১০৬ সালের, অরণ্যকাণ্ডের ১২০৪ সালের, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ১২২৪ সালের, সুন্দরা-কাণ্ডের ১১৪২ সালের, লঙ্কাকাণ্ডের ১১৭৪ সালের পুথিই প্রাচীন। ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান চলিতেছে, নতুবা যেরূপ প্রাচীন পুথি দেখিয়া অযোধ্যা ও উত্তরকাণ্ড মুদ্রিত হইয়াছে, তদনুরূপ হইবে না।

২। কাশীরামদাসের মহাভারত,—ইহার আদিপর্ব্বের একখানি ৯৮৫ সনের পুথি দেখিয়া আদর্শলিপি প্রস্তুত করা হইয়াছে। অপরাপর পর্ব্বের প্রাচীনতম পুথির অনুসন্ধান হইতেছে। অন্যান্য পর্ব্বের যে সকল পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সভাপর্ব্বের ১০৮৩ সালের, বনপর্ব্বের ১০৭৭ সালের, বিরাটপর্ব্বের ১০৮৬ সালের, উদ্যোগপর্ব্বের ১০৮৩ সালের, ভীষ্ম-পর্ব্বের ১০৫৭ সালের, দ্রোণপর্ব্বের ১০০০ সালের, কর্ণপর্ব্বের ১০০০ সালের, শল্যপর্ব্বের ১০৭৬ সালের, গদাপর্ব্বের ১০৫২ সালের, সৌপ্তিকপর্ব্বের ১১৬৪ সালের, নারীপর্ব্বের ১২৩৪

সালের, অশ্বমেধপর্ব্বের ১০০৩ সালের, শান্তিপর্ব্বের ১০৬২ সালের, মৌষলপর্ব্বের ১০৯২ সালের, আশ্রমিক পর্ব্বের ১০৯৩ সালের ও স্বর্গারোহণপর্ব্বের ১০৪৮ সালের পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, অতএব ইহা অপেক্ষা প্রাচীন পুথি না হইলে তাহা আদিকাণ্ডের পুথির অনুরূপ হইবে না।

৩। কবিকঙ্কণ চণ্ডী,—ইহার পুথির মূল আদর্শ দেখিয়া যে আদর্শলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ইহা মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু মধ্যে মূল আদর্শলিপি হস্তান্তরিত হইয়া যাওয়ায়, উহার পুনরুদ্ধারের এবং প্রাচীনতম অন্য পুথি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে।

এই সকল পুথির প্রাচীনতম পুথি এবং অন্যান্য পুথি সংগ্রহের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি এ বৎসর বিশেষ ব্যয় মঞ্জুর করাতে, এই বৎসর বিশেষভাবে একজন পুথিসংগ্রাহক নিযুক্ত করা স্থির হইয়াছে, বর্ষাকালে এই কার্য্যের সুবিধা হইবে না বলিয়া বর্ষান্তে পুথিসংগ্রাহক নিযুক্ত হইবেন, স্থির হইয়াছে।

৪। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত,—ইহার বঙ্গানুবাদকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি এক্ষণে পিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইউরোপভ্রমণে নিযুক্ত। তিনি দেশে না আসিলে, ইহার মুদ্রণকার্য্য আরম্ভ হইতে পারিতেছে না।

৫। সয়রুল মোতাখরীনের প্রতিলিপি যে পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা হইতে মুদ্রণ-কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে; কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী কতকগুলি নূতন প্রস্তাব উপস্থাপন করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতি এবং কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির বিবেচনাধীন থাকায়, ইহার কার্য্য আর এখনও অগ্রসর হয় নাই। তবে ইহার সম্পাদনকার্য্য সমাধার জন্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সহিত পত্রব্যবহার চলিতেছে।

পরিষদের সঙ্কলিত, বিজ্ঞাপিত এবং আরব্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে যাহার যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা উপরে বিবৃত হইল।

এতদ্ভিন্ন ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, পরিষদের একান্ত হিতৈষী, প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের যত্নে "অনিলপুরাণ" নামে একখানি অজ্ঞাতপূর্ব্ব ধর্ম্মমঙ্গল পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত ইহার রচয়িতা। এই গ্রন্থে রামাই পণ্ডিতের পিতৃনাম 'হিমাই পণ্ডিত' ও তাঁহার বাসগ্রামের নাম 'জাজপুর' পাওয়া গিয়াছে। সারদাবাবুরই সম্পূর্ণ ব্যয়ে এবং তাঁহারই নির্দ্দেশক্রমে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সম্পাদকতায় এই সুবৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রিত হইতেছে। ইহার ছয় ফর্ম্মা ছাপা হইয়া গিয়াছে। সারদাবাবুর অভিপ্রায়মত মুদ্রণান্তে এই গ্রন্থ সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলীভুক্ত হইবে।

এতদ্ভিন্ন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির প্রতিলিপি এবং সম্পাদন-কার্য্য নানা বিজ্ঞ জনের চেষ্টায় সম্পূর্ণ হইয়া পরিষদের হস্তগত হইয়া আছে। গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির অনুমোদনক্রমে এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি ব্যয় নির্দ্ধারিত করিলে ক্রমশঃ এইগুলি প্রকাশিত হইতে পারিবে।—

১। অনাদিমঙ্গল (ধর্ম্মমঙ্গল শ্রেণীর গ্রন্থ) রামকৃষ্ণ আদক-প্রণীত। কবি ২০০ বর্ষের অধিক প্রাচীন। পরিষৎ নিজ ব্যয়ে ইহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন।

২। ফকীররামের সত্যনারায়ণ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ইহার সম্পাদন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া মুদ্রণোপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন।

৩। শঙ্করদাসের "জাগরণ" নামে একখানি গ্রন্থ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় সম্পাদন করিয়া দিয়াছেন এবং তিনি নিজে ইহার মুদ্রণব্যয় ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতেও প্রস্তুত আছেন।

৪। রূপরাম ঘোষের দুর্গামঙ্গলের পুথি পরিষদে সংগৃহীত হইয়াছে। কবির বংশধরেরা ইহার সম্পাদন ও মুদ্রণব্যয় বহন করিতে স্বতই প্রস্তুত হইয়াছেন।

৫। ঈশ্বরপুরী-কৃত সংস্কৃত ভক্তিরত্নাবলীর একখানি প্রাচীন বঙ্গানুবাদ পাইয়া পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী ইহার সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছেন এবং চৈতন্যসম্প্রদায়ের ষড়্-গোস্বামী ও চৌষট্টি মোহন্তের পরিচয়মূলক "স্বরূপনির্ণয় গ্রন্থ" সম্পাদন করিতেছেন। কবিচন্দ্রের কৃষ্ণমঙ্গলের বহু খণ্ডাংশ পরিষদের পুথিশালায় সঞ্চিত হইয়াছে। এইগুলি একত্র করিয়া কবিচন্দ্রের গ্রন্থ প্রকাশের কল্পনা গ্রন্থপ্রকাশ-সমিতির বিবেচনাধীন রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর ভট্টাচার্য্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় ময়নামতির গানের সম্পাদন-কার্য্যে বহুকাল হইতে ব্রতী আছেন। মানসী পত্রিকায় সংপ্রতি চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ময়নামতীর গানের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের প্রাচীনতম যুগের জ্ঞাত সাহিত্যাংশগুলির মধ্যে ইহা অতীব প্রাচীন। ইহার সুসম্পাদিত সুসংস্করণ প্রকাশ করিতে পারিলে পরিষদের গৌরব বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই।

(খ) পুথিশালার কার্য্যবিবরণ

পুথিশালার কার্য্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছে। অধিকন্তু এ যাবৎ যে সকল প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, সে সমুদায়ের একটি বর্ণানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা হইতেছে। তালিকা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, উহা প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যের ইতিহাস-সঙ্কলনে বিশেষ সহায়তা করিবে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসের মধ্যে পরিষদের গ্রন্থাগারে নিম্নলিখিত চারিখানি উল্লেখযোগ্য পুথি সংগৃহীত হইয়াছে,—

১। পঞ্চমসার-সংহিতা—নারদকৃত। সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থ।

২। পদ্মৈশলতিকা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত। বিষয়—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব।

৩। নারদ উপাসনা-তত্ত্ব—বৃন্দাবনদাস-রচিত।

৪। বটুক-মঙ্গল—দ্বিজ রামচরণ বিরচিত। বিষয়—ভৈরবমাহাত্ম্য প্রতিপাদন। পুথি খণ্ডিত। ১৮—২৭ পত্রে সংক্ষেপে সমগ্র রামায়ণ বর্ণিত হইয়াছে। মূল উপাখ্যান ভৈরব (স্থানে

স্থানে পঞ্চানন্দও পাওয়া যায়) ধরাধামে স্বীয় পূজা প্রচারার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন। সেই উপলক্ষে বটুকভৈরব এবং দামোদরতীরবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র প্রদেশীয় রাজার মধ্যে বলাবলের খানিকটা পরীক্ষা চলে। যুদ্ধে রাজকোটাল কানু নিহত হয়। শোকাতুরা কোটালিনী সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলে আপন উদ্দেশ্য সংসাধনমানসে ভৈরব তাহাকে ব্রাহ্মণ-বালকবেশে দেখা দেন এবং কোটালের প্রাণদান করেন। অবশ্য কিসে তাহাদের ভাল হইবে, তাহা বলিতে ভুলেন না'ই অর্থাৎ এই অবসরে কি ভাবে ভৈরবরাজের উপাসনাদি করিতে হইবে, উপদেশ করেন। কোটাল সরকারের চাকুরীতে ইস্তাফা দিল, কোটালিনীও দেশে দেবদাসী বা দেয়াসিনীর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। কিন্তু কথাটা ভিন্নাকারে রাজসভায় পৌঁছিল। এটাও কি ভৈরবের কীর্ত্তি? রাজা কোটালিনীকে ধরিয়া আনিতে আদেশ দিলেন। দুই জন পাঠান গেল। একজন কোটালের হাতে মরিল, অপর ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল। রাজার ক্রোধের সীমা-পরিসীমা রহিল না। কোটালের বিরুদ্ধে রাজসৈন্য ধাবিত হইল। কোটাল বন্ধনদশায় রাজার সমীপে আনীত হইলে তাহার প্রতি বধ-দণ্ডের ব্যবস্থা হইল। দামোদর-তীরবর্ত্তী বধ্যভূমিতে নীত হইবার কালে কোটাল পথিমধ্যে এক বটবৃক্ষতলে কোটালিনীকে দেখিয়া আপনার অবস্থা জানাইল। কোটালিনী বিপদ্‌বারণ ভৈরবকে স্মরণ করিতে বলিল। স্মরণমাত্রে ভৈরব ব্যাধিগণকে রাজসৈন্য আক্রমণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। যাবতীয় ব্যাধি ভৈরবদেবের অনুচর। অনতিবিলম্বে বিপক্ষদল বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্টপ্রায় হইল। রাজাও আক্রান্ত হইলেন। মস্তক ভার হইয়া আসিল, অঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল,—'আমায় ধর' বলিয়া রাজা মঞ্চ হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন; দেখিতে দেখিতে চক্ষু কপালে উঠিল। ক্রমে চেতনা বিলুপ্ত হইল। অতি কষ্টে রাজাকে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইল। বৈদ্যের সর্ব্বপ্রকার প্রযত্ন ব্যর্থ হইল। বুঝিবা আসন্নকাল উপস্থিত। দেখিয়া শুনিয়া রাণী ধৈর্য্য হারাইলেন। ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিচক্ষণ দেওয়ান (প্রধান সচিব) বীরচন্দ্র রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আপনি কোটালিনীর স্থানে গমন করুন। ইহা তাহারই কাণ্ড।" রাণী দাসদাসীসহ স্বয়ং কোটালিনীকে আনিতে বাহির হইলেন এবং বটমূলে কোটালিনীকে দেখিয়া তাহার পা জড়াইয়া পড়িলেন। ইহার পর আর কতদূর আছে, জানিবার উপায় নাই। পুথি প্রাচীন মনে হয় না। ভাষাটি বেশ প্রাঞ্জল মধ্যে মধ্যে হিন্দী আছে। ফার্সী শব্দের ব্যবহারও বড় কম নহে। বিষয়টি সম্পূর্ণ নূতন। বটুকমঙ্গলের সম্পূর্ণ পুথি সংগৃহীত হইলে কখন কাহার দ্বারা কি প্রকারে ভৈরবের পূজা এদেশে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা জানা যাইবে।

নীচের লিখিত ২৭ খানি পুথি ক্রীত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৪ খানি সংস্কৃত ও ২৩ খানি বাঙ্গালা।

সংস্কৃত।—

১। পঞ্চমসার-সংহিতা—নারদ-কৃত

২। শ্রীমদ্ভাগবত,—১ম স্কন্ধ
৩। ঐ ৩য় স্কন্ধ
৪। ঐ ১০ম স্কন্ধ

বাঙ্গালা—

৫। হংসদূত—নরসিংহ দাস-প্রণীত (১০৯৬)
৬। মহাভারত কর্ণপর্ব্ব—দৈবকীনন্দকৃত
৭। পরেশ লতিকা—কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত
৮। ধ্রুবচরিত্র—শঙ্কর কবিচন্দ্র-প্রণীত
৯। প্রসাদচরিত্র—কবিচন্দ্র-বিরচিত
১০। রসভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তমদাস
১১। হরিনাম-কবচ—কৃষ্ণদাস
১২। মহাভারত আদিপর্ব্ব—কাশীরাম দাস (১১১৯)
১৩। চৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
১৪। ঐ মধ্যখণ্ড ঐ
১৫। ঐ অন্ত্যখণ্ড ঐ
১৬। মহাভারত আদিপর্ব্ব—কাশীরামদাস
১৭। ঐ সভাপর্ব্ব ঐ
১৮। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড—কৃষ্ণদাস কবিরাজ
১৯। নারদ উপাসনাতত্ত্ব—বৃন্দাবনদাস—(১১০২)
২০। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—নরোত্তমদাস—(১০৫৭)
২১। চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ড—কৃষ্ণদাস—(১০৮০)
২২। মহাভারত আদিপর্ব্ব—কাশীরাম—(১১২০)
২৩। ঐ সভাপর্ব্ব ঐ
২৪। ঐ দ্রোণপর্ব্ব ঐ
২৫। ঐ মৌষল পর্ব্ব ঐ
২৬। ঐ দ্রোণপর্ব্ব ঐ
২৭। অঙ্গদের রায়বার—কবিচন্দ্র

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

প্রাচীন পদাবলি ও পদকর্ত্তৃগণ

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

গৌরদাস

পদসমষ্টি ৪। পদসংখ্যা যথা,— ৩৭৬। ৪৪১। ১০২২। ১৫২৩।

গৌরমোহন

পদসমষ্টি ১। ১০২৩ সংখ্যক পদ।

গৌরদাস কোন্ সময়ে, কোন্ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তবে গৌরদাস ৩৭৬ পদের ভণিতায়—

"কহে যদুনন্দনদাসক দাস।
গৌরদাস তহিঁ করু আশোয়াস॥"

এইরূপ উক্তি করায় তাঁহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর প্রিয়শিষ্য প্রসিদ্ধ যদুনন্দনদাস ঠাকুরের জনৈক ভক্ত বলিয়াই বিবেচনা হয়। গৌরদাসের মাত্র চারিটি পদ "পদকল্পতরু" গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পদগুলি মিশ্র-মৈথিলী অর্থাৎ ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। এই চারিটি কবিতা-দর্শনে ইহাঁর কবিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংসার কথা কিছু বলা যায় না; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ব্রজবুলি ভাষায় ইহাঁর বেশ অধিকার ছিল। ইহাঁর জ্যোৎস্নাভিসারের সঙ্কেত-বিষয়ক ১০২২ সংখ্যক পদের—

"এত শুনি দূতী চলল অবিলম্বনে
আসি ভেল উপনীত কামুক পাশ।
নয়নতরঙ্গে সকল সমুঝায়ল
পুন হেরি কুমুদ কহে পরকাশ॥
কুমুদিনী গুণ পরি- মলে জগ জীতল
কাহে বিফলায়ত শ্যামল ভৃঙ্গ।
দূতীক বচনে চলল বরনাগর
তুরিতহি গৌরহৃদয় পরসঙ্গ॥"

এহ
মনে
য এই

পংক্তি[illegible]কটিতে কবি সুন্দর কৌশলে দূতীর সঙ্কেত ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই [illegible]ভিসারের পরেই শ্রীরাধার জ্যোৎস্নাভিসার-বিষয়ক গৌরমোহনদাসের ১০২৩ সংখ্যক পদটি [illegible]তরু গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উভয় পদের রচনা-সাদৃশ্য ও একত্র সন্নিবেশ-

দর্শনে দুইটি পদ একজনের রচিত বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। অতএব আমরা গৌরদাস ও গৌরমোহনকে অভিন্ন বলিয়াই বিবেচনা করি।

গৌরসুন্দর দাস

পদসমষ্টি ৭। পদসংখ্যা ১৮৮। ১০২৮। ২৯৪৩—২৯৪৭।

গৌরসুন্দর দাসেরও বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা যায় নাই; তবে তিনি যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই;—কারণ, তিনি তাঁহার ২৯৪৩ সংখ্যক পদে মহাপ্রভু ও তাঁহার সমসাময়িক কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ অন্তরঙ্গ ভক্তের নাম কীর্ত্তন করিয়া আক্ষেপ সহকারে লিখিয়াছেন—

"রাধানাথ এ সব ভকত মেলি।
যে কৈলা কীর্ত্তন আবেশে নর্ত্তন
প্রেমদান কুতূহলী॥
রাধানাথ বড় অভাগিয়া মুঞি।
সে কালে থাকিতু প্রেমদান পাইতু
কেনে না করিলা তুঞি॥" (প-ক-ত ২১৬৩ পৃঃ)

গৌরসুন্দরদাসের পদগুলির মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই। তাঁহার ১৮৮ সংখ্যক ব্রজবুলি পদটি ব্যতীত অন্যান্য পদগুলি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। সাধারণতঃ ত্রিপদীর প্রত্যেক কলিতে (stanza) তিন থাকে ছয়টি পংক্তি দেখা যায় এবং কেবল ধুয়ার কলিটিতেই উদ্ধৃত কলির ন্যায় চারি থাকে চারিটি পংক্তি দৃষ্ট হয়; কিন্তু গৌরসুন্দরদাসের ২৯৪৩ হইতে ২৯৪৭ সংখ্যক পদগুলির প্রত্যেকটি কলিই (stanza) উদ্ধৃত কলির ন্যায় ধুয়ার ধরণে গঠিত এবং প্রত্যেক কলির প্রারম্ভেই "রাধানাথ" সম্বোধন-পদ দেখা যায়। কলির গঠনে এইরূপ বিশেষত্ব গৌরসুন্দরদাসের নিজস্ব নহে; চণ্ডীদাসের "সখি, কহবি কানুর পায়" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিতেই বোধ হয়, সকলের প্রথমে এই পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকবর্গের তুলনার সুবিধার জন্য আমরা চণ্ডীদাসের সেই ক্ষুদ্র পদটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখসাগর দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥

সখি, যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করল বাদ॥
সখি, হাম সে অবলা তায়।
বিরহ-আগুন দহয়ে দ্বিগুণ
সহনে নাহিক যায়॥
সখি, বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে সে জন
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ॥" (প-ক-ত ১২৩৬ পৃঃ)

"লীলাসমুদ্র", "পদসমুদ্র" প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত সংগ্রহ-গ্রন্থে চণ্ডীদাসের নামে অনেক সন্দিগ্ধ পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলির সমালোচনা-কালে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এ স্থলে ইহাই বক্তব্য যে, চণ্ডীদাসের উদ্ধৃত পদটি সন্দিগ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। "পদামৃত-সমুদ্র" নামক প্রাচীন পদ-সংগ্রহকার পদকর্ত্তা রাধামোহন ঠাকুর উক্ত পদটি তাঁহার "পদামৃত-সমুদ্রে" উদ্ধৃত করিয়াছেন। * গৌরসুন্দরদাসের শ্রীগৌরাঙ্গের রূপবর্ণনা-বিষয়ক "ওহে গৌর বসিয়া থাকহ নিজঘরে" ইত্যাদি ১০২৮ সংখ্যক পদটি কবিত্ব-অংশে উল্লেখ-যোগ্য।

"হেরিয়া বদনচাঁদ উদয় না করে চান্দ
লাজে যায় মেঘের ভিতরে।
সৌদামিনী চমকিল চম্পক শুখাঞা গেল
লাজে কেহ সোনা নাহি পরে॥

স্থলপদ্ম আদি যত তরুতে শুখায় কত
না তোলয়ে হেরি পদপাণি।
শুন গৌরসুন্দর এই তোমার কলেবর
ভুবনবিজয়ী অনুমানি॥" (প-ক-ত ৭৪৫ পৃঃ)

এই পংক্তিগুলির সকল ভাব সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও কবির বলিবার ভঙ্গী সুন্দর, কানন স্বভাবতই কত স্থল-পদ্ম প্রভৃতি প্রস্ফুটিত হইয়া আপনা আপনি শুকাইয়া যায়,—কবি এই বাস্তব কথাটির যে কাল্পনিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে অতিশয়োক্তি ও ব্যতিরেক অলঙ্কারমূলক ব্যঞ্জনা দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের স্থলকমলারুণ পদপাণির অপূর্ব্ব সুষমা রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। যদি ভণিতার "শুন" শব্দটি "কহে" শব্দের পরিবর্ত্তে

* "পদামৃতসমুদ্র" ৩১৭ পৃষ্ঠার মূল ও সংস্কৃত টিপ্পনী দেখুন।

হস্তলিখিত পুস্তকে ভুলে লিখিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই পদটির ভণিতাও বিচিত্র বটে। কবি পদের আরম্ভের ন্যায় শ্রীগৌরাঙ্গকে সম্বোধন করিয়াই পদের সমাপ্তি করিয়াছেন এবং "গৌরসুন্দর" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা কৌশলে নিজের নাম প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌরীদাস

পদসমষ্টি ২। পদসংখ্যা ১৬১। ২২৪৩।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন গৌরীদাসের বিবরণ পাওয়া যায়। গৌর-পদ-তরঙ্গিণী গ্রন্থের প্রণেতা স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উক্ত গ্রন্থের উপক্রমণিকায় উভয় গৌরীদাসেরই পরিচয় দিয়াছেন। এই গৌরীদাস-দ্বয়ের মধ্যে (১) পণ্ডিত গৌরীদাস অম্বিকা কাল্‌না-নিবাসী কংসারি মিশ্রের পুত্র প্রসিদ্ধ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় প্রভু নিত্যানন্দ এই সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা বসুধা ও জাহ্নবী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গৌরীদাস দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। কথিত আছে, তিনি ব্রজলীলায় সুবল-সখা ছিলেন এবং মহাপ্রভু ইহাঁকে প্রসাদস্বরূপ এক বৈঠা প্রদান করেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাইর প্রসিদ্ধ দারুময় বিগ্রহ অদ্যাপি অম্বিকায় বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার বংশধরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইতেছেন। (২) নিত্যানন্দ-ভক্ত গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়া। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বলেন যে, বৈষ্ণব-বন্দনায় ইহাঁর সম্বন্ধে লিখিত আছে যে—

"গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়ার কেশেতে ধরিয়া।
নিত্যানন্দ স্তব করাইলা নিজ শক্তি দিয়া॥"

জগদ্বন্ধু বাবু লিখিয়াছেন যে, শ্রীহট্ট জেলানিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় অনুমান করেন যে, পদকল্পতরুর চতুর্থ শাখার নিত্যানন্দ-বন্দনা-বিষয়ক ২২৪৩ সংখ্যক পদটি এই গৌরীদাস কীর্ত্তনিয়ার বিরচিত। বৈষ্ণব-বন্দনার পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্য অনুসারে কীর্ত্তনিয়া গৌরীদাসই পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। গৌরীদাসের পদ দুটির সম্বন্ধে আর কিছুই বক্তব্য নাই।

ঘনরাম

পদসমষ্টি ১৬। পদসংখ্যা—১১৪১। ১১৪৩। ১১৪৪। ১১৪৮। ১১৫৩। ১১৫৮। ১১৬১। ১১৬২। ১১৭৫। ১১৭৬। ১১৯১। ১১৯২। ১২১৩। ১২১৮। ১২২০। ১২২৩।

পদকর্ত্তা ঘনরামের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। "ধর্ম্ম-মঙ্গল" কাব্য-প্রণেতা ঘনরাম ও পদকর্ত্তা ঘনরাম একই ব্যক্তি কি না, তাহাও নির্ণয় করার উপায় নাই। যদি তাঁহারা পৃথক্ ব্যক্তি হন ও ধর্ম্ম-মঙ্গল-প্রণেতা কোন পদ রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ঘনরাম ভণিতায় সম্ভবতঃ উভয়ের পদ মিশিয়া গিয়াছে। ঘনরাম দাসের* [illegible] লির সমস্তই বাৎসল্যরস ও গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক। উহার প্রায় কুত্রাপি ব্রজবুলি [illegible] হৃত

হয় নাই। কেবল ১১৪৮ সংখ্যক পদটির গঠন বিচিত্র রকমের। ঐ পদের অধিকাংশ কলিগুলি ব্রজবুলি ভাষায় ত্রিপদীছন্দে রচিত, কিন্তু শেষের চারি ছত্র বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় পয়ার ছন্দে রচিত। একই পদে এইরূপ ভাষা ও ছন্দের বিপর্য্যয় পদাবলি-সাহিত্যে নিতান্ত বিরল। সম্ভবতঃ হস্তলিপি পুথির লেখকদিগের ভ্রমবশতই এইরূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। 'ঘনরাম' ও 'ঘনশ্যাম' এই দুইটি নামের সাদৃশ্য বশতঃ দুইটি পদের ভণিতা লইয়াও গোলযোগ আছে। পদকল্পতরুর মুদ্রিত গ্রন্থে ও উহার (ক) চিহ্নিত আদর্শ হস্তলিপি পুস্তকে তৃতীয় শাখার উনবিংশ পল্লবে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাবিষয়ক ১১৪১ ও ১১৪৩ সংখ্যক পদ দুইটিতে 'ঘনশ্যাম' দাসের ভণিতা আছে কিন্তু (খ) চিহ্নিত হস্তলিপি পুথিতে তাহার পরিবর্ত্তে 'ঘনরাম' দাসের ভণিতা দেখা যায়। (খ) পুথির পাঠ অধিকাংশ স্থলে অধিকতর সুসঙ্গত এবং ঘনশ্যাম দাসের বাৎসল্যরস ও গোষ্ঠলীলা-বিষয়ক অন্য কোন পদ পদকল্পতরু গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত পদ দুইটি ঘনরামদাসের রচিত বলিয়াই আমাদিগের অনুমান হয়।

ঘনরামের বাল্য ও গোষ্ঠলীলার পদগুলিতে উচ্চ অঙ্গের কবিত্ব না থাকিলেও, উহাতে বাৎসল্য-রসের চিত্র সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। এই পদগুলি প্রাঞ্জলতাগুণে সকল শ্রেণীর পাঠকেরই চিত্ত হরণ করিয়া থাকে। আমরা কৌতূহলী পাঠকবর্গকে ঘনরাম দাসের ১১৬১ ও ১১৬২ সংখ্যক পদ দুইটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্বভাবতঃ মধুর-রস-প্রিয় বৈষ্ণব পদ-কর্ত্তৃগণের বাৎসল্যরসাশ্রিত পদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম বটে। অতএব ঘনরামদাস বাৎসল্য-রসবিষয়ক এই সকল মধুর প্রাঞ্জল পদাবলি রচনা দ্বারা পদাবলি-সাহিত্যের যে বিশেষ পুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঘনশ্যাম

পদসমষ্টি ৪১। পদসংখ্যা যথা—৩৬।৫৫।১৩৮।১৫০।১৫১।১৫৫।২১৬।৩৪৮—৩৫০।৩৮৩। ৪২৫।৪২৬।৪৩৮।৪৫৫।৪৬৫।৪৬৬।৪৯০।৫২১।৫৩৬।১১৩৪।১৬০৪।১৬৩১।১৬৯২—১৬৯৪।১৭২১।১৭-৬৮।১৮৫৭।১৯০১।১৯৪০।১৯৫১।১৯৮৪—১৯৮৬।২২৪০। ২২৬৮।২৩২৯।২৬৪১।২৬৫৯।২৮৩৩।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে দুই জন প্রসিদ্ধ ঘনশ্যামের বিবরণ পাওয়া যায়। (১) প্রসিদ্ধ "ভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থপ্রণেতা নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী। (২) কবিরাজবংশাবতংস ঘনশ্যাম দাস। "গৌর-পদ-তরঙ্গিণী" গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার উদ্ধৃত গৌরাঙ্গলীলা-বিষয়ক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির সমস্ত পদই বোধ হয়, নরহরি বা ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর রচিত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন ; কারণ, তিনি কবিরাজবংশজ দ্বিতীয় ঘনশ্যামের কথা উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ঘনশ্যাম দাসের ভণিতাযুক্ত পদগুলি সমস্তই ঘনশ্যাম নরহরির রচিত বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হয় না। পদাবলি-সাহিত্যে ঘনশ্যাম ও বলরাম অতি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা। পদকল্পতরু

গ্রন্থের রচয়িতা বৈষ্ণবদাস ঐ গ্রন্থের প্রথম শাখার প্রথম পল্লবে প্রসিদ্ধ ভক্ত ও পদকর্ত্তৃগণের বন্দনাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"কবি-নৃপ-বংশজ ভুবনবিদিত যশ
ঘনশ্যাম বলরাম।
ঐছন দুহুঁ জন নিরুপম গুণগণ
গৌরপ্রেমময় ধাম ॥"

সঙ্গীতকুশল অপর একজন বলরামের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও * জগদ্বন্ধু বাবু "প্রেম-বিলাস"-রচয়িতা বৈদ্যবংশোদ্ভব নিত্যানন্দ ওরফে বলরাম দাসকে পদকর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। অবশ্য কোন ব্যক্তি সঙ্গীতকুশল হইলেই তাহাকে পদকর্ত্তা হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; সুতরাং দোগাছিয়াবাসী বলরাম দাস যে প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন, ইহার পোষক বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে জগদ্বন্ধু বাবু তাঁহার দাবি অগ্রাহ্য করিয়া যে অসঙ্গত করিয়াছেন, এরূপ আমরা বিবেচনা করি না। কিন্তু "প্রেম-বিলাস"-রচয়িতা নিত্যানন্দ ওরফে বলরাম দাসই যে সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা "বলরাম", তাহার কি প্রমাণ আছে? সত্য বটে, আমরা নিত্যানন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কোন পদ "পদামৃত-সমুদ্র", "পদকল্পতরু" প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে প্রাপ্ত হই নাই। ইহা হইতে অবশ্যই এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, "প্রেম-বিলাস"-রচয়িতা কোন পদ রচনা করিয়া থাকিলে, তাহা বলরাম নামেই প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া "বলরামদাস" ভণিতাযুক্ত সমস্ত পদই প্রেমবিলাস-রচয়িতার রচিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা কোন মতেই নিরাপদ্ নহে। জগদ্বন্ধু বাবুর মতানুসারে "ভক্তি-রত্নাকর"-রচয়িতা ঘনশ্যাম ও "প্রেমবিলাস"-রচয়িতা বলরামদাসকেই পদকর্ত্তা ঘনশ্যাম ও বলরাম বলিয়া ধরিয়া লইলে, বৈষ্ণবদাসের স্তুতিভাজন, কবিরাজবংশোদ্ভব, ভুবনবিখ্যাত ঘনশ্যাম ও বলরামের কি গতি হইবে? বৈষ্ণবদাসের বর্ণিত বলরামই "প্রেমবিলাস"-রচয়িতা বলরাম-দাস, এইরূপ তর্কও করা যাইতে পারে না; কারণ, বৈষ্ণবদাস যেরূপ সংযুক্তভাবে "ঘনশ্যাম" ও "বলরামের" উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে একই বংশোদ্ভব প্রায় সমসাময়িক দুই জন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। এই বৈদ্যকুলোদ্ভব "ঘনশ্যাম" ও "বলরামদাস" প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা না হইলে, কিরূপে যে ভুবনবিখ্যাত হইয়া-

* জগদ্বন্ধু বাবুর উদ্ধৃত ভাবামৃত-মঙ্গলের শ্লোক যথা—

"জয় প্রভুপ্রিয় শ্রীবলরামদাস।
সঙ্গীতপ্রবীণ দোগাছিয়া যাঁর বাস ॥"

পুনশ্চ—

"জয় দ্বিজ বলরাম দোগাছিয়াবাসী।
গৌর-গুণ-গানে যেই মত্ত দিবানিশি ॥"

ছিলেন, তাহাও বুঝা যায় না। "ভক্তিরত্নাকর" ও "প্রেমবিলাস" প্রভৃতির ন্যায় জীবন-চরিত্র গ্রন্থ রচনা ও উৎকৃষ্ট পদরচনায় মধ্যে শক্তির অনেক পার্থক্য আছে। যিনি উৎকৃষ্ট জীবন-চরিত্র গ্রন্থ লিখিতে পারেন, তিনিই যে উৎকৃষ্ট কবি হইবেন, এরূপ কোন কথা নাই, বরং জীবন-চরিত্র-রচনায় অসাধারণ দক্ষতা দ্বারা উৎকৃষ্ট পদরচনা-শক্তির অভাবই অনুমিত হইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য দূরে যাইতে হইবে না; বৈষ্ণব-সাহিত্যেই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীবন-চরিত্র-লেখকদিগের অগ্রগণ্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবতকার বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কেহই উৎকৃষ্ট পদকর্ত্তা ছিলেন না। পক্ষান্তরে লোচনদাসের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল জীবন-চরিত্রের হিসাবে অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তিনি তাহাতে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাবিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়া পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছিলেন। "ভক্তিরত্নাকর" ও "প্রেমবিলাস"-রচয়িতার সম্বন্ধে যে এই মানব-চরিত্রমূলক বিচিত্র নিয়মটির ব্যভিচার ঘটিয়াছিল, এরূপ মনে করার কোনই কারণ নাই। সুতরাং আমরা "ভক্তিরত্নাকর" ও "প্রেমবিলাস"-রচয়িতার প্রতি কোনরূপ অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে উহাঁ-দিগকে "ঘনশ্যাম" ও "বলরাম"দাসের ভণিতাযুক্ত উৎকৃষ্ট পদসমূহের রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে কোন পদই রচনা করেন নাই, আমরা এরূপ বলিতে পারি না। নরহরি চক্রবর্ত্তীর সংগৃহীত "গীত-চন্দ্রোদয়" গ্রন্থ বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার রচিত "ভক্তিরত্নাকর" গ্রন্থেও তিনি নিজের রচিত 'ঘনশ্যাম' ও 'নরহরি' উভয়বিধ ভণিতাযুক্ত বহুসংখ্যক পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই পদগুলি রচনা ও কবিত্ব-অংশে নিন্দনীয় নহে; কিন্তু 'ঘনশ্যাম' ভণিতাযুক্ত পদকল্পতরুর উৎকৃষ্ট পদগুলির সহিত তুলনা করিলে, কিছুতেই তাহা একই ব্যক্তির রচনা বলিয়া অনুমান করা যায় না। সুতরাং "ভক্তিরত্নাকর"-রচয়িতা বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি ভাষায় বহু পদাবলি রচনা করিয়া থাকিলেও আমাদিগের বিশ্বাস যে, বৈষ্ণবদাসের বর্ণিত বৈদ্যবংশোদ্ভব 'ঘনশ্যাম' ও 'বলরামদাস'ই পদকর্ত্তৃরূপে অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রচিত নানাবিষয়ক বহু উৎকৃষ্ট পদ বৈষ্ণবদাসকর্ত্তৃক "পদ-কল্পতরু" গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে; এ অবস্থায় প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তৃগণের নাম-কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ না করিলে বৈষ্ণবদাসের পক্ষে তাহা অমার্জ্জনীয় ত্রুটি বলিয়া গণ্য হইতে পারিত। দুঃখের বিষয় এই যে, বৈষ্ণবদাসের পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত উল্লেখ ব্যতীত আমরা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা "ঘনশ্যাম" ও "বলরাম" সম্বন্ধে আর কিছুই জানিতে পারি নাই। "ঘনশ্যাম দাসের উক্ত পাঁচটি বাঙ্গালা পদের মধ্যে ১১৩৪ সংখ্যক পদটি শ্রীরাধার জন্মবিষয়ক, ২২৪০ সংখ্যক পদটি শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা এবং ২২৬৮ সংখ্যক পদটি শ্রীনিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ অবতারের বন্দনা। এই তিনটি পদের ভাষা ও রচনা-পদ্ধতি বেশ সাদাসিধা। কিন্তু "ঘনশ্যাম" ভণিতাযুক্ত ব্রজবুলী পদগুলির রচনা-পদ্ধতি সেরূপ নহে; ঐ পদগুলিতে কবি

গোবিন্দদাস কবিরাজের অনুকরণে অনুপ্রাস, শ্লেষ প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের এবং নানারূপ অর্থালঙ্কারের বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। ইহাতে পদগুলি কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য হইয়া থাকিলেও তাহা পদকর্ত্তার উত্তম রচনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক হইয়াছে। এ স্থলে ঘনশ্যামদাসের অনুপ্রাস-শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কার-পটুতার কয়েকটি উদাহরণ না দিলে, তাঁহার প্রতি অবিচার করা হইবে বলিয়া আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি। প্রথমে শ্লেষ-মূলক বক্রোক্তি অলঙ্কারের একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। বর্ষাকালের রজনী; "গরজয়ে গগনে সঘন ঘন ঘোর"; শ্রীকৃষ্ণ "দামিনী-চমক" অনুসরণ করিয়া সঙ্কেত-কুঞ্জে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সহিত রহস্য করার অভিলাষে—

"কুঞ্জ-মন্দিরে ধনী দেওল কপাট।
কানু না জানল ঐছন নাট॥
অন্তরে ভাবয়ে শ্যাম-শরীর।
আজু দুরদিনে ধনী না ভেল বাহির॥"

শ্রীকৃষ্ণ যখন কাতর হইয়া নানারূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন—

"শুনি ধনী ধাইক দরবে হৃদয়।
কহতহি কোন দ্বার মাহা রোয়॥"

শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে বলিলেন—"আমি হরি।" শ্রীরাধা 'হরি' শব্দের 'সিংহ' অর্থ ধরিয়া বলিলেন—

"কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
হরি হাম জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরি-কন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওল মৃগরাজ॥"

অর্থাৎ কে এখানে বারংবার হুঙ্কার করিতেছে? 'হরি' আমি বুঝিতে পারিলাম না, প্রকাশ করিয়া বল। গিরি-কন্দর ত্যাগ করিয়া মৃগরাজ কেন মন্দিরে আসিবে?

"সো নহ ধনি মধুসূদন হাম।"

অর্থাৎ তাহা নহে, ধনি! আমি মধুসূদন। শ্রীরাধা "মধুসূদন" শব্দের ভ্রমর অর্থ ধরিয়া বলিলেন,—

"চল কমলালয় মধুকরী ঠাম।"

অর্থাৎ যদি তুমি ভ্রমর, তাহা হইলে পদ্মবনে মধুকরীর নিকট যাও। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—

"শ্যাম মুরতি হাম তুহুঁ কি না জান।"

অর্থাৎ আমি শ্যাম-মূর্ত্তি, তাহা কি তুমি জান না?

শ্রীরাধা শ্যাম-মূর্ত্তি শব্দের 'অন্ধকার' অর্থ ধরিয়া বলিলেন—

"তারাপতি-ভয়ে বুঝি অনুমান।
ঘরহুঁ রতন-দীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন আন্ধিয়ার ॥"

অর্থাৎ—অন্ধকার বুঝি চন্দ্রের ভয়ে এথায় আসিয়াছে? * গৃহে রত্ন প্রদীপ উজ্জ্বল রহিয়াছে, ঘন অন্ধকার তাহাতে কিরূপে প্রবেশ করিবে?

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—

"রাধারমণ হাম কহি পরচার।"

শ্রীরাধা—'রাধারমণ' শব্দের অর্থ রাধা অর্থাৎ অনুরাধা নক্ষত্রের † আনন্দ-দায়ক পূর্ণিমা-চন্দ্র ধরিয়া বলিতেছেন—

"রাকা রজনী নহ ঘন আন্ধিয়ার।"

অর্থাৎ (ইহা) পূর্ণিমা-রজনী নহে; (ইহা যে) ঘন অন্ধকার! অর্থাৎ ইহা পূর্ণিমা-রজনী হইলে এখানে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হওয়া সম্ভবপর ছিল; কিন্তু ইহা যখন ঘোর অন্ধকার-রজনী, তখন পূর্ণচন্দ্র (ধ্বনিগম্য অর্থে) কলঙ্কচিহ্ন-বিশিষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র এখানে কিরূপে আসিবে?

এখন—"পরিচয়-পদ যবে সবে ভেল আন।
তবহি পরাভব মানল কান ॥"

অর্থাৎ যখন সকল পরিচয়-বাক্যই বৃথা হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইয়া নীরব হইলেন এবং শ্রীরাধা তখন—

"করে ধরি রাই　মন্দির মাহা আনল
দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম।
আগমন-জনিত　সকল দুখ কহতহি
মধুর বচন অনুপাম ॥"　ইত্যাদি

(প-ক-ত—৩৪৮-৩৫০ সংখ্যক পদ)

* এ স্থলে "তারাপতি" শব্দে একটা শ্লেষ (pun) আছে; এক অর্থে 'তারা-পতি' চন্দ্র; "তারা-পতি" শব্দের অপর অর্থ তারা-নাম্নী—শ্রীরাধার অভিন্নদেহা সত্যভামার পতি শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত "ললিত-মাধব" নামক প্রসিদ্ধ নাটকে শ্রীরাধার সহিত সত্যভামার অভিন্নতা ও মথুরা পুরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তাঁহার পরিণয় বর্ণিত হইয়াছে। ললিত-মাধবের প্রস্তাবনায় সূত্রধার-বাক্য যথা—"নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা। সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥" সুতরাং "তারা-পতি-ভয়ে বুঝি অনুমান" বাক্যের বিদ্রূপাত্মক অর্থ এই যে, "বোধ হয়, অন্ধকার কৃষ্ণতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াই পলাইয়া আসিয়াছে।"

† মহাভাষ্যের মতে সত্যভামা, অনুরাধা প্রভৃতি শব্দের স্থলে সংক্ষেপের জন্য 'ভামা', 'রাধা' ইত্যাদির প্রয়োগ অশুদ্ধ নহে; সুতরাং অনুরাধা (নক্ষত্রবিশেষ) ও রাধা একার্থক।

এখন ঘনশ্যামদাসের ব্যতিরেক অলঙ্কারমূলক ব্যাজ-স্তুতি অর্থাৎ স্তুতিচ্ছলে নিন্দার একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর সহিত রজনী-যাপন করিয়া তাঁহার সম্ভোগ-চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করতঃ প্রভাতে শ্রীরাধার নিকটে উপনীত হইয়াছেন দেখিয়া, শ্রীরাধা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন,—

গগনহি এক চাঁদ নাহি দোসর
ধরু যাহে নীলিম-চিন।
অরুণ-উদয়ে পুন লাজে মলিন তনু
বেকত না হোয়ত দিন॥
মাধব, অপরুব তোহারি বিলাস।
তুয়া উর-অম্বরে চাঁদ ঘটাওল
দিনহি হোত পরকাশ॥ ধ্রু।
বিহিক শকতি জিতি কোন কলাবতী
অরুণ ঘটাওল তায়।
তছু সেবন বিনু প্রাতরে তোহে পুন
আনত গমন না যুয়ায়॥
জানলুঁ অতয়ে কয়লি হাম বহু পুণ
তাহে তুহুঁ আপনাহি আব।
কহ ঘনশ্যাম- দাস হাম কৈছনে
ঐছন দরশন পাব॥" (প-ক-ত—৩৮০ সংখ্যক পদ)

অর্থাৎ—যে কলঙ্কচিহ্ন ধারণ করে, (সেই) চাঁদ আকাশে একটি ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, (সেই চাঁদ) আবার অরুণের উদয়ে লজ্জায় মলিন-তনু হইয়া দিবসে প্রকাশিত হন না। হে মাধব! তোমার লীলা অপূর্ব্ব! তোমার হৃদয়াকাশে (যে) চাঁদ অর্থাৎ নখক্ষত সাজাইয়াছ, তাহা দিনেই প্রকাশ পাইতেছে। (চান্দের সঙ্গে আকাশে অরুণের উদয় অসম্ভব হইলেও) বিধাতার শক্তিকে পরাজয় করিয়া কোন্ শিল্পনিপুণা রমণী তাহাতে আবার সূর্য্য অর্থাৎ রক্তিম অলক্তক-চিহ্ন ঘটাইল? সেই (অদ্ভুত শক্তিশালিনী) রমণীর সেবা না করিয়া তোমার প্রাতে অন্যত্র গমন উপযুক্ত হয় না। অতএব জানিতেছি, আমি বহু পুণ্য করিয়াছি, তাই তুমি আপনি আসিয়াছ। ঘনশ্যামদাস বলে, আমি কিরূপে ঐ রূপের দর্শন পাইব। উদ্ধৃত পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজের উৎকৃষ্ট ধ্বনি ও অলঙ্কার-পূর্ণ পদের সহিত তুলনার অযোগ্য নহে।

ঘনশ্যামদাসের ব্রজবুলি পদগুলির মধ্যে ১৭৬৯ সংখ্যক সুদীর্ঘ বারমাসী পদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঐ বারমাসী হিন্দী-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ "কুন্তলী"ছন্দে রচিত। এই পদটি ঘনশ্যামের হিন্দী-সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বটে।

ঘনশ্যামদাসের সম্ভোগ-রসোদ্গারবিষয়ক—

"ঝাঁপল বিরহ- মিহির নবজলধর
সুন্দর দরশন-ছায়।
কয়ল সুশীতল সুরতরঙ্গিণী *
সরস-সমাগম-বায় ॥" (প-ক-ত—১৯৫১ সংখ্যক পদ)

ইত্যাদি পদটির শ্লেষ-মূলক 'সুরতরঙ্গিণী' শব্দ ও কোন কোন ভাব পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের কাব্য হইতে গৃহীত হইলেও ঐ সাঙ্গ-রূপক পদটি রচনা ও কবিত্ব-অংশে উৎকৃষ্ট। আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গকে সমগ্র পদটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ঘনশ্যামদাসের "নয়নক লোর ওর নাহি রেকত" ইত্যাদি ১৮৫৭ সংখ্যক পদটি রাধামোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক পদামৃত-সমুদ্রে উদ্ধৃত হইয়াছে। রাধামোহন ঠাকুর স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবুর মতে ১৬২০ কি ১৬২১ শকে জন্মগ্রহণ এবং ১৭০৩ শকে পরলোকগমন করেন। তিনি মধ্যবয়সে "পদামৃত-সমুদ্র" গ্রন্থ রচনা করেন। এইরূপ অনুমান করিলে পদকর্ত্তা ঘনশ্যামদাস যে নিশ্চিতই ১৬৬০ শাকের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নাই।

পদাবলি-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয় "ভক্তিরত্নাকর"-প্রণেতা নরহরি চক্রবর্ত্তীকে পদকর্ত্তা "ঘনশ্যাম" বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "নরহরি দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি। তাঁহার লেখা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের মত প্রাঞ্জল বা ভাব তেমন প্রগাঢ় না হইলেও জ্ঞানদাস বা গোবিন্দদাস অপেক্ষা ন্যূন নহে, তাঁহার রচনায় নর-চরিত্রের স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে।" স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—"আমাদের মত এই যে, ঘনশ্যাম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের ত্রিসীমায়ও যাইতে যোগ্য নহেন। গোবিন্দদাসের ও জ্ঞানদাসের কোন কোন পদের সহিত তাঁহার পদের নিকট সাদৃশ্য থাকিলেও মোটের উপর তাঁহাদের তুল্যাসনেও ইনি বসিবার যোগ্য নহেন। রায় শেখর, লোচনদাস, বাসুদেব ঘোষ, বলরামদাস এবং রাধামোহন দাসও ঘনশ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি।" ঘনশ্যাম কবিত্ব-বিষয়ে কোনমতেই যে গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসের সমকক্ষ নহেন, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় রায় শেখর ও বলরামদাসও তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি বটে। লোচনদাসের বাঙ্গালা ধামালির পদগুলি প্রাঞ্জলতা ও রস-মাধুর্য্যে অতি উপাদেয় হইলেও তিনি ব্রজ-বুলি পদ-রচনায় কিংবা অলঙ্কার-বৈচিত্র্যে নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, অথচ ভাবের প্রগাঢ়তায়ও তিনি চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস প্রভৃতি ভাবপ্রধান কবিগণের সমকক্ষ নহেন; সুতরাং আমরা লোচনদাসকে ঘনশ্যাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

* এক অর্থে—সুর+তরঙ্গিণী…গঙ্গা; অপর অর্থে—সুরত+রঙ্গিণী=সম্ভোগ-লীলাবতী।

বাসুদেব ঘোষের পদাবলির বিশেষত্ব এই যে, তিনি শ্রীমহাপ্রভুর সহচর ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রচিত পদাবলির অনেক বর্ণনা কাল্পনিক বলিয়া বাদ দিলেও তাহার ঐতিহাসিক মূল্য বড় কম নহে। এই বিশেষত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল কবিত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে তাঁহাকে ঘনশ্যাম, বলরাম, রায়শেখর প্রভৃতির সহিত তুল্যাসন দেওয়া যাইতে পারে না। রাধামোহন ঠাকুর বৈষ্ণব-শাস্ত্রে বিশেষতঃ রস-তত্ত্বে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ পদই ব্রজবুলি-ভাষায় রচিত এবং তিনি তাঁহার পদাবলিতে গোবিন্দদাসের অনুকরণে অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার ও নানাপ্রকার অর্থালঙ্কার সংযোজিত করিয়াছেন; এ বিষয়ে ঘনশ্যামদাসের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য সুপরিস্ফুট। তথাপি উভয়ের কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়া আমরা রাধামোহন ঠাকুর অপেক্ষা ঘনশ্যামের বর্ণনার স্বাভাবিকতারই অধিক প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছি। রাধামোহন ঠাকুরের অনেক পদ পড়িয়াই বোধ হয়, যেন তিনি রস-শাস্ত্রোক্ত বিভাব অনুভাব-সমূহের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করার জন্যই লক্ষণের সহিত মিলাইয়া পদ রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ রস-পর্য্যায় অনুসারে পদাবলি-বিন্যাস করিতে যাইয়া তিনি যে স্থলে উপযুক্ত প্রাচীন পদ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সেই স্থলেই স্বরচিত পদে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এইরূপ দায়ে ঠেকিয়া পদরচনা করিলে সেই পদে যে, সহৃদয় সমালোচকগণ স্বাভাবিকতার অসদ্ভাব অনুভব করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। যাহা হউক, সংস্কৃত-সাহিত্যের প্রসিদ্ধ "রত্নাবলী" নাটিকার ন্যায় অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের সম্পূর্ণ প্রাধান্য রক্ষা করিয়াও রাধামোহন ঠাকুরের পদাবলি যে কবিত্ব-অংশে নিন্দনীয় হয় নাই, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।

চণ্ডীদাস

পদসমষ্টি ১১৫

পদসংখ্যা যথা:—২৯।৩০।৯৪।৯৮।১৩৪।১৩৫।১৪১।১৪৩।১৫৩।১৯৮।২০২।২০৩।২০৫।২০৬।২১০। ২৮২।৩৩১।৩৫২।৫৯০—৫৯৩।৪০২।৫৭৪।৬৩৬—৬৪৩।৬৬৯।৬৭০।৬৯৫।৭১৩।৭৩৭।৭৩৯।৭৪০।৭৫৫। ৭৯৩।৭৯৯।৮০৩।৮০৮।৮১২—৮১৪।৮২৪।৮২৫।৮২৬।৮২৭।৮৩১।৮৩২।৮৩৪।৮৩৮।৮৪০।৮৪১।৮৪৫। ৮৪৭—৮৪৯।৮৫৪।৮৫৭—৮৬০।৮৬৪।৮৬৬।৮৬৮—৮৮৪।৮৮৬—৮৯৪।৯০৩।৯১০।৯১২।৯১৬।৯১৭। ৯২৩।৯২৪।৯৩১।৯৪২।৯৫০।১০৯৮।১২৮৬।১২৮৭।১৫০৮।১৭১৪।১৮৯৬।১৯২৩।২৫৯০—২৩৯২। ২৪৪০।

বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বাঙ্গালা-সাহিত্যে বহু আলোচনা হইয়াছে। সংস্কৃত কবি জয়দেব ও মৈথিলকবি বিদ্যাপতিকে তুলনার মধ্যে না আনিলে চণ্ডীদাস যে অন্যান্য পদকর্ত্তৃগণ হইতে স্বাভাবিক কবিত্ব-শক্তির হিসাবে অনেক শ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে বোধ হয় কোন মতভেদ নাই। আমরা গোবিন্দদাসের পদাবলির সমালোচনা-প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, বর্ণনার পারিপাট্য, অনুপ্রাসাদি অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য ও রচনা-মাধুর্য্যে

বাঙ্গালী পদকর্ত্তৃগণের মধ্যে গোবিন্দদাস অদ্বিতীয়। কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান রস ও ভাবের প্রগাঢ়তায় চণ্ডীদাসের ত কথাই নাই—অনেক স্থলে জ্ঞানদাসও গোবিন্দদাসের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা দেখাইয়াছেন। চণ্ডীদাসের রস ও ভাবের প্রগাঢ়তাই প্রধানতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচকগণ কর্ত্তৃক সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে; অতএব যদিও কাব্য-সমালোচকের উহাই প্রধান আলোচ্য বিষয় বটে এবং উহার যথাযথ আলোচনা ব্যতীত এইরূপ প্রবন্ধ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হইতে পারে না, তথাপি আমরা এই প্রবন্ধের সর্ব্বাঙ্গীনতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া চণ্ডীদাসসংসৃষ্ট অনালোচিত পূর্ব্ববিষয়েরই প্রধানতঃ আলোচনা করিব।

চণ্ডীদাসের পদাবলির সংখ্যা ও প্রামাণিকতার সম্বন্ধেই আমরা প্রথমে আলোচনা করিব। চণ্ডীদাসের পদাবলির সম্পাদক রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় চণ্ডীদাসের ব্রজলীলা-বিষয়ক ২৭৬টি পদ, রাগাত্মিক ৫১টি পদ এবং গ্রন্থের পরিশিষ্টে নানাবিষয়ক ৮টি পদ তাঁহার সংস্করণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন; কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলির সংখ্যা আরও অনেক বেশী বলিয়া জানা গিয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর সংখ্যা ও প্রামাণিকতা

স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বাবু "গৌরপদতরঙ্গিণী" গ্রন্থের ভূমিকায় ৮১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"সপ্তম বর্ষের "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকার কোন অজ্ঞাতনামা লেখক একটি পদাংশ প্রচার করেন, তাহাতে চণ্ডীদাসের পদাবলির কাল-নিরূপণ এবং রচিত পদের সংখ্যা-নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছে। যথা—

"বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চবাণ।
নবহুঁ নবহুঁ রস গীত পরিমাণ॥"

অর্থাৎ ১৩২৫ শকে পদগুলির রচনা শেষ হইল এবং সমুদয় পদের সমষ্টি ৯৯৬ মাত্র। এই পদাংশের উক্তি কতদূর প্রামাণিক, বলা যায় না।

প্রাচীন-সাহিত্যে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় গত বর্ষের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র দ্বিতীয় সংখ্যায় "চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক সারবান্ প্রবন্ধে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন" নামক চণ্ডীদাসের লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের পরিচয় দিতে যাইয়া চণ্ডীদাসের পদাবলির সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিব। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমরা ১৬।১৭ বৎসর ধরিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা-সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া আসিতেছি; তাহাতে এইটুকু বুঝিয়াছি যে, যে সকল গ্রন্থ আমরা দেখিবার অবসর পাইয়াছি, তাহারই ভাষা আদর্শ-গ্রন্থের ভাষা হইতে ন্যূনাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত। কোনও একখানি গ্রন্থ অপরিবর্ত্তিত বা অবিকৃত আকারে পাইয়াছি, বলিতে পারি না। আবার যে গ্রন্থের যত অধিকসংখ্যক প্রতিলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, সে গ্রন্থে পাঠবিকৃতির মাত্রাও তদনুরূপ। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনামধ্যে প্রক্ষেপের আতিশয্যের কথাও উল্লেখ করিতে হয়। এমত স্থলে চণ্ডীদাসের পদাবলি যে অবিকৃত আকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, বলা যায় না। পরমভাগবত

স্বর্গীয় উমাচরণ দাস মহাশয়ের সাহায্যে ৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় সর্ব্বাগ্রে চণ্ডীদাসের পদ সংগ্রহ করিয়া সাধারণের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার পর শ্রীযুক্ত অক্ষয়বাবু ও রমণীবাবু যথাক্রমে "প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ" ও "চণ্ডীদাস" নাম দিয়া দুইটি পৃথক্ সংস্করণ বাহির করেন। রমণীবাবুর সংস্করণে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক পদ স্থান পাইয়াছে। অধুনা শ্রীযুত নীলরতন বাবু ও শ্রীযুত শিবরতন বাবুর চেষ্টায় অনেক পদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। পুরাতন ও নূতন পদ লইয়া চণ্ডীদাসের পদসংখ্যা প্রায় ৯০০ হইবে। প্রথমতঃ ঐ সমুদয় পদের ভাষা চতুর্দ্দশ শতাব্দীর ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। পদগুলির ভাষা যে ক্রমে রূপান্তরিত হইয়া আসিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয়তঃ অপরের পদ যে কবিকুলরবি চণ্ডীদাসের পদাবলির মধ্যে প্রবেশলাভ করে নাই, তাহা কে বলিবে? কবির সমগ্র পদাবলি প্রকাশিত হইলে তখন তাহার সুমীমাংসা হইবে।"

শ্রীযুক্ত নীলরতন বাবু ও শ্রীযুক্ত শিবরতন বাবুর আবিষ্কৃত পদাবলি মুদ্রিত হইয়াছে কি না, বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় লিখেন নাই। কবির সমগ্র পদাবলির সম্বন্ধে সুমীমাংসাই যেন এখন অসম্ভব হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত চণ্ডীদাসের যে পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহারই সুমীমাংসা হইয়াছে কি? সুমীমাংসা হওয়া দূরে থাকুক, কি প্রণালী অনুসারে আমাদিগকে এ ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে, ইতিপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধেও কোন আলোচনা হইয়াছে বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়; অতএব আমরা সর্ব্বাগ্রে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

পদাবলির কৃত্রিমতা-নির্ণয়ের উপায়

আমাদিগের বিবেচনায় কোন্ পদ অকৃত্রিম ও কোন্ পদ কৃত্রিম ও প্রক্ষিপ্ত, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে নিম্নলিখিত কতিপয় স্থূল নিয়মের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

(১) কোনও পদ হস্তলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হইলেই, উহা অকৃত্রিম বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করা নিরাপদ্ নহে।

(২) "পদামৃতসমুদ্র," "পদকল্পতরু" প্রভৃতির প্রাচীন হস্তলিপি পুথিতে কোনও পদ প্রাপ্ত হইলে, তাহা অকৃত্রিম না হইলেও অন্ততঃ প্রাচীন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ স্থলেও "পদসমুদ্রের" * ন্যায় কোন কোন সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রমাণ নিতান্ত সন্দিগ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

* "পদসমুদ্র" নামক হস্তলিখিত পুঁথির স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় হারাধন ভক্তিনিধি স্বার্থ কিংবা পরার্থ কিছুর জন্যই তাঁহার সেই পুঁথি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়দিগকে দেখাইতে স্বীকৃত হন নাই বলিয়া তাঁহারা ঐ গ্রন্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছেন। আমরা স্বতন্ত্র কয়েকটি কারণে উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে না হউক, অন্ততঃ উহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ১৩১৬ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ২য় সংখ্যায় এই প্রবন্ধের প্রথমাংশে ৮৩।৮৪ পৃষ্ঠায় "পদসমুদ্র" সম্বন্ধে আমাদিগের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(৩) হস্তলিখিত পুথির প্রমাণ হইতে পদাবলির ভাষাগত ও ভাবগত প্রমাণই অধিক বিশ্বাসযোগ্য ; অতএব ভাষাগত ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ (internal evidence) অনুসারে কোন পদ যদি কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে প্রাচীন হস্তলিখিত আদর্শ-পুথিতে তাহা বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাকে সন্দিগ্ধ পদাবলির মধ্যেই স্থান দিতে হইবে।

(৪) পদকর্ত্তার স্বহস্ত-লিখিত প্রামাণিক আদর্শ হস্তলিপি পুথির আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত অপরের লিখিত হস্তলিপি গ্রন্থে ভণিতা ইত্যাদি বিষয়ে পাঠভেদ দৃষ্ট হইলে, হস্তলিপি পুথিগুলির প্রাচীনতা ও শুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পাঠের মীমাংসা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান সময়ের আদর্শ অনুসারে পাঠের শুদ্ধতা কিংবা অশুদ্ধতার বিচার না করিয়া পদকর্ত্তার দেশ-কাল ও ভাষা অনুসারেই তাহা স্থির করিতে হইবে।

(৫) হস্তলিপি পুথির মতভেদস্থলে অধিকসংখ্যক অশুদ্ধ পুথির মত অপেক্ষা অল্প-সংখ্যক শুদ্ধ পুথির মতই বলবৎ গণ্য করিতে হইবে।

(৬) সমসংখ্যক তুল্য শুদ্ধ কিংবা তুল্য অশুদ্ধ পুথির মতবিরোধস্থলে বিভিন্ন স্থানের লিখিত অধিকাংশ পুথির মতেই নির্ভর করিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলির অনুসরণ করিয়া আমরা রমণীমোহন মল্লিক মহাশয়ের সম্পাদিত চণ্ডীদাসের পদাবলির * প্রামাণিকতার বিচার করিব।

বলা বাহুল্য যে, রমণীবাবুর সংগৃহীত সমুদায় পদাবলিই তিনি সম্ভবতঃ কোন না কোন অখণ্ডিত কিংবা খণ্ডিত হস্তলিখিত পুথিতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রথম নিয়ম অনুসারে ঐ সকল পদই তুল্যরূপ অকৃত্রিম বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তাঁহার সংস্করণের নায়িকার পূর্ব্বরাগবিষয়ক ১।২।৪।৮।৯।১০।১২ সংখ্যক পদগুলি "পদকল্পতরু" গ্রন্থের (ক) ও (খ) চিহ্নিত হস্তলিখিত পুথিতে ও মুদ্রিত পুস্তকে পাওয়া যায়। যদিও এই পদগুলি প্রাচীনতর সংগ্রহ-গ্রন্থ রাধা-মোহন ঠাকুরের "পদামৃত-সমুদ্রে" উদ্ধৃত হয় নাই, তথাপি পদ-গুলির ভাষা চণ্ডীদাসের অন্যান্য নিঃসন্দিগ্ধ উৎকৃষ্ট পদাবলির অনুরূপ এবং উহাতে চণ্ডীদাসের প্রধান বিশেষত্ব ভাবের প্রগাঢ়তা লক্ষিত হয় ; অতএব আমরা এই পদগুলি অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ৩ সংখ্যক সংগৃহীত পদটি "পদামৃতসমুদ্র" কিংবা পদকল্পতরুতে পাওয়া না গেলেও ঐ পদটির ভাষা ও ভাব চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদের অনুরূপ।

নায়িকার পূর্ব্বরাগের পদ

"জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হয়েছে সুধাময়।

* রমণীবাবুর সংগৃহীত পদাবলির উপরে সংখ্যানির্দ্দেশক অঙ্ক নাই ; আমরা আলোচনার সুবিধার জন্য তাহাতে ১।২।৩ ইত্যাদি সংখ্যা দিয়া লইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, ঐ সংস্করণের প্রত্যেক পদের প্রথম ছত্র ও পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশ করিয়া বুঝাইতে হইলে অনর্থক অনেক স্থান নষ্ট হয়।

নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয় ॥”

অল্প কথায় এইরূপ গভীর প্রেমোল্লাস ব্যক্ত করিতে চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কেহই নাই। ৫।৬।৭ সংখ্যাক পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট কবিতার আদর্শ না হইলেও ভাষা ও ভাবে তাঁহার অযোগ্য নহে; অতএব ঐগুলিও অকৃত্রিম বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। ১০ সংখ্যক পদটির সহিত ১১ সংখ্যক পদের ভাষা ও ভাবের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ১১ সংখ্যক পয়ারের পদটিকে ১০ সংখ্যক ত্রিপদী পদের সংক্ষিপ্ত বাক্যান্তর (Paraphrase) বলা যাইতে পারে। একই ভাবের এরূপ একাধিক পদের দৃষ্টান্ত পদাবলি-সাহিত্যে বিরল নহে। সুতরাং যখন ভাষা ও ভাবে এই পদটিকে চণ্ডীদাসের অযোগ্য বিবেচনা করা যায় না, এরূপ অবস্থায় ইহাকে কৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না। ১৩।১৪।১৫।১৬ সংখ্যক পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য না হইলেও তাহা কৃত্রিম বলিয়া মনে করার কারণ নাই।

নায়কের পূর্ব্বরাগের পদ

রমণীবাবুর সংগৃহীত নায়কের পূর্ব্বরাগবিষয়ক পদাবলির আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহার ১৭।১৮।১৯।২০।২৩।২৬ সংখ্যক পদগুলি “পদামৃতসমুদ্র” কিংবা “পদকল্পতরু” গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। ঐগুলি চণ্ডীদাসের চল-সই পদ। তাহাতে কৃত্রিমতার কোন চিহ্ন আমরা পাই নাই। রমণী বাবুর সংগৃহীত ২১।২২।২৪।২৫।২৮ সংখ্যক প্রসিদ্ধ পদগুলি পদকল্পতরুগ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদগুলি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। ইহাতে শ্রীরাধার অতি স্বাভাবিক ও মনোহর প্রাঞ্জল রূপ-বর্ণনার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নবানুরাগের চাঞ্চল্য ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত চিত্রিত হইয়াছে।

গোষ্ঠ-বিহারবিষয়ক পদ

রমণী বাবুর সংগৃহীত গোষ্ঠ-বিহারবিষয়ক পদাবলির মধ্যে ৩১।৩২ সংখ্যক পদ দুইটি “পদামৃত-সমুদ্র” কিংবা “পদকল্পতরু” গ্রন্থে উদ্ধৃত না হইলেও তাহাতে কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই; কিন্তু বিশিষ্ট কারণে ৩৩ সংখ্যক পদটি কৃত্রিম বলিয়াই আমরা স্থির করিয়াছি। প্রথমতঃ চণ্ডীদাসের পদাবলির স্থানে স্থানে আরবি, ফারসী ও মৈথিল শব্দ থাকিলেও তিনি কোনও স্থলে মৈথিলি কারক-বিভক্তি কিংবা ক্রিয়া-বিভক্তির ব্যবহার করেন নাই; সুতরাং তাঁহার পদ যে খাঁটি বাঙ্গালার পদ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। ৩৩ সংখ্যক পদটির ভাষা যে ব্রজবুলি অর্থাৎ মিশ্র-মৈথিলী, তাহা নিম্নলিখিত পংক্তি-গুলি দৃষ্টি করিলেই প্রতীতি হইবে। যথা;—

“ঘনশ্যাম-শরীর, কেলিরস, যমুনাক তীর, বিহার বণি”, কত যন্ত্র সুতান, কলারস গান, বাজায়ত মান করি সুমেল,” “কেহ প্রেমক আনন্দে বোল কহে” ষষ্ঠী বিভক্তির সূচক ‘ক’ বিভক্তি (‘যমুনাক’ ‘প্রেমক’) ও ‘বণি’ ‘বাজায়ত’ প্রভৃতির ন্যায় ক্রিয়া-পদের দৃষ্টান্ত আমরা চণ্ডীদাসের অকৃত্রিম পদাবলিতে পাই নাই। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ

মহাশয় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" নামক অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পরিচয়-প্রসঙ্গে ঐ পুথির বিভিন্ন অধ্যায় হইতে ১৮টি পদ উদ্ধৃত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন যে, "কৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের ভাষা বিচিত্র; উহাতে মৈথিল-প্রভাব সমধিক প্রবল। এরূপ প্রাকৃতশব্দ-বহুল বাঙ্গালা পুস্তক আর আছে কি না, আমাদের জানা নাই। পুথিখানির বর্ণ-বিন্যাস-প্রণালীতেও কিছু বিশেষত্ব আছে। আমরা বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-গ্রন্থের ভাষা বিচিত্র, প্রাকৃত-শব্দ-বহুল, মৈথিল-প্রভাব-বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্রবর্ণ-বিন্যাসসমন্বিত হইলেও ঐ গ্রন্থের ভাষা যে বাঙ্গালা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ গ্রন্থের কারক-বিভক্তি ও ক্রিয়া-বিভক্তির সহিত আধুনিক বাঙ্গালা কারক ও ক্রিয়াবিভক্তির যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও তাহা মৈথিল কি হিন্দী ভাষার অনুরূপ নহে। ষষ্ঠীসূচক 'এর' বিভক্তির পরিবর্ত্তে তাহাতে কুত্রাপি মৈথিল 'ক' কিংবা হিন্দী 'কা' ব্যবহৃত হয় নাই। যদিও "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র—"লক্ষ্মীক বুলিল দেবগণে", "মায়ক বুলিল আইহনে" (অর্থাৎ আয়ানে), "হাটেক না জাইব", "চিরদিন মথুরাক না জাহাল", "তাক উপেখহ", "তোহ্মাক লিখিআঁ কাহ্ন মদনরূপ" ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয়া-সূচক 'কে' বিভক্তির পরিবর্ত্তে যদিও ব্রজবুলির ন্যায় 'ক' বিভক্তির ব্যবহার দেখা যায়, কিন্তু তাহা ব্রজবুলির নিজস্ব নহে। পাবনাজেলায় এখন পর্য্যন্ত দ্বিতীয়ার 'কে' বিভক্তির পরিবর্ত্তে 'ক্', কথিত ভাষায়, এমন কি, অল্পশিক্ষিত লোকের লিখিত ভাষায় পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা,—"সে আমাকে বলিল" স্থলে "সে আমাক্ বলিল", "আমাদিগকে দাও" স্থলে "আমাদেক্ দেও" ইত্যাদি। আধুনিক "হইনু," "যাইনু" প্রভৃতি শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা প্রাচীন পদাবলিতে প্রায় সর্ব্বত্রই "হইলুঁ" "যাইলুঁ" প্রভৃতি রূপ দৃষ্ট হয়। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে "হইল" ও "হইলুঁ" স্থলে "ভৈল" ও "ভৈলোঁ" রূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহাকে মৈথিল-প্রভাব না বলিয়া বাঙ্গালা 'হইল' ও 'হইনু' শব্দের পুরাতন রূপ বলাই সঙ্গত। কারণ, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা প্রাচীন মৈথিল ভাষা হইতে উৎপন্ন হয় নাই। অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তির স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় সমকালেই প্রাকৃত ভাষা হইতে হিন্দী, মৈথিল, বাঙ্গালা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং ঐ সকল ভাষার মধ্যে শব্দ কিংবা বিভক্তি-গত সাদৃশ্য দেখিতে পাইলে তাহাকে অনুকরণ বলিয়া মনে না করিয়া ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম (Phonetic Law) অনুসারে তাহার উৎপত্তির কারণ নিরূপণ করার চেষ্টা করাই সঙ্গত। সে যাহা হউক, ষষ্ঠীসূচক 'এর' বিভক্তির স্থলে 'ক' বিভক্তির ও "বাজায়ত" শব্দের ন্যায় ক্রিয়া-বিভক্তির দৃষ্টান্ত আমরা চণ্ডীদাসের পদাবলি কিংবা "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন" গ্রন্থে কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নাই; অতএব ১৩ সংখ্যক পদটিকে আমরা কোনমতেই অকৃত্রিম বলিয়া মনে করিতে পারি না।

রমণী বাবুর সংগৃহীত "রাই-রাখাল", "শ্রীবলরামের রূপ" ও "প্রৌঢ়ার উক্তি"বিষয়ক ৩৪—৪২ সংখ্যক পদগুলি "পদামৃত-সমুদ্র" কিংবা "পদকল্পতরু" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। ঐ পদগুলি চল-সই রকমের। উহাতে কৃত্রিমতার কোন লক্ষণ আমরা পাই নাই।

শ্রীকৃষ্ণের "আপ্তদূতী"বিষয়ক ৪৩।৪৪ সংখ্যক পদ দুটি প্রসিদ্ধ। উহা "পদামৃত-সমুদ্র" ও "পদকল্পতরু" উভয় গ্রন্থেই উদ্ধৃত হইয়াছে। এই পদ দুটির প্রধান বিশেষত্ব উহাদিগের ছন্দে।

"সে যে নাগর গুণধাম।
জপয়ে তোহারি নাম॥"

ইত্যাদি ৪৩সংখ্যক পদের সকল পংক্তিতেই আটটি অক্ষর আছে; কেবল প্রথম পংক্তিতেই একটি অক্ষর বেশী আছে; তজ্জন্য পড়িতে ছন্দঃপতন হয়। আমাদের বিবেচনা হয়, ঐ পংক্তির 'যে' শব্দটি প্রক্ষিপ্ত। উহা না থাকিলেও অর্থের কোন ক্ষতি হয় না, বরং অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়মানুসারে শুদ্ধ হয়। কারণ, "যে" শব্দ থাকিলেই পরে পুনরায় "সে" শব্দের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। এই ছন্দটিকে আট অক্ষরী পয়ার নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। "এ ধনি এ ধনি বচন শুন" ইত্যাদি ৪৪ সংখ্যক পদটির প্রত্যেক পংক্তি ১১ অক্ষরে গ্রথিত। ইহাকে পরবর্ত্তী সময়ে কবিবর ভারতচন্দ্র "একাবলী ছন্দ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। "একি লো মালিনি কি তোর রীতি। কিঞ্চিত হৃদয়ে না হল ভীতি॥" ইত্যাদি ভারতচন্দ্রের সুললিত ছন্দের আদর্শ চণ্ডীদাসের এই একাবলীর পদ বটে। ভারতচন্দ্রের উক্ত একাবলীর কবিতাটি কামিনীর কল-কণ্ঠ সঙ্গীতের ন্যায় শ্রুতি-সুখকর হইলেও চণ্ডীদাসের "এ ধনি এ ধনি বচন শুন। নিদান দেখিয়া আইনু পুন॥" ইত্যাদি পদের বিষয় ও কবিত্ব যে তদপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য।

চণ্ডীদাসের আট অক্ষরী পয়ার

চণ্ডীদাসের একাবলী ছন্দ

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যবিষয়ক ৪৫—৬১ সংখ্যক পদগুলির মধ্যে ৪৫। ৪৬। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪।৫৭। ৫৮।৬০ সংখ্যক পদগুলি "পদামৃত-সমুদ্রে" নাই; কিন্তু "পদকল্পতরু" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। তবে তাহাতে ৫৩ ও ৫৪ সংখ্যক পদ স্বতন্ত্র পদ নহে;—৫৪ সংখ্যক পদটি ৫৩ সংখ্যক পদেরই শেষাংশরূপে লিখিত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন ৫৩ সংখ্যক পদের "কেবল একান্ত ধন্বন্তরি" ইত্যাদি ধুয়া সহিত তিনটি কলি ও ভণিতার "চণ্ডীদাস" শব্দটি পদকল্পতরুতে পরিত্যক্ত হইয়াছে। * শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের অবশিষ্ট পদগুলি "পদামৃতসমুদ্র" কিংবা "পদকল্পতরু"গ্রন্থে উদ্ধৃত না হইলেও সেইগুলির ভাষা ও ভাব চণ্ডী-

শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যবিষয়ক পদ

* ৫৩ সংখ্যক পদের ভণিতা "চণ্ডীদাস কহে হাসি" স্থলে পদকল্পতরুতে "মনের হরিষে ভাসি" পাঠ দৃষ্ট হয়।

দাসের পদেরই অনুরূপ বটে। অতএব আমরা ঐ পদগুলিকে অকৃত্রিম বলিয়াই বিবেচনা করি। কেবল—

চণ্ডীদাসের ভাবের প্রগাঢ়তা

"না ভাঙ্গিল মান দেখি চতুর নাগর।
বিশাখারে ডাকি কহে বচন উত্তর॥
শুনহ আমার কথা বিশাখা সুন্দরী।
আমারে সাজায়ে দেহ নবীন এক নারী॥

ইত্যাদি ৪৯ সংখ্যক পদটি ভ্রমক্রমে স্বয়ং দৌত্যের পদের মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগের পরেই স্বয়ং দৌত্য; তখন পর্য্যন্ত প্রণয়ি-যুগলের সম্ভোগ-মিলন ঘটে নাই; কিংবা মানেরও কারণ উপস্থিত হয় নাই। অতএব এই পদে বর্ণিত নাপিতানীর বেশে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীরাধার মানভঞ্জনের বিবরণের সহিত স্বয়ং দৌত্যের ৫০ সংখ্যক পদের—

"ধরি নাপিতানী-বেশ　　মহলেতে পরবেশ
সেখানেতে বসিয়াছে রাই।
হাতে দিয়া দরপণী　　খোলে নখ-রঞ্জনী
বোলে বৈস দেই কামাই॥"

ইত্যাদি বিবরণের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় পদের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ আছে। মানভঞ্জনের পদে শ্রীকৃষ্ণ—

"চূড়া ধড়া তেয়াগিয়া কাঁচলি পরিল।
নাপিতানী-বেশ ধরি নাগর দাঁড়াইল॥
*　　*　　*　　*
কি লাগিয়া ধূলায় পড়ি বিনোদিনী রাই।
হের আইস তুয়া পায়ে যাবক পরাই॥
চরণমুকুরে শ্যাম নিজমুখ দেখে।
যাবকের ধারে ধারে নিজ নাম লেখে॥
সচকিত হৈয়া ধনী চরণপানে চায়।
আচম্বিতে শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ কেন পায়॥
ইঙ্গিতে কহিল তখন বিশাখা সুন্দরী।
নাপিতানী নহে তোর নাগর বংশীধারী॥
বাহু পসারিয়া নাগর রাই নিল কোলে।
আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে॥"

স্বয়ং দৌত্যে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ নাপিতানীর ছদ্মবেশে শ্রীরাধার পদতলে অলক্তক-রচনার ছলে নিজের নাম চিত্রিত করিয়া—

"নাপিতানী বলে ধনি দেখহ চরণখানি
ভাল মন্দ করহ বিচার।
দেখি সুবদনী কহে কি নাম লিখিলা ওহে
পরিচয় দেহ আপনার ॥"

নাপিতানী-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ কৌশলপূর্ণ বাক্যে পরিচয় দিয়া যখন নিজের পারিশ্রমিক-স্বরূপ "পরশরতন" যাচ্ঞা করিলেন, তখন—

"হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গোরী।
ভাল নাপিতানী পরাণ-চোরী ॥
পরশরতন পাইবা বনে।
এখনে চলহ নিজ ভবনে ॥"

সহৃদয় পাঠকবর্গ উভয় পদের বর্ণিত অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টি করুন; মানের পদে যদিও শ্রীরাধা মানিনী ও প্রেমাপরাধী শ্রীকৃষ্ণ উপায়ান্তরের অভাবে কৌশলক্রমে শ্রীরাধার মানাপনয়ন করিতে প্রবৃত্ত, কিন্তু প্রেমাস্পদের অঙ্গস্পর্শে প্রেমিকা-শিরোমণি শ্রীরাধা কি স্থির থাকিতে পারেন? তিনি প্রিয়স্পর্শে সচকিতা হইয়া অনন্যবেদ্য শ্যাম-অঙ্গের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে সন্দেহবিমূঢ়া হইয়া উঠিলেন। তখন প্রিয়সখী বিশাখা শ্রীরাধার সেই উদ্বিগ্ন ভাব দেখিয়া ইঙ্গিতে প্রকৃত অবস্থা বুঝাইয়া দিল। সে সময়ে শ্রীরাধার যে মানসিক অবস্থা, তাহা বর্ণনীয় নহে; মহাকবি একটিমাত্র বাক্যদ্বারা সেই ভাবটি আভাসে বুঝাইয়াছেন; শ্রীরাধা প্রেমোচ্ছ্বাসে সকল কথা বিস্মৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে বাহুপাশে বেষ্টিত করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন; তাঁহার প্রাণের কথা প্রাণেই রহিল,—মুখে বলিতে সাধ্য হইল না; কিন্তু এই অতুলনীয় প্রেমলীলার দ্রষ্টা, প্রেমের ঋষি চণ্ডীদাস শ্রীরাধার হইয়া জগতের নিকট সেই মর্ম্মকথাটি বলিয়া দিলেন—

"আর না করিব মান চণ্ডীদাসে বলে।"

স্বয়ং দৌত্যের উদ্ধৃত পদে প্রেমের এই প্রগাঢ়তা—এই সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি কোথায়? সেখানে অবস্থানুসারে যাহা সম্ভবপর, তাহাই কবি দেখাইয়াছেন। উহাতে প্রণয়ি-যুগলের প্রেম-কৌশল ও অতৃপ্ত প্রণয়াকাঙ্ক্ষাই পরিব্যক্ত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস প্রেমবৈচিত্ত্যের পদের বিরোধী

রমণীবাবুর সংস্করণের ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদগুলি 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' নামে অভিহিত হইয়াছে। 'প্রেম-বৈচিত্ত্য' শব্দটি শ্রীরূপ গোস্বামি-প্রণীত "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক সুপ্রসিদ্ধ রস-গ্রন্থের ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দ। শ্রীপাদ গোস্বামী মহোদয় তাহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা,—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তং প্রেম-বৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥"

"ভক্তমাল" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস ইহার মর্ম্মানুবাদ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"প্রিয়ের নিকটে বসি প্রেমময়ী ধনী।
প্রেমের বিহ্বলে প্রিয় কোথা মনে গণি ॥
চৌদিকে নেহারি কান্দে বিরহ-হুতাশে।
প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহ হেরি হরি হাসে ॥"

আপাততঃ সাধারণ পাঠকের নিকট এই বিষয়টি অসম্ভবপর ও কবি-সুলভ অতিশয়োক্তি বলিয়াই বিবেচনা হইতে পারে ; কিন্তু মহাভাবময়ী শ্রীরাধার পক্ষে ইহা কিছুই অসম্ভবপর নহে। প্রিয়-বিরহে প্রেমিকার লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, কৃশতা, জড়তা, ব্যাকুলতা, ব্যাধি, উন্মত্ততা, মোহ ও মৃত্যু, এই রস-শাস্ত্রোক্ত দশটি অবস্থা যে ঘটিতে পারে, বোধ হয় তাহাতে কাহারও সন্দেহ হইবে না। প্রেমের আতিশয্যেও একরূপ মোহ বা মূর্চ্ছার ন্যায় ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রেমিক ভক্তদিগের 'দশা' ও যোগীদিগের 'সমাধি' অনেক পরিমাণে এইরূপ বটে। এ অবস্থাকে দুঃখের অবস্থা বলা যাইতে পারে না, বোধ হয় সুখেরও বলা যায় না, ইহাকে সুখ-দুঃখের অতীত আনন্দময় প্রেম-তন্ময়তার অবস্থা বলাই অধিক সঙ্গত। তাই "প্রেম-বৈচিত্ত্য ইহ হেরি হরি হাসে।" সে যাহা হউক, এই প্রেম-বৈচিত্ত্যের সহিত রমণীবাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক তথাকথিত প্রেমবৈচিত্ত্যের পদগুলির কোন সংস্রব নাই। এই সকল পদের কোন স্থানে আভাসেও এই "প্রেমবৈচিত্ত্য" সূচিত হয় নাই ; সুতরাং রমণীবাবু "ভক্তমাল" হইতে যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়াও যে কি জন্য তাহার উদাহরণ সম্বন্ধে এরূপ ভ্রান্ত হইয়াছেন, আমরা বুঝিতে পারি না। প্রেমবৈচিত্ত্যের পদের সংখ্যা যে কারণেই হউক, পদাবলি-সাহিত্য বড় কম। পদকল্পতরু গ্রন্থের তৃতীয় শাখায় নবম পল্লবে শ্রীরাধার প্রেমবৈচিত্ত্যবিষয়ক নয়টি ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমবৈচিত্ত্যবিষয়ক ৪টি মোটে ১৩টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে; উহার একটিও চণ্ডীদাসের রচিত নহে। বস্তুতঃ "পদামৃত-সমুদ্র", "পদকল্পতরু" কিংবা রমণীবাবুর সংগৃহীত চণ্ডীদাসের পদাবলি-গ্রন্থে আমরা বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়াও চণ্ডীদাসের কোন প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ প্রাপ্ত হই নাই। ইহার কি কারণ আছে, চিন্তা করিতে যাইয়া আমরা চণ্ডীদাসের বর্ণিত প্রেমলীলার একটি নিগূঢ়তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমরা অমূলক কল্পনাপ্রিয় বলিয়া উপহাস্যাস্পদ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

চণ্ডীদাস ভাবের প্রগাঢ়তার জন্যই অধিক প্রসিদ্ধ ; আবার প্রেমবৈচিত্ত্য সর্ব্বাপেক্ষা ভাব-প্রগাঢ়তাই সূচনা করিয়া থাকে ; এরূপ অবস্থায় চণ্ডীদাস যে কি জন্য তাঁহার কাব্যের একান্ত উপযোগী এই বিষয়টি পরিত্যাগ করিবেন, তাহা আপাততঃ নিতান্তই দুর্বোধ্য বিবেচনা হয়। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলি অভিনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, চণ্ডীদাস শুধু প্রেমের জন্যই প্রেমিক ছিলেন ; তিনি প্রেমের লাভ-লোকসান কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না ; প্রেমের জন্য সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া, সকল প্রকার গ্লানি ও দুঃখ সহিয়া শুধু প্রেমের সাধনায়ই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। তিনি আদর্শ-প্রেমিকা শ্রীরাধাকেও সেই ভাবেই

চিত্রিত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রেণীর প্রেমিক ভক্তদিগের কথা মনে করিয়াই বলিয়াছেন, -

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ আমার সেবা ব্যতীত আমার ভক্তগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য কিংবা সারূপ্য এই চতুর্বিধ মুক্তি তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেও গ্রহণ করেন না। প্রণিধান করিলে বুঝা যাইবে যে, "প্রেম-বৈচিত্ত্য" কিংবা সমাধিতে * প্রেমিক ও প্রেমিকার—উপাস্য ও উপাসিকার দ্বৈত-জ্ঞান অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও অন্তর্হিত হয়; সে সময়ে বাহ্য-জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় কখনও প্রণয়িযুগল পরস্পরের নিকটে থাকিয়াও বিরহ-ভাবনায় ব্যাকুল হন, কখনও বা নিজকেই নিজের প্রণয়ভাজন বলিয়া মনে করেন। শেষোক্ত অবস্থার বর্ণনা করিতে যাইয়া জয়দেব গোস্বামী গাহিয়াছেন—

"তব বেশ আভরণ
ধরি রাধা অনুক্ষণ
ভাবে মনে এবে যেন
হয়েছে মধুসূদন"; †

বিদ্যাপতির—

"মাধব মাধব অনুখণ সোঙরিতে
সুন্দরী ভেল মাধাই।
সো নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
তছু গুণে মনে লুবুধাই॥"

ইত্যাদি পদ্যাংশে ঠিক এই অদ্বৈতজ্ঞানেরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় প্রেমিক ও প্রেমিকার—উপাস্য ও উপাসিকার দ্বৈতভাব বিলুপ্ত হওয়ায় প্রেমিক উপাসক প্রাণ ভরিয়া প্রণয়ী উপাস্যের প্রিয়-কার্য্য সাধন অর্থাৎ সেবা করিতে পারেন না। প্রেমিক-চূড়ামণি চণ্ডী-দাস ক্ষণকালের জন্যও এই সেবাব্রত-ভঙ্গ সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়াই বোধ হয়, তিনি

* আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, প্রেম-বৈচিত্ত্যে প্রিয়-সমাধি বা প্রিয়-তন্ময়তা নাই; কারণ, তাহা থাকিলে প্রিয়তমের বিরহ-জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? কিন্তু প্রিয়-তন্ময়তাজাত বিহ্বলতা হইতেই যে এইরূপ ভাবের উৎপত্তি হয়, তাহা "উজ্জ্বল-নীলমণি" গ্রন্থের টীকায় শ্রীমৎ জীবগোস্বামী ও শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন।

† শ্রীগীতগোবিন্দের মৎকৃত পদ্যানুবাদ—১৩৭ পৃষ্ঠা।

প্রেম-বৈচিত্ত্যের পদ রচনা করেন নাই ; আর সেই জন্যই বোধ হয় পরবর্ত্তী পদাবলি-সাহিত্যে প্রেমবৈচিত্ত্য-বিষয়ক পদের সংখ্যা এত অল্প।

রমণীবাবুর সংগৃহীত ৬৬ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদগুলি সমস্তই আক্ষেপানুরাগের পদ বটে। "উজ্জ্বল-নীলমণি" গ্রন্থে অনুরাগের নিম্নলিখিত লক্ষণ দৃষ্ট হয়। যথা,—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥

অর্থাৎ যে প্রেম নিত্য নবীনভাব ধারণ করিয়া, সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়কেও নব অর্থাৎ অননুভূতের ন্যায় আকাঙ্ক্ষার বস্তু করিয়া তুলে, তাহাকেই অনুরাগ বলা যায়। 'রূপানুরাগ', 'আক্ষেপানুরাগ,' 'অভিসারানুরাগ'ভেদে অনুরাগ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত।

আক্ষেপানুরাগ নানাবিধ ; যথা,—

চণ্ডীদাসের অনুরাগের পদ

"কৃষ্ণস্য মুরলীঞ্চৈব আত্মানঞ্চ সখীন্ প্রতি।
দূত্যাং ধাতরি কন্দর্পে তথা গুরুগণাদিষু॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, বংশী, নিজে, সখীগণ, দূতী, বিধাতা, কন্দর্প এবং গুরুজন যথাক্রমে আক্ষেপের বিষয় বটে। "পদকল্পতরু" প্রভৃতি প্রাচীন সংগ্রহ-গ্রন্থে ঠিক পূর্ব্বোক্ত ক্রম অনুসারেই রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারানুরাগের পদাবলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির পদাবলির আধুনিক সম্পাদকগণ প্রায় কেহই সেই পর্য্যায় রক্ষা করেন নাই ; সুতরাং রমণীবাবুকে এ জন্য অধিক দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। প্রেম-বৈচিত্ত্য অধ্যায়ে সন্নিবেশিত ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদগুলি সমস্তই আত্মপ্রতি আক্ষেপানুরাগের পদ বটে।

রমণীবাবু ইহার পরে তাঁহার সংস্করণে সম্ভোগ-মিলন ও রসোদ্গারের কতকগুলি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন ও তৎপরে 'অনুরাগ—নায়ক-সম্বোধনে', 'অনুরাগ—সখী-সম্বোধনে' ও 'অনুরাগ—আত্মপ্রতি' শিরোনাম দিয়া ১০৩ হইতে ২০৩ সংখ্যক পদ পর্য্যন্ত অনুরাগের আরও এক শত একটি পদ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আমরা সুবিধার জন্য আগে সেই পদগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া পরে "সম্ভোগ-মিলন" ও "রসোদ্গার" বিষয়ক পদাবলির সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিব।

আমরা দেখিয়াছি যে, রসশাস্ত্র অনুসারে অনুরাগ—রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগ ও অভিসারানুরাগ-ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আক্ষেপানুরাগ আবার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, বংশীর প্রতি আক্ষেপ ইত্যাদি বিষয়ভেদে নানা প্রকার। রমণীবাবুর সংস্করণে

"কানড় কুসুম জিনি কালিয়া বরণখানি
তিলেক নয়নে যদি লাগে।
ছাড়িয়া সকল কাজ জাতি কুলশীল লাজ
মরিবে কালিয়া-অনুরাগে॥"

ইত্যাদি রূপানুরাগের প্রসিদ্ধ পদটিসহ আক্ষেপানুরাগের অবশিষ্ট পদগুলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, কাল্পনিক অধ্যায়ে বিভক্ত করা অসঙ্গত হইয়াছে। সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে হইলেই যে তাহা সখীর প্রতি আক্ষেপ হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। প্রকৃত-পক্ষে সখী-সম্বোধনে শ্রীরাধার—

"সজনি লো সই।
খানিক বৈসহ শ্যামের বাঁশীর কথা কই॥
শ্যামের বাঁশীটি দুপর্য্যা ডাকাতি
সরবস হরি নিল।
হিয়া দগদগি পরাণ পোড়নি
কেন বা এমতি কৈল॥"

ইত্যাদি পদগুলিতে বংশীর প্রতি আক্ষেপই পরিব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের পদাবলির ভবিষ্যৎ-সম্পাদকগণকে সতর্ক করার জন্যই আমরা এই কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

অনুরাগের পদে চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠত্ব বোধ হয় সর্ব্ববাদি-সম্মত। সরল ও মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে প্রাণের গভীর ব্যথা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতে বোধ হয়, চণ্ডীদাসের সমকক্ষ কোন কবি আমাদিগের দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দিতে হইলে বোধ হয়, তাঁহার অনুরাগের পদগুলিই যথেষ্ট হইতে পারে; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পদগুলির সাদাসিধা ভাব দর্শনে সাহস পাইয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কারণেই হউক, চণ্ডীদাসের অনুরাগের পদের মধ্যে কৃত্রিম পদ যত দৃষ্ট হয়, তত আর কোন স্থলেই দৃষ্ট হয় না।

চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত কৃত্রিম পদ

রমণীবাবুর সংস্করণে ভ্রমবশতঃ "প্রেমবৈচিত্ত্য" শিরোনামে যে ৬২ হইতে ৭৭ সংখ্যক পদ আছে, তাহার সকলগুলিই অতিপ্রসিদ্ধ আক্ষেপানুরাগের পদ বলিয়া "পদকল্পতরু"গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু রমণীবাবুর সংস্করণের ১০৩ হইতে ২০৩ পর্য্যন্ত ১০১ এক শত একটি অনুরাগের পদের মধ্যে ১০৫।১১০।১১১।১২২।১২৪।১২৬।১২৯।১৩০।১৩১।১৩২।১৩৩।১৩৪।১৩৫। ১৩৬।১৪০।১৪১।১৪২।১৪৬।১৪৭।১৪৮।১৪৯।১৫০।১৫১।১৫২।১৫৩।১৫৪।১৫৮।১৫৯।১৬২।১৬৩।১৬৪। ১৬৫।১৬৬।১৬৮।১৭০।১৭১।১৭৪।১৭৫।১৭৬।১৭৭।১৭৯।১৮০।১৮২।১৮৩।১৮৪।১৯০।১৯১।১৯২।১৯৩। ১৯৫।১৯৮।২০০।২০১।২০৩ সংখ্যক ৫৪টি পদ "পদকল্পতরু" গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত ১৬টি পদ সহ ১৬+১০১=১১৭টি পদের মধ্যে ১৬+৪৭ =৬৩টি পদ "পদকল্পতরু" গ্রন্থে পাওয়া যায়। "পদকল্পতরু" গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়াই বাকী পদগুলিকে কৃত্রিম বলা যাইতে পারে না। পদকল্পতরুর অনুদ্ধৃত পদের মধ্যে ১৫১।১৫২ সংখ্যক অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ পদ দুটি "পদামৃতসমুদ্র" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতে তদ্ভিন্ন চণ্ডীদাসের আর কোনও অনুরাগের পদই দৃষ্ট হয় না। সত্য বটে, রাধামোহন ঠাকুরের "পদামৃতসমুদ্র" আকারে পদকল্পতরুর চতুর্থ অংশের কিঞ্চিৎ অধিক

মাত্র এবং যে স্থলে পদকল্পতরু গ্রন্থে রাধামোহন ঠাকুরের কেবল উৎকৃষ্ট ১৮৭টি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে স্থলে পদামৃতসমুদ্রে তাঁহার স্বকৃত ২২৮টী পদ সন্নিবেশিত হওয়ায় স্থানাভাবে রাধামোহন ঠাকুর চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিখ্যাত পদ-কর্ত্তৃগণের অনেক উৎকৃষ্ট পদ উদ্ধৃত করিতে পারেন নাই, কিন্তু উক্ত গ্রন্থে চণ্ডীদাসের অনুরাগের পদের এরূপ অল্পতার উহাই বিশিষ্ট কারণ কি না, অথবা রাধামোহন ঠাকুর স্বভাবতঃ যুগল-মিলন-ভক্ত ছিলেন বলিয়া বিষাদপূর্ণ বিরহাত্মক আক্ষেপানুরাগের পদ ভালবাসিতেন না বলিয়াই চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ আক্ষেপের পদের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। আমাদিগের মতে শেষোক্ত কারণ ব্যতীত কেবল স্থানাভাবই এরূপ একটি ত্রুটির বিশিষ্ট কারণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বস্তুতঃ যে কারণেই পদামৃতসমুদ্রে উৎকৃষ্ট অনুরাগের পদগুলি সন্নিবেশিত না হইয়া থাকুক, সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট উহা যে ঐ গ্রন্থের একটি প্রধান অভাব বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। "পদকল্পতরু" গ্রন্থের পদসংগ্রহ যে পদামৃতসমুদ্র অপেক্ষা কত সুবহুল ও উপাদেয়, ইহা দ্বারা তাহাও কথঞ্চিৎ প্রমাণিত হইবে।

"পদামৃতসমুদ্রে" চণ্ডীদাসের অনুরাগের পদের অল্পতা

আমরা ইতিপূর্ব্বে সন্দিগ্ধ পদ-নির্ণয়ের জন্য যে কয়েকটি নিয়ম স্থির করিয়াছি, তাহার সর্ব্বপ্রধান নিয়মই হইল—ভাষা ও ভাবগত আভ্যন্তরীণ প্রমাণ। বস্তুতঃ কোন কবির ভাষা ও ভাব পুনঃপুনঃ বিশেষরূপে আলোচনা করিলে সহৃদয় পাঠকগণের হৃদয়ে সেই ভাষা ও ভাবের একটা ছাপ পড়িয়া যায়। ভণিতা গোপন করিয়াও যদি তাঁহাদিগকে ঐরূপ পরিচিত কবির কবিতা পড়িতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা অধিকাংশ স্থলেই তাঁহাদিগের মনোগত আদর্শের সহিত মিলাইয়া, উহা কোন্ কবির কবিতা, বলিয়া দিতে পারেন। মহাকবিগণের প্রায় সকলেরই নিজস্ব বিশেষত্ব থাকায় তাঁহাদিগের কবিতা চেনা অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য বটে। মহাকবি চণ্ডীদাসের পদেরও ঐরূপ একটি নিজস্ব বিশেষত্ব আছে; তাহা অনেক সময়েই সহজে অনুভব করা যায়, কিন্তু অন্যকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে গেলেই বিপদে পড়িতে হয়। যাঁহারা চণ্ডীদাসের কবিতার বিশেষজ্ঞ, তাঁহাদিগকে আমরা রমণীবাবুর সংগৃহীত ১২২।১৪০।১৭৫।১৭৯।১৮২।১৮৪।১৯১ সংখ্যক কৃত্রিম পদগুলি প্রণিধানসহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। এই পদগুলির ভাষা ও ভাব যে মহাকবি চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাহা স্থির করিতে তীক্ষ্ণ সমালোচনা-শক্তির আবশ্যক হয় না। ঐ পদগুলির প্রায় ছত্রে ছত্রেই কৃত্রিমতার চিহ্ন সুস্পষ্ট। দুঃখের বিষয় যে, স্থানাভাবে আমরা ঐ পদগুলি উদ্ধৃত করিয়া চণ্ডীদাসের অন্যান্য অনুরাগের পদের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে পারিলাম না। উৎকৃষ্ট পদের মধ্যে এরূপ অযোগ্য পদ সন্নিবেশিত হইলে, তাহা সহৃদয় পাঠকদিগের নিতান্তই অপ্রীতিকর হইয়া রসভঙ্গ করিয়া থাকে। এজন্যই প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ প্রভৃতি মহাকবি কালিদাসেরও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির ব্যাখ্যা করেন নাই এবং উহা সকল উৎকৃষ্ট সংস্করণেই পাদ-টীকায় কিংবা পরিশিষ্টে তুলনার জন্য সংযোজিত

অনুরাগের কৃত্রিম পদ

হইয়াছে। ভরসা করি, বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলির ভবিষ্যৎ সংস্করণেও সেই প্রকৃষ্ট রীতিই অবলম্বিত হইবে। রমণীবাবুর সংস্করণের ১৫৫ সংখ্যক—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

ইত্যাদি সর্ব্বজনবিদিত বিখ্যাত পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে জ্ঞানদাসের ভণিতা দৃষ্ট হয়। পদটি অতি সুন্দর। ইহা যদি প্রকৃতপক্ষেই জ্ঞানদাসের রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি যে চণ্ডীদাসের অযোগ্য শিষ্য নহেন, এই একটি পদই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

সম্ভোগ ও কুঞ্জ-ভঙ্গ

রমণীবাবুর সংস্করণে ৭৮ হইতে ৯৪ সংখ্যক সম্ভোগের পদ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চণ্ডীদাসের পদে আদিরসাত্মক বিপ্রলম্ভ যেরূপ অপূর্ব্বভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সম্ভোগ সেরূপ নহে। যে বিরহ-তন্ময়তাহেতু সমস্ত জগৎ প্রিয়ময় হইয়া যায়, সেই বিরহ বৈষ্ণব কবিগণের যেরূপ প্রিয়, সম্ভোগ সেরূপ নহে। তবে অবশ্যই ব্রজলীলার সর্ব্বাঙ্গীনতা রক্ষার জন্য বৈষ্ণব কবিগণ যথাস্থলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের সম্ভোগবিষয়ক পদের সহিত চণ্ডীদাসের এই শ্রেণীর পদের তুলনা করিলে দেখা যায়, যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত কবিগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গীতগোবিন্দের অনুকরণে সম্ভোগবর্ণনার কোন অঙ্গই অপরিস্ফুট রাখেন নাই, সে স্থলে চণ্ডীদাস কেবল শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণিত রাসলীলার ন্যায় আভাসে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ-লীলা বর্ণনা করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। চণ্ডীদাসের "শরদ পূর্ণিমা নিরমল রাতি" ও "রমণীমোহন বিলসিতে মন হইল মরমে পুনি" ইত্যাদি ৭৮ ও ৭৯ সংখ্যক পদ দুটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাসলীলাবিষয়ক কতিপয় শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ বলিলেও বলা যাইতে পারে। "আজুক শয়নে, ননদিনী সনে, শুতিয়া আছিনু সই", "আর একদিন সখি শুতিয়া আছিনু", "পরাণ বন্ধুকে স্বপনে দেখিনু" ইত্যাদি ৮১।৮২।৮৩।৮৪।৮৫।৮৬।৮৭।৮৮। ৮৯।৯০ সংখ্যক পদগুলি প্রকৃতপক্ষে রসোদ্গারের পদ; তাহা যে কি জন্য রমণীবাবু সম্ভোগ-মিলনের পদের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি না। ৮০ সংখ্যক—

"কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে।"

ইত্যাদি পদটি সখীর উক্তি পূর্ব্বরাগের পদ; ভ্রমক্রমে সম্ভোগ-মিলনে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটির ভণিতা দৃষ্ট হয় না; পদটি সন্দিগ্ধ। "আজু কে গো মুরলী বাজায়" ইত্যাদি সম্ভোগ-মিলনের যে প্রসিদ্ধ পদটি "ভাবী গৌরচন্দ্র"রূপে গ্রন্থারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে দিলেই ভাল হইত।

"একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।
ঠেকিল বিষম প্রেমে কত সবে জ্বালা॥"

ইত্যাদি ৯৪ সংখ্যক বিখ্যাত পদটি প্রকৃতপক্ষে সখীর উক্তি পূর্ব্বরাগের পদ বটে; তাহা ভ্রম-বশতঃ রমণীবাবু সম্ভোগ-মিলনের শেষপদরূপে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। নবানুরাগ-জনিত দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতায় প্রণয়ি-হৃদয়ের যে কিরূপ দুঃসহ অবস্থা ঘটে, এই পদটিতে তাহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

"অকথন বেয়াধি এ কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়।
সোনার পুতলী যেন ভূমেতে লুটায়॥
পুছয়ে কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি॥"

ইত্যাদি পংক্তিগুলিতে শ্রীরাধার যে ভাবগম্য করুণমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অন্তরঙ্গ ভক্তদিগের জনে জনের হাত ধরিয়া আকুল-ক্রন্দনে তাহার সত্যতা প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

রমণীবাবুর সংস্করণের "বাসক-সজ্জা", "বিপ্রলব্ধা" ইত্যাদি বিষয়ক ২০৪ হইতে ২২৪ সংখ্যক পদগুলির সম্বন্ধে মাত্র ইহাই বক্তব্য যে, খণ্ডিতা শ্রীরাধার "ভাল হৈল আরে বঁধু আইলা সকালে", ছুঁইও না ছুঁইও না বঁধু ঐখানে থাক," "হেদে হে নিলাজ বঁধু লাজ নাহি বাস" প্রভৃতি পদগুলিতে চণ্ডীদাস সরল ও মর্ম্মস্পর্শী বাক্যে শ্রীরাধার যে তীব্র বিদ্রূপাত্মক মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার তুলনা পদাবলি-সাহিত্যে বিরল।

রমণীবাবুর সংস্করণের ২২৫—২৩৭ সংখ্যক "মান" ও "কলহান্তরিতার" পদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ২২৫ সংখ্যক—

"রামা হে, কি আর বলিব আন।
তোহারি চরণে　　শরণ সো হরি
অবহুঁ না মিটে মান॥"

ইত্যাদি পদটিতে পদকল্পতরু গ্রন্থে কোন ভণিতা দৃষ্ট হয় না।

"এ ধনি মানিনি মান নিবার।
আবীরে অরুণ শ্যাম　　অঙ্গ-মুকুরপর
নিজ প্রতিবিম্ব নেহার।"

ইত্যাদি ২২৭ সংখ্যক পদটিতে কতকগুলি ব্রজবুলি শব্দের প্রয়োগ থাকায় অন্য প্রমাণ না থাকিলেও তাহা চণ্ডীদাসের রচিত নহে, সিদ্ধান্ত করিলে অসঙ্গত হইত না। কিন্তু এ সম্বন্ধে

অপর প্রমাণও বর্ত্তমান আছে। পদকল্পতরু গ্রন্থে এই পদটি হরিদাসের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়; সুতরাং ইহা যে চণ্ডীদাসের রচিত নহে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহের কারণ নাই।

রমণীবাবু কোন হস্তলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ২২৯।২৩০ সংখ্যক পদ দুটি সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া ফুটনোটে লিখিয়াছেন। এই দুইটি পদই ব্রজবুলি ভাষায় রচিত এবং ভণিতা ছাড়া পদকল্পতরু গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে; অতএব পদ দুইটি অন্য কাহারও রচিত বলিয়াই প্রতীতি হয়।

২৩১।২৩২ সংখ্যক পদ দুটিতে চণ্ডীদাসের স্বাভাবিক নিপুণতার অণুমাত্রও দৃষ্ট হয় না। ২৩১ সংখ্যক পদের—

"ত্বরিত-গমনে এস আমা সনে
গলেতে ধরিয়া বাস।
সো হেন নাগর হইয়া কাতর
দাঁড়াইল রাইয়ের পাশ॥
রাই কমলিনী হেরি গুণমণি
বঁধুয়া লইল কোলে।"

ইত্যাদি এবং ২৩২ সংখ্যক পদের—

"এত শুনি হরি গলে বাস ধরি
কহয়ে কাতর-বাণী।
শুন বিনোদিনি জনমে জনমে
আমি আছি প্রেমে ঋণী॥
এত শুনি গোরী দু বাহু পসারি
বঁধুয়া করিল কোরে।"

ইত্যাদি কথাগুলি মহাকবির বর্ণিত মানান্তে মিলন নহে; ইহা পালা সাঙ্গ করিবার জন্য কোন পদকর্ত্তা কিংবা কীর্ত্তনিয়ার ব্যগ্রতাসূচক গোঁজা-মিল ব্যতীত আর কিছু নহে। যদি চণ্ডীদাস প্রকৃতপক্ষেই এ ভাবে মানান্তে মিলন দেখাইয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিব যে, এখানে প্রয়োজনের নিকট কবিত্ব পরাজিত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের একটি মানভঞ্জনের পদের কিয়দংশ আমরা ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গের তুলনা করার জন্য এ স্থলে আমরা চণ্ডীদাসের আর একটি মানভঞ্জনের পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

"রাইয়ের বচন শুনি সখীগণ
আনল যমুনা-বারি।
নাগর সুন্দর সিনান করল
উলসিত ভেল গোরী॥

ললিতা আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া
পরায়ল পীতবাস।
পরিয়া বসন হরষিত মন
বসিলা রাইক পাশ ॥
রাই বিনোদিনী তেড়ছ চাহনি
হানল বন্ধুর চিতে।
নাগর সুন্দর প্রেমে গর গর
চাহে অঙ্গ পরশিতে ॥
মনে আছে ভয় মানের সঞ্চয়
সাহস নাহিক হয়।
অতি সে লালসে না পায় সাহসে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয় ॥”

কি সুন্দর স্বাভাবিক বর্ণনা! এই বর্ণনা পড়িয়া ২৩১।২৩২ সংখ্যক পদ দুইটি চণ্ডীদাসের রচিত বলিয়া মনে করা যায় কি?

চণ্ডীদাসের প্রবাসের ও মাথুরের পদ

রমণীবাবুর সংস্করণের ২৩৮ হইতে ২৪৬ সংখ্যক প্রবাসের পদগুলির সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ২৪৩ সংখ্যক—

“অকথ্য বেদনা সই কহা নাহি যায়।”

ইত্যাদি পদটি পূর্ব্বোক্ত ৯৪ সংখ্যক—

“একে কুলবতী ধনী তাহে সে অবলা।”

ইত্যাদি পদের প্রথম কলি-বর্জ্জিত অংশের সহিত প্রায় অভিন্ন; সুতরাং আমরা এই দুইটিকে একটি পদ বলিয়া বিবেচনা করি। পদটি পূর্ব্বরাগের পদ হইলেও প্রবাসের অনুপযোগী নহে; তজ্জন্যই বোধ হয়, কোন সংগ্রহকর্ত্তা কিংবা কীর্ত্তনিয়া কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিতভাবে প্রবাসের পদাবলির মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়া থাকিবে। প্রবাসের পদাবলির মধ্যে কেবল ২৪৬ সংখ্যক—

“সখি, কহবি কানুর পায়।
সে সুখ-সায়র দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায় ॥”

ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটি পদকল্পতরু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

রমণী বাবুর সংস্করণের ২৪৭ হইতে ২৫৩ সংখ্যক মাথুরের পদগুলির কোনটিই পদামৃতসমুদ্র কিংবা পদকল্পতরুগ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। এই পদগুলির মধ্যে “হে কুবজার বন্ধু” ইত্যাদি পদটি আধুনিক কীর্ত্তন-গায়কদিগের মুখে প্রায়শই শুনিতে পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস প্রবাস ও মাথুরের পদে বিদ্যাপতির ন্যায় নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই।

চণ্ডীদাসের ২৫৪ হইতে ২৭৬ সংখ্যক ভাবোল্লাসের * পদগুলির মধ্যে কেবল ২৫৪ ও ২৫৫ সংখ্যক পদ দুইটি পদকল্পতরু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি যে নিশ্চিতই চণ্ডীদাসের রচনা, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনটি পদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। ২৫৫ সংখ্যক পদটি ব্রজবুলি ও ব্রজবুলি পদের নিজস্ব মাত্রা-ত্রিপদীছন্দে রচিত। এই পদটি পদকল্পতরুগ্রন্থের (ক), (খ), (গ) চিহ্নিত হস্তলিপি পুথিতে ভণিতা-হীন দৃষ্ট হয়। ২৫৬ সংখ্যক পদটিও ব্রজবুলি-মিশ্রিত বলিয়া সন্দিগ্ধ বোধ হয়। ২৫৭ সংখ্যক সুদীর্ঘ পদটির রচনা ও ভাব চণ্ডীদাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কবি-যশোলিপ্সু কোন ব্যক্তি সম্ভবতঃ নিজের শক্তি-পরীক্ষার জন্য চণ্ডীদাসের নামে এই পদটি চালাইয়া গিয়াছেন।

ভাবোল্লাসের পদ

২৫৯ ও ২৬০ সংখ্যক পদ দুইটি চণ্ডীদাসের উৎকৃষ্ট ভাবোল্লাসের পদের নিদর্শন।

বিদ্যাপতির—

"যব্ হরি আওব গোকুল পুর।
ঘরে ঘরে নগরে বাজব জয়-তূর॥
আলিপন দেওব মোতিম-হার।
মঙ্গল-কলস করব কুচ-ভার॥
* * *
ধূপ দীপ নৈবেদ্য করব পিয়া আগে।
লোচন-নীরে করব অভিষেকে॥"

অথবা—

"পিয়া যব্ আওব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে॥
কনক-কুম্ভ ভরি কুচযুগ রাখি।
দরপণ ধরব কাঁজর দেই আঁখি॥"

কিংবা আবার—

"অঙ্গনে আওব যব্ রসিয়া।
পালটি চলব হাম ঈষত হাসিয়া॥"

ইত্যাদি পদাবলিতে কবি অলঙ্কার-পূর্ণ বিচিত্র ভাষায় ভাবোল্লাসের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার নিকট চণ্ডীদাসের উক্ত পদগুলি মলিন বলিয়া প্রতিভাত হইলেও—

* রমণী বাবুর ব্যবহৃত "ভাবসম্মিলন" শব্দটি এ স্থলে সমীচীন নহে

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥"

ইত্যাদির ন্যায় গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ বাক্য কেবল চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভবপর বটে।

রমণী বাবুর সংগৃহীত রাগাত্মিক পদগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, পরকীয়া-সাধন-পদ্ধতি সঙ্কেতে ব্যক্ত করাই এই সকল পদের মুখ্য উদ্দেশ্য; উহা কবিত্বপ্রকাশের স্থল নহে এবং সেখানে কবিত্বের দৃষ্টান্ত আশা করাও সঙ্গত নহে। চণ্ডীদাসের প্রচারিত সাধন-পদ্ধতি যাঁহারা নিজের জীবনে কার্য্যে পরিণত করেন নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ইহার অনেক পদই হেঁয়ালীর ন্যায় প্রতীত হইবে। চণ্ডীদাসের এই গুহ্য সাধন-পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদিগের নিজের কোন অভিজ্ঞতা নাই। আমরা এ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উপযুক্ত অধিকারী নহি; তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, এইরূপ সাধন-পদ্ধতি যুক্তি কিংবা শাস্ত্র কোনটির প্রতিকূল নহে। নাগার্জ্জুন-প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় ও তদনুকারী শাক্ত তান্ত্রিক সম্প্রদায় হইতেই এই অদ্ভুত মতের উদ্ভব হইয়াছে, যাঁহারা এরূপ মনে করেন, ছান্দোগ্য-উপনিষদের "ন কাঞ্চন পরিহরেৎ" এই শ্রুতিবাক্য ও তাহার শাঙ্করভাষ্য আলোচনা করিলেই তাঁহাদিগের সেই ভ্রম অপনীত হইবে।

রাগাত্মিক পদ

আমরা এখন চণ্ডীদাসের পদাবলির কতকগুলি মারাত্মক পাঠবিকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিশেষজ্ঞ পাঠক জানেন যে, প্রাচীন হস্তলিপি পুথির প্রায় কোন দুইখানা পুথির পাঠ একরূপ দেখা যায় না। এ অবস্থায় চণ্ডীদাসের পদাবলি সম্বন্ধে যে অনেক পাঠ-ভেদ থাকিবে, তাহাতে কিছুই বিচিত্র নাই। কোন হস্তলিপি পুথিতে কোন পদের একাধিক কলি পরিত্যক্ত হইয়াছে; কোন পুথিতে তাহা স্বতন্ত্র আকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত ২য় নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এরূপ স্থলে কোন্ পাঠটি সুসঙ্গত, তাহা স্থির করা যদিও অসম্ভব নহে, কিন্তু এখানে ঐ সকল পাঠভেদ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করার স্থান নাই। অতএব ঐরূপ শতাধিক পাঠভেদের আলোচনা না করিয়া, যে স্থলে রমণী বাবুর গৃহীত পাঠে একেবারেই অর্থ-সঙ্গতি হয় না, আমরা এ স্থলে সেরূপ কতকগুলি পাঠ বিকৃতির দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

চণ্ডীদাসের পদাবলির পাঠ-বিভ্রাট

(১) "কুচ যে মণ্ডলী কনক কটোরী
বনালে কেমন ধাতা।
হাসির রাশি মনের খুসি
দান করে যদি দাতা॥

চণ্ডীদাস কহে যদি দান নহে
কি জানি মাগিবা তায়।
যে ধন মাগয়ে তাহা না পাইয়ে
অপযশ রহি যায়॥" (২৩ পৃষ্ঠা)

"যদি দান নহে" বাক্যাংশের কোন অর্থ হয় না; কারণ, দান না হইলে যাচ্ঞা করা নিরর্থক। পদকল্পতরুর (ক), (খ) ও (গ) পুথিতে "নহে" স্থলে 'হয়ে' পাঠ আছে। তাহাতে এইরূপ অর্থ হয় যে, চণ্ডীদাস বলিতেছে, যদি দান হয়, (তাহা হইলেও) তাঁহার নিকট কোন্ জিনিষ যাচ্ঞা করিবা? লোকে যে ধন যাচ্ঞা করে, তাহা না পাইলে অপযশ থাকিয়া যায়।

(২) "সিনিয়া উঠিতে নিতম্ব-তটীতে
পড়েছে চিকুররাশি।
কাঁদিয়া আধার কলঙ্ক চাঁদার
শরণ লইল আসি॥" (২৬ পৃষ্ঠা)

'কলঙ্ক চাঁদার' বাক্যটির কোন অর্থ হয় না। কবি স্নানোত্থিতা নায়িকার জলকণা-স্রাবী নিতম্ববিলম্বী কেশরাশি দেখিয়া কল্পনা করিতেছেন, যেন অন্ধকার অশ্রুজল বর্ষণ করিতে করিতে আসিয়া কনকবর্ণ চন্দ্রমার অর্থাৎ নায়িকার সুন্দর বদনের শরণ লইল। চন্দ্র স্বভাবতঃ রজতবর্ণ হয় এবং তাহার প্রভায়ই অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারে না; কিন্তু নায়িকার মুখ তদপেক্ষা উজ্জ্বল কনক-চন্দ্রমা তুল্য; সুতরাং তাহা দেখিয়া অন্ধকার যে অধিকতর ভীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এই ভাবটি বুঝাইতে কবি নায়িকার মুখের পক্ষে অধিক স্বাভাবিক 'কনক-চাঁদা' শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন। 'কলঙ্ক' শব্দ প্রয়োগ করিলে এই অর্থ প্রকাশ পায় না। 'কলঙ্কচাঁদার' অর্থ কলঙ্ক-যুক্ত চন্দ্র কল্পনা করিলে নায়িকার "হরিণী-হীন-হিমধাম" বদনের পক্ষে তাহা একান্তই অনুপযোগী হইয়া পড়ে।

(৩) "সাপিনীরে দেয় থোব সাপিনী বাঢ়য়ে কোব
দম্ভ করি উঠি ধরে ফণা।"

'সাপিনী দম্ভ করিয়া উঠিয়া ফণা ধরে' এইরূপ অর্থ সংলগ্ন হয় না। 'সাপ রাগিয়া উঠে' বলা যায়, কিন্তু 'দম্ভ করিয়া উঠে' এরূপ প্রয়োগ নিতান্ত অস্বাভাবিক। পদকল্পতরুর (ক) ও (খ) পুথিতে 'দম্ভ' স্থলে 'দণ্ড' পাঠ আছে; 'দণ্ড করিয়া উঠে' বাক্যের অর্থ 'দণ্ডের ন্যায় হইয়া উঠে' অর্থাৎ দণ্ডায়মান হইয়া উঠে। 'দণ্ড' শব্দের উত্তর 'দণ্ডের ন্যায় আচরণ করে' এই অর্থে 'ক্যঙ্' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন "দণ্ডায়" ধাতু হইতে 'শানচ্' প্রত্যয়যোগে 'দণ্ডায়মান' শব্দটি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 'দণ্ড করিয়া উঠা' ও 'দণ্ডায়মান' হওয়া একার্থক।

(৪) "হাসিয়া কহয়ে সুন্দরী গৌরী।
ভাল নাপিতানী পরাণচুরী॥" (৫৭ পৃঃ)

নাপিতানীর বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ আলতা পরাইবার পারিশ্রমিকস্বরূপ শ্রীরাধার নিকট কৌশলময় বাক্যে "পরশরতন" (স্পর্শরূপ অমূল্য ধন; অপরার্থ পরশপাথর) যাজ্ঞা করিলে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে মুগ্ধ হইয়া হাসিয়া বলিতেছেন—"ভাল নাপিতানী" ইত্যাদি। "পরাণচুরি" বাক্যে কতকগুলি শব্দ উহ্য না করিলে অর্থ হয় না। পদকল্পতরুর (ক) ও (খ) পুথিতে 'গৌরী' স্থলে 'গোরী' ও 'পরাণচুরি' স্থলে "পরাণচোরী" পাঠ দৃষ্ট হয়। তাহাতে সুন্দর অর্থ হয়। 'ভাল নাপিতানী' বাক্যের পরে 'পরাণচোরী' শব্দের ন্যায় একটি কৃত্রিম বিদ্রূপাত্মক বিশেষণ না থাকিলে ভাল শব্দের কোন তাৎপর্য্য থাকে না। পদাবলি-সাহিত্যে "সুন্দরী রমণীর" অর্থে "গোরী" শব্দই দৃষ্ট হয়— "গৌরী" নহে। "গৌরী" শব্দের অর্থ—পার্ব্বতী কিংবা অষ্টমবর্ষবয়স্কা কন্যা; তুলনা করুন,—বাং "গৌরীদান" অর্থাৎ অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার সম্প্রদান। বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে মিলের অনুরোধেই 'পরাণ-চোর' স্থলে 'পরাণ-চোরী' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। চোর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে চোরী শব্দের ব্যবহার পদাবলি-সাহিত্যে অন্যত্র দৃষ্ট হয় না।

(৫)　"আপন বসন　　ঘুচাঞা তখন
লেপয়ে কেশেতে মাটী।
তবল্লক ছাঁদে　　বসন পিঁধে
সঙ্গে চলয়ে হাটি॥" (৬০ পৃঃ)

শ্রীকৃষ্ণের চিকিৎসক-রূপ-ধারণের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ইহা লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসক যে কেন কেশে মৃত্তিকা লেপন করিবেন, তাহা সাধারণ-বুদ্ধির অগম্য। পদকল্পতরুর (ক) ও (খ) পুথিতে 'কেশেতে' শব্দের স্থলে 'কেশর' পাঠ আছে। 'কেশর' কুঙ্কুমেরই অপর নাম। প্রাচীনকালে কুঙ্কুম গন্ধ-দ্রব্যরূপে বিলাসিগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। "কেশর মাটী" বোধ হয়, বস্ত্ররঞ্জনে ব্যবহৃত কেশর-সংযুক্ত গিরিমাটী হইবে। রমণীবাবু পাদ-টীকায় 'তবল্লক' শব্দের আর একটি পাঠান্তর 'তকল্লুবী' লিখিয়াছেন; 'তবল্লক' কিংবা 'তকল্লুবী' শব্দের অর্থনির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেন নাই। আমরা হিন্দী, ফারসী, কি আরবী অভিধানে 'তবল্লক' শব্দ খুঁজিয়া পাই নাই; 'তকল্লুফ্' এই আরবী শব্দটি পাইয়াছি—তাহার অর্থ ভদ্রতার রীতি (Etiquette); সুতরাং "তকল্লুফী ছাঁদে" বাক্যের অর্থ—'কায়দা-মাফিক্' অর্থাৎ "ভদ্রতার রীতি অনুসারে।" পদকল্পতরুর (ক) পুথিতে 'তকল্লকি' ও (খ) পুথিতে 'তকল্লবি' পাঠ আছে। আরবী ও পারসীমূলক হিন্দুস্থানী শব্দের উকার-বোধক 'পেশ্' চিহ্ন অনেক সময়েই ব্যবহৃত হয় না, সুতরাং 'তকল্লুফ্' সহজেই 'তকল্লফ্' কিংবা 'ফ' ও 'ব' অক্ষরের উচ্চারণের সাদৃশ্যবশতঃ 'তকল্লবে' পরিণত হইতে পারে। 'ক' ও 'ফ' অক্ষরের আকৃতিসাম্য-হেতু 'তকল্লফ' শব্দটি 'তকল্লক' লিখিত বা পঠিত হওয়াও বিচিত্র নহে।

(৬) "দেখি দেয়াশিনী বোলে শুভ বাণী
সব সুলক্ষণযুতা।
গন্ধর্ব্ব পাবনী যশোদানন্দিনী
রাধা নামে ভানুসুতা॥" (৬৪ পৃঃ)

ইহা শ্রীরাধিকাকে লক্ষ্য করিয়া তপস্বিনী-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। শ্রীরাধার সম্বন্ধে "যশোদানন্দিনী" বিশেষণ কোনমতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। পদকল্পতরুর (ক) ও (খ) পুথিতে "জগদানন্দিনী" পাঠ আছে; তাহাই শুদ্ধ পাঠ বটে। কোনও লিপিকার বোধ হয় 'গ' অক্ষরটি বুঝিতে না পারিয়া 'গ' স্থলে 'শ' অক্ষর কল্পনা করিয়া 'জশদানন্দিনী' লিখিয়াছিলেন,—পরে কোনও পণ্ডিতম্মন্য লিপিকার তাহা শুদ্ধ করিতে যাইয়া "যশোদানন্দিনী" লিখিয়া বসিয়াছেন। পদাবলির হস্তলিপি পুথির অনুশীলন করিলে অনেক সময়েই এরূপ অনেক হাস্যজনক পাঠবিকৃতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ১৩১৫ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"র ৩য় সংখ্যায় "প্রাচীন পদাবলির পাঠভেদ" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এরূপ আরও কয়েকটি হাস্যজনক পাঠবিভ্রাটের উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছি।

(৭) "সখী কহে সার দেখি নরাকার
স্বরূপ কহিবে কে।
অনুরাগ-ছুরী বৈসে মনোপরি
জাতির বাহির সে॥"

ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের কি আকার, কি জাতি ইত্যাদি বিষয়ক শ্রীরাধার প্রশ্নের উত্তরে সখীর উক্তি। প্রেম "নরাকার" এই কথার কোন অর্থ হয় না। (ক) ও (খ) পুথিতে 'নৈরাকার' পাঠ আছে, বলা বাহুল্য যে, তাহাই সুসঙ্গত। 'নিরাকার' শব্দের স্থলে 'নৈরাকার' শব্দের প্রয়োগ লিখিত ও কথিত ভাষায় অনেক দৃষ্ট হয়।

(৮) "নিঠুর বচনে কাঁপিছে পরাণ
মরিয়া রহিনু লাজে।
ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি
সঘনে আমারে যজে॥" (৯৩ পৃঃ)

শ্রীরাধা একদিন নিদ্রার অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ননদিনীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছিলেন,—তাহাতে ননদিনী তাঁহাকে অসৎ-চরিত্রা মনে করিয়া যথেষ্ট তর্জ্জন-গর্জ্জন করে; শ্রীরাধা সেই কাহিনী সখীর নিকট বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন, "নিঠুর-বচনে" ইত্যাদি। "ফিরাইয়া আঁখি গরবেতে থাকি" বাক্যের সঙ্গত অর্থ হয় না; (অন্যদিকে) চক্ষু ফিরাইয়া, গর্ব্বেতে থাকিয়া, এইরূপ অর্থ নিতান্ত অস্বাভাবিক। "মানে থাকি" বাক্যের ন্যায় "গর্ব্বেতে থাকি" বাক্যের প্রয়োগ বাঙ্গালা ভাষার রীতি-সিদ্ধ প্রয়োগ (idiom) নহে। পদকল্পতরুর (ক) ও (খ) পুথিতে 'গরবেতে থাকি' বাক্যের স্থলে "গরবাথাকি" পাঠ আছে। আমাদিগের বিবেচনায় তাহাই

শুদ্ধ পাঠ। নতুবা (ক) ও (খ) পুথির ন্যায় বিভিন্ন স্থানে লিখিত বিভিন্ন রকমের দুইখানা পুথিতেই সেই একই পাঠ দৃষ্ট হইত না। "গরবাখাকি" স্ত্রীদিগের গালিবিশেষ। শ্রীরাধা বলিতেছেন যে,—ননদিনী গরবাখাকি চক্ষু ঘুরাইয়া আমার প্রতি বারংবার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। রমণীবাবুর গৃহীত 'যজে' পাঠটিও আমরা সুসঙ্গত বোধ করি না। রমণী বাবু "যজে" পাঠের কোন অর্থ করারও চেষ্টা করেন নাই। (ক) ও (খ) পুথিতে 'যজে' স্থলে 'তাজে' পাঠ আছে। তাজে = তর্জ্জন করে। এরূপ অর্থে 'যজে' শব্দের প্রয়োগ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না;—সুতরাং—"যজ্" ধাতুর "যজ্ঞ করা" অর্থ হইতে "আশীর্ব্বাদ করা" ও তৎপরে অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত বিপরীত-লক্ষণ দ্বারা "অভিশাপ দেওয়া" অর্থ কষ্টকল্পনা দ্বারা স্থির করা সমীচীন বোধ হয় না। তুলনা করুন,—"কাঁপয়ে শরীর দেখি আঁখির তাজনি।" চণ্ডীদাস—৯৩ পৃষ্ঠা।

(৯) "পরাণ বঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র-পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ মধুর হাসে॥
পিঙল বরণ বসন খানিতে
মুখানি আমার মুছে।
শিথান হইতে মাথাটি বাহুতে
রাখিয়া শুতল কাছে॥" (৯৪ পৃঃ)

"পিঙল" শব্দের "পিঙ্গল" অর্থ এখানে শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। (ক) ও (খ) পুথিতে 'পিয়ল' পাঠ আছে। 'পিয়ল' শব্দ সংস্কৃত 'পীত' কিংবা 'পীতল' (পীত + ল) শব্দ হইতে জাত। উহার অর্থ পীতবর্ণবিশিষ্ট। 'পিয়ঁল' শব্দই 'পিঙল' লিখা হইয়াছে, এরূপও মনে করা যাইতে পারে না; কারণ, পীতশব্দজাত 'পিয়ল' শব্দে চন্দ্রবিন্দুর আগম কিরূপে হইবে? সুতরাং 'পিঙল' শব্দ যে ভুল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 'শিথান' শব্দের ব্যুৎপত্তি লিখিত হয় নাই; সম্ভবতঃ ইহা সংস্কৃত 'শিরঃস্থান' শব্দ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেইরূপ 'পৈথান' শব্দও সংস্কৃত 'পাদ-স্থান' হইতে জাত।

(১০) নিতুই নূতন পীরিতি দুজন
তিলে তিলে বাঢ়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি থায়॥
সখি হে, অদভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন ঠাঞি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম॥ ধ্রু

উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্দ।
এ কি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিলে অন্ধ ॥
চণ্ডীদাসে কহে তুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোনজনে
শুনি না দরবে চিত ॥" (১০১ পৃঃ)

এই প্রসিদ্ধ পদটিতে কয়েকটি মারাত্মক পাঠবিকৃতি দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ তৃতীয় পংক্তির "বাড়ায়" শব্দটি দ্বারা কোন অর্থ হয় না ;—নিত্যই নূতন দুজনার পীরিতি তিলে তিলে বাড়িয়া যায় ; (হৃদয় পূর্ণ হওয়ায়) ঠাই পায় না—তথাপি 'বাড়য়' অর্থাৎ বাড়িতে থাকে ; পরিণামে 'থায়' না অর্থাৎ থাই পায় না—ইহাই প্রথম চারি ছত্রের অর্থ। (ক) ও (খ) পুথিতে 'বাড়য়' ও 'থায়'ই আছে ; সুতরাং তাহাই শুদ্ধ পাঠ বটে। ষষ্ঠ পংক্তির "এতদিন ঠাঞি" বাক্যের অর্থ হয় না। বটতলার মুদ্রিত পুস্তক ও তাহার আদর্শ (ক) পুথিতে 'ঠাঞি' শব্দই আছে ; কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের লিখিত (খ) পুথিতে 'ঠাঞি' স্থলে 'চাই' আছে ; তাহাতে এরূপ অর্থ হয় যে,—এতদিন চাহিয়া অর্থাৎ দেখিয়াও আমরা (সেই প্রেমের) অন্ত পাই না ; ইহার সহিত তুলনায় কষিল অর্থাৎ কষ্টি-করা সোনা কোন্ ছার ?

১১ পংক্তির "সবারে করিলে অন্ধ" এই বাক্যটির বিরুদ্ধ অর্থ ছাড়া সঙ্গত অর্থ হয় না। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই অতুলনীয় আদর্শ-প্রেমের সকলের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করাই সঙ্গত ; উহা কি সকলকে অন্ধ করিতে পারে ? 'সবারে' শব্দের স্থলে (ক) পুথিতে 'সভারে' ও (খ) পুথিতে 'স্বভাবে' পাঠ আছে। এ স্থলে 'স্বভাবে' শব্দ গ্রহণ করিলে উত্তম সংলগ্ন হয় ; সেই প্রেমের স্বরূপ কি রকম অপূর্ব্ব যে, (তাহার) স্বভাবে অর্থাৎ স্বভাব দ্বারা (শ্রীরাধা-কৃষ্ণকে) অন্ধ অর্থাৎ দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য করিয়াছে ; অথবা (শ্রীরাধাকৃষ্ণের) স্বভাবকে অন্ধ করিয়াছে। প্রাচীন পুথিতে 'সবার' স্থলে প্রায় সর্ব্বত্র 'সভার' পাঠ দৃষ্ট হয় ; আবার প্রাচীন কোন কোন পুথিতে অনেক স্থলে 'র' অক্ষর অন্তঃস্থ 'ব' অক্ষরের জ্ঞাপক, (খ) পুথিতে আমরা অনেক স্থলেই 'ব' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'র' পাইয়াছি। এই পদ্ধতি সর্ব্বত্র অনুসৃত না হওয়ায় পরবর্ত্তী সময়ে এই 'র' অক্ষর-সূচিত 'ব'কার যে প্রকৃতপক্ষেই 'র'কার বলিয়া এরূপ সন্দিগ্ধ স্থলে গৃহীত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? আমাদিগের অনুমান হয় যে, প্রাচীন পুথির 'স্বভারে' (অর্থাৎ স্বভাবে) শব্দটি কোন পণ্ডিতম্মন্য লিপিকার কর্ত্তৃক সংশোধিত (?) হইয়া 'সভারে' শব্দে এবং তৎপরে 'সভারে' শব্দটি আধুনিক কোন লিপিকার কিংবা পদাবলি-সম্পাদক কর্ত্তৃক পুনরায় সংশোধিত (?) হইয়া 'সবারে' শব্দে পরিণত হইয়াছে। এখন শব্দটিকে ডবল সংশোধনের মাহাত্ম্যে চিনিয়া উঠাই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

১২ পংক্তির "দুহুঁ সম নহে" বাক্যটি অর্থশূন্য ; প্রণয়িযুগলের প্রেম সমান না হইলে তাহা কি কবির বর্ণনা অনুসারে সকল উপমার বস্তুকে পরাজিত করিয়া বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারে ? (ক) ও (খ) পুথিতে ইহার পরিবর্ত্তে "দুহুঁ সম হয়ে" পাঠ আছে। তাহাই শুদ্ধ পাঠ বটে। "এখানে সে বিপরীত" বাক্যদ্বারা প্রকৃত পক্ষে সেই প্রেমের সমত্ব অস্বীকৃত হয় নাই ; তবে সেই অসমোর্দ্ধ অনন্য প্রেম এ স্থলে বিপরীত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে কুল-মান-লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়াছেন এবং অশেষ গঞ্জনা সহ্য করিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ এখন ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছেন। পদটি সখীর উক্তি ; সুতরাং সখী যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঔদাসীন্যের দোষারোপ করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক নহে। আমাদিগের বোধ হয়, 'এখানে' শব্দটির স্থলে 'এখনে' পাঠ ছিল—লিপিকারগণ ভুলে 'এখানে' লিখিয়াছেন। সেই অতুলনীয় অনন্য প্রেম 'এখানে' বিপরীত হইয়াছে, এরূপ না বলিয়া, 'এখন বিপরীত হইয়াছে' বলাই অধিক সঙ্গত।

(১১)   "মদনে আগুলি   গলে গলে মিলি
চুম্বন করল যত।
কেশ বেশ যদি   বিথার হইল
তাহা বা কহিব কত ॥" (১০৬ পৃঃ)

প্রথম পংক্তির 'মদনে আগুলি' অর্থাৎ 'মদনকে আগুলাইয়া' বলিলে কি বুঝা যায় ? (ক) ও (খ) পুথিতে 'আগলি' পাঠ আছে ; হিন্দী ও পদাবলিতে সংস্কৃত 'অগ্র্য' শব্দজাত পুংলিঙ্গে 'আগর' ও স্ত্রীলিঙ্গে 'আগরী' শব্দের বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয় ; এই 'আগর' ও 'আগরী' শব্দের অর্থ—পরিপূর্ণ, সুনিপুণ। তুলনা করুন—'আগর' যথা—"শুন শুন নাগর, সব গুণ আগর (প-ক-ত—২১১।২) ; 'আগরি' যথা—"নদীয়া নাগরী, সোহাগে আগরি" (প-ক-ত—৬৮১।১৩)। 'র'কার ও 'ল'কারের অভেদ-হেতু 'আগরি'স্থলে 'আগলি'ও দৃষ্ট হয়। 'আগলি' যথা—

"অমৃত পুতলী   রূপের আগলি
না জানি কি জানি হয়।" (প-ক-ত—১৩৯।১৬)

উদ্ধৃত পদাংশের তৃতীয় পংক্তির 'কেশ বেশ যদি' বাক্যের 'যদি' শব্দটির কোন তাৎপর্য্য নাই। (ক) ও (খ) পুথিতে 'যদি' স্থলে 'আদি' আছে। প্রাচীন পুথির কোন কোন স্থলে অজ্ঞ লিপিকারগণ স্বরবর্ণ 'অ' অক্ষরের পরিবর্ত্তে 'য়' ব্যবহার করিয়াছেন ; আমাদিগের অনুমান হয়, কোন লিপিকার 'আদি'স্থলে 'য়াদি' লিখিয়াছেন ;—আবার তাহা শুদ্ধ করিতে যাইয়া পরে কেহ 'যদি' লিখিয়া বসিয়াছেন।

(১২)   "ঘন ঘন তুমি   মুড়িতেছ অঙ্গ
সঘনে নিশ্বাস ছাড়।

স্বরূপ করিয়া কহনা কহসি
কপট কেন বা কর ॥" (১০৮ পৃঃ)

তৃতীয় পংক্তির 'কহনা' শব্দটি অর্থশূন্য। সংস্কৃত 'কথন' শব্দজাত 'কহন' শব্দের ব্যবহার ভাষা ও পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু 'কহনা' শব্দ নাই। 'কহন কহসি' এরূপ বাক্যও অপ্রচলিত বটে। (ক) ও (খ) পুথিতে 'কেন না কহসি' পাঠ আছে; প্রাচীন পদাবলিতে সংস্কৃত কথং (প্রাকৃত—কহং) শব্দ-জাত কাহেঁ শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে; আমাদিগের অনুমান হয়, এ স্থলেও 'কেন না' শব্দ দুটির স্থলে প্রাচীন হস্তলিপি গ্রন্থে 'কাহে না' পাঠ ছিল; ঐ পাঠ নবীকৃত হইয়া 'কেন না' হইয়াছে; কিন্তু কোন কোন পুথিতে প্রাচীনতর 'কাহেঁ না' শব্দদ্বয়ের বিকৃত নিদর্শন রহিয়া গিয়াছে।

চতুর্থ পংক্তির "কপট কেন বা কর" স্থলে (ক) ও (খ) পুথিতে "মরমে কপট কর" পাঠ আছে।

(১৩) "সই, যে বোল সে বোল মোরে।
শপতি করিয়া বলি দাঁড়াইয়া
না রব এ পাপ-ঘরে ॥" (১৫৬ পৃঃ)

দ্বিতীয় পংক্তির "বলি দাঁড়াইয়া" বাক্যের কোন সার্থকতা দেখা যায় না। (ক) ও (খ) পুথিতে 'বলি দড়াইয়া' পাঠ আছে, তাহার অর্থ—দৃঢ় অর্থাৎ নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি। ঐরূপ পাঠ ও অর্থই সমীচীন বটে।

(১৪) নবঘন হেরি পিয়াসে চাতকী
চঞ্চু পসারল আশে।
বারিক কারণ বহল পবন
কুলিশ মিলল শেষে ॥" (১৬৫ পৃঃ)

তৃতীয় পংক্তির "বারিক কারণ বহল পবন" বাক্যটির সঙ্গত অর্থ হয় না। 'জলের জন্য পবন বহিল' এরূপ বলিলে বৃষ্টিপাতের বিরোধী পবনকেই অনুকূল বলিয়া বুঝা যায়; আর সেরূপ হইলে চাতকীর অদৃষ্টে বাঞ্ছিত বারি-বিন্দু-লাভ না ঘটিয়া পরিণামে কেন যে বজ্রপাত ঘটিবে, তাহা একেবারেই বুঝা যায় না। (ক) ও (খ) পুথিতে "বারিক বারণ করল পবন" পাঠ আছে; তাহার অর্থ এই যে, পবন বারি নিবারণ করিল অর্থাৎ বৃষ্টি উড়াইয়া নিল। বর্ষণ বন্ধ হইয়াও অশনিপাত হইতে দেখা যায়, সুতরাং "কুলিশ মিলল শেষে" এই বাক্যের সহিত তৃতীয় পংক্তির কোন অসঙ্গতি নাই।

চণ্ডীদাসের পদাবলির ব্যাখ্যাবিভ্রাট

পদাবলির সম্পাদকগণের মধ্যে স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু ভদ্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়গণই তাঁহাদিগের সম্পাদিত বিদ্যাপতির পদাবলির দুরূহ শব্দ ও বাক্যের অর্থনির্ণয় জন্য

এক জনের পর অন্য জনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই ক্রমাগত চেষ্টার ফলে যদিও অনেক সন্দিগ্ধ অর্থের মীমাংসা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি বিদ্যাপতির পদের অনেক শব্দ ও বাক্যের এ পর্য্যন্ত কোন সদর্থ হয় নাই। বিদ্যাপতির পদ ছাড়া পদকল্পতরু গ্রন্থে অন্যান্য জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কবিদিগের যে ব্রজবুলি পদাবলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও এরূপ অনেকগুলি শব্দ ও বাক্য আছে, যাহার কোন অর্থ-গ্রহ হয় না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তৃগণের বাঙ্গালা পদাবলিতে ঐরূপ সন্দিগ্ধার্থ শব্দ ও বাক্যের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প হইলেও তাহা একান্ত বিরল নহে; কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, "বোবার শত্রু নাই", এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়াই সম্পাদকগণ দুরূহ বাক্যের অর্থনির্ণয়ের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করা দূরে থাকুক, উহাদিগের উল্লেখ করিতেও কুণ্ঠিত হইয়াছেন। সমীচীন অর্থোদ্ধার না করিতে পারিলে, কেবল এইরূপ দুরূহ শব্দ ও বাক্যের একটি তালিকা প্রকাশ করিলেও সাহিত্য-সেবীদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিতে পারে বিবেচনায় আমরা "পদকল্পতরু" গ্রন্থের ত্রিসহস্রাধিক পদাবলির দুরূহ শব্দ ও বাক্যাবলির একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং আমাদিগের সাধ্যানুসারে ঐ সকল শব্দ ও বাক্যাবলির ব্যুৎপত্তি-মূলক সমীচীন অর্থনির্ণয়ের জন্যও চেষ্টা করিতেছি। আমরা এ স্থলে চণ্ডীদাসের পদাবলির কতকগুলি দুরূহ শব্দ ও বাক্যের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব।

(১)

"জলদবরণ কানু দলিত অঞ্জন জনু
উদয় হৈয়াছে সুধাময়।
নয়ন চকোর মোর পিতে করে উতরোল
নিমিখে নিমিখ নাহি সয়॥" (৫ পৃঃ)

রমণী বাবুর মতে "করে উতরোল" বাক্যের অর্থ 'উৎকণ্ঠিত হয়' আর নিমিখ শব্দের অর্থ 'নিমিষ'। 'ষ' অক্ষরটি হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় 'খ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয়; সংযুক্ত অক্ষর 'ক্ষ' (ক+ষ) এর বাঙ্গালা রীতির উচ্চারণেও 'ষ' অক্ষর 'খ'এর ন্যায় উচ্চারিত হয়; সুতরাং নিমিষ শব্দটিই যে চণ্ডীদাসের সময় 'নিমিখ' উচ্চারিত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কথা হইতেছে, 'নিমিখ' শব্দের অর্থ লইয়া; এ স্থলে দুইটি 'নিমিখ' শব্দের অর্থ যে এক নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম 'নিমিখ'—'নিমিষপরিমিত কাল' ও দ্বিতীয় 'নিমিখ' 'চক্ষুর পলক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শেষোক্ত অর্থে নিমিখ শব্দের ব্যবহার চণ্ডীদাস আরও করিয়াছেন। তুলনা করুন—

"না চিহ্নে মানুখ নিমিখ নাই।
কাঠের পুতলি রৈয়াছে চাই॥" (চণ্ডী—৪৭ পৃষ্ঠা)

সুতরাং "নিমিখে নিমিখ নাহি সয়" বাক্যের অর্থ—'নিমিষের তরেও চক্ষুর পলক ফেলিতে প্রাণে সহে না।'

রমণীবাবুর মতে 'করে উতরোল' বাক্যের অর্থ 'উৎকণ্ঠিত হয়'। উতরোল শব্দটি বিশেষ্য; বিশেষণ নহে; উৎকণ্ঠিত হয় বলা যায়—কিন্তু সেই অর্থে "উৎকণ্ঠিত করে" বলা যাইতে পারে না; অতএব "করে উতরোল" বাক্যটির ভাবার্থ 'উৎকণ্ঠিত হয়' বা সেইরূপ কিছু বুঝা গেলেও প্রকৃতপক্ষে 'উতরোল' শব্দটির অর্থ যে কি, তাহাই আমাদিগকে নির্ণয় করিতে হইবে। পদাবলি-সাহিত্যে উতরোল (সংস্কৃত—উৎ+তরল শব্দজাত) শব্দের বহু প্রয়োগ আছে। যথা,—

"দধি ঘৃত মঙ্গল করি সবে উতরোল
করয়ে আনন্দ পরকাশ।" (প-ক-ত—২৪।১৪)
"উতর না দেই রোয়ে উতরোল।" (প-ক-ত—১১৬।১১)
"গৌর-বিরহ-দাব- দাহে দগধ হাম
মরি মরি করি উতরোল॥" (প-ক-ত—১২৭৫)

এই সকল স্থলে 'উতরোল' শব্দের 'উৎকণ্ঠা' অর্থ সংলগ্ন হয় না;—'উচ্চ শব্দ' অর্থ করিলে সংলগ্ন হয়। কিন্তু—

"গৃহের ভিতরে থাকি যেমন পিঞ্জরে পাখী
সদা ভয়ে জীউ উতরোল।" (প-ক-ত—২১৩।৪)
"শুনি কহে সখী শুন মো সবার বোল।
সবহুঁ ঘুমায়ব নহ উতরোল॥" (প-ক-ত—৫৫০।১৭)
"আশ্বিন শারদ হংস-শবদ শুনি
পিয়া জিউ অতি উতরোল॥" (ঐ—১৩০৩।১২)

এই সকল স্থলে 'উৎকণ্ঠিত' বা 'চঞ্চল' অর্থই অধিক সংলগ্ন হয়; কিন্তু এই তিনটি প্রয়োগের কোন স্থলেই "উতরোল করে কিংবা কর" এইরূপ 'কৃ' ধাতুর ক্রিয়া-পদ ব্যবহৃত হয় নাই; নহ (না+হও) এই 'ভূ' ধাতুর ক্রিয়া-পদ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং উহ্য আছে। 'পিতে করে উতরোল', চণ্ডীদাসের এই বাক্যের 'উতরোল' শব্দের অর্থ "উচ্চ শব্দ" কিংবা 'উৎকণ্ঠিত' অর্থ সংলগ্ন হয় না; এ স্থলে ঐ বিশেষ্য শব্দটি উৎকণ্ঠিতের কার্য্য ছট্‌ফটি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২)

"কিবা সে চাহনি ভুবন ভুলনি
দোলনি গলে বনমাল। *

* আমাদিগের দুই একখানা হস্তলিখিত পুথির "দোলনি গলের মাল" পাঠ উৎকৃষ্টতর। কারণ, "দোলনি গলে বনমাল" পাঠে যতিভঙ্গ ও ছন্দঃপতন ঘটে।

মধুর লোভে ভ্রমরা বুলে
বেড়িয়া তহি রসাল ॥" (চণ্ডী—৬ পৃঃ)

রমণী বাবু 'তহি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন,—'তাহাকে'। সংস্কৃত 'তত্র' শব্দ হইতে অপভ্রংশ—তথ, হিন্দী—তহাঁ, তহিঁ কিংবা তঁহা, তঁহি উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দী 'অ'কারের উচ্চারণ 'অ' ও আকারের মাঝামাঝি;—উহা শুনিতে অনেকটা বাঙ্গালা আ-কারের ন্যায় বোধ হয়; সুতরাং তহাঁ তহিঁ প্রভৃতি অনেক হিন্দী শব্দ পদাবলি-সাহিত্যে অনেক স্থলেই 'তাহাঁ' 'তাহিঁ' ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। কচিৎ কোন কোন স্থলে হিন্দীর অনুযায়ী আকারও দেখা যায়। 'তহিঁ' শব্দের চন্দ্রবিন্দুটি বোধ হয়, এ স্থলে ভুলে পরিত্যক্ত হইয়াছে। 'তহিঁ' শব্দের অর্থ 'তাহাতে'। তুলনা করুন,—

"হেরইতে নাগর আয়ল তাঁহি।
কি করহু এ সখি আওলি কাঁহি ॥" (প-ক-ত—৩২৮।১৭)

(৩)

"সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমতি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আনিল রে
চাঁদ নিঙ্গারি কৈল থেহা ॥
সে থেহা নিঙ্গারি কেবা মুখ বনাইল রে
জবা ছানিয়া কৈল গণ্ড ॥ (চণ্ডী—৮ পৃঃ)

রমণীবাবু কেবল 'থেহা' শব্দের অর্থ 'স্থৈর্য্য' লিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; তাহাতে যে কিরূপ অর্থ হয়, সে বিষয়ে কোনই আলোচনা করেন নাই। পদাবলি-সাহিত্যে "স্থৈর্য্য" অর্থে "থেহ", "থেহা" শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা,—

"এত শুনি মানিনী ঐছে কাতর বাণী
আকুল থেহ না পায়।"—(প-ক-ত—৪০৭।১০)

"ঐছন বচন কানু যব শুনব, জীবনে না বান্ধব থেহা।" (ঐ—৩১৬।২০)

কিন্তু এখানে 'চাঁদ নিঙ্গারিয়া স্থৈর্য্য করিল' ইত্যাদি অর্থ সংলগ্ন হয় না। এখানে 'থেহা' শব্দে 'স্থির' অর্থাৎ 'সার-অংশবিশিষ্ট' অর্থ করিতে হইবে। (সারো বলে স্থিরাংশে চ—অমরকোষ)। তাহা হইলে এরূপ অর্থ হইবে—"কোন্ ব্যক্তি (কলঙ্ক-কালিমা থাকায়) চন্দ্রকে নিঙ্গরাইয়া* মলিন-অংশ ফেলিয়া দিয়া, স্থির অর্থাৎ সারাংশযুক্ত করিল এবং তাহা (আরও নির্ম্মল করার জন্য পুনরায়) নিঙ্গরাইয়া (তাহা দিয়া) শ্রীকৃষ্ণের মুখ নির্ম্মাণ করিল?"

* নিঙ্গাড়ি শব্দটি সংস্কৃত গালনার্থক 'নি+গাল' ধাতু কিংবা 'নিঃ+গ' ধাতুজাত।

(৪)

"আরদ্র মাখিয়া কেবা সারদ্র বনাইল রে
ঐছন দেখি পীতাম্বর ॥" (চণ্ডী—৮ পৃঃ)

রমণীবাবু 'আরদ্র' শব্দের অর্থ 'হরিদ্রা' এবং 'সারদ্র' শব্দের অর্থ 'সহিত আরদ্র=পীতবর্ণ' লিখিয়াছেন। 'আর্দ্রক' অর্থাৎ আদা ও 'হরিদ্রা' প্রায় একজাতীয় মূল ও মশলার দ্রব্য বলিয়া চণ্ডীদাসের সময়ে তাঁহার জন্মস্থান বীরভূম প্রদেশে আর্দ্রককে হরিদ্রা বলা হইত কি না, তাহা আমরা জানি না; পূর্ব্ববঙ্গে 'আম-আদা' নামে পরিচিত অপক্ব আম্র-গন্ধি উদ্ভিদ-মূলকে পশ্চিমবঙ্গের লোকে 'আম-হলুদ' বলে। ঐ মূলটি কিঞ্চিৎ হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা 'আদা' কিংবা 'হলুদ' কোনটি না হওয়ায় তাহাকে 'আম-আদা' কিংবা 'আম-হলুদ' সবই বলা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া 'হলুদ' জিনিষটি যে কোনও সময়ে 'আদা নামে' পরিচিত হইবে, ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। সুতরাং প্রমাণাভাবে আমরা রমণীবাবুর এই কল্পনামূলক অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না। উদ্ধৃত পাঠ শুদ্ধ বলিয়া ধরিলে এই বাক্যের কোন সঙ্গত অর্থ হয় না। 'আরদ্র' স্থলে 'হারিদ্র' পাঠ কল্পনা করিলে—'হারিদ্র' (হরিদ্রা × 'ষ্ণ' প্রত্যয়) অর্থাৎ হরিদ্রারঙ্গ মিশ্রিত করিয়া কোন্ ব্যক্তি 'সারদ্র' (সংস্কৃত সার্দ্র) অর্থাৎ জলীয়াংশযুক্ত তরল পদার্থ নির্ম্মাণ করিল? (শ্রীকৃষ্ণের) পীতাম্বর ঐরূপ দেখিতেছি, এরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। হরিদ্রা-রঙ্গ জলে না মিশাইলে বর্ণের উজ্জ্বলতা খোলে না বলিয়াই ঐরূপ বলা হইয়াছে। সংস্কৃত 'হ' অক্ষরটি পূর্ব্ববঙ্গে অনেক সময়েই 'অ' অক্ষরের ন্যায় উচ্চারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গবাসী কোন অশিক্ষিত ব্যক্তির মুখে শুনিয়া পদটি লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে 'হরিদ্রা' কিংবা 'হারিদ্র' শব্দের স্থলে 'আরদ্র' লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে।

(৫)

"আদলি উপরে কেবা কদলি রোপল রে
ঐছন দেখি উরুযুগ ॥" (চণ্ডী—৯ পৃঃ)

রমণীবাবু "আদলি" শব্দের অর্থ 'ঘৃতকুমারী' লিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন। এখানে কোন্ জিনিষটিকে ঘৃতকুমারী বলা হইল, তাহা লিখেন নাই। 'আদলি' শব্দের 'ঘৃতকুমারী' অর্থ কোনও স্থানে প্রচলিত আছে কি না, আমরা জানি না; সম্ভবতঃ ঐ অর্থ কোনও স্থানে প্রচলিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে কি অর্থ হইবে? ঘৃতকুমারীর দীর্ঘ, স্থূল ও সূক্ষ্মাগ্র কতিপয় পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রের সহিত পদাঙ্গুলির ও তাহার স্থূল শাখাহীন কাণ্ডের সহিত পদের অভিন্নতা-সূচিত সাদৃশ্য ব্যক্ত করাই কি কবির অভিপ্রেত? কোনও অভিজ্ঞ পাঠক অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার মীমাংসা করিবেন কি?

(৬)

"শির বেড়ল বৈলান জালে নবগুঞ্জামণি মালে
চঞ্চল চাঁদ উপরে জোড়া ॥" (চণ্ডী—১০ পৃঃ)

রমণীবাবু 'বৈলান জাল' বাক্যাংশের অর্থ করিয়াছেন—'চূড়া-বন্ধন বেণী'। আমরা পদাবলি-সাহিত্যে কোথায়ও 'বৈলান' শব্দ পাই নাই ; বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের যুক্তভণিতা-বিশিষ্ট একটি পদে 'বেনন' শব্দ পাইয়াছি। যথা,—

"বেনন সঞে যব　　　　বসন উতারলু
　　লাজে লাজাওলি গোরী।" (প-ক-ত—১৯৪।২)

এই 'বেনন' শব্দটির স্থলে বটতলার মুদ্রিত পুস্তকে 'বেলল', (ক) পুথিতে 'বেলন'—(শেষের 'ন' অক্ষরটি বিন্দুযুক্ত) ও (গ) পুথিতে 'বেরল' পাঠ আছে ; (গ) পুথির স্বত্বাধিকারী ২৪ পরগণা বসিরহাটনিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের মতে সংস্কৃত 'বের' (অর্থাৎ প্রত্যঙ্গ) শব্দের উত্তর 'লা' ধাতু 'ড' প্রত্যয় দ্বারা 'বেরল' অর্থাৎ অঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার মতে 'বেরল সঞে' অর্থ—'অঙ্গ হইতে' ; অঙ্গ-অর্থে 'বেরল' শব্দের প্রয়োগ সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, মৈথিলী প্রভৃতি কোন ভাষায়ই দৃষ্ট হয় না ; এইরূপ কষ্ট-কল্পনা করা অপেক্ষা 'বেরল' পাঠে অর্থগ্রহ হয় না বলিয়া কবুল-জবাব দেওয়াই সুবুদ্ধির কার্য্য বটে। বাঙ্গালায় 'বিনান' বিশেষণ শব্দটির ব্যবহার আছে। সংস্কৃত 'বেণী' মৈথিলী ভাষায় 'বৈণী'রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে ; সুতরাং উচ্চারণের কিঞ্চিৎ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া 'বিনান', 'বেনন', 'বৈনন' শব্দগুলি একই শব্দের বিভিন্ন রূপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। 'বেনন' শব্দের বিশেষণ অর্থ হইতেই 'বিনান কেশ' বিশেষ্য অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলেই 'বেনন সঞে' ইত্যাদি বাক্যের অর্থ হইবে—'বেণী-সংবদ্ধ কেশ হইতে বসন উন্মোচন করিলে সুন্দরী লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইল।' আমাদিগের বোধ হয়, চণ্ডীদাসের এই পদও 'বেনান জালে' পাঠের পরিবর্ত্তে ভুলক্রমে লিপিকারগণ কর্ত্তৃক 'বৈলান জালে' লিখিত হইয়াছে ; এরূপ অনুমান করার প্রকৃষ্ট কারণও আছে। প্রাচীন পুথিতে অনেক স্থলেই 'ন' অক্ষরের পুটুলীর নীচে বিন্দু দিয়া 'ল' অক্ষর লিখিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে সহজেই 'ল' ও 'ন' অক্ষরের মধ্যে গোলযোগ হইতে পারে, তাহা বেশ বুঝা যায়। আমরা হস্তলিখিত পুথিতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত পাইয়াছি।

(৭)

"আমার কথাটি শুন　　　　না করিহ ইহা পুন
　　না মজে নন্দের কুল গারি।" (চণ্ডী—৪৫ পৃষ্ঠা)

রমণীবাবু 'গারি' শব্দের অর্থ 'গৌরব' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'গালি' বা 'গালী' শব্দ ও হিন্দী মৈথিল 'গারি' শব্দ অভিন্ন ; 'র' ও 'ল' অক্ষরের অভেদহেতু সংস্কৃত অনেক শব্দের 'ল' স্থলে হিন্দীতে 'র' উচ্চারিত হয়। যথা—সংস্কৃত 'বাল', হিন্দী 'বার' (কেশ) ; সংস্কৃত 'কালী', হিন্দী 'কারী', তুলনা করুন,—'ঘনঘটা ঘেরি রহি কারী'—(হিন্দী গীত)।

'গারি' শব্দ "নিন্দাবাক্য" অর্থে পদাবলি-সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা,—

"ইথে যদি কোই করয়ে পরচারি।
কাঁদন মাথি হাসি দেই গারি॥" বিদ্যাপতি, (প-ক-ত—৩৭৯।২)

"দারুণ ফুলশর কুঞ্জে বিথারল
মন্দিরে গুরুজন গারি।
গোবিন্দদাস কহয়ে তুহু সংশয়
নিরমল রসিক মুরারি॥" (ঐ—২৫৩।৯)

চণ্ডীদাসের উদ্ধৃত বাক্যের অর্থ এই যে, 'আমার কথা শুন,—পুনরায় ইহা করিও না; (কারণ, তাহা হইলে) নন্দের কুলের নিন্দা (অর্থাৎ কুপুত্র উৎপন্ন হওয়ায় কলঙ্ক) মজে না অর্থাৎ দূর হইতেছে না।

(৮)

"একদিন মনে রভস কাজ।
মালিনী হইল রসিকরাজ॥" চণ্ডী—৫৭ পৃঃ)

রমণীবাবু 'রভস' শব্দের অর্থ 'রহস্য' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'রভস' শব্দের 'উল্লাস' অর্থই প্রসিদ্ধ। মৈথিলী ও ব্রজবুলি ভাষায় উহা 'উল্লাস' ও 'রতি-কেলি' উভয় অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; 'উল্লাস' অর্থে যথা,—

"দরিদ্র হেম যেন তিলেক না ছাড়ই
রভসে রজনী গোঙায়।" (প-ক-ত—৪৮৯।১৬)

"চাঁদনী রজনী উজোরলি গোরী।
হরি অভিসার রভস-রসে ভোরি॥" (ঐ—৫৫১।৪)

'রতিকেলি' অর্থে যথা,—

"রভস করবি বুঝি বিদগধ রায়।" (ঐ—৪৪।১২)

'রভস' শব্দের 'রহস্য' অর্থাৎ কৌতুক অর্থ পদাবলি-সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, 'রহস্য' এই সংস্কৃত শব্দটির অর্থ গুহ্য বিষয়; যথা,—'শ্যামারহস্য' নামে প্রসিদ্ধ তন্ত্র। 'রহস্য' শব্দ কৌতুক বা রসিকতা করা অর্থে কেবল আধুনিক বাঙ্গালা লেখকগণ কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হইতেছে। চণ্ডীদাসের উদ্ধৃত বাক্যে 'রভস কাজ' শব্দের অর্থ উল্লাসজনক কার্য্য অর্থাৎ স্বয়ং-দূতরূপে ছদ্মবেশে শ্রীরাধার সহিত সমাগম।

(৯)

"কর সমাধান বুঝিলাম কান
আর না বলিহ মোরে।
এতেক গুণে মারহ পরাণে
কেবা শিখাইল তোরে॥" (চণ্ডী—৬৭ পৃঃ

রমণী বাবু—'সমাধান' শব্দের অর্থ 'অবধান' লিখিয়াছেন। সংস্কৃত 'সমাধান' শব্দ ও তাহা হইতে জাত বাঙ্গালা 'সমাধা' শব্দ সমাপ্তি অর্থে প্রসিদ্ধ; উহার 'অবধান' অর্থ হইতে পারে না এবং এ স্থলে সেইরূপ অর্থের কোন বিশেষ সার্থকতাও থাকে না। 'বেন্যানী'-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে সুগন্ধি চুয়া মাখাইয়া, তাহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ সম্ভোগ-বাসনা কৌশলে ব্যক্ত করিলে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের চাতুরী বুঝিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—

"গন্ধের বেতন　　হইল এমন
জীবন যৌবন টানে॥
কর সমাধান　　বুঝিলাম কান
আর না বহিল মোরে।
এতেক গুণে　　মারহ প্রাণে
কেবা শিখাইল তোরে॥"

অর্থাৎ তোমার গন্ধদ্রব্যের এমন মূল্য হইল যে, তাহা জীবন যৌবন ধরিয়া টানিতেছে; হে কৃষ্ণ! (আমি) বুঝিয়াছি, আর আমাকে কিছু বলিও না, (এখন তোমার কৌতুক) শেষ কর অর্থাৎ রঙ্গ-রসে ক্ষান্ত দাও; (তুমি) এই সকল গুণেই ত প্রাণে মারিতেছ;: তোমাকে (এত সব গুণ) কে শিখাইল?

(১০)

"পীরিতি পীরিতি　　পীরিতি অনল
দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেল।
বিষম অনল　　নিবাইল নহে
হিয়ায় রহিল শেল॥" (চণ্ডী—৭৪ পৃঃ)

রমণী বাবু 'নিবাইল নহে' বাক্যের অর্থ করিয়াছেন—"নিবিল না"। "নিবাইল" শব্দটিকে যদি তর্কস্থলে ক্রিয়া-পদ বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও 'নিবাইল' এই নিজন্ত ক্রিয়া-পদের অর্থ 'নির্ব্বাপিত করিল' না হইয়া কিরূপে 'নিবিল' হইবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বলা বাহুল্য যে, এখানে "নির্ব্বাপিত করিল" অর্থ মোটেই খাটে না; কাজেই ব্যাকরণ অনুসারে সঙ্গত না হইলেও রমণীবাবু বাধ্য হইয়া 'নিবিল' অর্থই করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মতে 'নিবাইল' শব্দটি তিঙন্ত ক্রিয়া-পদ নহে; ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা কৃদন্ত যোগ্যার্থক 'ইল' প্রত্যয়ের পদ বটে। যোগ্য ও 'ক্ত' প্রত্যয়ের অর্থে এই কৃদন্ত "ইল" প্রত্যয় হইয়া থাকে। যথা,—কহ+(যোগ্যার্থে) ইল, 'কহিল' অর্থাৎ কহার যোগ্য; কষ্‌+(ক্ত প্রত্যয়ার্থে) ইল, 'কষিল', যাহা কষ্ট করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত যথা—

"সজনি, বড়ই বিদগধ কান।
কহিল নহে সে প্রেম-আরতি
কষিল হেম দশবাণ॥" (প-ক-ত—৪৯০।১৬)

পুনশ্চ—খেপ্ +(ক্ত প্রত্যয়ার্থে) ইল=খেপিল অর্থাৎ যাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছে; রাখ+(যোগ্যার্থে) ইল=রাখিল অর্থাৎ রক্ষা বা ধারণ করার যোগ্য। দৃষ্টান্ত যথা,—

"যে চিতে দড়াঞাছি সেই সে হয়।
খেপিল বাণ যেন রাখিল নয়॥" (প-ক-ত—৬৫৭।৬)

এইরূপে 'নিবাইল' শব্দের অর্থ এখানে "নির্ব্বাণযোগ্য"; "নির্ব্বাপিত করিল" নহে। 'নিবাইল' শব্দের 'নিবিল' অর্থ ব্যাকরণ-মতে সিদ্ধই হইতে পারে না।

(১১)

"সুখের লাগিয়া রন্ধন করিনু
জ্বালাতে জ্বলিল সে।
স্বাদু নহিল জাতি সে গেল
ব্যঞ্জন খাইবে কে॥
সই, ভোজন বিস্বাদ হৈল।
কানুর পীরিতি হেম রসবতী
স্বাদগন্ধ দূরে গেল॥" (চণ্ডী—৭৮ পৃঃ)

রমণীবাবু পাদটীকায় "জ্বালায় জ্বলিল দে" এই পাঠান্তরের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেই পাঠ পরিত্যাগ করিয়া "জ্বালাতে জ্বলিল সে" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় এই পাঠে উদ্ধৃত পদাংশের অপূর্ব্ব ভাবটি নষ্ট হইয়া যায়। এখানে "সে" শব্দে কাহাকে বুঝাইতেছে? নিজকে "এ" বা "এজন" বলিয়া বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু "সে" বলিলে কোনরূপেই নিজকে বুঝায় না। এখানে সে শব্দে শ্রীকৃষ্ণকে কোন মতেই বুঝাইতে পারে না। শ্রীরাধার এই বাক্যের অর্থ এই যে, "সুখের জন্ত রন্ধন করিলাম, দে অর্থাৎ দেহ অগ্নির জ্বালায় জ্বলিল অর্থাৎ আগুনের তাপে পুড়িল; (কিন্তু) সেই রন্ধন সুস্বাদু হইল না; (স্থানাস্থান বিচার না করিয়া রন্ধন করায়) কেবল জাতি গেল অর্থাৎ সদাচার নষ্ট হইল, (কিন্তু) সেই (বিস্বাদ) ব্যঞ্জন কে খাইবে? সখি! আহার বিস্বাদ হইল; কৃষ্ণের প্রেম এরূপ একটি রন্ধন-পাত্র যে, (তাহাতে রন্ধন করায়) (ব্যঞ্জনের) স্বাদ ও (সু) গন্ধ দূরে গেল।" এখানে সংস্কৃত রসবতী শব্দটি রসিকা অর্থে নহে—পাকপাত্র অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। রসবতী শব্দের এই অর্থ সাধারণে জানে না, সুতরাং পাদটীকায় তাহা লিখা উচিত ছিল।

রমণী বাবু অনেক দুরূহ শব্দ কি ভাবে ছাড়িয়া গিয়াছেন, ইহা তাহার একটি

দৃষ্টান্ত বটে। পক্ষান্তরে এইরূপ অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দ্বারা চণ্ডীদাসের সংস্কৃত ভাষায় যে বিশেষ জ্ঞান ছিল, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ চণ্ডীদাসের অনেক পদের রচনা ও ভাবদর্শনে তিনি সংস্কৃত-সাহিত্যে ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়াই প্রতীতি হয়। কৌতূহলী পাঠক চণ্ডীদাসের পূর্ব্বরাগ-বিষয়ক "সজনি ও ধনী কে কহ বটে" ইত্যাদি ২৪ সংখ্যক ও "কাঞ্চনবরণী কে বটে সে ধনী" ইত্যাদি ২৭ সংখ্যক পদ ও রাস-লীলাবিষয়ক ৭৮।৭৯ সংখ্যক পদগুলি হইতে চণ্ডীদাসের সংস্কৃতসাহিত্য-জ্ঞানের পরিচয় লইবেন।

(১২)

"আসিয়া মদন দেয় কদর্থন
অন্তরে জ্বালায় উকি ॥" (চণ্ডী—৮২ পৃঃ)

রমণী বাবু 'কদর্থন' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—কুৎসিত অর্থকরণ। সংস্কৃত কদর্থন শব্দের ঐ অর্থ ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ হইলেও ঐ অর্থে প্রয়োগ দেখা যায় না। এখানে যে ঐরূপ অর্থ একেবারেই খাটে না, তাহা পাঠমাত্রেই প্রতীতি হইতে পারে। এখানে উহার অর্থ—বিড়ম্বনা বা যন্ত্রণা। "উকি" শব্দের অর্থ রমণী বাবু লিখেন নাই। ইহা সংস্কৃত 'উল্কা' কিংবা 'অগ্নি' শব্দ হইতে জাত। সংস্কৃত অগ্নি, অপভ্রংশ—অগ্‌গি, হিন্দী, মৈথিলী আগি, আগ্ শব্দে পরিণত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে আদ্য 'অ'কার, 'আ'কার, 'উ'কার বা 'ই'কার যে অনেক স্থলে পরস্পর পরিবর্ত্তনীয় (interchangeable) তাহা নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। যথা,—

সংস্কৃত—'ইক্ষু', হিন্দী, মৈথিলী ও পূর্ব্ববাঙ্গালা 'উখ', পশ্চিম-বাঙ্গালা 'আঁখ'।

সংস্কৃত অমৃত, হিন্দী—অমৃত্, ইম্রত্, ইম্রিত্। (Fallon কৃত New Hindustani-English অভিধান দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃত—অম্লিকা, হিন্দী—অম্বলী, ইম্‌লি, পূর্ব্ববাঙ্গালা—'আম্‌লি'। সংস্কৃত—অন্ধু, হিন্দী—অন্দারা, ইন্দ্রা, বা ইন্দারা। সংস্কৃত—অঙ্গুলি, হিন্দী—উঙ্গলি। সংস্কৃত—অনুমান, হিন্দী—উনমান। সংস্কৃত—ইন্দুর, মারোয়ারী—উন্দ্রো, পূর্ব্ব-বঙ্গ (বরিশাল) উন্দুর।

শব্দের অন্ত্য 'ক' অক্ষর 'গ' অক্ষরে পরিবর্ত্তিত হওয়ার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই; সংস্কৃত 'কাক', 'শাক', 'বক' প্রভৃতি হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষায় 'কাগ', 'শাগ', 'বগ' ইত্যাদি শব্দে পরিণত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অনুসারে যদিও সংস্কৃত 'অগ্নি' হইতে অপভ্রংশ 'অগ্‌গি' এবং তাহা হইতে 'আগ্' ও 'আগি' শব্দের ন্যায় 'উকি' শব্দ উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব নহে, তথাপি এই 'উকি' শব্দটি উল্কা শব্দ হইতে জাত হওয়াই অধিক সম্ভবপর বটে; সং উল্কা (প্রা—উক্কা) অর্থাৎ প্রজ্বলিত তৃণ-কাষ্ঠাদির খণ্ড অর্থে হিন্দীভাষায় 'লুকা' ও 'উকা' এবং পূর্ব্ববঙ্গে 'উকা' শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

(১৩)

"রমণীমোহন বিলসিতে মন
হইল মরমে পুনি।
গিয়া বৃন্দাবনে বসিলা যতনে
রমিতে বরজ-ধনী ॥" (চণ্ডী—৮৮ পৃঃ)

রমণী বাবু 'পুনি' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—পুনঃ। পুনঃ অর্থে পুনি শব্দের প্রয়োগ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এই 'পুনি' শব্দটি দ্বিতীয় চরণের শেষে না থাকিয়া যদি চতুর্থ চরণের শেষে থাকিত, তাহা হইলে মনে করা যাইতে পারিত যে, পুনঃ শব্দটিই মিলের (Rhyme) অনুরোধে পুনি লিখিত হইয়াছে। এ স্থলে সে অনুমান খাটে না; বিশেষতঃ এখানে পুনঃ শব্দের কোনই সার্থকতা দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতের বিবরণ সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত এই শারদীয় রাস-লীলাই শ্রীকৃষ্ণের প্রথম সম্ভোগ-লীলা। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজাঙ্গনাদিগের ব্রতফল প্রদান করার জন্যই শারদীয় পূর্ণিমা-রজনীতে এই রাস-লীলার অনুষ্ঠান করেন এবং তিনি তাঁহার ব্রজাঙ্গনা-আকর্ষণের মহামন্ত্র সুমধুর বংশীরব দ্বারা তাঁহাদিগকে বিমোহিত করিয়া, যমুনা-পুলিনে আনয়ন করিয়া—

"ব্রজ-নারীগণে দেখিয়া তখন
হাসিয়া নাগর রায়।
রাস-বিলাসন করল রচন
দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায় ॥" (ঐ)

এরূপ স্থলে পুনরায় বিলাস করিতে ইচ্ছা হইল, এরূপ বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমাদিগের মতে 'পুনি' শব্দটি সংস্কৃত 'পূর্ণিমা' শব্দের অপভ্রংশ। মৈথিলী ভাষায় সংস্কৃত পূর্ণিমা 'পুনিম্' হইয়াছে, পুনিম্ শব্দের শেষ হসন্ত 'ম' অক্ষরটি লুপ্ত হইয়া পুনি হইয়াছে। জ্যোতিষের একটি প্রাচীন প্রবচনে এই পুনি শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—

"পুনির 'প' অমার 'তি'।
বাপের ঘরে না যায় ঝি ॥"

অর্থাৎ পুর্ণিমার (শুক্লপক্ষের) প্রতিপৎ ও অমার (অমাবস্যার=কৃষ্ণপক্ষের) তৃতীয়া তিথিতে কন্যা স্বামীর গৃহ হইতে পিতৃগৃহে যাইবে না।*

(১৪)

"পদ উধ কাক কোকিলের ডাক
জানাইল রজনী-শেষ।
তুরিতে নাগরী গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ ॥" (চণ্ডী—১০৪ পৃঃ)

* "কৃষ্ণা তৃতীয়া প্রতিপচ্চ শুক্লা" ইত্যাদি জ্যোতিষ-বচন হইতেই বাঙ্গালা প্রবচন জাত হইয়াছে।

রমণীবাবু 'পদউধ' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'দৈয়াল'। 'পদউধ' শব্দটি সংস্কৃত 'পদায়ুধ' শব্দের অপভ্রংশ এবং উহার অর্থ 'কুক্কুট'। "কুক্কুটশ্চরণায়ুধঃ"—অমরকোষ। বলা বাহুল্য যে, 'চরণায়ুধ' ও 'পদায়ুধ' একার্থবাচক। সংস্কৃত কিংবা পদাবলি-সাহিত্যে শ্যামা, দয়েল প্রভৃতি পক্ষীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সকল পক্ষী কি বৃন্দাবন অঞ্চলে নাই ?

(১৫)

"যখন পীরিতি কৈলা   আনি চাঁদ হাতে দিলা
আপনি করিতা মোর বেশ।
আঁখি আড় নাহি কর   হিয়ার উপরে ধর
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ ॥" (চণ্ডী—১১২ পৃঃ)

রমণীবাবু 'এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ' বাক্যটির অর্থ করিয়াছেন—এখন তোমার সংবাদ পাওয়া যায় না। এখন তোমার দেখা পাওয়া যায় না, ইহাই যে বাক্যটির ভাবার্থ, তাহা সহজেই বুঝা যায়; কিন্তু ঐরূপ অর্থ কিরূপে হয়, তাহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয় বটে। আগে 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ বিচার করা যাউক। সংস্কৃত 'সন্দেশ' শব্দটির অর্থ সংবাদ। কুটুম্ব-বাড়ীর সংবাদাদি জানার জন্য লোক পাঠাইলে ঐ লোকের সহিত অনেক সময়েই মিষ্ট-দ্রব্য পাঠান হয়; বোধ হয়, এই সংশ্রব হইতেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিষ্ট দ্রব্যটি 'সন্দেশ' নামে পরিচিত হইয়াছে। আজকালও পশ্চিমবঙ্গে সংবাদার্থক 'তত্ত্ব' শব্দটি ঐরূপ উপঢৌকন-দ্রব্য অর্থে চলিত কথায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্যমাত্রই দুর্লভ হইয়া থাকে; সেই জন্যই মিষ্টান্নবাচক 'সন্দেশ' শব্দটি চলিত কথায় দুর্লভ পদার্থের উপমাস্থল হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে কোনও একটি জিনিষের দুর্লভতায় বিস্ময় প্রকাশ করিতে হইলে বলা হয়—"এও কি একটা চিনি-সন্দেশ !" চণ্ডীদাসের উদ্ধৃত বাক্যে 'সন্দেশ' শব্দটি 'সংবাদ' ও 'দুর্লভ পদার্থ' ইহার কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। উহার 'সংবাদ' অর্থ করিলে—"এখন তোমাকে দেখিতে সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদ লাগে", এইরূপ অর্থ করিতে হইবে। আর উহার 'দুর্লভ পদার্থ' অর্থ ধরিলে—'এখন তোমাকে দেখিতে (অর্থাৎ তোমাকে দেখা) দুর্লভ পদার্থ'—এইরূপ অর্থ হইবে। 'তোমাকে দেখা' অর্থে 'তোমাকে দেখিতে' বাক্যের প্রয়োগ অপ্রচলিত নহে। 'খাইতে মিষ্ট' বাক্যের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ "খাওয়ার আস্বাদ মিষ্ট।" "দেখিতে সুন্দর" বাক্যের অর্থ "দর্শন বা আকৃতি সুন্দর" ইত্যাদি। 'সন্দেশ' শব্দের 'সংবাদ' অর্থ ধরিলে, "লাগে" এই অপ্রসিদ্ধ ক্রিয়া-পদটি উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হয় এবং সেই অর্থও তেমন উৎকৃষ্ট হয় না, কারণ, সংবাদ দিলেই যদি শ্রীকৃষ্ণের দেখা পাওয়া যাইত, তাহা হইলে শ্রীরাধার সেইরূপ আক্ষেপ করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু বহু চেষ্টায়ও যে এখন তাঁহার দেখা পাওয়া দুর্লভ হইয়াছে, ইহা বলাই শ্রীরাধার উদ্দেশ্য বটে। অতএব আমরা শেষোক্ত অর্থই সঙ্গত

বিবেচনা করি। "এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ" এই গভীরার্থ স্বল্পাক্ষর প্রচলিত বাক্যটি অন্যান্য পদকর্ত্তৃগণও ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

"করিলা পীরিতিময় ফাঁদ। হাতে দিলা আকাশের চাঁদ॥
এবে তোমা দেখিতে সন্দেশ। কহে গোরা করিয়া আবেশ॥"

নরহরি, প-ক-ত—৫৮৫।১৬

(১৬)

"চিকণ চূড়ার ছাঁদ কে নিলে বরিহা ফাঁদ
আজি কেন পিঠে দোলে বেণী।" (চণ্ডী—২০২ পৃঃ)

রমণীবাবু 'বরিহা' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"(হিন্দী) উৎকৃষ্ট"। হিন্দীতে 'বঢ়িয়া' শব্দ 'উৎকৃষ্ট' অর্থে ব্যবহৃত হয় বটে; কিন্তু সেই 'বঢ়িয়া' ও এই 'বরিহা' শব্দ সম্পূর্ণ পৃথক্। হিন্দী 'বঢ়িয়া' সংস্কৃত বৰ্দ্ধ ও প্রাকৃত 'বড্ঢ' ধাতু হইতে জাত; ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (Literal meening) 'বাড়ন্ত' অর্থাৎ বৃদ্ধিশীল; তাহা হইতেই 'উৎকৃষ্ট' অর্থ আসিয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যে এই 'বঢ়িয়া' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। 'বরিহা' শব্দ সেই 'বঢ়িয়া' হইলে 'ঢ়' স্থলে 'র' হওয়ার কোন কারণ নাই, বিশেষতঃ এ স্থলে 'উৎকৃষ্ট' অর্থের কোন সার্থকতাও দেখা যায় না। আমাদিগের মতে ইহা সংস্কৃত 'বর্হ' (ময়ূরপুচ্ছ) শব্দের অপভ্রংশ বটে। তুলনা করুন,—

"কুন্তল-কুসুমদাম হরি নেল।
বরিহা-মাল পুনহি মুঝে দেল॥" বিদ্যাপতি, (প-ক-ত—৫৩৪।১৭)

(১৭)

"সখি, ধরবি কানুর কর।
আপনা বলিয়া বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥" (চণ্ডী—২২৫ পৃঃ)

রমণীবাবু "বোল না তেজবি" বাক্যের অর্থ লিখিয়াছেন—"কথা কহিতে ছাড়িও না।" শ্রীকৃষ্ণ আপনার লোক বলিয়া তাঁহাকে কথা কহিতে ছাড়িবে না অর্থাৎ তাঁহাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিবে—এইরূপ অর্থ যদি কোনরূপে করাও যায়, তাহা হইলেও এ স্থলে উহা সঙ্গত হয় না। যেখানে শ্রীরাধা সখীকে শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরিয়া, মিনতি করিয়া করুণা-ভিক্ষা করার জন্য উপদেশ দিতেছেন, সেখানে "শ্রীকৃষ্ণকে শক্ত শক্ত দু'কথা শুনাইয়া দিবে", এ ভাব মনেই আসে না। তারপর ঐরূপ অর্থ করিলে শ্রীরাধা সখীকে শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে কি বর মাগিয়া লইতে বলিতেছেন, তাহা না বলায়, কথাটা সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। আমাদিগের বিবেচনায়, "আপনা বলিয়া বোল না তেজবি" এই বাক্যটিই "মাগিয়া লইবি" সকর্ম্মক ক্রিয়াপদের কর্ম্ম-পদ বটে। এই কয়েক পংক্তির অর্থ এই যে,—"সখি! কানুর কর ধরবি এবং তাঁহার নিকট

হইতে এই কৃপাভিক্ষা করিয়া লইবি যে, শ্রীরাধা যে আপনা অর্থাৎ আপনার জন বলিয়া কথা আছে, সেই কথা ত্যাগ করিও না অর্থাৎ তুমি যাহাই কেন না কর, শ্রীরাধাকে আপনার জন মনে করিতে ভুলিও না, শুধু এই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিও।" ইহার সদৃশ ভাব বিদ্যাপতির পদে যথা,—

"পরিজন-গণনায় লিহে মোর নাম।"

(১৮)

অগাধ জলের　　　মকর যেমন
না জানে মিঠ কি তীত।" (চণ্ডী—২২৯ পৃঃ)

রমণীবাবু 'তীত' শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—'ঝাল'। সংস্কৃত 'তিক্ত' শব্দ হইতে অপভ্রংশ 'তিতা' ও 'তিত' শব্দ হইয়াছে ; সুতরাং ইহার 'ঝাল' অর্থ কোনরূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। তুলনা করুন,—

"তিতায় তিতিল দেহ মীঠ হবে কেন।
জলন্ত অনলে মোর পুড়িছে পরাণ॥" (চণ্ডী—১৭১।১)

বলা বাহুল্য যে, এ স্থলে 'তিতিল' শব্দটি 'তিক্ত হইল' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—'সিক্ত হইল' অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

পুনশ্চ—

"তিতা কৈল দেহ মোর ননদী বচনে।
কত না সহিব জ্বালা এ পাপ পরাণে॥" (চণ্ডী—১৩৮।৬)

(১৯)

"প্রেমের সাধন　　　শুন সর্ব্বজন
অতি সে নিগূঢ় রস।
যখন সাধন　　　করিবা তখন
এড়ায় টানিবা শ্বাস॥" (চণ্ডী—২৭৩ পৃঃ)

'এড়ায়' শব্দের কোন অর্থ হয় না—রমণী বাবুও কোন অর্থ লিখেন নাই। আমাদিগের বোধ হয়, 'ঈড়ায়' শব্দটিই নিরক্ষর লিপিকারদিগের হাতে পড়িয়া 'এড়ায়' হইয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণনাসাস্থিত ঈড়া নাড়ীতে শ্বাস চলার সময়ে জপ-ধ্যান—ইত্যাদি সাধনকার্য্য করার ব্যবস্থা স্বরোদয়-শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সহজিয়া-মতাবলম্বীদিগের ব্যবহারও সেইরূপ বটে। অতএব 'এড়ায়' শব্দে যে এখানে 'ঈড়ায়' বুঝিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

চণ্ডীদাসের "রাগাত্মিক পদ" নাম দিয়া রমণীবাবু ৫১টি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন,—রসিক ভক্তগণের সাধন-প্রণালীর নাম "রাগাত্মিক"। কিন্তু ইহা

রাগাত্মিক পদ ও "সহজ"-সাধন।

দ্বারা রাগাত্মিক শব্দটির অর্থ বুঝা যায় না। আমাদিগের বিবেচনা হয়, সংস্কৃত 'রাগাত্মক' শব্দটিই 'রাগাত্মিক' শব্দে পরিণত হইয়াছে। ইহার অর্থ প্রেম-মূলক উপাসনা। এই রাগাত্মিক পদাবলির নানাস্থলেই সহজ-ভজন (২৫৭।৮), সহজ-পীরিতি (২৭৭।১০), সহজরীত (২৭৭।১৭) ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। রমণীবাবু বোধ হয় 'সহজ' শব্দটি সহজ মনে করিয়াই তাহার কোন অর্থ লিখেন নাই; কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় শব্দটি কিছু কঠিন; তাই উহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সংস্কৃত 'সহজ' শব্দটির অভিধেয় অর্থ (Literal meaning) সহ-জাত। এই সহ-জাত অর্থ হইতেই সহজ শব্দের স্বাভাবিক অর্থ আসিয়াছে। যাহা যে ব্যক্তির পক্ষে স্বাভাবিক, তাহা তাহার পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয় বলিয়াই ঐ স্বাভাবিক অর্থ হইতে 'সোজা' অর্থ হইয়াছে। পদাবলি-সাহিত্যে 'সহজ' শব্দটি কুত্রাপি সরল বা সোজা * অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"কহ কবিরঞ্জন সহজ মধুরাই।"

(প-ক-ত—১৯১।৯)

'সহজ' শব্দের অর্থ স্বাভাবিক, সুতরাং 'সহজে' শব্দের অর্থ "স্বভাব অনুসারে" বা স্বভাবতঃ।

"সহজে আমরা বালা।
কে জানে এতহুঁ কলা॥" (ঐ—১৮১।৫)
"ধনী সহজে রাজার ঝি।" ইত্যাদি। (ঐ—২৩০।১৪)

চণ্ডীদাস 'সহজ-ভজন', 'সহজ-পীরিতি', 'সহজ রীত' ইত্যাদি স্থলে সহজ শব্দটি এই স্বাভাবিক অর্থেই প্রয়োগ করিয়াছেন। 'সহজিয়া' অর্থাৎ সহজ-ভজনাবলম্বীদিগের মতে সংসারী ব্যক্তিগণ প্রিয়তমা কামিনীর প্রতি যে দুশ্চেছ্য প্রেমপাশে আকৃষ্ট হইয়া সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া থাকে, তাহাদিগের পক্ষে সেই দুর্দ্দমনীয় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, বৈরাগ্য-পথাবলম্বী হইয়া প্রেমময় ভগবানের আরাধনা করা একরূপ অসাধ্য বটে; বিশেষতঃ প্রেমময় ভগবান্‌কে লাভ করিতে যাইয়া প্রেমের সাহায্য উপেক্ষা করা কোনরূপেই সুবিধাজনক হইতে পারে না; এজন্য সহজিয়া-মতের সাধক প্রিয়তমা কামিনীর সহিত প্রেম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া, সেই প্রেমের সাহায্যেই শ্রীভগবানের রাগানুগ-সাধনের পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এই 'সহজ'

* অপভ্রংশ 'সোজা' শব্দটি 'সহজাত' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া আছে, সং—সহজাত, অপভ্রংশ—সজ্জাঅ, স-উজা, সোজা।

অর্থাৎ স্বভাবতঃ আনন্দজনক ভজন-পদ্ধতিই রাগানুগ ভক্ত চণ্ডীদাস কর্ত্তৃক 'সহজভজন', 'সহজ পীরিতি' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত সহজিয়া-মতের তাৎপর্য্য দুর্বোধ্য নহে; কিন্তু কামভাব-কলুষিত সাধারণ নায়ক-নায়িকার অপূর্ণ প্রেম হইতে কামগন্ধবিরহিত আদর্শ পূর্ণপ্রেম লাভ করার উদ্দেশ্যে সহজিয়া-মতাবলম্বিগণ হঠযোগের প্রণালীতে যে কতকগুলি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহা একান্ত নিগূঢ় এবং তাহার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ আছে। এই সাধনপ্রক্রিয়া গুহ্য এবং গুরুর নিকট শিক্ষা ও অভ্যাস না করিলে শুধু বর্ণনা পড়িয়া বোধগম্য হয় না বলিয়াই চণ্ডীদাস উহার সম্বন্ধে স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া ব্যতীত স্পষ্টভাবে কিছু লিখেন নাই। কিন্তু তিনি তাঁহার ধর্ম্মমতের প্রধান উদ্দেশ্যটি অনেক রাগাত্মিক পদে অল্প কথায় বেশ পরিস্ফুট করিয়াছেন। আমরা কৌতূহলী পাঠকদিগের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম,—

"শুন রজকিনী রামি।
ও দুটি চরণ　　　শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি॥
তুমি বেদ-বাদিনী　　　হরের ঘরণী
তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে　　　ত্রিসন্ধ্যা যাজনে
তুমি সে গলার হারা॥
রজকিনীরূপ　　　কিশোরীস্বরূপ
কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনীপ্রেম　　　নিকষিত হেম
বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"　(চণ্ডী—২৫৯ পৃঃ)

এই পদটি হইতে চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম-সাধনার আশ্রয়শক্তি-রূপিণী রামীকে যে উপাস্য দেবতা ভাবিয়া তাঁহার সহিত প্রেম-সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কাম-গন্ধ-হীন অবিনশ্বর প্রেম-ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়।

যদিও প্রেম গৃহীর পক্ষে সহজ অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ বটে, কিন্তু অখণ্ড মায়াবিমূঢ় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে পার্থক্য, গৃহীর কাম-কলুষিত নশ্বর প্রেমের সহিতও কাম-গন্ধহীন অবিনশ্বর পূর্ণপ্রেমের সেইরূপ পার্থক্য বটে। সুতরাং তাহা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইলেও উহা সহজসাধ্য নহে। এই কথাটি বুঝাইবার জন্যই চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে।
তিমির অন্ধকার যে হৈয়াছে পার
সহজ জেনেছে সে ॥" (চণ্ডী—২৮১ পৃঃ)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মায়াকে অতিক্রম করিয়া পূর্ণপ্রেমময় ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকৃত 'সহজ' অর্থাৎ প্রেম যে কি বস্তু, তাহা জানিতে পারে।

চণ্ডীদাসের প্রচারিত এই "সহজ" বা "রাগাত্মিক" সাধন-পদ্ধতির উৎপত্তির সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ ইহা নাগার্জ্জুনের প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ মহাযান-মত ও তদনুযায়ী তান্ত্রিক মত হইতে উদ্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। তাহা যে প্রকৃত নহে, পরকীয়া-সাধনমূলক উপাসনা যে প্রাচীনতর ছান্দোগ্য উপনিষদেও দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

উপসংহার

চণ্ডীদাসের জীবন-চরিত্রের ও তাঁহার কবিত্বের কিংবদন্তীমূলক ঘটনাবলির সম্বন্ধে অনেক লেখকই ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। চণ্ডীদাস যে ভাবের প্রগাঢ়তায় বৈষ্ণব কবি-গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, প্রায় সকল সমালোচকই তাহা স্বীকার করিয়াছেন; মনীষী প্রতীচ্য সমালোচক ম্যাথু আর্ণল্ডের সুপ্রসিদ্ধ মতানুসারে মানব-জীবনের উদ্দেশ্য (Criticism of life) কাব্যে পরিস্ফুট করাই যদি শ্রেষ্ঠ কবিতার পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে চণ্ডীদাসের কবিতাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়

গন্ধতৈল-পরীক্ষাপ্রণালী*

বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের নাম সকলেই জ্ঞাত আছেন। উক্ত কারখানায় প্রস্তুত যমানি জলের নামও অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। এই জল প্রস্তুত করিবার জন্য উক্ত কোম্পানী প্রায় প্রতি মাসে প্রচুর যমানি খরিদ করিয়া থাকেন। যমানি খরিদ করিবার পূর্ব্বে উহার গুণ (quality) পরীক্ষা করা হয়। যমানিতে এক প্রকার "গন্ধতৈল" (aromatic or volatile oil) আছে। জলের সহিত যমানি চোয়াইলে ঐ তৈল জলসহ পাতিত হয়। পরে ঐ জলের উপর যমানির তৈল ভাসিয়া উঠে। ঐ তৈল জলেও অতি সামান্য পরিমাণে দ্রব হয়। এই গন্ধতৈলের প্রধান উপাদান থাইমল (thymol); উহার স্বাদ অত্যন্ত রূক্ষ (ঝাল), সেইজন্য যমানির জল রূক্ষস্বাদসম্পন্ন।

সাধারণতঃ যে যমানি হইতে যত অধিক পরিমাণে গন্ধতৈল পাওয়া যায়, সেই যমানি তত অধিক রূক্ষ এবং সেই অনুপাতে উহার মূল্য স্থির করা হয়।

যমানিতে† কতখানি গন্ধতৈল আছে, তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে পরীক্ষা করা হয়;—একটি কাচ বা ধাতুনির্ম্মিত (সাধারণতঃ কলাই-করা তামার) ভাণ্ডে (flask) কিছু জল ও ওজন করিয়া যমানি রাখা হয়। ঐ পাতনভাণ্ডের সহিত পাতননল (condensor) জুড়িয়া দিয়া তির্য্যক্‌পাতন দ্বারা উহার স্বত্ব পাতিত হয় এবং ঐ সময়ে পাতননল শীতল রাখিবার ব্যবস্থা করা হয়। পাতিত জল বকভাণ্ডে (florentine flask) গৃহীত হয়। পাতনভাণ্ডস্থিত জল দুই ভাবে ফুটানো যায়।

১ম। যমানি ও জলসহ ভাণ্ডটি আগুনে বসাইয়া উহার জল ফুটানো এবং উহার বাষ্প পাতননলে শীতল করিয়া উহা সংগ্রহ করা। এই প্রক্রিয়ায় ভাণ্ডে প্রচুর জল দিতে হয়।

২য়। অন্য পাত্র (যেমন বয়লার) হইতে জলীয় বাষ্প (steam) এই ভাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করাইয়া ভাণ্ডস্থ জল ফুটানো ও তদুত্থিত বাষ্প পাতননলে শীতল করিয়া সংগ্রহ করা। এই প্রক্রিয়ায় ভাণ্ডে সামান্য পরিমাণ জল থাকিলেই চলে।

সাধারণতঃ রসশালায় (Laboratory) দ্বিতীয় ব্যবস্থামত কার্য্য করা হয়। পরীক্ষানলে (test tube) পাতিত জল যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঘোলা দেখা যায়, ততক্ষণ পাতন করা হয়। যখন দেখা যায় যে, তৈলাক্ত জল আর আসিতেছে না, তখন সমস্ত পাতিত জল একত্র করিয়া 'গালন ফুঁদেল'এর (separating funnel) ভিতর থিতাইতে দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা পরে সমস্ত গন্ধতৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন তলস্থিত জল প্রায় স্বচ্ছ হইয়া আসে। এই অবস্থায় ফুঁদেলের নীচের ছিপি খুলিয়া জল বাহির করিয়া দিয়া কতখানি গন্ধতৈল পাওয়া গেল, তাহা মাপিয়া দেখা হয়। ‡

---

* চট্টগ্রাম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত। † যমানি ভিন্ন অন্যান্য গন্ধতৈলাক্ত দ্রব্যও এইভাবে পরীক্ষিত হয়।

‡ অতি সামান্য গন্ধতৈল জলে দ্রবভাবে থাকিয়া যায়। সেইজন্য বিশেষ সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিতে হইলে পাতিত জলে কিছু লবণ দ্রব করিতে হয়। তাহা হইলে আরও কম তৈল জলে দ্রব হইবে এবং অধিক তৈল ভাসিয়া উঠিবে। তাহার পর ইথার বা কেরোসিন ইথারের (petroleum ether) সহিত নাড়িলে সমস্ত তৈল

এই প্রক্রিয়ার অসুবিধা এই যে, পাতিত গন্ধতৈল মাপা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কোন জিনিষে প্রচুর পরিমাণে গন্ধতৈল থাকিলে এই প্রক্রিয়ায় কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে, নচেৎ প্রথম পাত্র হইতে মাপিবার চোঙ্গায় (measuring cylinder) ঢালিবার সময় পাত্রের গায়েই অধিকাংশ তৈল লাগিয়া যায়, বিশেষ যদি কয়েক ফোঁটা মাত্র তৈল পাওয়া যায়। পাদটীকায় লিখিতমতে ইথার দিয়া তৈল নিষ্কাষণ অত্যন্ত ব্যয় ও সময়সাপেক্ষ।
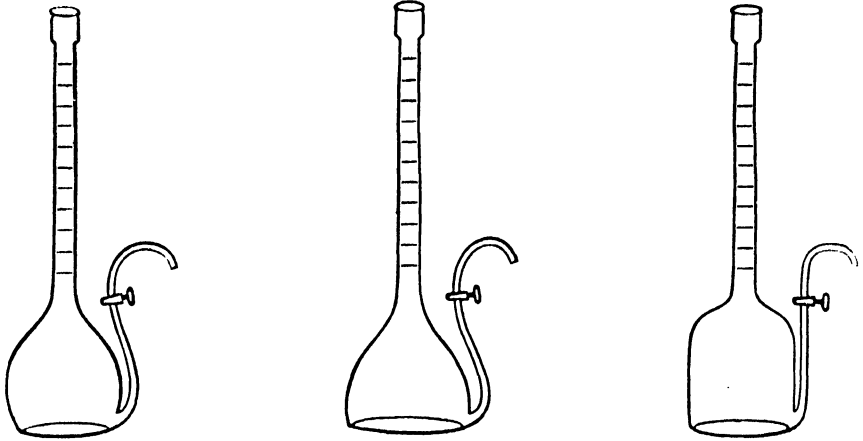
এই সকল অসুবিধা দূর করিয়া অতি সহজে ও সরলভাবে গন্ধতৈল মাপিবার জন্য আমি যে যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহারই বিবরণ এইবার আপনাদিগকে জানাইব। যন্ত্রটি অতি সামান্য, গঠনও অতি সোজা, একটি লম্বগ্রীব কাচকুপির (long-necked flask) তলা হইতে একটি হংসগ্রীব বাহির হইয়াছে। ঐ হংসগ্রীব নলের মাঝে একটি ছিপি আছে।* যন্ত্রের গ্রীবাদেশ ১০ কিউবিক সেন্টিমিটারে (cubic centimetre) ভাগ করা। প্রতি সি-সি (c. c.) আবার দশ ভাগে বিভক্ত। মোটামুটি ১৫ ফোঁটায় এক সি সি হয়। অতএব এই যন্ত্রদ্বারা দেড়ফোঁটা তৈল মাপা যাইবে। এই যন্ত্রের আমি নাম দিয়াছি "তৈলমিটার" বা তৈলমাপক যন্ত্র।

নিম্নলিখিত ভাবে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। কোন গন্ধতৈলাক্ত দ্রব্য পরীক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বের ন্যায় উহা তির্য্যক্ পাতনযন্ত্রের সাহায্যে চোলাই করিতে হয় এবং বকভাণ্ডের পরিবর্ত্তে 'তৈলমিটারে' পাতিত জল সংগ্রহ করিতে হয়। চোলাই শেষ হইলে তৈলমিটারের বক্রনালীর ছিপি বন্ধ করিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত গলদেশের দাগের মধ্যে সমস্ত তৈল না আসে, ততক্ষণ জল ঢালিবে। পরে থিতাইলে দাগদৃষ্টে কতখানি তৈল পাওয়া গেল, জানা যাইবে। এই যন্ত্রসাহায্যে ভারতীয় গন্ধদ্রব্য ও তাহাদের উপাদানসমূহের বিশ্লেষণ করা হইতেছে; উহার ফলাফল বারান্তরে প্রকাশ করিব। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইথারে দ্রব হইবে। এক্ষণে ইথার আলাহিদা করিয়া একটু গরম করিলে বা খোলা জায়গায় রাখিলে সমস্ত ইথার উঠিয়া যাইবে এবং গন্ধতৈল পড়িয়া থাকিবে। তখন উহা মাপা বা ওজন করা হয়।

* ভাণ্ডের বিভিন্ন আকার অনুসারে যন্ত্রের তিন প্রকার নক্সা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। (চিত্র দেখ)। এক্ষণে পরীক্ষা দ্বারা প্রথম নক্সানুযায়ী যন্ত্রই উত্তম সাব্যস্ত হইয়াছে।

সরিফপুরের লৌহমল

ভূমিকা

প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে "Magrahat Drainage Scheme" অনুসারে ডায়মণ্ডহারবার সবডিভিসনের অন্তর্গত উস্তির খাল খননকালে জাহাঙ্গীরগড় ও হেজল হাটের দক্ষিণ-পশ্চিমে সরিফপুরের নিকট বহুপরিমাণে লৌহমল বাহির হয় এবং এই স্থানের দুই এক মাইলের মধ্যে পলির ভিতর হইতে জাহাজের মাস্তুল, তক্তা ও শৃঙ্খল, হস্তী, অশ্ব ও মানুষের অস্থি (অশ্ব ও মনুষ্যের অস্থির কয়েকটি যেন তীক্ষ্ণ অস্ত্রাঘাতে সুন্দরভাবে কাটা), শ্লেটে খোদিত নরমূর্ত্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হয়।

যে স্থানে লৌহমল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ও তাহার নিকটে কোন স্থানে একশত বৎসরের ভিতর কোন বড় কামারশালার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ শুনা যায় না। ইহার নিকটে জাহাঙ্গীরগড়, ঘোলা, হেজলহাট, তুল্যাণ প্রভৃতি স্থানে পুরাতন গড়ের নিদর্শন এখনও কিছু কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল স্থান খনন করিলে, প্রথমে নানা বর্ণের কর্দ্দমস্তর, তৎপরে গাছের গুঁড়ি, হরিণ ও মহিষের শিং, ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন ইত্যাদি যুক্ত ঈষদঙ্গারীভূত তৃণের স্তর ও তৎপরে কাল রঙের কর্দ্দম ও সকলের নিম্নে শাদা বালি (নদীমধ্যবর্ত্তী চরের ঝুরঝুরে বালির মত) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শাদা বালিতে মৎস্যের অস্থি আবিষ্কৃত হয়। ইহা উদ্ধার হইলে পচাগন্ধ বাহির হইয়াছিল। এই শাদা বালি ১৮ হইতে ২১ ফুট পরে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত স্থানসমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থানগুলি ঈষৎ নিম্ন এবং এই স্থানে ১ হইতে ১½ হস্তপ্রমাণ মাটীর পরই শাদা বালি দৃষ্ট হয়। এইরূপ বালি বহু নিম্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। গত শত বৎসরের পূর্ব্বভাগে বহু মরা খালের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবাদ শুনা যায়। এই সকল হইতে অনুমান হয়, মগরাহাটের পশ্চিমদিক্ হইতে একটি প্রকাণ্ড নদী বহির্গত হইয়া বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবারের কিছু দক্ষিণে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল। কালে ইহার মোহানায় বহু দ্বীপের সৃষ্টি হয় ও বৃহৎ নদীটিকে বহু শাখায় পরিণত করে। এই শাখাগুলিও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে ও তন্মধ্যে কতকগুলি গত শতবৎসরের মধ্যভাগে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীরগড়, ঘোলা, হেজলহাট, বাঁশবন হাটা, উস্তি ও তুল্যাণ প্রভৃতি স্থানগুলি পূর্ব্বে দ্বীপ ছিল ও এই সকল স্থানের মধ্য দিয়া শাখানদীগুলি প্রবাহিত হইত। এই প্রদেশে কিম্বদন্তী আছে যে, এই দ্বীপগুলি মুসলমান-রাজত্বকালে পর্ত্তুগীজদিগের আক্রমণে বাঁধা প্রদান করিবার জন্য যুদ্ধোপ-যোগী নৌবহররূপে ব্যবহৃত হইত। দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজ-আক্রমণেই এই সকল স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও কালে সুন্দরবনে পরিণত হয়। ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই এই সকল স্থানে পুনরায় লোকবসতি আরম্ভ হয়। উক্ত শাখানদীগুলির ভিতর যেটি চক্রদহ, কেলে-ঘাই, হেজলহাট, জাহাঙ্গীরগড়, সরিফপুর, বাঁশবনহাটা প্রভৃতি স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, সেটি একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এই স্থান দিয়া উস্তির নূতন খাল কাটা হয়। ইহা ব্যতীত উস্তির চতুর্দ্দিকে স্বাভাবিক খাল ছিল, তাহাও কাটা হইয়াছে। লৌহমল উস্তির নূতন খালে

সরিফপুরের নিকট পাওয়া যায়। আমার অনুমান হয়, এই লৌহমলের সঙ্গে মুসলমানদিগের উক্ত নৌবহরের সম্পর্ক আছে।

যাহাই হউক, এই লৌহমলের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এই প্রবন্ধে লৌহমলের গুণ আলোচিত হইবে। লৌহমলের পরীক্ষা আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্বের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, এফ্ জি এস্ মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে করিয়াছি।

লৌহমলের অবস্থিতির বিবরণ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, এই লৌহমল সরিফপুরের নিকট খাল খননকালে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে সর্ব্বোচ্চে অতি সূক্ষ্ম পলি কর্দ্দম। ইহার থাড়াই প্রায় ১½ হস্ত হইবে। এই কর্দ্দমের রং ঈষৎ কাল। ইহার পর বহু কঙ্কর প্রাপ্ত হওয়া যায়। কঙ্করের সহিত লোহিতাভ পিঙ্গলবর্ণের কিংবা পিঙ্গলাভ কাল বর্ণের কঠিন চোঙ্গ পাওয়া যায়। কঙ্কর ও চোঙ্গগুলি শাদা বালিতে দৃষ্ট হয়। ক্রমে যত নিম্নে যাওয়া যায়, কঙ্কর ও চোঙ্গের সংখ্যা ততই কমিয়া যায় ও বালির কণাগুলির আয়তন বৃদ্ধি হয়। এই সমস্ত চোঙ্গ শাদা বালির উপরের ১ হইতে ১¾ হস্তের ভিতর পাওয়া যায়। শাদা বালি বহু নিম্ন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। এই বালিগুলি নদীমধ্যস্থ নূতন চরের ঝরঝরে শাদা বালির মত। শাদা বালির উপরিভাগে কঙ্কর ও চোঙ্গ ব্যতীত ক্ষুদ্র তরঙ্গচিহ্ন, রৌদ্র হেতু ফাটলযুক্ত সূক্ষ্ম কর্দ্দমস্তর, স্থানে স্থানে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু শক্ত ও নমনীয় কর্দ্দমস্তর; কেঁচো নরম পলির উপর দিয়া চলিয়া গেলে যেরূপ দাগ পড়ে, ঐরূপ দাগ-যুক্ত সূক্ষ্ম কর্দ্দমস্তর পরিলক্ষিত হয়। শাদা বালির উপরিভাগে যে পর্য্যন্ত উক্ত চোঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার ভিতর এগুলি সকল অবস্থাতেই দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, বালিতে একটি ·০১ কি ·০২ সেন্টিমিটার লম্বা সূচের মত সূক্ষ্ম ছিদ্র হইয়াছে ও ঐ ছিদ্রকেন্দ্র লইয়া একটি পিঙ্গলবর্ণের ·০১ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত চক্র উৎপন্ন হইয়াছে। পিঙ্গলবর্ণ কেন্দ্রে গাঢ় ও ক্রমে ফেকাসে হইয়া দূরে একেবারে বর্ণশূন্য হইয়াছে ও শাদা বালিতে ক্রমে মিশিয়া গিয়াছে। বালির সহিত এই পিঙ্গলবর্ণের চক্র বা চোঙ্গগুলির কোনও বিচ্ছেদ নাই। চক্র বা চোঙ্গগুলির কেন্দ্রের ছিদ্র অতি সূক্ষ্ম হইতে ঝাঁটার কাঠির মত স্থূল দেখা যায়। রঙ্ও কেন্দ্রে অতি ফেকাসে পিঙ্গল হইতে গাঢ় পিঙ্গল লক্ষিত হয়। এমন কি, স্থানে স্থানে ছিদ্র হইয়াছে, কিন্তু পিঙ্গলবর্ণ একেবারেই দৃষ্ট হয় না; যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সামান্য। কেবল যে এগুলি বালিতেই দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, এই শাদা বালিমধ্যস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্দ্দমস্তরেও দৃষ্ট হয়। যে স্থানে চোঙ্গগুলি উৎপন্ন হইয়াছে, সে স্থানে একটি কি দুইটি থাকে না, অসংখ্য চোঙ্গ একটি আর একটিকে ভেদ করিয়া অতি কম পরিসরের ভিতর অবস্থিত। গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের চোঙ্গ-গুলি বিশেষ কঠিন। যেগুলি বর্ণে যতই ফেকাসে, সেগুলি ততই কম কঠিন। একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, কম কঠিন ফেকাসে পিঙ্গলবর্ণের চোঙ্গগুলিই কঠিন ও গাঢ়

পিঙ্গলবর্ণের চোঙ্গগুলিতে কাটিয়া গিয়াছে। যেগুলি যতই কম কঠিন ও ফেকাসে রঙের, সেগুলি ততই নূতন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ চোঙ্গগুলির সহিত বালির কোনও বিচ্ছেদ নাই। স্থানে স্থানে বিচ্ছেদ লক্ষিত হয়। এ স্থানের চোঙ্গগুলি অত্যধিক কঠিন ও রঙেও বিশেষ রকমের গাঢ়। এই চোঙ্গগুলি পূর্ব্বোক্ত চোঙ্গগুলির মত যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই স্থানেই অবস্থিত নহে, কিছু দূরে উৎপন্ন হইয়া পরে জলস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া এই স্থানে পড়িয়াছে।

চোঙ্গগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অতিমাত্রায় লৌহের প্রমাণ দেয়। যেগুলি যত গাঢ় পিঙ্গলবর্ণের, সেগুলিতে তত বেশী লৌহ লক্ষিত হয়। যেগুলি ফেকাসে পিঙ্গলবর্ণের, সে-গুলিতে লৌহ কম। চোঙ্গগুলি জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের (hydrochloric acid) সাহায্যে বুড়্বুড়ি দেয় না। চোঙ্গগুলিতে কর্দ্দম ও বালি দৃষ্ট হয়। বালিগুলি স্থানীয় শাদা বালির মত।

শাদা বালির উপরিভাগে যে সকল কঙ্কর দেখা যায়, উহা জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে অত্যধিক বুড়্বুড়ি দেয়। ইহাতে লৌহের অস্তিত্ব একেবারেই দৃষ্ট হয় না। যখন লৌহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অতি কম। কঙ্করগুলির ভিতর বালি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বালির গুণও স্থানীয় শাদা বালির মত। শাদা বালিতে কঙ্কর ও চোঙ্গের পর কিছু নিম্নে লৌহমল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আপেক্ষিক গুরুত্বের তালিকা,—ঝর্‌ঝরে শাদা বালি—২'৬৬; অর্দ্ধ কর্দ্দমযুক্ত বালি ২'৩১৬, কর্দ্দম ২'০১০; কঙ্কর ২'৫৩৪; চোঙ্গ ২'০২৫।

লৌহমলের গুণ

লৌহমলগুলির ভিতর কিছু কিছু প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রভেদ ধরিয়া মোটামুটী লৌহ-মলগুলি 'ক', 'খ' ও 'গ' এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি বর্ণনা করিলাম।

ক-চিহ্নিত লৌহমলটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩'৩৬৩—৩'৬১৭। ইহার আভা ঈষৎ ধাতুর মত। রঙ্ কাল, কিন্তু স্থানে স্থানে ঈষৎ পাংশুবর্ণের। ঘর্ষণজাত গুঁড়ার রঙ্ কাল ও স্থানে স্থানে ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণের। ছুরী দ্বারা অতি কষ্টে আঁচড় দেওয়া যায়; ভাঙ্গিলে অসমতল দৃষ্ট হয়। চুম্বক দ্বারা অতি সূক্ষ্ম গুঁড়ার কতক আকৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে; অতি নরম লৌহতারের অতি সূক্ষ্ম অগ্রভাগ গুঁড়ার কতকগুলিকে আকৃষ্ট করে, অবশিষ্টকে করে না, কণাগুলিতে চৌম্বক মেরু উৎপন্ন হইয়াছে; কারণ, প্রত্যেক কণাটির সর্ব্বদিক্ সমভাবে আকৃষ্ট হয় না। স্থানে স্থানে পিঙ্গলবর্ণের মরিচা লক্ষিত হয়।

খ-চিহ্নিত লৌহমলটির আপেক্ষিক গুরুত্ব ২'২০০-২'২০৩। ইহার আভা কাচের মত; রঙ্ স্থানে স্থানে শাদা ও পাংশু এবং কয়েক স্থানে পিঙ্গল। ঘর্ষণজাত গুঁড়ার রঙ্ পাংশু, কখন বা রঙ্‌শূন্য। ছুরীদ্বারা আঁচড় দেওয়া যায় না; কাচে অতি কষ্টে অতি সূক্ষ্ম দাগ পড়ে। অন্যান্য বিষয়ে ইহা সাধারণতঃ 'ক'-চিহ্নিত মলের ন্যায়।

গ-চিহ্নিত লৌহমলটির আপেক্ষিক গুরুত্ব—২'০১৭-২'১৩৫। ইহার আভা কাচের মত; রঙ্ স্থানে স্থানে শাদা ও পাংশু এবং কয়েক স্থানে পিঙ্গল। ঘর্ষণজাত গুঁড়ার রঙ্ ঈষৎ পাংশু,

কখন বা রঙ্‌শূন্য। ছুরী দ্বারা আঁচড় দেওয়া যায় না, কাচে অতি কষ্টে অতি সূক্ষ্ম আঁচড় দেওয়া যায়। চুম্বক ও অতি সূক্ষ্ম নরম লৌহ দ্বারা ইহার গুঁড়া আকৃষ্ট হইতে দেখা যায় না। 'ক' ও 'খ'এর ন্যায় ইহাতে কতক স্থানে পিঙ্গল মরিচা এবং কয়লার আঁইস দৃষ্ট হয়।

রাসায়নিক উপাদান—ক ও গ-চিহ্নিত লৌহমলগুলি জলমিশ্রিত লৌহদ্রাবের সাহায্যে বুড়্‌বুড়ি দেয় না, কিন্তু খ-চিহ্নিত লৌহমলটির দুই এক স্থানে অল্প বুড়বুড় দেয়।

লৌহমলগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	MgO	CaO	Na_2O	K_2O	H_2O	MnO	C
ক	১২'৭৬	১১'২৫	২৭'৩১	১৯'৫০	২১'০২	কিঞ্চিৎ	কিঞ্চিৎ	১'৪৫	৫'৮৩	...
খ	৪২'৫৬	৭'৫৩	১৩'২৬	১৪'৫১	১৭'২৪	'০৫	'০১	২'৫৩	২'৩	'১৭
গ	৫৯'৩৪	৬'৯৯	৫'২১	৯'৪২	১৫'৪১	'২২	'১৫	'৮২	'০৩	২'৪২

আণবীক্ষণিক গুণ—ক (১) ও (২) চিহ্নিত লৌহমলের পাতদ্বয় অণুবীক্ষণে সবুজ রঙের দেখায়। ইহা সম্পূর্ণ স্ফটিকীভূত। ইহাতে অয়স্কান্ত ও ডায়পসিড কেবল লক্ষিত হয়। ডায়পসিড ও অয়স্কান্তের স্ফটিকগুলি গুচ্ছভাবে অবস্থিত। এই সমস্ত গুচ্ছের চিত্র এতৎসহ প্রদত্ত হইল।
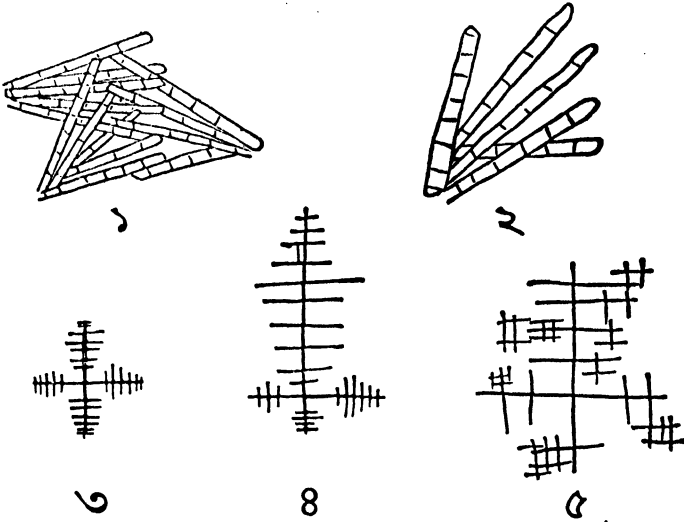
১। ডায়পসিড গুচ্ছ। ৪। অয়স্কান্ত বৃক্ষ। ২। ডায়পসিড গুচ্ছ।
৩। অয়স্কান্ত বৃক্ষ। ৫। অয়স্কান্ত বৃক্ষ।

খ (১) চিহ্নিত লৌহমলের পাতটির রঙ স্থানবিশেষে স্বচ্ছ, ঈষৎ সবুজ অস্বচ্ছ, ঈষৎ পিঙ্গল ও পাংশু, স্বচ্ছ রঙ্‌শূন্য। ইহা সম্পূর্ণ স্ফটিকীভূত নহে। ইহার কিছু অংশ কাচ ও অবশিষ্ট অংশ স্ফটিকীভূত। স্ফটিকীভূত অংশের কতক স্থান ঠিক আছে, আর কতক স্থান ঈষৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে ও কতক স্থান একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া নূতন স্ফটিক উৎপন্ন করিয়াছে। কাচ-অংশ স্বচ্ছ ও ঈষৎ সবুজ। কাচগুলির সীমায় গোলক উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহার সূচাকার স্ফটিকগুলিও ডায়পসিড ও অয়স্কান্তের। ঈষৎ সবুজ অস্বচ্ছ কাচ অ ঘোলা দেখায়। ইহা প্রাথমিক কাচের ধ্বংসে উৎপন্ন, দ্বিতীয়জ অতিসূক্ষ্ম স্ফটিকের জন্যই ঘটিয়াছে। এই কারণে এই অস্বচ্ছ অংশ Cross Nicol এ স্বচ্ছ কাচ হইতে কিছু আলোকিত হয়। ইহাতে বহুপরিমাণে স্ফোটিক লক্ষিত হয়। স্ফোটকের তারাগুলি আটটি শাখা বা কোণযুক্ত ও প্রতিশাখার অগ্রভাগ বৃক্ষের মত। ইহা ব্যতীত সমান্তর গুচ্ছবদ্ধ ও কেন্দ্র হইতে বিস্তৃত ডায়পসিডের বহু সূক্ষ্ম সূচ লক্ষিত হয়। স্ফোটকের তারার আটটি শাখা বা কোণ ও শাখার কোণের সমতা ও ডায়পসিডের সূচাকার স্ফটিকগুচ্ছ, পরমাণু ও অণুর নির্দ্দেশক শক্তি সূচিত করিতেছে। ইহাদেরও একটি চিত্র প্রদত্ত হইল।
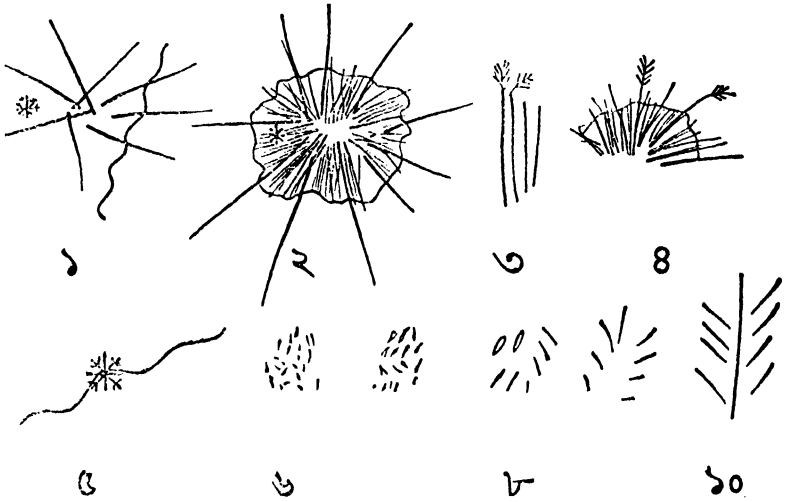
১। ফাটল দ্বারা কাটা গুচ্ছ (ডায়পসিড) ৪। বৃক্ষগঠন (ডায়পসিড) গোলক (ডায়পসিড ও অয়স্কান্ত) ৭। মারগরাইট।
২। গোলক (ডায়পসিড ও অয়স্কান্ত) ৮। বেলোনাইট।
৩। বৃক্ষগঠন (ডায়পসিড) গুচ্ছ (ডায়পসিড) ৫। ফাটল দ্বারা কাটা শাখাযুক্ত স্ফোটিক। ৯-১০। গ্লোবুরাইট ইত্যাদির নিকট বৃহৎ গঠন।
৬। গ্লোবুরাইট।

কাচের সীমায় বহু গোলক আছে। গোলকগুলি ডায়পসিড ও অয়স্কান্তের সূক্ষ্ম স্ফটিকে গঠিত। গোলকের ডায়পসিড স্ফটিকের দুই একটির সূক্ষ্ম অগ্রে গাছের গঠন লক্ষিত হয়। এই ডায়পসিড্ ও অয়স্কান্তের পারস্পরিক অবস্থিতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে মনে হয় যে,সর্ব্বপ্রথমে ডায়পসিডের অত্যধিক লম্বা ও ফাঁক সূচাকার স্ফটিক (চিত্র ১, ২, ৩) হইয়াছে। তখন দ্রব ঈষৎ চট্‌চটে ছিল ও শীঘ্র শীতল হইতেছিল। তৎপরে দ্রব আরু শীতল হইলেও এই অবস্থায় দ্রব অয়স্কান্ত স্ফটিকীভূত হওনের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় ঈষৎ লম্বা ও ঘন ডায়পসিড ও অয়স্কান্ত সূচ (চিত্র ২, ৪) এক সঙ্গে গোলক বাঁধিল। ইহার কেন্দ্র Eutectic, মিশ্রদ্রব্য ও উত্তাপ সূচিত করিতেছে। যে স্থানে গ্লোবুরাইট ইত্যাদির স্ফটিকগুলি দৃষ্ট হয়, সে স্থানে গোলক কিংবা ডায়পসিডের সূচাকার স্ফটিকের গুচ্ছ নাই।

কাচ ব্যতীত অন্য স্থানগুলি কম বেশী ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে ও এস্থানে গোলক দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঈষৎ ক্ষয়প্রাপ্ত করতজ স্ফটিক বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। এগুলি দ্রব হইতে স্ফটিকীভূত হয় নাই।

খ (২) চিহ্নিত লৌহমলের পাতটি খ (১) এর মত। তবে ইহাতে গ্লোবুরাইট মারগরাইট ও বেলোনাইট অতি সুন্দরভাবে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার ডায়পসিড স্ফটিকগুলির অধিকাংশই বক্র অবস্থায় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইহার কোণ (৩৭°-৪১°)।

গ (১) চিহ্নিত লৌহমলটির রঙ পাংশুবর্ণের। ইহাও সম্পূর্ণ স্ফটিকীভূত নহে এবং ঈষৎ স্বচ্ছ স্থানে ডায়পসিডের স্ফটিকগুলি গুচ্ছাকার ধারণ করিয়াছে।

গ (২) লৌহমল অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, ইহা অনেকাংশে গ (১) লৌহমলের ন্যায়। ইহাতে বহু পরিমাণে কয়লার আঁইস দৃষ্ট হয়। এক স্থানে গ্রাফাইট লক্ষিত হয়। মধ্যে মধ্যে ঈষৎ ক্ষয়প্রাপ্ত করতজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এগুলি দ্রব হইতে স্ফটিকীভূত হয় নাই। এগুলি বাহিরের, দ্রবের উত্তাপে গলিয়া গিয়াছে।

উপসংহার

SiO_2, Al_2O_3, Fe_2O_3, CaO, MgO ইত্যাদির দ্রব বা চুল্লীপরিত্যক্ত ধাতুর মলায় আমরা সাধারণতঃ ওলিভিণ, ডায়পসিড, অগিট, মিলিলাইট, অয়স্কান্ত ইত্যাদি অতি-উত্তাপে উৎপন্ন বা ক্ষারপ্রস্তরের খনিজ প্রাপ্ত হই। Day এর মতে ডায়পসিড ১৩৭১°C ও Vogt এর মতে ইহা ১২২৫°C উত্তাপে স্ফটিকীভূত হয়। অয়স্কান্ত ১২৬০°C উত্তাপে স্ফটিকীভূত হয়। যে দ্রবে বা চুল্লীপরিত্যক্ত ধাতুমলে Al_2O একেবারে থাকে না বা অতি অল্পই থাকে আর SiO_2 ও Fe_2O_3র পরিমাণ কিছু কম ও CaO এবং MgO বেশী থাকে (যদি CaO, MgO অপেক্ষা বেশী হয়) তাহাতে সাধারণতঃ ডায়পসাইড উৎপন্ন হয়। যত Fe_2O_3 বেশী হয়, ডায়পসাইড ততই অগিটের ধর্ম্মাবলম্বী হয়। অবশিষ্ট Fe_2O_3 অয়স্কান্তরূপে স্ফটিকীভূত হয়। MgO, CaO অপেক্ষা বেশী হইলে ওলিভিন উৎপন্ন করে।*

আমাদিগের লৌহমলগুলিতে ডায়পসিড ও অয়স্কান্ত দৃষ্ট হয়। অতি উত্তাপোদ্ভূতশীল ডায়পসাইড অন্ততঃ (১৩৭৫°C—১২২৫°C) উত্তাপে উৎপন্ন হইয়াছিল। দ্রবে Al_2O_3 কম ও CaO, MgO অপেক্ষা বেশী পরিমাণ থাকায় আমরা ডায়পসিড পাইয়াছি। কিন্তু লৌহের পরিমাণানুসারে স্থানে স্থানে ডায়পসিড অনেকটা অগিটের ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে এবং ডায়পসিডের গঠন বাদে অবশিষ্ট লৌহ অয়স্কান্তরূপে স্ফটিকীভূত হইয়াছে। সুতরাং এই লৌহমল পরীক্ষায় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে—এতদ্দেশবাসিগণ পূর্ব্বে খনিজ হইতে লৌহ প্রস্তুত করিতে অন্ততঃ ১৩৭৫°C উত্তাপ উৎপন্ন করিতে পারিত। কিন্তু কি ভাবে আকর হইতে লৌহ বাহির করা হইত, তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই।

শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত

* Natural History of Igneous rocks— C. A. Harker. Rock Minerals by Iddings.

তর্কের পরিভাষা

বাঙ্গালায় তর্কের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে এবং উহা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্‌টারমিডিয়েটের পাঠ্য হইয়াছে। বঙ্গদেশের বাঙ্গালী প্রফেসারেরা ঐ পুস্তকের কিরূপ সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। বঙ্গীয় শিক্ষিত-সমাজের দৃষ্টি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের প্রণীত উক্ত তর্কবিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করা এ প্রবন্ধের মুখ্য উদেশ্য। যদি 'তাঁহারা' তর্কবিজ্ঞানখানি পড়িয়া দেখেন এবং বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকাদিতে তর্কের আলোচনা করেন, তবে লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইবে।

পরিভাষার জন্য গ্রন্থ প্রণয়ন বন্ধ থাকে না। গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিলে, পরিভাষা জুটিয়া যায়। আর পরিভাষা যে অপরিবর্ত্তনীয়, তাহাও নহে। ইংরাজিতে বহু দার্শনিক পরিভাষা বদলিয়া গিয়াছে। আমাদেরও অনেক বদলাইতে হইবে। একেবারে বিশুদ্ধ অপরিবর্ত্তসহ পরিভাষা হাতে না পাইলে গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিব না, এইরূপ মনে করা উচিত নহে।

নিম্নলিখিত পরিভাষা-সঙ্কলনে ৺কাশীধামের নাগরী-প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হিন্দি বৈজ্ঞানিক কোষ" হইতে প্রচুর সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু সকল স্থলে ঐ কোষের নির্দ্ধারিত পরিভাষা গ্রহণ করিতে পারি নাই। উক্ত কোষের দার্শনিক কমিটীতে আমি মেম্বর ছিলাম, তখন যাহা যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছি, আজ নয় বছর পরে তাহা সর্ব্বত্র সমীচীন মনে হইতেছে না।

ইংরাজিতে যাহাকে লজিক্ বলে, তাহার বাঙ্গালা কি? ন্যায়, ন্যায়বিদ্যা, ন্যায়-বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র; তর্ক, তর্কবিদ্যা, তর্কবিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়? ন্যায়শাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র চলিবে না; কেন না, শাস্ত্র বলিতে মনে অনুশাসনের (command) ভাব আসে, যেমন মানবধর্ম্মশাস্ত্র। উপনিষদে বলে,—"এষ আদেশ এষ উপদেশঃ।" শাস্ত্র কথাটা এক হিসাবে বিজ্ঞানের বিপরীতার্থক। শাস্ত্র শব্দপ্রমাণ-মূলক বা রেভিলেশন্ (revelation), উহার মূল আতিমানুষিক; বিজ্ঞান মানবীয় যুক্তির দ্বারা উদ্ভাবিত ও সমর্থিত হইয়া থাকে; শাস্ত্র অদৃষ্ট, বিজ্ঞান দর্শন। (৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল-প্রণীত সাঙ্খ্যদর্শন দেখুন)। সংস্কৃতভাষায় যুক্তিশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্র ইংরাজি secular ও revealed knowledge এর সমানার্থক। আমরা বলিব, যুক্তিশাস্ত্র = বিদ্যা; শব্দশাস্ত্র = শাস্ত্র। ইংরাজীতে যাহাকে এক্‌জাক্‌ট্ সায়েন্স (exact science) বলে, বাঙ্গালায় তাহাকে "বিজ্ঞান" বলা সুবিধাজনক। 'বিদ্যা' শব্দটিতে এক্‌জাক্‌ট্ ও ইন্-এক্‌জাক্‌ট্ (exact, inexact) এই উভয় সায়েন্স্‌ই বুঝাইবে। এই হিসাবে গণিত বিজ্ঞান, ভূতবিজ্ঞান (physics = পদার্থবিদ্যা, এ অনুবাদ পরিহর্ত্তব্য) বিজ্ঞান, জ্যোতিষ (astronomy) বিজ্ঞান; এবং শীলবিদ্যা (ethics) বিদ্যা, সমাজবিদ্যা বিদ্যা, অর্থনীতি বিদ্যা। লজিক এক্‌জাক্‌ট্ সায়েন্স্ (exact science), অতএব লজিকও বিজ্ঞান।

এখন লজিকের অনুবাদ কি করিব? ন্যায়-বিজ্ঞান, না তর্কবিজ্ঞান, না আন্বীক্ষিকী? ইংরাজীতে "লজিক" নামটিতে একটি মাত্র শব্দ আছে। বাঙ্গালায়ও বিভিন্ন বিদ্যার নামগুলি

যতদূর সম্ভব, একশব্দাত্মক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইংরাজিতে এই সে দিনও Mental Science, Science of Mind, Mental Physiology প্রভৃতি শব্দদ্বারা psychology লক্ষিত হইত; তখন শীলবিদ্যার নাম ছিল moral science। এখন psychology ও ethics এই এক শব্দাত্মক নামই চলিতেছে। ইহাতে Psychical, ethical, Psychologist প্রভৃতি শব্দগুলি সহজে পাওয়া যাইতেছে। সংস্কৃতে "লজিক" অর্থে ন্যায়, তর্ক, আন্বীক্ষিকী এই তিনটি শব্দ আছে। 'আন্বীক্ষিকী' সাধারণের অবিদিত; সুতরাং 'ন্যায়' বা 'তর্কের' সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উহাকে হটিতে হইবে। এখন 'লজিক্' 'ন্যায়'—না 'তর্ক'? সিলোজিজম্ (syllogism) অর্থে ন্যায় শব্দের প্রয়োগ সিদ্ধ ও আবশ্যক। অতএব লজিকের বাঙ্গালা হইল "তর্ক"। তর্কশব্দ সাধারণ যুক্তি অর্থেও সংস্কৃতে বহুল প্রযুক্ত হইয়া থাকে, "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" (কাঠক), "তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ" (মহাভারত), "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (ব্রহ্মসূত্র)। এতদ্ভিন্ন ন্যায়শাস্ত্রে তর্কশব্দের একটি বিশেষ অর্থও আছে। পারিভাষিক শব্দের একার্থত্ব বাঞ্ছনীয় হইলেও, অগত্যা তর্ক-শব্দের অনেকার্থত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

ইংরাজি 'লজিক্' প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—(১) ডিডাক্‌শন (deduction), (২) ইন্‌ডাক্‌শন (induction); ইহারা উভয়েই রিজনিঙ্ (reasoning)। রিজনিঙ্ = যুক্তি। এই অর্থে পূর্ব্বে অনুমান শব্দ ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সংস্কৃতে, বিশেষতঃ নব্য নৈয়ায়িকদের গ্রন্থে অনুমান, অনুমিতি, অনু-মা প্রভৃতি ডিডাকশন্ (deduction) অর্থে ব্যবহৃত দেখা যায়। এই জন্যই ডিডাক্‌শনের বাঙ্গালা তর্কবিজ্ঞানে 'অনুমান' লিখা হইয়াছে। তত্ত্বচিন্তামণির 'ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ', এই লক্ষণ কেবল ডিডাকশনেই খাটে। ইন্‌ডাক্‌শনের বাঙ্গালা কি? ব্যাপ্তিগ্রহ। ইহা ছাড়া ইডাক্‌শন (eduction) শব্দও আজ কাল চলিতেছে। উহার অনুবাদ "অর্থাক্ষেপ" হইতে পারে। "অর্থাপত্তি" শব্দের একটি পারিভাষিক অর্থ দার্শনিকপ্রসিদ্ধি না থাকিলে, ইডাক্‌শন (eduction) অর্থে অর্থাপত্তি চালান যাইত। ইংরাজিতেও বহু গ্রন্থকার eductionকে Interpretation of propositions বলিয়াছেন। বস্তুতঃ ভারতীয় দর্শনে অর্থাপত্তির স্থল এরূপ অপ্রয়োজনীয় যে, তজ্জন্য একটি স্বতন্ত্র শব্দ না রাখিলেও চলে। তাহা হইলে eductionএর বাঙ্গালা অর্থাপত্তিই হইবে। deduction = অনুমান, induction = উন্মান, eduction = পরামাণ, চলিবে কি? inductive method of teaching = আরোহ-পদ্ধতি, এ অনুবাদ বেশ হইয়াছে। ইহা বদলাইবার প্রয়োজন নাই। ইংরাজিতে এক শব্দ আছে, অতএব আমাদেরও একশব্দ চাই-ই, এইরূপ বলা যায় না।

term = পদ, নাম।

proposition = প্রতিজ্ঞা, না বাক্য?

'তর্কতত্ত্ব' নামক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রথম তর্কগ্রন্থে 'proposition = প্রসঙ্গ'; অবশ্য ইহা চলিবে না। sentence = বাক্য। sentence এবং propositionএর পার্থক্য এত কম

যে, একশব্দে দুইয়ের অনুবাদ বিশেষ দোষাবহ হইবে না। তাই তর্কবিজ্ঞানে 'proposition = বাক্য' লিখা হইয়াছে। ঐরূপ লিখার আর একটি কারণ এই যে, পঞ্চাবয়বযুক্ত ন্যায়ের প্রথম অবয়বের (probandum) নাম প্রতিজ্ঞা। প্রতিজ্ঞা শব্দটি (১) proposition, (২) probandum এই দুই অর্থে প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু আর এক হিসাবে proposition প্রতিজ্ঞা বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। তর্কে propositionগুলির প্রমাণ করিতে হয়, উহারা প্রমেয়-রূপেই তার্কিকের নিকট উপস্থাপিত হয়। ইংরাজিতেও proposition শব্দের যৌগিক অর্থ that which is proposed i'e. placed before you for proof or disproof. প্রতিজ্ঞা শব্দের ন্যায়-প্রচলিত পারিভাষিক অর্থও ঐরূপ, "সাধ্যনির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞা"। জ্যামিতিতে proposition অর্থে প্রতিজ্ঞা চলিয়াছে, তর্কেও চলিতে পারে।

Categorematic word = স্বতন্ত্রার্থবাচক শব্দ।

Syncategorematic word = পরতন্ত্রার্থবাচক শব্দ।

ভাল হইল না। কিন্তু আর কিছু খুঁজিয়া পাইলাম না। বাচক ও অবাচক বলিলে চলিবে না, কেন না, তাহাতে সংস্কৃতের সঙ্গে বড় বিরোধ হয়। বাচক লাক্ষণিক ব্যঞ্জক, অলঙ্কারে এইরূপ শব্দের বিভাগ আছে।

singular term = বিশেষ নাম।

general term = সামান্য নাম।

proper name = যদৃচ্ছা শব্দ।

proper name অর্থে 'যদৃচ্ছা শব্দ' পদ সংস্কৃত অলঙ্কার গ্রন্থাদিতে, এমন কি, কাব্যেও আছে। মাঘ বলিতেছেন—

অসম্পাদয়তঃ কিঞ্চিদর্থং জাতিক্রিয়াগুণৈঃ।
যদৃচ্ছাশব্দবৎ পুংসঃ সংজ্ঞায়ৈ জন্ম কেবলম্॥

বিলাতে যেমন মিল্ (Mill), বেইন (Bain) প্রভৃতির মতে proper name non-connotative, মাঘও তেমনি যদৃচ্ছা শব্দকে non-connotative বলিতেছেন। (১৩১৭ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 'কাতন্ত্র' প্রবন্ধে "যদৃচ্ছা শব্দ" কথাটার বহু প্রয়োগ করিয়াছিলাম। মুদ্রাকর ভাবিলেন, শব্দ কথাটা পুংলিঙ্গ, অতএব তিনি সমস্ত স্থানে 'যদৃচ্ছা'র বদলে 'যদৃচ্ছ' ছাপাইয়া দিলেন!)

collective term = সমষ্টি নাম।

distributive use of names = ব্যষ্টিবাচকরূপে প্রয়োগ।

collective use of names = সমষ্টিবাচকরূপে প্রয়োগ।

concrete = গুণিনাম। abstract—গুণনাম।

positive = ভাবাত্মক বা ভাবনাম।

negative = অভাবাত্মক বা অভাবনাম।

privative = প্রতিষেধক নাম।

প্রতিষেধ বলিলে প্রসক্তের প্রতিষেধ বুঝায়। প্রসক্তং হি প্রতিষিধ্যতে। বস্তুতঃ privative ও negativeএর ভেদ এত অকিঞ্চিৎকর যে, উহার জন্য স্বতন্ত্র শব্দ না রাখিলেও চলে।

correlative term = সম্বন্ধি নাম।

absolute term = অসম্বন্ধি নাম।

correlative অর্থে "সম্বন্ধি" শব্দ সংস্কৃতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। মেধাতিথি মনুভাষ্যে বলিতেছেন—"সোপচয়ং কালান্তরে দাস্যামীতি যো ধনমন্যস্মাৎ গৃহ্লাতি সোঽধমর্ণঃ। যস্তু সোপচয়ং প্রত্যাদাস্যামি (?) ইতি প্রযুঙ্ক্তে স উত্তমর্ণঃ। সম্বন্ধিশব্দৌ এতৌ।" (৮।৪৭)। আবার ভার্য্যা, পুত্র, দাস, ভ্রাতা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধে মেধাতিথি (৮।২৯৯) বলিতেছেন,—"সম্বন্ধিশব্দাশ্চ এতে।" অতএব—

correlative term = সম্বন্ধি শব্দ।

connotative term = দ্যোতক নাম।

non-connotative term = অদ্যোতক নাম।

সংস্কৃত ব্যাকরণে যাবতীয় পদনিচয়কে চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত। মহাভাষ্যে এই বিভাগ আছে। চত্বারি শৃঙ্গত্রয়ো অস্য পাদাঃ (ঋগ্বেদ ৪।৫৮।৩), চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি (ঋঃ ১।১৬৪।৪৫) এই দুই বৈদিক মন্ত্রেও শব্দের নাম আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, এইরূপ ভাগ শাব্দিকেরা দেখিতে পান। আজকাল ইংরাজি ব্যাকরণের অনুকরণে লিখিত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রসাদে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয় পদজাতের এইরূপ বিভাগই সাধারণের পরিচিত; নাম, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত এই বিভাগ কেবল পণ্ডিতজন-বিদিত। পণ্ডিতেরা বলেন,—নাম ও আখ্যাত বাচক এবং উপসর্গ ও নিপাত দ্যোতক। 'সংহরতি' এই পদের অর্থ মারিতেছে। শাব্দিকেরা বলেন যে, ধাতুদিগের নানা অর্থ আছে বলিয়া 'সংহরতি'র 'হরতি'ভাগেই মারা বুঝায়। 'সম্' উপসর্গটি কেবল ঐ অর্থের দ্যোতন বা প্রকাশ করিয়া দিতেছে মাত্র। এই জন্য উপসর্গগুলিকে বাচক না বলিয়া দ্যোতক বলে। প্রণমতি = প্রকৃষ্টরূপে প্রণাম করে। শাব্দিকেরা বলেন যে, এখানে "নমতি"রই ঐ অর্থ; 'প্র' উপসর্গটি উহার দ্যোতন করিতেছে মাত্র। অতএব 'প্র' দ্যোতক, বাচক নহে। এইরূপ অকিঞ্চিৎকর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচারের জন্য দ্যোতক পদ না রাখিয়া, তাহাকে connotativeএর অনুবাদরূপে চালাইতে কোনও দোষ হইবে না। তাই প্রকাশবাবুর তর্কবিজ্ঞানে connotative = দ্যোতক।

Denotation = বাচ্য বা শক্য।

Connotation = দ্যোতন বা দ্যোত্য।

শব্দের বাচ্য লাক্ষণিক ব্যঙ্গ তিন রকম অর্থ আছে, কাজেই বাচ্য না বলিয়া শক্য বলাই শ্রেয়ঃ। সংস্কৃত তর্কশাস্ত্রে—

শক্যতাবচ্ছেদক = Connotation

বড় সুন্দর অনুবাদ, কিন্তু চলিবে কি ?

Genus = পর জাতি।

Species = অপর জাতি।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, গোত্ব একটি সামান্য বা জাতি, ঘটত্ব একটি সামান্য বা জাতি। 'ত্ব' দেখিয়া সহজে অনুমিত হয় যে, নৈয়ায়িক-প্রসিদ্ধ জাতি, আমাদের Genus নহে। জাতি ও Genus এই উভয় শব্দই এক 'জন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইলেও উহাদের অর্থে তফাৎ দাঁড়াইয়া যাইতেছে। ইংরাজিতে যাহাকে Genus, Species বলে, তাহা নামের Denotation, সাধারণতঃ দ্রব্য পদার্থ। Genus *Man* বলিতে প্রত্যেক-মনুষ্য-দ্রব্যান্তর্ভাবয়িত্রী একটি শ্রেণী বুঝায়। তার্কিকদিগের জাতি কিন্তু তাহা নহে। জাতি নিত্য, জাতি অনেক-সমবেত। Genus নিত্য নহে, অনেক সমবেতও নহে। নৈয়ায়িকেরা জাতিদ্বারা কি বুঝিতেন ? নৈয়ায়িকদিগের জাতি কি প্লেটোর idea স্থানীয় ? "জাতি বস্তুর প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম, এবং গুণ উহার বিশেষাধান হেতু ধর্ম্ম" এই উক্তি দ্বারাও কি 'জাতি'কে প্লেটোর idea বা প্রত্যয়ের সদৃশ বলিয়া মনে হয় না ? পৃথিবীর সমস্ত গোরু মরিয়া গেলে গোত্ব জাতির ধ্বংস হইবে কি না ?

Genus = সামান্য

Species = বিশেষ

এইরূপ অনুবাদ চলিবে কি ? নব্য ন্যায়ে সামান্য ও জাতি একার্থক শব্দ, বিশেষ একটি স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৈশেষিক সূত্রে আছে,—

সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্। ১।২।৩

একটা পদার্থ সামান্য, না বিশেষ, ইহা আমাদের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে অর্থাৎ যে পদার্থ এক দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সামান্য, তাহাই আবার আর এক দিক্ দিয়া দেখিলে বিশেষ নামে উক্ত হইয়া থাকে। যেমন—

দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্ম্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষশ্চ। ১।২।৫

দ্রব্যত্ব সামান্যও বটে, বিশেষও বটে। পৃথিবীত্বের তুলনায় দ্রব্যত্ব সামান্য, গুণত্ব কর্ম্মত্ব ও সত্তার তুলনায় দ্রব্যত্ব বিশেষ। এ যেন ঠিক্ ইউরোপীয় তর্কশাস্ত্রের কথা। তার পর সত্তা বা ভাব কেবল সামান্যই, কখনও বিশেষ হইতে পারে না অর্থাৎ উহা summum genus. সূত্রটি এই :—

ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব। ১।২।৪

Generic property = সামান্য ধর্ম্ম।

Specific property = বিশেষ ধর্ম্ম।

ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের বিশেষ ধর্ম্ম। আহার্য্য পরিপাক করিবার ক্ষমতা মনুষ্যের সামান্য ধর্ম্ম (তর্কবিজ্ঞান, ৪০।৪১ পৃষ্ঠা দেখুন)

Differentia = ব্যাবর্ত্তক গুণ, ভেদকগুণ

Proprium = ধর্ম্ম

Accidens = আকস্মিক গুণ

Differentiaকে বিশেষ, না ভেদক গুণ, না ব্যাবর্ত্তক গুণ বলিব ? Proprium—ধর্ম্ম ? আর কিছু খুঁজিয়া পাই নাই। Attribute = ধর্ম্ম। নব্য ন্যায়ে ধর্ম্ম কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। যাহা অন্য কোন কিছুতে থাকে, তাহা শেষোক্তের ধর্ম্ম। বহ্নি পর্ব্বতের ধর্ম্ম।

Essence = সার, প্রাণপ্রদ গুণ।

রসায়নে essence—সত্ত্ব (ডাক্তার রায়ের হিন্দুরসায়ন, ২য় খণ্ড, ৪ পৃঃ)। essence শব্দটির যৌগিকার্থ সত্ত্বই বটে। সত্ত্ব, রজঃ, তম,—এখানে সত্ত্ব অর্থ কি ? ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেন, এখানেও সত্ত্ব = essence (Hindu Chemistry, P. 61)। তবে কি তর্কেও essence অর্থে সত্ত্ব শব্দ গ্রহণীয় ? "প্রাণপ্রদ গুণ" অবশ্য essence এর অর্থ, পর্য্যায় নহে। কাব্যপ্রকাশে আছে,—"বস্তুধর্ম্মোঽপি দ্বিবিধঃ সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ পদার্থস্য প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুশ্চ। তত্রাদ্যো জাতিঃ দ্বিতীয়ো গুণঃ।" অর্থাৎ গোত্ব গরুর প্রাণপ্রদ ধর্ম্ম। আর উহার শুক্লত্ব প্রভৃতি উহাতে "ইহা একটি বিশিষ্ট গরু" এই বুদ্ধি জন্মাইতেছে (আধান = জন্মান)।

Idea = প্রত্যয়।

Judgment = অবগতি।

Reasoning = যুক্তি

Apprehension = ধারণা।

যখন এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম, তখন মনেই আসে নাই যে, retention এরও বাঙ্গালা চাই। মনোবিজ্ঞানের পরিভাষা ও তর্কের পরিভাষা একত্রই বাঁধিতে হইবে। ধারণা = retention, apprehension কি ?

Law of identity = তাদাত্ম্য নিয়ম

Law of excluded middle = মধ্যাভাব নিয়ম।

Law of contradiction = বিরোধ নিয়ম।

Predicables = বিধেয়ক।

Definition = সংজ্ঞা।

Definition অর্থে লক্ষণ শব্দ সংস্কৃতে বহু প্রযুক্ত হইয়াছে।

Simple states of conciousness = অমিশ্র বেদন।

Division = বিভাগ।

ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য লক্ষণ ও বিভাগ স্মরণ করুন।

Subject = উদ্দেশ্য।

Predicate = বিধেয়।

Copula = সংযোজক।

Affirmative proposition = অন্বয়ী প্রতিজ্ঞা।

Negative proposition = ব্যতিরেকী প্রতিজ্ঞা।

বিধায়ক ও নিষেধক প্রতিজ্ঞা বলিলেও বলা যাইত। তবে বিধি কথাটা অপ্রাপ্তপ্রাপক অর্থাৎ অজ্ঞাতপূর্ব্ব-সত্যজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞার জন্য থাকা উচিত। নৈতিক নিয়মগুলিকে বিধি বলা যাইতে পারে; কেন না, উহারা প্রত্যক্ষ বা অনুমান দ্বারা জানা যায় না।

Universal proposition = ব্যাপক প্রতিজ্ঞা।

Particular proposition = অব্যাপক প্রতিজ্ঞা।

Universal proposition এর খাঁটি সংস্কৃত 'ব্যাপ্তি'। পণ্ডিতেরা সাধারণ কথাবার্ত্তায়ও general truth or law অর্থে ব্যাপ্তি শব্দের প্রয়োগ করেন।

Categorical proposition = নিরপেক্ষ প্রতিজ্ঞা।

Conditional proposition = সাপেক্ষ প্রতিজ্ঞা।

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে "সান্তর প্রতিজ্ঞা"র উল্লেখ আছে (১১ ও ১২ অধ্যায়)।

'সান্তরে তু প্রতিজ্ঞাতে রাজ্ঞো দ্রোণেন নিগ্রহে।'

'সান্তরং হি প্রতিজ্ঞাতং দ্রোণেনামিত্রকর্ষণ।'

এই প্রয়োগের অনুকরণে আমরা বলিতে পারি—

Categorical proposition = নিরন্তর প্রতিজ্ঞা।

Conditional proposition = সান্তর প্রতিজ্ঞা।

এইরূপ করিলে, একটু সুবিধাও হয়। তর্কবিজ্ঞানে—

immediate inference = নিরপেক্ষানুমান

mediate inference = সাপেক্ষানুমান

এবং categorical proposition = নিরপেক্ষবাক্য

conditional proposition = সাপেক্ষবাক্য

এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এখানে সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দুইটি শব্দের প্রত্যেকেরই দুইটি করিয়া পারিভাষিক অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। কাজেই mediate অর্থে "সাপেক্ষ" রাখিয়া, conditional অর্থে "সান্তর" চালান সঙ্গত।

Hypothetical proposition = সঙ্কল্প বাক্য।

এটি মনঃপূত হইতেছে না, কিন্তু এর চেয়ে ভাল দুই বছর আগেও পাই নাই, এখনও পাইতেছি না।

Disjunctive proposition = বৈকল্পিক বাক্য।

বেইন সাহেব বলেন,—"The disjunctive proposition expresses an alternative" এই ভাব অবলম্বন করিয়াই বৈকল্পিক শব্দ বাছিয়া লইয়াছি।

Synthetical proposition = সংশ্লেষক প্রতিজ্ঞা।

Analytical proposition = বিশ্লেষক প্রতিজ্ঞা।

Real proposition = বাস্তব প্রতিজ্ঞা।

Verbal proposition = বাক্‌প্রতিজ্ঞা।

বাচিক প্রতিজ্ঞা বলিলাম না। বাচিক প্রতিজ্ঞা বলিলে, কায়িক প্রতিজ্ঞা ও মানসিক প্রতিজ্ঞার আকাজ্ক্ষা থাকে। কিন্তু বাক্‌প্রতিজ্ঞা বলিলে তা থাকে না। মহাভারতে আছে—

উত্থানবীরান্ বাগ্বীরা রময়ন্ত উপাসতে।

অর্থাৎ যাহারা কেবল বাক্যেই বীর, তাহারা কার্য্যবীরদিগের সেবা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়। Verbal propositionগুলিও বাক্যেই প্রতিজ্ঞা, কার্য্যে নহে; অতএব উহারা 'বাক্‌প্রতিজ্ঞা'।

distributed = ব্যাপ্য।

এ অনুবাদে সন্তুষ্ট হই নাই, কিন্তু আর কিছু মনে আসিতেছে না। কি ভাবিয়া এই পদটি গ্রহণ করিয়াছি, বলিতেছি। প্রত্যেক মানুষ মর, এখানে মর ব্যাপক, মানুষ ব্যাপ্য। কোনও মানুষ পূর্ণ নহে। এখানে মানুষ ব্যাপ্য, অপূর্ণ ব্যাপক; আবার পূর্ণ ব্যাপ্য, অমানুষ ব্যাপক। কোন কোন মানুষ জ্ঞানী, এখানে একটিকে আর একটির ব্যাপক বলা যায় না। কোন কোন মানুষ জ্ঞানী নহে, এখানে কি? তবে কি distributed = ব্যাপক? ব্যাপ্তির ভাবটা একেবারে ছাড়িয়া দিলে কেমন হয়? যখন কোন বাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় পদদ্বারা ঐ পদের প্রতিপাদ্য প্রত্যেক ব্যক্তি পরামৃষ্ট হয়, তখন ঐ পদকে পূর্ণবাচক বা পূর্ণ পরামর্শি (distributed) বলে (তর্কবিজ্ঞান, ৬৩ পৃষ্ঠা দেখুন)।

distributed = পূর্ণবাচক, পূর্ণ পরামর্শি, পূর্ণ, অখণ্ড।

undistributed = খণ্ডবাচক, খণ্ডপরামর্শি, খণ্ড, অপূর্ণ।

fallacy of undistributed middle = কি?

Immediate inference = নিরপেক্ষানুমান।

mediate inference = সাপেক্ষানুমান।

অর্থাপত্তি বা অর্থাক্ষেপ দ্বারা immediate inference বা eductionএর অনুবাদ চলে।

inference by opposition = বিরূপানুমান।

contrary proposition = বিপরীত প্রতিজ্ঞা।

contradictory proposition = বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা।

subaltern = অনুকূল।

subcontrary = অধীন বিপরীত।

conversion = আবর্ত্তন।

Simple conversion = সমাবর্ত্তন।

Conversion by limitation = পরাবর্ত্তন।

Barbara, Celarent প্রভৃতিতে যে p ও s আছে, তাহার সার্থকতা রাখিবার জন্য সমা-বর্ত্তন ও পরাবর্ত্তন নাম করিতে হইয়াছে।

obversion = ব্যাবর্ত্তন।

inversion = অন্তরাবর্ত্তন।

contraposition = বিপরীতাবর্ত্তন।

হয় ত আরও ভাল শব্দ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এগুলি চলিলেও ক্ষতি নাই।

syllogism = ন্যায়।

conclusion = উপসংহার, নিগমন।

major term = সাধ্য।

minor term = পক্ষ।

middle term = হেতু।

ইউরোপীয় তর্কে, পদগুলির বাচ্য বা শক্য (denotation) ধরিয়া তদ্‌ঘটিত অবয়বগুলির অর্থ করা হয়। এই জন্য "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" এই স্থলে বহ্নিমান্ major term. আরিস্‌-টটেলের সুপ্রসিদ্ধ ন্যায় স্বতঃসিদ্ধেও পদগুলির শক্যই গৃহীত হইয়াছে। এই জন্য major term একটি সামান্য জাতি এবং minor term তদন্তর্গত বিশেষ জাতি বা ব্যক্তি। major term ব্যাপক, minor term ব্যাপ্য; কিন্তু সংস্কৃত ন্যায়ে বহ্নি বা বহ্নিমত্ত্ব সাধ্য। পক্ষে যাহার অস্তিত্বের সাধন বা প্রমাণ করিতে হইবে, সেই সাধ্য। পক্ষ আধার, সাধ্য আধেয়। বহ্নিমান্ পর্ব্বতে থাকে না, বহ্নি বা বহ্নিমত্ত্বই থাকে, অতএব বহ্নি বা বহ্নিমত্ত্ব সাধ্য। সাধারণ কথায় বলে—

বান্ মান্ ছাড়িয়া সাধ্য আন্ আজিয়া।
যদি না থাকে বান্ মান্ ত্ব চড়াইয়া সাধ্য আন্॥

পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ—এখানে মান্ ছাড়িয়া দিয়া বহ্নি সাধ্য। মানবো মর্ত্ত্যঃ জন্তুত্বাৎ—এখানে বান্ মান্ নাই, অতএব মর্ত্ত্যত্ব সাধ্য। এই হইল সাধ্য পদের নব্য পারিভাষিক অর্থ। আমরা major termকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া এই নব্য পারিভাষিক ব্যবহারের কিঞ্চিৎ অপলাপ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন নৈয়ায়িকের অসহনীয় হইবে না। অনুমিতির ফল (conclusion) অর্থে সাধ্য কথাটা বেশ মানায়। ন্যায়সূত্রে সাধ্য শব্দটি ঐ অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বহ্নি সাধ্য—এটি আধুনিক ব্যবহার। প্রবন্ধলেখকের Pramanas of Hindu Logic নামক প্রবন্ধ দেখুন—Journal of the Asiatic Society of Bengal 1910 জুন সংখ্যা।

premise = হেত্ববয়ব।

অর্থাক্ষেপ বা immediate inferenceএ একটি মাত্র premise হইতে conclusionটি অনুমিত হয়, এখানে হেত্ববয়ব=হেতুরূপ অবয়ব, অর্থাৎ যে অবয়ব যুক্তিটির কারণ। আর ন্যায়ে (syllogism) দুইটি প্রতিজ্ঞা হইতে একটি উপসংহার হয়। ঐ দুইটি প্রতিজ্ঞাতেই হেতু বা লিঙ্গ থাকে, এই জন্য উহারা হেত্ববয়ব (হেতুবিশিষ্ট অবয়ব)। অতএব premise =হেত্ববয়ব। অবয়ব কথাটায় ন্যায়ের তিনটি প্রতিজ্ঞাই বুঝায়। ইংরাজিতে তিনটি বাচি কোন শব্দ নাই, premise প্রথম দুটার নাম, conclusion শেষটার নাম। আমাদের প্রথম দুইটার একটা নাম ছিল না। তাই হেত্ববয়ব শব্দ তৈয়ার করিতে হইয়াছে।

figure=আকার।

mood=সংস্থান।

institution অর্থে সংস্থান শব্দ আজকাল ভূরি প্রযুক্ত হইতেছে। অবশ্য বড় ভাল হইতেছে বলিতে পারি না, তবে আর কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। কাজেই mood= প্রকার বলা মন্দ নহে।

enthymeme=অব্যক্ত ন্যায়।

prosyllogism=উপকারী ন্যায়।

episyllogism=উপকৃত ন্যায়।

sorites=ন্যায় শৃঙ্খল।

dilemma=দ্বিকল্প ন্যায়।

"উভয়তঃ পাশা রজ্জু" dilemmaর খাঁটি সংস্কৃত।

fallacy=আভাস।

হেত্বাভাস=fallacious middle term (তর্কবিজ্ঞান, ১৮৩ পৃষ্ঠার টীকা দেখুন।)।

fallacious definition=লক্ষণাভাস, সংজ্ঞাভাস।

fallacious division=বিভাগাভাস।

fallacy of four terms=চারিপদী অনুমানাভাস। যেমন কবিরাজেরা বলেন, 'আট পদী লাল শুঁড়া' (লাল শুঁড়ায় কত পদ লাগে, তাহা মনে নাই। এই কাশ্মীরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি, এমন লোকও নাই। ছোটকালে দুই রকম লাল শুঁড়ার কথা শুনিয়াছিলাম—আট (?) পদী ও ষোল-(?) পদী)।)

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ
শ্রীনগর, কাশ্মীর।

———
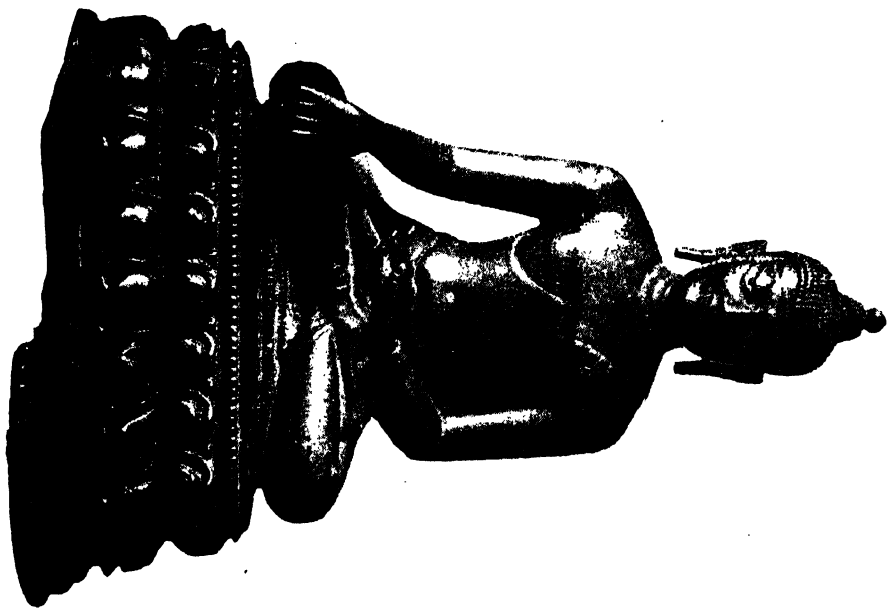
মূর্ত্তির নিম্নস্থিত খোদিত-লিপি

একটি বুদ্ধমূর্ত্তি

গত পৌষ মাসে পরিষদে প্রদর্শনী উপলক্ষে ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকীল স্বর্গগত রায় সূর্য্য-নারায়ণ সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় প্রদর্শনার্থ দুইটি ধাতু-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রেরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি দণ্ডায়মান ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি; তাম্র-নির্ম্মিত এবং স্বর্ণ-মণ্ডিত; দ্বিতীয়টি পিত্তল-নির্ম্মিত। প্রথমটির পাদপীঠে বঙ্গাক্ষরে লিখিত একটি খোদিত লিপি আছে এবং দ্বিতীয়টির নিম্নে একখণ্ড পিত্তলফলকে তিন পঙ্‌ক্তিতে ভৈক্ষুকী লিপিতে লিখিত একটি উৎকীর্ণ লিপি আছে। সৌরেন্দ্র বাবুর প্রেরিত দ্বিতীয় মূর্ত্তি এবং তাহার খোদিত লিপি বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। মূর্ত্তিটি পিত্তল-নির্ম্মিত ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত গৌতম বুদ্ধের মূর্ত্তি। বুদ্ধদেব প্রস্ফুটিত কমলের উপরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ জানুর উপরে রক্ষিত এবং অঙ্গুলিগুলি সিংহাসন স্পর্শ করিতেছে। দ্বিতীয় হস্ত ক্রোড়ের উপরে রক্ষিত। মূর্ত্তিটি সাড়ে ছয় ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার পাদপীঠের দৈর্ঘ্য সাড়ে চার ইঞ্চি, প্রস্থ আড়াই ইঞ্চি। মূর্ত্তিটির ওজন ৭৩৶১০ তিয়াত্তর তোলা সাড়ে সাত আনা। বুদ্ধদেব উরুবেলায় অশ্বত্থরূপী বোধিবৃক্ষতলে যখন সম্বোধিলাভ করিতেছিলেন, ইহা তাঁহার সেই অবস্থার মূর্ত্তি। মার নানা উপায়ে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া গৌতমকে বোধিমার্গ হইতে বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অকৃতকার্য্য হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি যে সম্বুদ্ধ হইলে, তাহার কেহ সাক্ষী রহিল না; পরে কে ইহার সাক্ষী প্রদান করিবে?" বুদ্ধ তদুত্তরে মেদিনী স্পর্শ করিয়া পৃথিবীকে সাক্ষী করিয়াছিলেন। সেই জন্য এই মুদ্রার নাম ভূমিস্পর্শমুদ্রা বা সাক্ষীমুদ্রা। মহাবোধিতে এই শ্রেণীর লক্ষ লক্ষ পাষাণময়ী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থে ধ্যানমালায় এই শ্রেণীর মূর্ত্তির সাধনা বা ধ্যান আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত ফুসে নেপালে আবিষ্কৃত সাধনমালাতন্ত্র, সাধন-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে বজ্রাসন-সাধন নামক ভূমিস্পর্শমুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তির ধ্যান আবিষ্কার করিয়াছেন। মুরশিদাবাদ জেলার কান্দি নগরের রুদ্রদেবের মূর্ত্তি যে এই শ্রেণীর বুদ্ধমূর্ত্তি, তাহা পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। যে পদ্মের উপরে বুদ্ধদেব আসীন, তাহার নাম "বিশ্বপদ্ম-বজ্র"। যে ভাবে তিনি উপবেশন করিয়া আছেন, তাহার নাম "বজ্রপর্য্যঙ্ক সংস্থান"।* মূর্ত্তিটির পরিধেয় বসনে ও উত্তরীয়ে লাল পাড় আছে, তাহা দেখাইবার জন্য শিল্পী মূর্ত্তিতে দীর্ঘ

* ... ... শ্রীমদ্বজ্রাসনবুদ্ধভট্টারকং আত্মানং ঝটিতি নিষ্পাদয়েৎ; দ্বিভুজৈকমুখং পীতং চতুর্মারসঙ্ঘটিতমহাসিংহাসনবরং তদুপরি বিশ্বপদ্মবজ্রে বজ্রপর্য্যঙ্কসংস্থিতং বামোৎসঙ্গস্থিত-বামকরং ভূস্পর্শমুদ্রাদক্ষিণকরং বন্ধুকরাগারুণবস্ত্রাবগুণ্ঠিততনুং সর্ব্বাঙ্গং প্রত্যঙ্গং সেচনকবিগ্রহং বিচিন্ত্য ওঁ ধর্ম্মধাতুস্বভাবাত্মকোহং ইত্যহঙ্কারং কুর্য্যাৎ—বজ্রাসন-সাধন।
Etude sur L' Iconographie Boudhique de L' Inde, P. 16

তাম্রখণ্ড সন্নিবেশ করিয়াছেন। মূর্ত্তির চক্ষুর্দ্বয় ও ললাটের টীকা রজত-নির্ম্মিত এবং মস্তকের উপরে "উর্ণা" ও "উষ্ণীষ" আছে।

সৌরেন্দ্র বাবুর নিকট মূর্ত্তি কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারি নাই। খোদিত লিপির আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, দ্বাবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উহার পাঠোদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালে অধ্যাপক বেণ্ডল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, এই পিত্তলমূর্ত্তিটি গয়ার ইঞ্জিনিয়র শ্রীযুক্ত রবিন্সন্ সাহেবের (C. E. Robinson Esq. C. E.) অধিকারে আছে।*

অধ্যাপক বেণ্ডল প্রবন্ধের প্রারম্ভে সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার ফ্লিট্ (Dr. J. F. Fleet) কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ মূর্ত্তির বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং তাহার সহিত পূর্ব্বোক্ত বিবরণ মিলাইয়া দেখিলে দৃষ্ট হইবে যে, সৌরেন্দ্র বাবু কর্ত্তৃক প্রেরিত মূর্ত্তি রবিন্সন্ সাহেবের মূর্ত্তি। মূর্ত্তির নাভিদেশে, বামহস্তের তলে ও পদদ্বয়ের তলে গোলাকার ক্ষুদ্র রজতখণ্ড সন্নিবিষ্ট আছে।

মূর্ত্তির তলদেশস্থিত ত্রিকোণাকৃতি পিত্তলখণ্ডে তিন পঙ্ক্তিতে একটি খোদিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরগুলির আকার নূতন ধরণের। উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে সাধারণতঃ খোদিত লিপিসমূহের যেরূপ অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সহিত এই খোদিত লিপির অক্ষরসমূহের কোনই সাদৃশ্য নাই। বহু পূর্ব্বে ডাক্তার বেণ্ডল এই জাতীয় অক্ষরে লিখিত কতকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থ নেপালে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ইহার "শরমাতৃকা লিপি" নামকরণ করিয়াছিলেন। পরে প্রসিদ্ধ মুসলমান পর্য্যটক আবু রিহান অল্‌বেরুণীর বিবরণ অনুসারে ইহার "ভৈক্ষুকী লিপি" নাম দিয়াছিলেন।† অল্‌বেরুণী বলিয়া গিয়াছেন যে, ইহা বুদ্ধের লিপি এবং পূর্ব্বদেশে উদুনপুর নগরে ব্যবহৃত হইত। বুদ্ধের লিপি অর্থে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত লিপি বুঝিতে হইবে, বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সৃষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, ইহার নাম "ভৈক্ষুকী লিপি" হইয়াছিল। উদুনপুর সম্ভবতঃ উদ্দণ্ডপুর বা বর্ত্তমান বিহার। অল্‌বেরুণীর শতাব্দীদ্বয় পরে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দীন উদ্দণ্ডপুর বিহার লিখিবার সময়ে অদন্দপুর বিহার লিখিয়া গিয়াছেন। অক্ষর-তত্ত্বের হিসাবে এই শ্রেণীর খোদিত লিপির মূল্য অত্যন্ত অধিক। ইহাতে খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যবহৃত অক্ষরসমূহের আকার দেখা যায়; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্বভারতে যে সমস্ত মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতেই এই শ্রেণীর খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় অক্ষর-তত্ত্ব-বিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা ডাক্তার জর্জ বুলার এই শ্রেণীর অক্ষর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন;—

* Indian Antiquary Vol XIX, page 77

† Transactions of the Seventh International Congress of Orientalists. Aryan Section page 111 and Transactions of the tenth International Congress of Orientalists part II page 151.

"The arrow head alphabet, plate VI, Cols XVIII, XIX, which C Bendall, its discoverer, is inclined to identify with Beruni's Bhaiksuki lipi appears to be confined to Eastern India. It of course, has no connection with the Nagari, but, as Bendall points out in his very careful description is the immediate offspring of an ancient form of the Brahmi. It would seem that the *A*, *A*, *ka*, *na*, *va* and perhaps also the *jha* of the present alphabet have curves at the lower end. This peculiarity, as well as the peculiar *e*, noted by Bendall and the absence of a difference between *r* and *ra*, seem to indicate that the present alphabet belonged to the southern scripts, for which these points are characteristic. It's pointed *kha*, *ga*, and *sa* likewise occur in southern alphabets. And the forms of *na*, *ta* and *na* perhaps point rather to the south-west than to the south. Only in the case of the looped *sa* it is possible to think of northern (Gupta) Influence, but the possibility that it is an independent new formation is not excluded."*

বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত তিনটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তিতে এই শ্রেণীর অক্ষরে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মগধে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠস্থিত খোদিত লিপি ডাক্তার বেণ্ডল উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।† দ্বিতীয় খোদিত লিপিটি কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় একটি "জম্ভল মূর্ত্তির" পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে। তৃতীয়টি ডাক্তার ওয়াডেল (L. A. Wadell) কর্ত্তৃক মুঙ্গের জেলার উরেন গ্রামে আবিষ্কৃত একটি মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে।‡

এই সমস্ত খোদিত লিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা অদ্যাপি হয় নাই। ডাক্তার বেণ্ডল বুদ্ধগয়ার খোদিত লিপির নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন,—

(১) শ্রীধর্ম্ম বরদ হেতু ॥ শ্রীরক্ষ পৌত্র সজ্য প্র

(২) বাল (?) শ্রীরাজাক্ষ (?) যক্ষপাল তৎপুত্র আহবম

(৩) ম্লস্ত দেয় ধর্ম্মোয়ম্।

ইহার পরে পাদটীকায় ডাক্তার বেণ্ডল স্বীকার করিয়াছেন যে, দানপতির নাম যক্ষপাল না হইয়া যক্ষপালিতও হইতে পারে।¶

কলিকাতা চিত্রশালার এই শ্রেণীর অক্ষরের খোদিত লিপি দুইটির সাহায্যে নিম্নলিখিত পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি;—

---

* Fleet's Translation of Buhler's Indian Paleography, Indian Antiquary Vol. XXXIII, appendix, page, 60.

† Indian Antiquary, Vol XIX, page, 78.

‡ Journal of the Asiatic Society of Bengal 1893 part I p. I,

§ Indian Antiquary, Vol, XIX, page 77, note 4.

(১) শ্রীধর্ম্ম বরপদেভ্য (?)॥ শ্রীবুদ্ধ পৌত্র সংঘ সা

(২) লাদ (?) শ্রীরাণক যক্ষপালিত পুত্র আহবম

(৩) ল্লস্য দেয় ধর্ম্মোয়ং ॥

মন্তব্য

১। প্রথম পঙ্ক্তির প্রথম শব্দটির "শ্রীধর্ম্ম বরদ হেতু" না হইয়া "শ্রীধর্ম্মবরপদেভ্য" হইতে পারে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপ পাঠ করিয়াছেন। এই শব্দের শেষের অক্ষরটি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে ; কারণ, ইহার উর্দ্ধদেশ "ত"এর অনুরূপ, দ্বিতীয় পঙ্ক্তিতে যক্ষপালিত শব্দের "ত" দ্রষ্টব্য। ডাক্তার বেণ্ডল প্রথম পঙ্ক্তির ষষ্ঠ অক্ষরটি "দ" বলিতে চাহেন, কিন্তু ইহা যক্ষপালিত শব্দের "প"এর অনুরূপ।

২। প্রথম পঙ্ক্তির দ্বিতীয় শব্দ "শ্রীবুদ্ধ পৌত্র", "শ্রীব্রহ্ম পৌত্র" নহে। ডাক্তার বুলার কর্ত্তৃক প্রকাশিত ভারতীয় অক্ষর-তত্ত্ব নামক গ্রন্থের ষষ্ঠ চিত্রের অষ্টাদশ স্তম্ভের সপ্তম ও পঞ্চাশৎ পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য।

৩। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রথম পঙ্ক্তির শেষ অক্ষর ও দ্বিতীয় পঙ্ক্তির প্রথম দুই অক্ষর লইয়া "সালাদ" পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। আমি এই তিনটি অক্ষরের পাঠোদ্ধার করিতে পারি নাই।

৪। দ্বিতীয় পঙ্ক্তির দ্বিতীয় শব্দ ডাক্তার বেণ্ডল কর্ত্তৃক "রাজাক্ষ" পঠিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা "রাণক", "রাজণ্যক" অপভ্রংশ এবং ভারতের ইতিহাসের মধ্যযুগে সামন্ত রাজা বা রাজকর্ম্মচারিবিশেষের উপাধি ছিল। "ণ" সম্বন্ধে ডাক্তার বুলারের গ্রন্থের ষষ্ঠ চিত্রের অষ্টাদশ ও উনবিংশ স্তম্ভের উনত্রিংশ পঙ্ক্তি দ্রষ্টব্য।

৫। "ক"এর আকার নূতন ; তবে "ক্ষ"এর উর্দ্ধদেশের সহিত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে ; কিন্তু ডাক্তার বুলারের ষষ্ঠ চিত্রের অষ্টাদশ স্তম্ভের পঞ্চদশ পঙ্ক্তির অক্ষরের সহিত কোনই সাদৃশ্য নাই। তবে ইহা "ক্ষ" নহে, কারণ, "যক্ষপালিত" শব্দে "ক্ষ" পাওয়া গিয়াছে এবং ইহার সম্বন্ধে ডাক্তার বুলারের গ্রন্থের ষষ্ঠ চিত্রের উনবিংশ স্তম্ভের উনপঞ্চাশৎ পঙ্ক্তির "ক্ষ্য" দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ

"শ্রীধর্ম্মশ্রেষ্ঠের চরণে (নমস্কার)॥ শ্রীবুদ্ধপৌত্র সঙ্ঘশালাপ্রদাতা রাণক যক্ষপালিতের পুত্র আহবমল্লের ধর্ম্মার্থ দান।"

রাণক যক্ষপালিত, তাঁহার পুত্র আহব মল্ল ও বুদ্ধপৌত্রসংঘ সম্বন্ধে এই খোদিত লিপি ব্যতীত অপর কোন কথাই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী

চট্টগ্রাম অঞ্চলে গ্রাম্য মহিলাসমাজে 'অন্ধেশ্বরী-ব্রত' নামক এক বিচিত্র ব্রত বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। সম্প্রতি এই ব্রতের একখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব "পাঞ্চালী" আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। "পাঞ্চালী" আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, ৮½ পৃষ্ঠা মাত্র; নিম্নে তাহা আমূল যথাযথ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইতেছে, ইহা পাঠে "অন্ধেশ্বরী-ব্রতে"র নিয়মাদি পাঠকগণ অবগত হইতে পারিবেন।

কোন একটি ব্রত বা পুরাণকথা অবলম্বন করিয়া প্রাচীন কালের বহু লেখক বিভিন্নভাবে লেখনী পরিচালন করিয়াছেন। একই বিষয়ে তাঁহাদের সকলের মূল-বক্তব্য এক হইলেও রচনাশক্তির বা ভাবপ্রকাশের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের পরস্পরের পুস্তকের মধ্যে একটা পার্থক্য স্বভাবতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এতদুপরি প্রতিলিপিকারগণের উদ্ভট বাহাদুরী-প্রকাশের ইচ্ছা বা অজ্ঞতা এ সমুদায় গ্রন্থাবলীর স্থানে স্থানে গুরুতর পাঠান্তর আনিয়া দিয়াছে। স্মরণ হয়, এই ধরণের এক "শনির পাঞ্চালী" পুস্তিকাই আমরা ১৫।১৬ খানা দেখিয়াছি।

আমাদের অদ্যকার আলোচ্য "অন্ধেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী"খানি যে পুরাতনের প্রাগুক্ত প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ কথা সাহস করিয়া বলা যায় না। তবে আমাদের কতকটা বিশ্বাস আছে, আমরা যে "পাঞ্চালী"খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার লেখার ভিতরে কুত্রাপি এমন কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, যাহাতে আমরা ইহাকে প্রতিলিপি বলিয়া স্থির করিতে পারি। "অন্ধেশ্বরী-ব্রত-পাঞ্চালী" অন্য লেখকেরা আরও লিখিতে পারেন; মনে হয়, এখানি সেগুলি হইতে পৃথক্ হওয়া অসম্ভব নহে।

আমাদের এইরূপ ভাবিবার দুইটি বিশিষ্ট কারণ আছে; একে একে তাহা লিখিতেছি।

"পাঞ্চালী"-পাঠে আমরা জানিতে পারি, "কুএপারা" গ্রামের "শ্রীউমাচরণ গুরুঠাকুর সন ১২৩০ মঘি তাং ১৮ আসার" এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন।

"কুএপারা" চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একখানা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, সাধারণতঃ ইহাকে "কোয়ে-পাড়া" বলা হয়। "কোয়ে" শব্দটি মঘী বা মাগধী, ইহার অর্থ—"মহিষ"। হয় ত এক সময়ে এই গ্রামে বহুতর মহিষ গৃহ-পালিত হইত, তাহা হইতেই এ নামের উৎপত্তি। যাহা হউক, এই "কুএপারা" গ্রাম হইতেই সেই গ্রামবাসী শ্রীমান্ নীরেন্দ্রলাল সেন এই "পাঞ্চালী"খানা সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে আনিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত "গুরুঠাকুর" বলিয়া "দত্ত", "রায়", "সেন" প্রভৃতির ন্যায় আমাদের সমাজের কোন শ্রেণীর কোন বংশজ পদবী আছে কি না, জানি না। দীক্ষাদাতারা "গুরুঠাকুর" বটে, কিন্তু উহা তাঁহাদের বংশজ পদবী নহে। প্রাচীন সময়ে আমাদিগের গৃহে আমাদিগের অল্পবয়স্ক সন্তানদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য বর্ত্তমান "গৃহশিক্ষকের" স্থলবর্ত্তী হইয়া কিংবা স্থানবিশেষে প্রতিবেশী-সন্তানদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যপদেশে এমন কতকগুলি স্বল্পশিক্ষিত প্রবীণ লোক নিযুক্ত হইতেন; তাঁহারা সকল ক্ষেত্রে উচ্চবংশ-জাত হইতেন না। ইঁহারা সাধারণ্যে নিজের বংশপদবী গোপন করিয়া আপনাদিগকে

"গুরুঠাকুর" বলিয়া প্রচার করিতে গৌরব অনুভব করিতেন। বক্ষ্যমাণ "পাঞ্চালী"-লেখক "উমাচরণ" যে এবম্বিধ "গুরুঠাকুর" নহেন, কে বলিতে পারে ?

অধিকন্তু "উমাচরণ গুরুঠাকুরের" গুরুঠাকুরীয় প্রাচীনত্বের প্রমাণ তাঁহার হস্তাক্ষরের মধ্যে পাওয়া যায়। আমরা ন্যূনকল্পে শতাধিক বৎসর পূর্ব্বের হস্তলিখিত গ্রন্থ দেখিয়াছি; সমালোচ্য "পাঞ্চালী"খানি তেমন কিছু প্রাচীন না হইলেও লেখকের হস্তাক্ষর এত "সাংঘাতিক" এবং বর্ণাশুদ্ধিবহুল যে, সে সমুদয় প্রাচীন পুস্তকের সহিত প্রথম দৃষ্টিতে কিছু ইতরবিশেষ উপলব্ধি হয় না। ইহাও সেই প্রাচীন যুগের সুবিখ্যাত তুলট-করা কাগজে লিখিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিতেও গলদ্ঘর্ম্ম হইতে হয়।

চট্টগ্রামে জমিদারি কাগজপত্রে এবং বৃদ্ধ ও গ্রাম্য লোকের চিঠিপত্রে এখনও মঘী সন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে ১২৭৪ মঘী সন চলিতেছে, আধুনিক বঙ্গাব্দের ন্যায় বৈশাখ মাস হইতে ইহার নববর্ষারম্ভ হইয়া থাকে। আমাদের আলোচ্য পুথিখানি ১২৩০ মঘী সনে রচিত, সুতরাং ইহা মাত্র ৪৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা বিকৃত না হইবারই সম্ভাবনা।

পক্ষান্তরে এ পুস্তিকাখানি যে অপর কোন কবির লিখিত "পাঞ্চালী"র প্রতিলিপি নহে, ইহা যে "উমাচরণ গুরুঠাকুরের" রচিত পুস্তিকার মূল পাণ্ডুলিপি, তাহার আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় প্রাচীন পুথির হস্তলিখিত প্রতিলিপি দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিতেই গ্রন্থশেষে লিখিত আছে, "যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি"; কিন্তু এ "পাঞ্চালীতে" তেমন কোন কথা লিখিত নাই, বরং তৎস্থলে আছে,—

"অযুদ্ধেরে যুদ্ধ করি দিবেন বুধজন। ইষ্টদেবের দোহাই জদি তথা না দে মন॥"

আমরা "বুধজন" বলিয়া স্পর্দ্ধা রাখি না; সুতরাং এ "পাঞ্চালী"খানির সম্বন্ধে আমাদের বাঙ্নিষ্পত্তি করিবার কোন অধিকার নাই। শুধু এইটুকু বলিতে পারি, প্রাচীন যুগের কবিকল্পিত দেবদেবীরা যেমন মনুষ্যবিশেষকে অকথিত যন্ত্রণা দিয়া আপনাদের মহিমা বা পূজা প্রচার করিয়াছেন, উমাচরণের "অন্ধেশ্বরী" তেমনটি করেন নাই—তিনি বিপন্নাকে উদ্ধার করিতেই মর্ত্ত্যধামে প্রকটিতা হইয়াছেন, এখানেই তাঁহার যাহা কিছু বিশেষত্ব।

অথ অন্দেশ্বরির পাঞ্চালী লিখ্যতে—

বন্দে দেব গণপতি করিআ প্রণাম।
সর্ব্ব কার্জ্য সিদ্ধি হএ লৈলে তান[১] নাম॥
সরশতির পাদুপর্দ্দে[২] প্রণতি করিআ।
অন্দেশ্বরির ব্রতকথা কহিব রচিআ॥
পূর্ব্বে এক সদাগর সত্যজুগে ছিলো।
অতি ধনবন্ত রাজার সপ্ত পুত্র ছিলো॥
সপ্ত পুত্র বিবাহ করাইলো একে একে।
মরিলেক সদাগর দৈবের বিপাকে॥
সদাগর মিত্যু হইলো বিধতা পাষণ্ড।
ক্রমে ক্রমে ধনজন গেলো রাজ্যখণ্ড॥
দুঃখিত হইয়া রাজা আছয়ে তথাএ।
দিনান্তেতে ভিক্ষা তারা করি অন্ন খাএ॥

১। তান—তাঁর, তাঁহার। ২। পাদপর্দ্দে—পাদপদ্মে।

এই মতে রহে তারা হইআ দুঃখিতা।
তারপরে জে হইলো যুন কহি কথা॥
একদিন ছোট বধু জল ভরিবারে।
সরবরে গেলো বধু কুম্ভ লইআ করে॥
কাকেতে কলসি লইআ ধিরে ধিরে জায়ে
সরবর নিকটেতে উপনিত হএ॥
হেনকালে এক রাজা মৃগআ কারণে।
সৈন্য সামন্ত সনে চলিছে কাননে॥
সৈন্য দেখি সাধুর পত্নি ভাবয়ে তথাএ।
কোন খানে জাইবা কৈন্যা না দেখে উফাএ॥
অন্য পন্থ নাহী কৈন্যা গৃহেতে জাইতে।
তাহা দেখী সাধুর পত্নি লাগিলো কান্দিতে॥

লাচড়ি—

কান্দে সাধুর বনিতা, মনেতে পাইআ বেথা, উফায়ে না দেখী ভাবি আর।
রাজসৈন্যে আমা পাইলে, ধরিআ নিবেক বলে, সত্যনষ্ট করিব আমার॥
জাল সাবুরির ঘরে, বিরূপ বলিব মোরে, ক্রোধ করি মারিব এখন।
হাহারে দারুণ বিধি, নাহী জাম কোন বুদ্ধি, এইবার রক্ষয়ে জিবন॥
এই মতে কান্দে ধ্বনি, দুই চক্ষুর পরে পানি, তাহা দেখী দেবি অন্দেশ্বরি।
অন্দেশ্বরি মহামাএ, হইআ জে বরদায়, আসিলা ব্রহ্মনির রূপ ধরি॥
দেবি বোলে যুন আই, কান্দ কোন দুঃখ পাই, কহ মোরে সব বিভরন।
কৈন্যা বোলে যুন কহি, রাজসৈন্য দেখ ঐ, ধরি নিব করিব লাঞ্ছন।
দেবি বলে কর কাচ, ঐ দেখ বিনাগাছ, তার তলে রহ লুকাইয়া।
বিনার সপ্তপাতা লইয়া, চক্ষু মুদি গ্রহস্তি[1] দিআ, তার তলে রহ লুকাইয়া॥
জদি জায় সৈন্য চলি, উঠিবা জে গ্রহস্তি মেলি, ঘরে যুখে জাইবা চলিআ।
এথ যুনি সোন্দরি[2], রহে বিনাগাছ ধরি, রাজসৈন্য গেলেন চলিআ।
অন্ধেশ্বরীর কৃপাএ, কৈন্যা না দেখে তথাএ, সৈন্যসব গেলেন চলিয়া।
সৈন্যসব গেলা দেখী, উঠে রামা চন্দ্রমুখি, ব্রাহ্মনির পায়ে পরে গীআ॥

পআর—

কৈন্যা বোলে ব্রাহ্মনি তুমি সর্ব্বথা ন হও[3]।
কোন বর্ণ হও মাতা পরিচয় দেও॥
তোমার কারনে মাতা পাইলুম পরিত্রান।
পরিচয় না দিলে মাতা তেজিমু[4] পরান॥
দেবি বোলে যুন কহি রাজার সোন্দরি।
মোর নাম হএ কৈন্যা জান অন্দেশ্বরি॥
সকল দেবতা পূজা আছয়ে সংসারে।
মোর পূজা সংসারেতে কেহ নাহি করে॥
তুমি গিআ মোর ব্রত কর হরসিতে।
ধনে পুত্রে বর পাইবা মনের বাঞ্ছিতে॥
কৈন্যা বোলে মাও তুমি কোন বর্ণ হও।
আপনার নিজমুত্তি ধরিআ দেখাও॥
এথেক যুনিআ তবে দেবি অন্দেশ্বরি।
কন্যারে দিলেন দেখা নিজমুত্তি ধরি॥
আষ্টাঙ্গে প্রনাম করে সাধুর বনিতা।
কোনমতে পূজা তোমার কহ যুনি মাতা॥

১। গ্রহস্তি—গ্রন্থি।
২। সোন্দরি—সুন্দরী।
৩। সর্ব্বথা না হও—যাহা দেখিতেছি, তাহা নহ।
৪। তেজিমু—ত্যজিব, ত্যাগ করিব।

দেবি বোলে যুন কৈন্যা ব্রতের বিধান।
কৃষ্ণপক্ষে মোর ব্রত কর সন্নিধান ॥
বুধ গুরু শুক্র সোম এই চারি বারে।
জার[১] মনে এই দিনে প্রতি মাসে পারে ॥
সর্ব্বদিবা উপবাস করিবেক ব্রতি।
রাত্রিজোগে করিবেক ব্রতের আহুতি ॥
ঘট স্থাপী গণেশাদি পুজিব হরিসে।
রক্তপুষ্প লইআ ধ্যান করিবো বিশেসে ॥
গন্ধ পুষ্প ধুপ নৈবিদ্য বিধান।
অন্দেশ্বরি মহাভাগী ইত্যাদি জে ধ্যান ॥
শোরশ উপচারে দিআ পুজিবো বিশেষে।
বেদের বিধানে পূজা করিবেক হরিসে ॥
বিনাপত্র[২] সপ্তগুটী আনিব তথাতে।
ব্রতকথা শুনিবেক বিনাপত্র হাতে ॥
বিনাপত্রে গ্রহন্তি দিবো কথাতে যুনিতে।
কথাসাঙ্গে গ্রহন্তি মেলি দিবো হরসিতে ॥
তার পরে ব্রতসাঙ্গ করিআ হরিসে।
চুরা[৩] খাইবেক ব্রতী আনন্দ বিশেষে ॥
অন্ধকার করি তবে প্রদীপ নিপাইব।
সপ্তমুষ্টি চুরা তবে চক্ষু মুদি খাইব ॥
তার পরে আর চুরা প্রকাশে খাইব।

* * *

সেই রাত্রি অন্ন আর না খাইব ব্রতি।
তোমারে কহিলো আমি এই ব্রতনিতি ॥
এই মতে ব্রত কৈন্যা জদি কর তুমি।
ধনে পুত্রে বরদায় হইবাম আমী ॥

এথেক বলিআ দেবি হইলা অন্তর্ধ্যান।
জলকুম্ভ লইয়া কৈন্যা গৃহেতে পআন[৪] ॥
বিলম্ব দেখিআ তানে[৫] জিজ্ঞাসে সাষুরি।
এথেক বিলম্ব কেনে কহত সুন্দরি ॥
আদী অন্ত কথা জদি শকলি কহিলো।
মিথ্যাবাক্য বলিআ সাষুরি ক্রোধ হইলো
রাজসঙ্গে সত্যনাশ করিছে তোমার।
বুদ্ধি করি আশিআছ আমা ছলিবার ॥
জদি শত্য আন্দেশ্বরি বর দিছেন তোরে।
এই জলকুম্ভ তোর কাকের উপরে ॥
জদি সোর্ন্নকুম্ভ[৬] হএ[৭] দেখি শাক্ষাতে।
তবে জানি বরদায় হইআছে তোমাতে ॥
এই কথা যুনি কৈন্যা ভাবে অন্দেশ্বরি।
সোবর্ন্নকুম্ভ হইলেক কাকের উপরি ॥
তাহা দেখী সাষুরি বিশ্বজ্ঞান হইলো।
পুত্রসব ডাকি তবে কহিতে লাগীলো ॥
যুনিআ ব্রতের কথা কৈন্যার মুখেতে।
সেই মতে ব্রত কৈল বেদবিধি মতে ॥
ব্রতের কারনে সাধুর পূর্ব্বধন হইলো।
ধনপুত্রবর পাইআ আনন্দিত হইলো ॥
এই মতে ব্রত তার হইলো প্রচার।
ঘরে ঘরে করে ব্রত দিআ জয়কার ॥
ব্যাসদেবে রচিলেক আন্দেশ্বরির পদে।
সর্ব্বকার্জ্য সিদ্ধি হএ রাথ নিরাপদে ॥
আমি অতি মুরমতি না জানি বর্ন্নিতে।
কিঞ্চিত কহিলো কথা তোমার কৃপাতে ॥
অযুদ্ধেরে যুদ্ধ করি দিবেন বুধগণ।
ইষ্টদেবের দোহাই জদি তথা না দে মন ॥

১। জার্‌ মনে—যাহার যেমন ইচ্ছা।
২। বিনাপত্র—বেনার পাতা, বেণুপত্র।
৩। চুরা—চিঁড়া, চিপিটক।
৪। পআন—পয়ান, প্রয়াণ।
৫। তানে—তাঁহাকে।
৬। সোর্ন্নকুম্ভ—স্বর্ণকুম্ভ। ৭। হএ—হয়।

ইতি অন্দেশ্বরির পাঞ্চালি সমাপ্তঃ। ইতি সন ১২৩০ মঘি তাং ১৮ আসার রোজ কুজবার লিখীত শ্রীউমাচরণ গুরুঠাকুর সাং কুএপারা।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

স্থান—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দির

সময়—২৯শে আষাঢ়, ১৩ই জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ ২। সদস্য-নির্ব্বাচন ৩। পুস্তক ও পুথি উপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ৪। পুস্তকাধার-প্রদাতাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত দুইটি প্রস্তরমূর্ত্তি ৬। প্রবন্ধপাঠ—শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" ৭। ইন্দোরনিবাসী প্রবাসী বাঙ্গালী ঐতিহাসিক এবং হিন্দীভাষায় সুকবি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরিচয় ও তাঁহার অভিভাষণ ৮। শোকপ্রকাশ—(ক) অধ্যাপক ৺গতিকৃষ্ণ সেন বিএ ও (খ) ৺রজনীকান্ত বিদ্যারত্নের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই, (সভাপতি)

" ডাঃ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, পি, এইচ, ডি,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
শরৎকুমার লাহিড়ী
" নিখিলনাথ রায় বি এল্
" রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
" সইয়দ আলি আখতার
" ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠ
" মৃণালকান্তি ঘোষ
" বি, এল, চৌধুরী বি এ, বিএস্‌সি
" প্রবোধচন্দ্র দে এফ, এচ, এস
" কালীপদ মুখোপাধ্যায়
" কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্
" বিজয়কৃষ্ণ দাশগুপ্ত সাহিত্যশাস্ত্রী
" দুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
" চিত্তসুখ সান্যাল বি ই
" ললিতমোহন দে
" নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত
শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র ঘোষ বিদ্যাভূষণ
" হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ, বি এল্
" চারুচন্দ্র মিত্র এম্ এ, বি এল্
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" গৌরহরি সেন
" তারাচরণ চক্রবর্ত্তী
" শশিভূষণ ঘোষ
" যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
" পরেশপ্রসন্ন সোম
" গিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য
" যোগেন্দ্রকুমার সেন
" যোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	„ নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
„ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	„ মন্মথনাথ মিত্র
„ অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী	„ সারদাচরণ ঘোষ
„ নকড়ি রায় গুপ্ত	„ সতীশচন্দ্র দত্ত
„ রমণীমোহন বসু	„ কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ
„ নৃপেন্দ্রনাথ রায়	„ পণ্ডিত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য
„ সুকুমার ঘোষ	„ সূর্য্যকুমার পাল
„ যতীন্দ্রমোহন সিংহ	„ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়
„ ভোলানাথ কোঁচ	

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি এল (সম্পাদক)

„ ব্যোমকেশ মুস্তফী
„ হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
„ দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
„ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
} সহকারী সম্পাদকগণ

সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

তৎপরে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীমন্মথমোহন বসু	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীনিতাইহরি দে বি এ ৫১।২ রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট।
শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ	শ্রীরামকমল সিংহ	শ্রীযতীন্দ্রমোহন ঘোষ ৮৬।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার	শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার শিঞাইল, হরিপুর, পাবনা।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীললিতচন্দ্র মিত্র	শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ সরস্বতী জমিদার, বোরগুল, বর্দ্ধমান।
		শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সরকার বি এল উকীল, বর্দ্ধমান।

প্রস্তাবক	সমর্থক	নূতন সদস্য
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীমোহিতচন্দ্র বসু বি এল ১৪ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	ডাঃ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন এল্ এম্ এস্ মুঙ্গের।
"	"	শ্রীতারাপ্রসন্ন বরাট, আলমোরা।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী	"	শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা।
শ্রীরামকমল সিংহ	"	শ্রীমনোরঞ্জন সিংহ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেটলমেণ্ট অফিসার, গয়া।
শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত	"	শ্রীকমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় নলিক্ষির, ফরিদপুর।
কবিরাজ শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন	"	কবিরাজ শ্রীহরপ্রসন্ন দাশগুপ্ত ৫১ মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট।
শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	"	শ্রীকালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, কুড়িগ্রাম, রঙ্গপুর।
শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল্ ১৬ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট।

তৎপরে নিম্নলিখিত পুস্তক-সকল প্রদর্শিত হইল এবং উপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল,—

উপহারদাতা	উপহৃত পুস্তকের নাম
শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়	১। শিক্ষাপ্রচার
" কার্য্যাধ্যক্ষ এরিয়ান প্রেস, শিলচর	২। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল
" হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী	৩। স্নেহ-উপহার
" ব্যোমকেশ মুস্তফী	৪। সুধাখণ্ড পাঁচালী (১ম খণ্ড)
Officer in charge Bengal Sectt. Book Depot	Annual Progress Report on Forest Administration in the Presidency of Bengal for 1911-12 Report on the Maritime Trade of Bengal for 1912-13 , Report on Survey and Settlement Operations in Bengal for 1912

উপহারদাতা		উপহৃত পুস্তকের নাম
Officer in charge Bengal Sectt. Book-Depot.		Statistical Returns with a note of the Regisrtation Dept. in Bengal 1912.
The Registrar, Calcutta University	2.	Calcutta University Minutes for [illegible]2 Parts III & IV
The Brotherhood	3.	Mundak Upanishad
শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ রায়	4.	Popular Education (Report of the Central Committee of Workingman's Institution
Director, Geological Society of India	5.	Memoirs of the Geological Survey of India Vol, XLI pt. 1.
	6.	Records of the Geological Survey of India, Vol. XLIII, pt. I
Mr. Arthur & Ellen Avalon through Messrs. (Thacker, Spink & Co)	7.	Tantra of the Great Liberation
	8.	Hymns to the Goddess.

তৎপরে একটি মেহগ্নি-কাঠের পুস্তকাধার (Rack) পরিষদে উপহার দেওয়ার জন্য পরিষদের হিতৈষী সদস্য শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সোম মহাশয়কে পরিষদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রদত্ত একটি বিষ্ণু ও একটি তারা বা ভৈরবী-প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় জানাইলেন যে, বর্দ্ধমানাধিপ মাননীয় মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্ত্তমান বর্ষে পরিষদের সদস্য-শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আগামী বৎসর পরিষদের স্থায়ী তহবিলে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া পরিষদের বান্ধব হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে মহারাজ বাহাদুরকে পরিষদের আন্তরিক ধন্যবাদসূচক পত্র প্রেরিত হইবে।

তৎপরে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্ এ মহাশয়ের "প্রাচীন পদাবলী ও পদকর্ত্তৃগণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রিকার ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

অতঃপর পরিষদের সদস্য অধ্যাপক ৺গতিকৃষ্ণ সেন বি এ মহাশয়ের ও মহাভাষ্য এবং সামবেদ প্রভৃতি বহু গ্রন্থের অনুবাদক পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরলোকগমনে শোকপ্রকাশ করা হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতকে "কৃষ্ণবিনোদিনী-স্বর্ণপদক" এবং শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্ এ, বি এল মহাশয়কে "বীরেশ্বর-বৃত্তি" ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হইল। যে সকল পুরস্কার ও বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পদক ও পুরস্কার পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

ইন্দোরনিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিহেতু তৎসম্বন্ধে কিছুই হয় নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি এল্ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে
সভাপতি।

প্রথম বিশেষ অধিবেশন

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের পরলোকগমনে শোক-প্রকাশ

সময়,—৪ঠা শ্রাবণ, ২০শে জুলাই, রবিবার, অপরাহ্ণ ৬টা

উপস্থিত—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই (সভাপতি)

স্যার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, ডি এল্, পি এইচ ডি

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম্ এ, বি এল্
„ দেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুর
„ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর
„ সি, এফ, এ্যাণ্ড্রুস্
„ গিরিশচন্দ্র বসু এম্ এ,
ডাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্ এ, পি এইচ ডি
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল
„ পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়
„ সুরেশচন্দ্র সমাজপতি
„ বিহারীলাল সরকার
„ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
„ মৃণালকান্তি ঘোষ
„ নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
„ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ
„ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ
„ শরৎকুমার লাহিড়ী
„ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ
„ ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ
„ দেবকুমার রায় চৌধুরী
„ গৌরহরি সেন
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
„ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার
„ মন্মথমোহন বসু এম্ এ
„ অক্ষয়কুমার বড়াল
„ বোধিসত্ত্ব সেন এম্ এ, বি এল্
„ বিপিনবিহারী গুপ্ত এম্ এ
„ সুরেশচন্দ্র সেন এম্ এ
কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়
কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়
শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
„ হেমচন্দ্র সেনগুপ্ত এম্ এ
„ বসন্তকুমার চক্রবর্ত্তী
„ নরেন্দ্রনাথ শেঠ এম্ এ, বি এল্
„ জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এম্ এ, বি এল্
„ অমূল্যচন্দ্র সেন
„ হেমেন্দ্রনাথ রায়
„ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ
„ মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
„ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিএ
„ রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়
„ যতীশচন্দ্র সমাজপতি
„ উপেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল
„ কৃষ্ণচন্দ্র সরকার
„ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়
„ হেমচন্দ্র ঘোষ

শ্রীযুক্ত অমৃতগোপাল বসু
" সতীশচন্দ্র মিত্র
" পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
" কৃষ্ণচন্দ্র দাস
" রায় বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র বাহাদুর
" যতীশচন্দ্র সমাজপতি
" বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ
" যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" রাজশেখর বসু এম্ এ
ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম ডি
শ্রীযুক্ত অম্বুনাথ চট্টোপাধ্যায়
" চিত্তসুখ সান্ন্যাল বিই

শ্রীযুক্ত পি চৌধুরী এম্ এ
মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ
কুমার " হেমেন্দ্রকুমার রায়
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু এম্ এ, বি এল্
" জলধর সেন
" খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্ এ
" দুর্গাদাস ত্রিবেদী
" বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ
" রামকমল সিংহ
" সুরেশচন্দ্র সরকার
" বিনোদবিহারী গুপ্ত
" তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম্ এ, বি এল্ (সম্পাদক)

" ব্যোমকেশ মুস্তফী
" হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ
" প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্ এ,
" রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এম্ এ
" কবিরাজ দুর্গানারায়ণ সেনশাস্ত্রী
} সহঃ সম্পাদকগণ

অপরাহ্ণ ৩টা হইতেই লোকসমাগম আরম্ভ হয়। প্রায় ৪টার সময় পরিষদের বিরাট সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণ এইরূপ জনসমাগম আশা করিয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নিম্নতলে আর এক অধিবেশনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিম্নতলেও স্থানসংকুলন না হওয়ায় ত্রিতলের ছাদের উপর তৃতীয় অধিবেশনের বন্দোবস্ত করিলেন। তিনটি পৃথক্ অধিবেশনেও বিরাট্ জনসঙ্ঘের স্থানসংকুলন অসম্ভব হওয়ায় নিকটস্থ পরেশনাথের বাগানে সভা করিবার প্রস্তাব হইল। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ বাগানের ম্যানেজার পূর্ণ বাবুর নিকট উক্ত স্থানে সভাধিবেশনের অনুমতি লইয়া আসিলে জনস্রোত সেই দিকে ছুটিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরেশনাথের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। তিন সহস্রেরও উপর লোকসমাগম হইয়াছিল। পরিষদের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষেও এত লোকসমাগম হয় নাই।

শ্রীযুক্ত রায় প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় প্রাজ্ঞ এম্ এ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্ত ভোলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মোহিনীনাথ বিশী,

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ দেবশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, শ্রীযুক্ত রায় রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর প্রভৃতি মহোদয়গণ সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক পত্র লিখিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনগ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক কবিবরের "আমার জন্মভূমি" গীত হইল। বিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় "দ্বিজেন্দ্র-স্মৃতি" নামক প্রবন্ধে দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যজীবন বিবৃত করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকচন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, প্রবন্ধপাঠকের ভ্রাতা ছিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রবাবুকে 'দ্বিজু' বলিয়াই ডাকিতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মাতা শান্তিপুরের স্বনামপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য-বংশের কন্যা ছিলেন। তাঁহারা সাত ভাই ও এক ভগিনী ; ভগিনী মালতীদেবী সর্ব্বাগ্রে স্বর্গারোহণ করেন। পরে সর্ব্বাগ্রজ রাজেন্দ্রলাল দেহত্যাগ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এণ্ট্রান্স ও এফ এ, উভয় পরীক্ষাতেই বৃত্তিলাভ করিয়া বিএ পাশ করেন এবং এম্ এ পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহার অল্পকাল পরেই ছাপরার মুখার্জ্জি সেমিনারীতে মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে শিক্ষকতা-পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি বিলাতে কৃষিবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন নিমিত্ত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হইয়া বিলাতযাত্রা করেন। প্রবাসে তিনি বিশেষ যত্নসহকারে তত্রত্য সঙ্গীতবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। ইহার পূর্ব্বেই তিনি বাঙ্গলাভাষায় বহু গীত রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলি একত্রে "আর্য্যগাথা" নামে প্রকাশিত হয়। সঙ্গীত-রচনাচাতুর্য্যবিষয়ে বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। তিনি এখানকার রাগরাগিণী ও ইংলণ্ডের রাগরাগিণী দুইয়ের সামঞ্জস্য করিয়া নূতন সংগীতের সৃষ্টি করিয়া দেশের মধ্যে এক সার্ব্বজনীন জীবনদায়িনী শক্তিপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সঙ্গীত তাঁহার চিরপ্রিয়—সঙ্গীত তাঁহার সাধনার ধন—এই সঙ্গীতই তাঁহার অমরত্ববিধায়ক। মৃত্যুকালে দ্বিজেন্দ্রলালের বয়ঃক্রম পঞ্চাশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। ৪ঠা শ্রাবণ (সভাধিবেশনের দিন) পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে তাহা পূর্ণ হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল এক পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ়াবস্থার পূর্ব্বেই তাঁহার পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীমান্ দিলীপকুমার, কন্যা শ্রীমতী মায়াদেবী। মায়াদেবী এখনও অবিবাহিতা। বালক দিলীপকুমার সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অতঃপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অপূর্ব্ব সুমিষ্ট ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে "আনন্দ-বিদায়" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের অকালমৃত্যুতে আমাদের জীবনে যে অভাব, যে অপূর্ণতা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবে না। আমাদের হৃদয়ে যে দুঃখ-জ্বালা—বিষাদ আসিয়াছে, তাহা ঘুচিবে না। দ্বিজেন্দ্রলালের অন্তর্দ্ধানে সমগ্র বাঙ্গালা দেশ শোকার্ত্ত। শুধু বাঙ্গালা কেন, ভারতের অন্যান্য

প্রদেশেও তাঁহার অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে; কেন না, তাঁহার বহু কবিতা ও গান ভরিতীয় অন্যান্য ভাষায় অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছে। সান্ধ্যসমিতির তারারত্ন, পূর্ণিমা-মিলনের পূর্ণচন্দ্র, নদীয়ার ষোলকলা পূর্ণচন্দ্র আজ অনন্তে বিলীন হইয়াছে। তাঁহার স্বদেশ-প্রেম সেদিনকার স্বদেশী আন্দোলনের ফল নহে। তাঁহার কৈশোর-রচিত আর্য্যগাথায় ইহার অঙ্কুর, তাঁহার রাণাপ্রতাপ, তারাবাই, দুর্গাদাস ও মেবারপতনে ইহার বিকাশ ও সিংহল-বিজয় ইহার চরম পরিণতি। তাঁহার ব্যঙ্গবিদ্রূপময় বহু গান সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য উদ্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি হাসিতে হাসিতে শিক্ষা দিতে, সমাজ-শাসনের জন্য ঠাট্টার চাবুক চালাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভারতীয় সকল কবিরই চরম উন্নতি ধর্ম্মে। দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ বয়সে রচিত গঙ্গাস্তব ও পরপারের সাধক ভবানীপ্রসাদের কয়েকটি রামপ্রসাদী গান ইহার সাক্ষী।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ কর্ত্তৃক কবিবর সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহার পর শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

অতঃপর মাননীয় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই—হাস্যরসরসিক, শ্রেষ্ঠ শ্লিষ্টকাব্যরচয়িতা, সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার, স্বদেশপ্রেমিক, কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এম্ এ, এম্ আর এ এস্ মহাশয়ের অকালবিয়োগে বাঙ্গালাদেশীয় সমাজের ও সাহিত্যের নিষ্ঠাবান্ ও জনৈক বিশিষ্ট কৃতী সেবকের যে অভাব হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে। তাঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমূহ ক্ষতি অনুভব করিয়া গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন,—দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে যে আমরা সকলেই দুঃখিত, তাহার প্রমাণ অদ্যকার এই সভা। আজ আপনারা সকলে আসনাভাবে কেহ শষ্পাসনে, কেহ দণ্ডায়মান হইয়া এই দারুণ গ্রীষ্মে যে এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, ইহা আপনাদের দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি শ্রদ্ধার স্পষ্ট নিদর্শন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, আমি দ্বিজেন্দ্রলাল অপেক্ষা দেড়গুণ বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও বাঁচিয়া আছি এবং তিনি অকালে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। কবির কথাতে বলিতে গেলে বলিতে হয়,—

একই ঠাঁই চলেছি ভাই ভিন্ন পথে যদি,
জীবন জলবিম্বসম মরণ হ্রদ হৃদি;
দুঃখ মিছে কান্না মিছে
দু-দিন আগে দু-দিন পিছে
একই সঙ্গে সাগরে গিয়ে মিশিবে সব নদী।

দ্বিজেন্দ্রলালের রচনার সমালোচনার এই সময় নয়। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তাঁহার চরিত 'আমার জন্মভূমি', 'আমার দেশ', 'আমার ভাষা', প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি তাঁহার বিশুদ্ধ

স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয় দেয় এবং ইহা চিরকাল বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠে গীত হইবে। তাঁহার রচিত এই সকল জাতীয় সঙ্গীতে বিদেশী-বিদ্বেষের লেশমাত্র নাই। দ্বিজেন্দ্রলালের মনের মধ্যে বিদ্বেষভাব আসিতেই পারে না।

মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকালে এইমাত্র বলিলেন যে, নীরবে শোকপ্রকাশ সকল দেশেরই নিয়ম, সেইজন্য আমি "নীরবে" এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতেছি। অতঃপর শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার মহাশয় পুনরনুমোদনকালে বলিলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে সঙ্গীত-রচয়িতা ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আজকালের অনেক কবির মত কেবল সঙ্গীতজ্ঞানবর্জ্জিত কবিতালেখক ছিলেন না। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই সম্বন্ধে কিছু বলিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় দ্বিতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই,— কবিবর শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অকালবিয়োগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছেন। এই সমবেদনা লিপিবদ্ধ করিয়া সভাপতি মহাশয়ের স্বাক্ষরে কবিবরের পুত্র শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের সমীপে প্রেরিত হউক।

কবিবরের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাহা কেবলমাত্র তাঁহার পুত্রই করিতে পারেন। আমরা কেবল তর্পণাধিকারী। দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয়-জীবনের উপগাগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতবাসী না হইতাম, তাহা হইলেও "আমার দেশ" গান শুনিলে আমারও শোণিত একটু খরতরবেগে প্রবাহিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলালের গান বিশ্ব জুড়িয়া। বিশ্ব-সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া তাহা সকলেই গাহিতে পারেন। এই কবিত্বের দ্বারা তিনি বাঙ্গালা দেশকে যে গৌরবান্বিত করিয়াছেন, তাহা নহে; তিনি বাঙ্গালীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার রচনার সমালোচনার সময় ইহা নয়। তাঁহার পরিবার প্রত্যেক বঙ্গবাসী। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার তর্পণ করি এবং তাঁহার পুত্রকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে এই প্রস্তাব সমর্থন করিতে আহ্বান করা হইল। তাঁহার অনুপস্থিতিহেতু শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জলধর সেন তৃতীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত করিলেন। সেই প্রস্তাবটি এই,— কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে রক্ষা করিতে হইবে। ইহার উপযুক্ত ব্যবস্থার ভার সাহিত্য-পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির প্রতি অর্পিত হউক।

যুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিএ ইহার সমর্থন করিলে, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

ইহার অনুমোদনকালে বলিলেন যে, বাঙ্গালী কবির শোক-সভায় আজ এত ইংরাজী-পড়া ছেলেরা কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, ইহা অতি সুখের বিষয়। বিপিনচন্দ্র বলিয়াছেন যে, আমরা শোক করিতে পারি না। আমি বলি যে, শোক করিব না কেন? সকলেরই শোক করিবার অধিকার আছে। এস, এক জায়গায় ব'সে সকলে কাঁদি। দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির ভিতর দিয়া কাঁদাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। দেশবাসীর চোখ ফুটাইবার জন্য তিনি ব্যঙ্গনাট্য, কবিতা ও গানের অবতারণা করেন। যেমন ছিলে তেমনি হয়—যদি তোমরা মানুষ হও। অতঃপর তৃতীয় প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় জ্ঞাপন করিলেন যে, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় ২০৲ টাকা মূল্যের একটি স্বর্ণপদক কবিবরের স্মৃতিকল্পে দান করিবেন এবং রায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর দ্বিজেন্দ্রলাল-স্মৃতিভাণ্ডারে ৫০৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সভাপতি মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে কিছু বলিলে শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল) সভাপতিকে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব করিলেন। পরেশনাথের বাগানে সভাধিবেশনের অনুমতি দেওয়ার জন্য রায় শ্রীযুক্ত বদরীলাল মুকিম বাহাদুরকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল। শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ ধন্যবাদ-প্রস্তাব সমর্থন করিলে দ্বিজেন্দ্রলালের "পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে" গীত হইয়া রাত্রি ৮॥০ টার সময় সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সহঃ সম্পাদক।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দে
সভাপতি।

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ

উজানি ও মঙ্গলকোট

(১)

উজানি নগর

উত্তর-রাঢ়ভূমি পরিদর্শনপূর্ব্বক লুপ্ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ও প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান করিবার জন্য আমরা মঙ্গলকোট ও উজানি-ভ্রমণে গমন করিয়াছিলাম। উজানি ও মঙ্গল-কোট প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্ত দত্ত এবং খুল্লনা সম্বন্ধে কবিকঙ্কণ-চণ্ডীকাব্যে সবিশেষ উল্লেখ আছে, তাঁহাদের বাসভবন উজানি নগরে ছিল। উজানি বা মঙ্গল-কোটে বিক্রমকেশরী নামক এক রাজা ছিলেন। উজানি একটি পীঠস্থান। তথায় দেবী ভগ-বতীর কনুই পতিত হইয়াছিল। দেবী মঙ্গলচণ্ডী এবং ভৈরব কপিলাম্বরের অবস্থান জন্য উজানি বা মঙ্গলকোট হিন্দুমাত্রেরই তীর্থস্থান। এই উজানিতে লোচনদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাকে বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন মঙ্গলকোট থানার অন্তর্গত পরগণা আজমৎসাহীর মধ্যে উজানি নগর অবস্থিত। 'উজানি নগর' বলিলে এখন আর সাধারণে বুঝিতে পারিবেন না। উজানির সে গৌরবস্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে। উজানির সম্পদ্, বাণিজ্য ও জনবহুলতা এক্ষণে কল্পনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল, তখন উজানির গৌরব ছিল। গৌড়ের ধ্বংস হইয়াছে, উজানিও সেই সঙ্গে মহিমাচ্যুত হইয়াছে। যখন ধনী বণিকৃগণের বাণিজ্যপোতগুলি ভ্রমরার ঘাটে বাঁধা থাকিত, তখন এই স্থানের নাম ছিল উজানি; মুসলমান বাদশাহী দপ্তরে উজানির নাম হয় 'সুগ্রাম'। চৈতন্য-মঙ্গল-প্রণেতা লোচনদাস (ত্রিলোচনদাস) তাঁহার জন্মভূমির নাম 'কোগ্রাম' বলিয়াছেন। তাঁহার ভার্য্যা পতিসহবাসে বঞ্চিতা হইয়া এই গ্রামের নাম 'কুগ্রাম' রাখিয়াছিলেন। গ্রাম-বাসীরা সতীর সম্মান রক্ষার জন্য 'কুগ্রাম' এবং লোচনদাসের সম্মানের জন্য 'কো-গ্রাম', এই উভয় নামই ব্যবহার করিয়া থাকেন। বাদশাহী 'সু-গ্রাম' নামের ব্যবহার আর নাই।

মঙ্গলকোটের পুলিশ ষ্টেশন হইতে উত্তর পূর্ব্বাংশে উজানি অবস্থিত। এই উন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া উজানি নগর দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। কুণুর নামক কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী বাঁকিয়া বাঁকিয়া কোগ্রামের দক্ষিণ ও পূর্ব্বপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া অজয়নদে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। কুণুরের উত্তরে ক্ষুদ্র প্রান্তর, পার্শ্বে 'আড়ওয়াল (আড়াল)' নামক ক্ষুদ্র পল্লীর ঘন পাদপশ্রেণী, দূরে উজানিকে আবৃত করিয়া ছোট ছোট গুল্ম হইতে অশ্বত্থ ও বট তরুগুলি

নিবিড় ভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে জটাজূটধারী তালতরুগুলির শীর্ষদেশ দেখা যাইতেছে, দূর হইতে উজানি যেন একটি বনভূমি বলিয়া মনে হইয়াছিল।

মঙ্গলকোট হইতে স্বল্পতোয়া কুণুর নদী পার হইয়া উত্তরমুখে কিঞ্চিৎ গমন করিলেই নাতি-বৃহৎ এক অশ্বত্থ তরুতলে কতিপয় বন্যবৃক্ষলতাচ্ছাদিত ধ্বংসপ্রায় একটী প্রাচীন মস্‌জিদ্ দেখা যায়। এখন সেটি কেবল ইষ্টকস্তূপ, তন্মধ্যে মস্‌জিদের ভগ্নপ্রায় কিয়দংশ আজিও দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে মস্‌জিদ্‌টি ইষ্টক ও চূণ দিয়া গাঁথা হইয়াছিল। ইহা দুই হইতে তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহার কি নাম, স্থানীয় লোকে তাহা অবগত নহে। এই মস্‌জিদ্ হইতে অতি নিকটে একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, গ্রামের নাম 'আড়ওয়াল'। তথায় যে কয়েক ঘর অধিবাসী আছে, তাহারা মুসলমান। এই ক্ষুদ্র আড়ওয়াল গ্রামটি দুই ভাগে বিভক্ত; মধ্য-ভাগে একটি শুষ্ক কেদারবাহিনী নদীর গর্ভ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই শুষ্ক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া আড়ওয়ালের উত্তর অংশ দিয়া গ্রামান্তরে যাইবার পথ প্রসারিত রহিয়াছে। গ্রামের এই অংশে আর একটি মস্‌জিদের চিহ্ন মাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। কুণুর নদীতীরে এক অজ্ঞাতনাম কাজির বাটীর ধ্বংসাবশেষ আছে। আজিও কাজির সানবাঁধা রোয়াক ও গৃহের মেঝের কিয়দংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিকাংশ গৃহচিহ্ন কুণুর-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কুণুরনদীর প্রায় শুষ্ক সামান্য জলধারা ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। নদীগর্ভ ইষ্টকস্তূপে প্রায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের নদীর 'আড়ানী' বড় উচ্চ। নদীগর্ভে অবতরণ করিয়া আড়ানী-গাত্রে কোন প্রকার প্রাচীন চিহ্ন বর্ত্তমান আছে কি না, অনুসন্ধান করা হইল। ইষ্টকময় গৃহভিত্তি এবং মৃত্তিকাপাত্রের চূর্ণরাশি নদীপ্রবাহে মৃত্তিকা হইতে উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখা গেল। ক্রমে উত্তর অংশে মৃত্তিকাপাত্রচূর্ণপরিপূর্ণ একটী ডাঙ্গা পার হইয়া দু চারিটী বাব্‌লাগাছের পার্শ্ব দিয়া কোগ্রাম-সীমায় উপস্থিত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, মহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুবর্গ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ঘনবন্যবৃক্ষসমাকীর্ণ নিবিড় বনভূমির মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা যায়। গ্রামটিও বনভূমি। সম্মুখে এক সুবৃহৎ বটবৃক্ষের পশ্চিম পার্শ্বে ভগ্নপ্রাচীর-বেষ্টিত প্রাঙ্গণমধ্যে একটি ক্ষুদ্র নবনির্ম্মিত ইষ্টকগৃহ দেখা গেল। ইহাই বর্ত্তমান কালের চণ্ডীর দেউল। এই স্থানেই মঙ্গলচণ্ডীর অবস্থান। ইহারই পার্শ্বে ধনপতি দত্ত সদাগরের বাসভবন ছিল।

মঙ্গলচণ্ডিকার মন্দির

মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে হইলে, পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিতে হয়। বর্ত্তমান মন্দিরটি দক্ষিণদ্বার। দীর্ঘে ২২ ফিট্ ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ২১ ফিট্। মন্দিরমধ্যে কাঠের সিংহাসনের উপরে পিত্তলময়ী দশভুজা মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী চণ্ডিকা দেবী বিদ্যমান রহিয়া-ছেন। তাঁহার সিংহাসনের পুরোভাগে একটি প্রস্তরের বৃষ। বামে প্রস্তরের পলতোলা

কৃষ্ণবর্ণ লিঙ্গমূর্ত্তি—ইহাঁরই নাম কপিলেশ্বর। তাঁহার বামে পদ্মাসনোপরি অবস্থিত ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি, তাঁহার বামে গৃহের কোণে একটী বৃহৎ খড়্গা।

পূজারী দীনদয়াল ব্রহ্মচারী মহাশয় চণ্ডীমূর্ত্তিটি বাহিরে আনয়ন করিলে এবং নিম্নে ও সম্মুখভাগে ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তিটি রাখিলে ছায়াচিত্র গ্রহণ করা হয়। চিত্রে মঙ্গলচণ্ডিকা ও বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি সুন্দর দেখাইতেছে। বুদ্ধমূর্ত্তিটি ঊর্দ্ধে ১´—৯´´, প্রস্থে ১১´, পুরু ৩´´। উজানির মঙ্গল-চণ্ডিকা পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং উজানি একটি পীঠস্থানমধ্যে গণ্য।

"উজানিতে কফোনি মঙ্গলচণ্ডী দেবী।
ভৈরব কপিলাম্বর শুভ যাঁরে সেবি॥"

—পীঠমালা।

তন্ত্রচূড়ামণি নামক তন্ত্রের মতে উজানি নামক স্থানে ভগবতীর কূর্পরদেশ পতিত হইয়াছিল এবং দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ও ভৈরব কপিলাম্বর তথায় নিয়ত অবস্থান করেন; কুব্জিকাতন্ত্রে মঙ্গলকোটে উক্ত পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। শিবচরিত নামক সংগ্রহ-পুস্তকে উজানিতে পীঠস্থানের কথা লিখিত আছে।

লোচনদাসের পাট

মঙ্গলচণ্ডিকা দেবীর দেউল হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বকোণে গমন করিলে 'লোচনদাসের পাটে' উপস্থিত হওয়া যায়। লোচনদাসের সমাধি-গৃহটি ক্ষুদ্র ও ইষ্টক-নির্ম্মিত। সমাধিগৃহের প্রাঙ্গণে দক্ষিণ মুখে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরটি দক্ষিণ-দ্বারী। এই সমাধি-গৃহটী দৈর্ঘে ১৫´ ফিট্ ৩´´ ইঞ্চি, প্রস্থে ১২´ ফিট্ ১´ ইঞ্চি। গৃহের মধ্যে লোচনদাসের পিরামিডাকৃতি (Pyramidal) সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। সমাধির উত্তরাংশে শ্রীশ্রীগৌর-নিতাই-এর মৃণ্ময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সমাধিগৃহপ্রবেশের দ্বারের উভয় পার্শ্বে ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ প্রস্তরের দুইটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি আবদ্ধ রহিয়াছে। মূর্ত্তিদ্বয় অতি সুন্দর ও অনুমান একাদশ কি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

সমাধিমন্দিরের বাহিরে পূর্ব্বভাগে মাধবীলতার তলে ছোট বড় দশটি পিরামিডাকৃতি সমাধিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। চিত্রে এইগুলি সুন্দর দেখা যাইতেছে। প্রাঙ্গণের দক্ষিণভাগে একটি ক্ষুদ্র ইষ্টক-নির্ম্মিত স্থান, তাহার তিনটি অংশ। উহার দুই পার্শ্বে দুইটি দেড় বা দুই হস্ত উচ্চ ছাদযুক্ত অতি ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট গৃহ, মধ্যস্থল উন্মুক্ত। এই ক্ষুদ্র গৃহের পূর্ব্বপার্শ্বে উদয়চাঁদ মহান্তের সমাধি এবং পশ্চিমে বীরচাঁদ অবধূত গোসাঞির ও তাঁহার প্রস্তৃতির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই দুই সমাধিস্থানের মধ্যস্থিত অংশে একটি সুন্দর কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্ম্মিত জৈন তীর্থঙ্করমূর্ত্তি বিদ্যমান ছিল। এই মূর্ত্তিটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের জন্য সংগৃহীত হইয়া কলিকাতায় আনীত হইয়াছে।

তীর্থঙ্করমূর্ত্তি-পরিচয়

মূর্ত্তিটি দিগম্বর, কাল প্রস্তরের উপর খোদিত, প্রস্তরটি উচ্চতায় ২৭॥০ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৭॥০ ইঞ্চি, স্থূলতায় ৩ ইঞ্চি। মূর্ত্তির মস্তকে একটি ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি ঢক্কা কোন অদৃশ্য বাদক কর্ত্তৃক ধ্বনিত হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে, দুন্দুভিনিনাদ হইতেছে। তন্নিম্নে মালাহস্তে দুইটি উড্ডীয়মান অপ্সরোমূর্ত্তি, তাহাদের নিম্নে, মূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দেবমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটির বদন শ্মশ্রুবিমণ্ডিত, তাহার এক হস্তে গদা, অন্য হস্তে অভয়মুদ্রা। দ্বিতীয় মূর্ত্তিটী ধ্যানমুদ্রায় অবস্থিত। তৃতীয়টির দক্ষিণ হস্তে গদা আর বামহস্তে জানুদেশ সংস্থাপিত। চতুর্থ মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে অভয়মুদ্রা, বামহস্তে বরদ-মুদ্রা এবং তাহার শ্মশ্রুও বিদ্যমান রহিয়াছে। বামদিকের পাঁচটি মূর্ত্তির মধ্যে প্রথমটির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম, বামহস্তে ঘট। দ্বিতীয় মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্তে পদ্ম এবং বামহস্তে গদা, তন্নিম্ন মূর্ত্তির দুই হস্তেই পদ্ম বিরাজিত রহিয়াছে। চতুর্থটি পুরুষের উর্দ্ধাঙ্গের মূর্ত্তি, তাহার দুই হস্ত অস্পষ্ট, মস্তকে আভামণ্ডল রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্ন মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ কোন স্ত্রীলোকের প্রতিকৃতি এবং নিম্নার্দ্ধ সর্পপুচ্ছবৎ, তাহার দক্ষিণ হস্তে অসি ও বামহস্তে চর্ম্ম বিদ্যমান। এই নয়টি মূর্ত্তিই আসনে উপবিষ্ট। বিশেষ পরীক্ষার পর স্থির হইয়াছে যে, এই মূর্ত্তি নয়টি নবগ্রহের। ইহাঁদের নিম্নে তীর্থঙ্করের দুই পার্শ্বে দুইটি চামরধারী পুরুষ-মূর্ত্তি, তাহারই ন্যায় দুইটি পদ্মের উপর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার পরই পাদপীঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার মধ্যভাগে তীর্থঙ্করের ঠিক পদতলে একটি শায়িত মৃগমূর্ত্তি; এই লাঞ্ছন দেখিয়া মূর্ত্তিটিকে ষোড়শতম তীর্থঙ্কর শান্তিনাথ অবধৃত বলা হইয়াছে।* মৃগের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্ম্মাতার কল্পিতমূর্ত্তি আর পাদপীঠে দুই ধারে দুইটি নৈবেদ্য।

লোচনদাসের পাটের বর্ত্তমান মোহান্তের নাম হরিদাস মোহান্ত, তিনি বাউলপন্থী। সমাধি-প্রাঙ্গণের পূর্ব্বভাগে উক্ত বাবাজীর আখড়াবাড়ী। লোচনদাসের সমাধি-গৃহের ছায়াচিত্র গৃহীত হইয়াছে।

লোচনদাসের পরিচয়

লোচনদাস তাঁহার আত্মপরিচয় স্বরচিত চৈতন্যমঙ্গল নামক কাব্যে প্রদান করিয়াছেন। লোচনদাস সর্ব্বসমেত তিনখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। "রামানন্দ রায়ে"র অপূর্ব্ব সংস্কৃত নাটক "জগন্নাথবল্লভ"-স্থিত গীত ভাঙ্গিয়া তিনি বাঙ্গালা পদ করেন। তাঁহার রচিত 'দুর্ল্লভসার'

* Ind. Ant. Vol. II p 138.
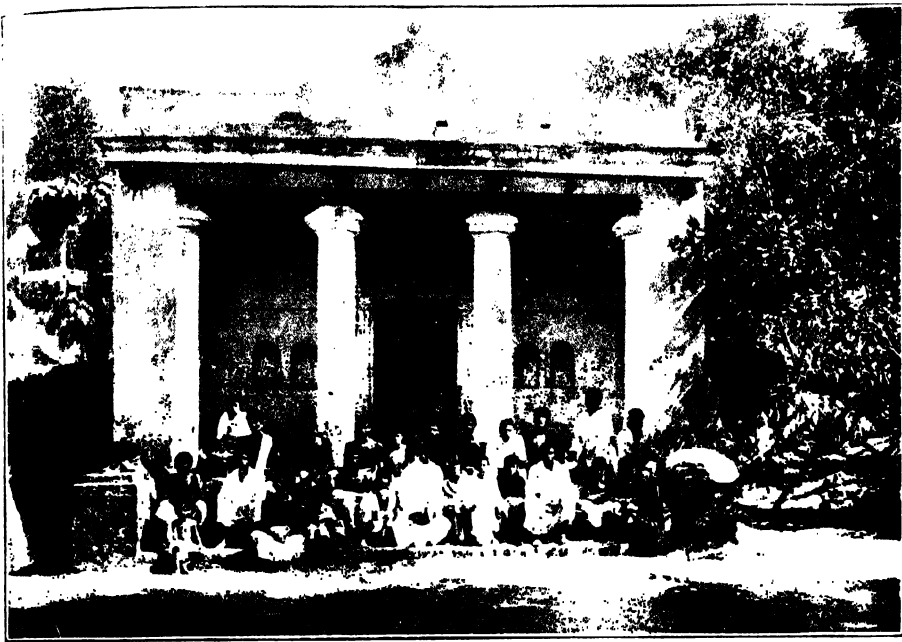
উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ] মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির [১৬২ পৃঃ

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ লোচনদাসের সমাধি [১৬৩ পৃঃ

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ] জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের
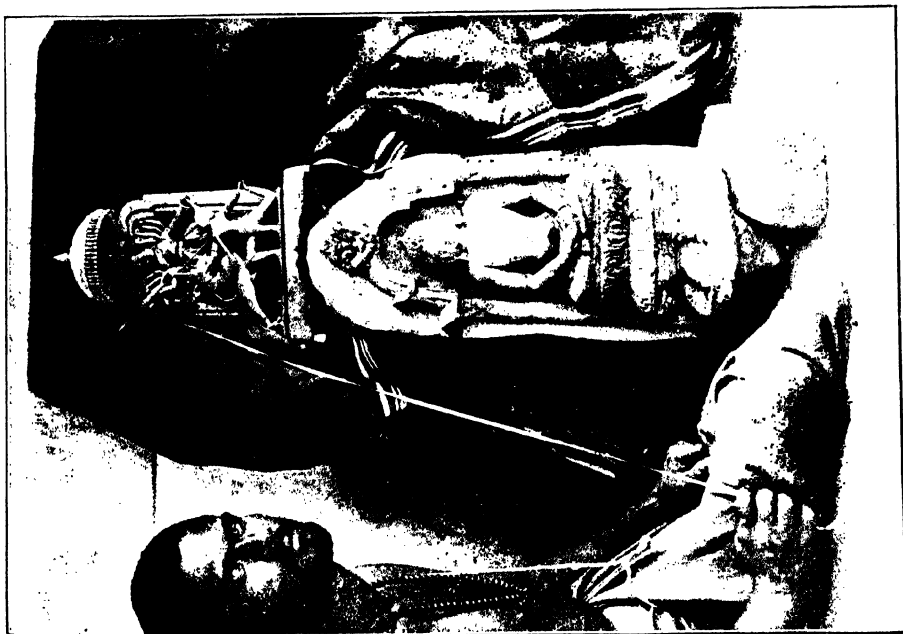
নামক একখানি সূক্ষ্মতত্ত্বপরিপূর্ণ সুন্দর গ্রন্থ আছে। তাঁহার রচিত গৌরগুণময় চৈতন্যমঙ্গল একখানি সুবৃহৎ পদ্যাত্মক কাব্য। এই চৈতন্যমঙ্গলে তিনি আপন বংশ-পরিচয় যাহা প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই,—

"চারি খণ্ড কথা সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কু-গ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর শ্রীশ্রীমতী সদানন্দী নাম।
যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম॥
কমলাকর দাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাঁহার প্রসাদে কহি গৌর-গুণ-গাথা॥
সংসারেতে জন্ম দিল যেই পিতা মাতা।
মাতামহকুল তার শুন কিছু কথা॥
পিতৃকুল মাতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়া দাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থ-পূত সেহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র॥
যথা তথা যাই সে দুল্লিল * করে মোরে।
দুল্লিল লাগিয়া কেহ পড়াবারে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে পড়াইল অক্ষর।
ধন্য সে পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাঁহার॥
তাঁহার চরণে মুঞি করো নমস্কার।
চৈতন্য-চরিত্র লিখি প্রসাদে যাঁহার॥
মাতৃকুল পিতৃকুলে কহিলো যো কথা।
নরহরি দাস মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
তাঁহার প্রসাদে যেবা করিলা প্রকাশ।
পুস্তক করিল সার এ লোচনদাস॥" শেষখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল।

লোচনদাস ভাল লেখা-পড়া শিক্ষা করেন নাই, এ কথা প্রকৃত নহে। কারণ, রামানন্দ রায়ের সংস্কৃত নাটকের যিনি বাঙ্গালা ভাষায় পয়ারে অনুবাদ করিতে পারেন, তিনি অশিক্ষিত, ইহা বলা যায় না। তবে তাঁহার হস্তাক্ষর আদৌ ভাল ছিল না। বাঁশের কলমে তেরেট

* দুল্লিল, আদুর, আদর।

পাতায় পাত যোড়া করিয়া তাঁহার এক একটি 'ক' 'খ' লেখা অভ্যাস ছিল। তাঁহার হস্তাক্ষর আজিও বিদ্যমান রহিয়াছে।*

বাঁশের কলম ও তেরিজপাতা লইয়া লোচনদাস, তাঁহার বাটীর কুলতলায় একখানি পাথরের উপর বসিয়া পাতাযোড়া অক্ষরে চৈতন্যমঙ্গল লিখিতেন, আজিও সেই প্রস্তরখণ্ড বর্ত্তমান আছে। তবে কো-গ্রামে নাই। ভক্তগণ সেই প্রস্তরখানি দর্শন ও ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া থাকেন।

লোচনদাসের অল্পবয়সেই বিবাহ হইয়াছিল। আমোদপুরস্থ কুকুটে গ্রামে তাঁহার শ্বশুর-বাড়ী ছিল। বিবাহের পর লোচনদাস শ্রীখণ্ড-নিবাসী শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন সরকার ঠাকুর মহাশয়দ্বয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে গমন করেন। কবি আপন শিক্ষক গুরুদ্বয়ের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই,—

"শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বিশেষ কহিব কিছু চরিত্র তাঁহার॥
তাঁহার চরিত্র আমি কি কহিতে জানি।
আপন বুদ্ধির শক্তি যেই অনুমানি॥
অভিমান কেহ কিছু না করহ মনে।
প্রণতি করিয়ে নিজ গুরুর চরণে
যাঁর পদ-পরসাদে আমি হেন ছার।
তোমরা ঠাকুর-গুণ কহি ত সবার॥
শ্রীনরহরি দাস ঠাকুর আমার।
বৈদ্যকুলে মহাকুল প্রভাব যাঁহার॥
অনর্গল কৃষ্ণ-প্রেম কৃষ্ণময় তনু।
অনুগত জনে না বুঝান প্রেম বিনু॥
অসংখ্য জীবের দয়া কাতরহৃদয়া।
কৃষ্ণ-অনুরাগ সদা অমিয় আশয়া॥
রাধা-কৃষ্ণরসে তনু গড়িয়াছে যেন।
ভাবের উদয় বলি যখন যেমন॥
ক্ষণে রাধাকৃষ্ণ-রসে নির্ম্মল পীরিতি।
শ্রীখণ্ডভূখণ্ডমাঝে যাঁর অবস্থিতি॥
নরহরি চৈতন্য বলিয়া প্রভুর খ্যাতি।
সে চরণ বিনু মোর আর নাহি গতি॥
* * * * * *

---

* চৈতন্য-মঙ্গল, বিজ্ঞাপন। (রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন)

বৃন্দাবনে মধুমতী নাম ছিল যার।
রাধাপ্রিয়-সঙ্গী তিঁহো মধুর ভাণ্ডার ॥
এবে কলিকালে গৌর-সঙ্গে নরহরি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের ভাণ্ডারে অধিকারী ।" চৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড।

লোচনদাস বিবাহের পর শ্বশুরবাড়ী যান নাই। বহুদিন পরে কুকুটে গ্রামে গিয়া শ্বশুর-বাড়ী চিনিতে পারিলেন না। তিনি শ্বশুরবাড়ীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! অমুকের বাড়ী কোন্ পথে যাইব?" লোচন যে রমণীকে মাতৃসম্বোধন করিলেন, তিনিই তাঁহার পরিণীতা স্ত্রী। অনতিবিলম্বে যখন তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী বলিয়া অবগত হইলেন, তখন লজ্জা ও পাপভয়ে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। তখন মনে ভাবিলেন যে, আমার গুরুদেব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় আকুমার ব্রহ্মচারী, আমারও স্ত্রীত্যাগের এই এক সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী এই ব্যাপারে বড় ক্ষুব্ধা হইয়াছিলেন। শেষে চিরজীবন স্ত্রীসহ একত্র যাপন করিলেন বটে, কিন্তু ভগ্ন-বিষদন্ত সর্পের ন্যায় দাম্পত্য-ব্যবহার কিছুই ঘটিল না। ত্রিলোচন যে শক্তিমান্ ও জিতেন্দ্রিয়, তাহা এই ঘটনাতেই সুস্পষ্ট জানা যাইতেছে। স্ত্রীর সহিত প্রগাঢ় প্রীতিও ছিল,:তাহাও নিজে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"প্রাণের ভার্য্যে! নিবেদি নিবেদি নিজ কথা,
আশীর্ব্বাদ মাগি আগে, যত যত মহাভাগে,
তবে গাব গোরা-গুণ-গাথা।"

উভয়ের মধ্যে কি মধুর ভাব ছিল, এই গীতেই তাহা জানা যায়। ত্রিলোচনের গীত প্রায়ই কৌতুকরসে পরিপূর্ণ।*

বৈষ্ণব কবিগণ লোচনদাসকে ব্রজের বড়াইবুড়ীর অবতার বলিয়া থাকেন।

"তুমি ত বড়াইবুড়ী, হও সে নাটের গুঁড়ী"

বলিয়া বৈষ্ণব কবিগণ আজিও তাহা গান গাহিয়া থাকেন। কি কারণে তাঁহার বড়াইবুড়ী আখ্যা লাভ হইয়াছিল, তাহার পরিচয় লোচনের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীরাধিকা একদিন কৃষ্ণসম্ভোগ-চিহ্ন গোপন করিতে গিয়া শাশুড়ীর নিকট ছল করিয়াছিলেন। ত্রিলোচন তাহা গীতে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীরাধিকার উক্তি—

"সাঁজ দিলাম শলিতা দিলাম গোহালে দিলাম বাতি।
তোমার ঘরের চোরা বাছুর বুকে মারিল লাথি ॥
বুক বুক ব'লে আমি প'লেম ক্ষিতিতলে।
এমন কেহ ব্যথিত নাই যে, হাতে ধ'রে তোলে ॥

* চৈতন্যমঙ্গল—বিজ্ঞাপন ৵০

লোচন বলে ওলো দিদি, আমি তখন কোথা।
শাশুড়ী ভুলাইতে তুমি এত জান কথা॥"

লোচন শ্রীরাধিকাকে "দিদি" বলিয়া সম্বোধন করিয়া যখন এই প্রকার কথা বলিতেছেন, তখন তাঁহাকে ব্রজের বড়াইবুড়ী না বলিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

অজয়নদ

কুগ্রাম বা কোগ্রামের উত্তর পার্শ্বে অজয়নদ। লোচনদাসের বাটী হইতে অজয় অতি নিকটে। আমরা অজয়তীরে এক অশ্বত্থমূলে গিয়া উপবেশন করিলাম। অজয় অতি বৃদ্ধ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, বালুকাস্তূপের অন্তরালে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত। উদ্যম নাই, চঞ্চলতা নাই। অজয়ের এই অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, ঘনরাম যে অজয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, এ অজয় বুঝি সে অজয় নহে। ঘনরামের অজয় যথার্থই অজয় ছিল।

"প্রলয় দারুণ বাণ আইল হেন কালে।
তরল তরঙ্গ-তেজে দুকূল উথলে॥
কুল কুল কুবর কখন কানে কান।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেল বাণ॥"

ঘনরাম-ধর্ম্মমঙ্গল, অষ্টাদশ সর্গ।

বর্ত্তমান কালে অজয় কুগ্রাম গ্রাস করিতেছেন। কোগ্রামের তীরভূমি সুউচ্চ আড়ানী। এই স্থানের সমতল ক্ষেত্রে লোচনের স্মরণার্থ উজানির মেলা বসিয়া থাকে।

কুণুর সঙ্গমস্থল

এই স্থান হইতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইলে, অজয় ও কুণুরের সঙ্গমস্থল। অজয় ও কুণুর-সঙ্গমের পশ্চিমেই উজানির মহাশ্মশান-ভূমি।

এই উজানির মহাশ্মশানের এক পার্শ্বে 'খড়্গমোক্ষণ' নামক পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। ইহার পার্শ্বেই 'খাড়গড়া', তৎপরেই নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে কবিকঙ্কণ চণ্ডীকাব্যোক্ত 'ভ্রমরার দহ'। প্রাচীন 'ভ্রমরার দহ' উপস্থিত বালুকাস্তূপ ও পলিমাটি পড়িয়া কৃষিভূমিতে পরিণত হইয়াছে। চিত্রে যে অংশ উন্নত ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষমূলে একজন দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহারই পশ্চাতে 'খড়্গমোক্ষণ' ও 'খাড়গড়া' নামক স্থান।

খড়্গমোক্ষণ

সম্বন্ধে যে দুইটি প্রবাদ এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল।

প্রথম—বিক্রমাদিত্য নামে কোন নরপতি বেতালসিদ্ধি ব্যাপারে খড়্গাঘাতে অনেক সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদন করেন। ব্রহ্মহত্যাপরাধে সেই খড়্গ সেই রাজার হস্তে সংলগ্ন হইয়া

ধীশে। বহুতীর্থ-ভ্রমণের পর উজানির এই মহাশ্মশানে অজয়নদতীরে খড়্গ হস্ত হইতে চ্যুত হইয়া পড়ে এবং মহারাজ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

দ্বিতীয়—এক ব্যক্তি খড়্গদ্বারা তাহার ভ্রাতার মস্তকচ্ছেদন করে। এই ভ্রাতৃহত্যারূপ মহাপাপে সেই খড়্গ তাহার হস্তে সংলগ্ন হইয়া যায়। এই 'খড়্গমোক্ষণ' বলিয়া খ্যাত প্রান্তরে আসিলে তাহার সেই মহাপাপ-বিমোচনের প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ হস্তসংবদ্ধ খড়্গ স্খলিত হয়। এই উভয় প্রবাদবশতঃ এই খড়্গমোক্ষণের মাঠ তীর্থরূপে বিবেচিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৌষসংক্রান্তির দিনে এই স্থানে স্নানার্থ বহু লোকসমাগম হইয়া থাকে এবং এই স্থানে একটি মেলা বসে। ইহার পার্শ্বেই

মাড়গড়া

নামক স্থান। এই স্থানটির নাম 'মাড়গড়া' কেন হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয় বলিলেন, এই স্থানে অজয়ের ধারে ধনপতি দত্ত সওদাগরের দ্বিতীয়া স্ত্রী খুল্লনা ছাগী চরাইবার সময় বিশ্রাম করিতেন। প্রবাদ এই যে, খুল্লনা এই স্থানে ভাত রাঁধিয়া ভাতের মাড় গালিয়া ফেলিতেন।

ভ্রমরার দহ

খড়্গমোক্ষণ ও মাড়গড়ার অনতিপূর্ব্বভাগে কুনুর ও অজয়সঙ্গম-পার্শ্বে ভ্রমরার দহ। উজানি যখন বণিক্-সমাকুল ছিল, তখন এই ভ্রমরার দহে তাঁহাদের বাণিজ্য-তরণী লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইত। ধনপতি দত্ত এই ভ্রমরার দহে ডিঙ্গায় চাপিয়া সিংহলে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত দত্ত এই ভ্রমরার দহে সাতখানি সমুদ্রগামী পোত ভাসাইয়া সিংহলে পিতার অনুসন্ধানে গমন করেন।

"প্রথমে ভ্রমরাজলে, শ্রীমন্ত নৌকায় চলে,
পূজিয়া মঙ্গলচণ্ডিকায়।
এড়ায় ভ্রমরা-পাণি, সম্মুখেতে উজানি,
নিজ-গ্রাম এড়াইয়া যায়॥"—কবিকঙ্কণ

বণিকেরা যখন সফরে বাহির হইতেন না, তখন তাঁহাদের ডিঙ্গাগুলি ভ্রমরার জলে নিমগ্ন থাকিত। বাণিজ্য-গমনের পূর্ব্বে জল হইতে নৌকাগুলি তুলিয়া মেরামত ও গাবকালী করাইয়া ব্যবহার করিতেন। ভ্রমরার দহ তখন খুব গভীর ছিল। ডুবুরী নামাইয়া ডিঙ্গাগুলি তুলিতে হইত।

"পূর্ব্ব হইতে ছিল ডিঙ্গা ভ্রমরার জলে।
ডুবুরী লইয়া সাধু গেল তার কূলে॥
ঘাটে জলদেবতার করিল পূজন।
জলেতে ডুবুরী গিয়া নামে দুই জন॥"—কবিকঙ্কণ

এই ভ্রমরার জলে ধনপতির মধুকর, দুর্গাবর, শঙ্খচূড়, চন্দ্রবাল, ছোটমুখী, গুয়ারেখী ও নাটশাল নামক সাতখানি সুবৃহৎ নৌকা নিমগ্ন ছিল।

শ্রীমন্তের ডাঙ্গা

মঙ্গলচণ্ডীর দেউল হইতে পূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দক্ষিণভাগে একটি সুবৃহৎ উন্নত ডাঙ্গার উপর বৃহৎ অশ্বত্থতরু বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্থানটি প্রাচীন কালে লোকবাস-ভূমি ছিল বলিয়া বিবেচনা হয়। বর্ত্তমান কালে এই স্থানটি বনাবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই স্থানের অনতিপূর্ব্বভাগে একটি উন্মুক্ত উচ্চ ভূখণ্ড বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে মধ্যে মধ্যে আকন্দ পুষ্পের ক্ষুদ্র গাছ হইয়াছে, এই স্থানের নাম শ্রীমন্তের ডাঙ্গা। ডাঙ্গার অনতি উত্তরে অজয়নদ এবং পূর্ব্বভাগে ক্ষীণ কুনুরনদী প্রবাহিত। শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে সিংহলে যাইবার জন্য মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে মহামায়াকে পূজা ও প্রণাম করিয়া যাত্রা করেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রথমে এই ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া অনতিদূরস্থ ভ্রমরার দহের পোতগুলি দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত যাত্রা করিয়া এই স্থানে প্রথমে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম 'শ্রীমন্ত-ডাঙ্গা' হইয়াছে। এই স্থানে জননী খুল্লনা শ্রীমন্তকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "খুল্লনা বলেন ছিরা শুন মোর বাণী।
> বিপদে রাখিবে তারা নগেন্দ্রনন্দিনী॥"—কবিকঙ্কণ

বর্ত্তমান কালে কোগ্রামনিবাসী নরনারীগণ বিজয়াদশমীর দিবস দেবীর ঘট-বিসর্জ্জনের পর মঙ্গলচণ্ডীর দেউলে গমন করিয়া মা মহামায়ার চরণে প্রণাম করিয়া, এই শ্রীমন্তডাঙ্গায় আগমন করিয়া যাত্রা করেন। শ্রীমন্ত এই স্থানে যাত্রা করিয়া সিংহলে গমনপূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের প্রতি সাধারণের যথেষ্ট ভক্তি ও বিশ্বাস রহিয়াছে।

উজানির পরিশিষ্ট

বর্ত্তমান কালে উজানি নামে গ্রাম বা নগর বর্ত্তমান নাই। কোগ্রামটিকে শিক্ষিত লোকে উজানি বলিয়া অবগত আছেন। কেবলমাত্র 'উজানির মেলা' উজানির অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে উজানি নগর কোগ্রাম নহে। উজানি নগরের একাংশের নাম কোগ্রাম। প্রাচীন কালে উজানিনগর বলিলে বর্ত্তমান কোগ্রাম, মঙ্গলকোট ও আড়াল (আড়ওয়াল) গ্রামগুলিকে বুঝাইত। বর্ত্তমান কোগ্রাম বা উজানি বণিক্‌পল্লী ছিল। মঙ্গলকোটও উজানিনগরের অন্তর্গত, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। উজানির যে অংশে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ ও প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণের বাস ছিল, তাহার নাম দুর্গের নামানুসারে "মঙ্গলকোট" হইয়াছে। উজানি নগর তখন কত বড় ছিল, তাহার আভাস কবিকঙ্কণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয়,—

"উজানি নগর   অতি মনোহর
বিক্রমকেশরী রাজা।

*   *   *   *

উজানির কথা   গড় চারি ভিতা
চৌদিকে বেউড়বাঁশ।
রাজার সামন্ত   নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে এক মাস।"

সে কালের দুর্গগুলি বেউড়বাঁশের বনে ঘেরা থাকিত। উন্নত গড়ের উপর বেউড়বাঁশের বন বড়ই দুর্ভেদ্য ছিল। ঘনরাম বাঁশড়াগড়ের কথা বলিতেছেন,—

"বেড়ুবাঁশে বেষ্টিত বিষম গড়খানা।
দ্বারবদ্ধ পাষাণে সম্মুখে দিল হানা॥"

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল, ৭ম সর্গ

উজানি ও মঙ্গলকোট পৃথক্ বলা হইয়াছে,—

"গন্ধবণিক্ জাতি দেশ গৌড় নাম।
স্থান মঙ্গলকোট উজাবনী গ্রাম॥"

কবিকঙ্কণ

গৌড়দেশে মঙ্গলকোট নামক স্থানে উজানি গ্রাম। এই উজানিগ্রাম প্রকৃতপক্ষে শ্রীমন্তের বাসভূমি হইলেও উজানি, মঙ্গলকোট, ইছানি, আড়াল প্রভৃতি গ্রামসমূহকে একত্র উজানি বলিত।

"বিক্রমকেশরী   তাঁহার নগরী
আছে কত সদাগর।
রাজার আদেশে   ধনপতি বসে
যারে সুখী নৃপবর॥" ——কবিকঙ্কণ

উজানিতে অনেক বণিক্ বাস করিত। ধনপতি রাজার বণিক্ ছিলেন। উজানির বণিক্পল্লীর সন্নিকটে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণপাড়া ছিল।

"বামভাগে এড়াইল কায়স্থের পাড়া॥
প্রবেশে ব্রাহ্মণপাড়া হয়্যা হরষিত।"—কবিকঙ্কণ

সেই কালে উজানির বণিক্পাড়া হইতে রাজবাড়ী মঙ্গলকোটে যাইতে হইলে,—

"কড়িয়া জাঙ্গাল এড়ে বামন শাসন।
ভূপতির দ্বারে আসি দিল দরশন॥"——কবিকঙ্কণ

হস্তলিখিত পুথিতে উজানির কথা

১৭০০ শকের হস্তলিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর পুথিতে—

"কর অবগতি শুন নরপতি
গৌড়দেশে মোর বাস।
বিক্রমকেশরী সাজি সাত তরী
পাঠাল তোমার পাশ॥
গন্ধবাণ্যা জাতি উজয়নি স্থিতি
দত্তকুলে উতপতি।
অজয়ের তটে গঙ্গার নিকটে
বসি নাম ধনপতি॥"

ক্ষেমানন্দকৃত মনসামঙ্গলের পুথি ১২২৪,—

"শুনহ সনকা এই কহিএ তোমারে।
লখিন্দরের বিভা দিব উজানি নগরে॥
সনকা বলিল বাণ্যা কহিএ তোমারে।
কেমন কন্যা বটে সেই উজানি নগরে॥"—পত্র ১১।১

নারায়ণদেবকৃত পদ্মাপুরাণের পুথি ২০০ শত বর্ষের প্রাচীন—

"বিষম সাগরে ঢেউ তোলপাড় করে।
জলেতে পড়িলে খাইবে মৎস্য মকরে॥
মাএ জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানি নগর॥"—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-ধৃত

হস্তলিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডীর (১৭০০ শকের) পুথি, পত্র ২০৬।১

"বন্দী দ্বাদশ বৎসর বন্দী দ্বাদশ বৎসর।
এ তিন মাসের পথ উজানি নগর॥
উজানি নগর বহু দিবসের পথ।
সিংহলে আইলে বন্দী কি বা মনোরথ॥"

ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস-কৃত মনসামঙ্গলের ১৭৪৪ শকের পুথি, পত্র ১০।১

"সাধু ধনপতি বৈসে উজানি নগরে।
আগে গিয়া উপনীত হৈল তার ঘরে॥"

বংশীদাস-কৃত পদ্মাপুরাণের পুথি। পত্র ১৪৪।১

"ভ্রমিয়া সকল দেশে উদ্দেশ করিল শেষে
কন্যা আছে বিপুলা সুন্দরী॥

উজানি নগর তথি গন্ধবণিক্ জাতি
সাহে রাজা বড় ধনেশ্বর।
তার কন্যা বিপুলা রূপে জিনি চন্দ্রকলা
সেহি কন্যার যোগ্য লখিন্দর ॥”

বাইশকবি মনসা। পৃ ৩৬৫—

“যাত্রা করে চন্দ্রধর সঙ্গে পুত্র লখিন্দর
যাইবারে উজানি নগরে।
আগে পাছে সৈন্য চলে মধ্যে চাঁদ কৌতূহলে
সাহের তনয়া যুড়িবারে ॥”

ষট্‌কবি মনসার পুথি। পত্র ১৬৩।১

“সভা করি বসিয়াছে উজানির নাথ।
বিপুলা মিলিল গিয়া সাহের সাক্ষাৎ ॥”

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল। পৃঃ ১৭৩—

“চম্পক নগরের রাজা উজানিতে গেলা।
সাত শত চলিয়াছে সোনারূপার দোলা ॥”

উজানি নগরে সায়বেণের বাড়ী বলা হইয়াছে। ক্ষেমানন্দ লখিন্দরের পাত্রী দেখিবার জন্য উজানিতে গিয়া প্রথমে ধনপতির গৃহে গমন করিয়াছিলেন। অধিকাংশ মনসার পুথি-লেখকদের মতে সায়বেণের বাড়ী উজানিতে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ সায়বেণের বাড়ী নিছনী বা ইছানীনগর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইছানী নগর উজানির প্রায় এক ক্রোশ পূর্ব্বে অজয়ের তীরে। আমরা খড়্গামোক্ষণের ঘাট হইতে ইছানী নগর দেখিতে পাইয়াছি। এই ইছানীর অনতিপশ্চিমে অশ্বত্থতরুমূলে খুল্লনা দেবকন্যাগণের সহিত মঙ্গল-চণ্ডীর পূজা স্বর্ণঘটে সম্পাদন করিয়া সোনার কড়ি পাইয়াছিলেন। খুল্লনা সেই স্থানে ছাগী চরাইতে যাইতেন। উজানির সমৃদ্ধিকালে ইছানী উহার অন্তর্গত ছিল। সেই কারণে কবিগণ ইছানী ও উজানি এক করিয়া উজানিতেই সায়বেণের বাড়ী বলিয়াছিলেন। এই ইছানী নগরে ধনপতির পায়রা উড়িয়া গিয়া খুল্লনার অঞ্চলে লুকাইয়া ছিল। ইছানী ধনপতির শ্বশুরবাড়ী, খুল্লনার পিত্রালয় ছিল।

ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধ উদ্দেশে দেশের বণিক্‌গণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কর্জ্জনা, সাঁকো, কহীত, সপ্তগ্রাম প্রভৃতির বণিক্‌গণ উজানি আগমন করিয়াছিলেন। চম্পানগরী হইতে চাঁদসদাগর আসিয়াছিলেন; কিন্তু ইছানী হইতে সায়বেণেকে উজানি আসিতে দেখি নাই। উজানির অনতিপশ্চিমস্থ সেমুলীয়ার বেণে নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন; কিন্তু সায়বেণের কোন সন্ধান পাইলাম না। সম্ভবতঃ উজানি ও ইছানী এ পাড়া ও পাড়া ছিল বলিয়া সায়বেণের আগমনবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত হয় নাই।

উজানিতে পীঠস্থান বলিয়া তন্ত্রাদিতে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু কোন মনসামঙ্গল বা চণ্ডী গ্রন্থাদিতে উজানির পীঠস্থানের কথা লিখিত নাই, কবিকঙ্কণ উজানির অনেক কথা বলিয়াছেন, মঙ্গলচণ্ডীর পূজার কথা বলিয়াছেন। ধনপতি চণ্ডীর ঘট পদদলিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শৈব ছিলেন অথচ একবারও ধনপতি উজানির কপিলাম্বর ভৈরবের কথা মুখে আনেন নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

ঘনরাম তাঁহার শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে চণ্ডীর বরপুত্র লাউসেনকে মঙ্গলকোটে হরি তাম্বুলীর গৃহে লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু পীঠস্থানের কথার উল্লেখ করেন নাই। এ দিকে পীরের চরণে প্রণাম করাইয়াছেন। বর্দ্ধমানের সর্ব্বমঙ্গলা দেবীর পূজা দিয়াছেন, কিন্তু উজানি বা মঙ্গলকোটের মঙ্গলচণ্ডী দেবী ও কপিলাম্বর শিবের নামোল্লেখ করেন নাই। ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

উজানির (কোগ্রামের) সর্ব্বমঙ্গলা ও ভৈরব কপিলেশ্বর প্রকৃত পীঠ-দেবতা নহেন। খুল্লনা-প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীরহস্ত ঘট এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কালক্রমে ইহাই বর্ত্তমান কালে পীঠস্থান বলিয়া স্থির হইয়াছে। প্রকৃত পীঠস্থান মঙ্গলকোটে দুর্গমধ্যে ছিল। মোসলমান-প্রাদুর্ভাবকালে তাহা ধ্বংস হইয়া গিয়া থাকিবে।

কোগ্রামের বর্ত্তমান মঙ্গলচণ্ডীর দেউলের উত্তরে লোচনদাসের সুবৃহৎ বাসভবন ছিল এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ধনপতির বাসভবন থাকাই একান্ত সম্ভব। শ্রীমন্ত স্বীয় বাসভবন হইতে চণ্ডী প্রণাম করিয়া, শ্রীমন্তডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া ভ্রমরাদহের নৌকা দেখিয়াছিলেন। এ কারণে শ্রীমন্তডাঙ্গার উত্তর ও পশ্চিমে শ্রীমন্তের বাসভবন ছিল, অনুমান করা চলে।

কোগ্রামে ধর্ম্মরাজের পূজা বা গাজন হইয়া থাকে। ধর্ম্মরাজের বেদী ও কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড বর্ত্তমান আছে। সেই স্থানে কোন প্রকার বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল বলিয়া মনে হয়। এই গাজনোৎসবের সময় ভক্তগণ মস্তকে 'মদের ভাঁড়' লইয়া নৃত্য করে এবং সেই মদ্যভাণ্ড ভ্রমরার জলে ভাসাইয়া দেয়—এই অনুষ্ঠানের নাম 'ভাঁড়াল-ভাসান'।

ধর্ম্মরাজের বোলান

ধর্ম্মোৎসবকালে ভক্তগণ বিবিধ বন্দনা সহ নৃত্য করে। এই প্রকার বন্দনা-গীতকে 'ধর্ম্মের বোলান' বলিয়া থাকে। এ স্থানে শিবেরও গাজন হয়।

গঙ্গামঙ্গল পুথি-

রচয়িতা কবি দ্বিজ কমলাকান্তের নিবাস উজানি নগরে ছিল। শ্রীমন্তের বাড়ী ও লোচনদাসের বাড়ী যে কোগ্রামে, এই কবি কমলাকান্তের বাড়ী সেই গ্রামে ছিল।

মঙ্গলকোট

অক্ষাংশ—	২৩°	৩১′	৫০″
দ্রাঘিমা—	৮৭°	৫৬′	৩০″

আমাদের মত লাউসেন, কর্পূরসেন এক দিন মঙ্গলকোটে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে মঙ্গলকোটের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান হইতে মঙ্গলকোট-গমনের প্রাচীন পথেরও পরিচয় দিয়াছেন,—

"গুরুগতি কর্জ্জনা রাখিয়া দুই জনে।
প্রবেশে মঙ্গলকোট রজনীবদনে ॥৬৯
বিশ্রাম-বাসনা হেতু নগর নেহালে।
প্রবেশ করিতে পুরী পথে হেনকালে ॥৭০
হরিদাস তাম্বুলি সনে পথে হ'ল দেখা।
মিলিল বিদুর যেন গোবিন্দের সখা ॥"৭১

মঙ্গলকোটের দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন ও উক্ত গ্রামনিবাসী অবসরপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীযুক্ত বাবু কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের সাহায্য না পাইলে অনুসন্ধান-কার্য্য সম্পন্ন হইত কি না, সন্দেহ।

মানসিংহ বঙ্গবিজয় করিয়া যখন জগন্নাথ-দর্শনে গমন করেন, তখন এই পথেই তিনি গিয়াছিলেন। কবি ভারতচন্দ্র তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন,—

"জগন্নাথ দেখিতে করিয়া মনোরথ।
ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ ॥
*　　*　　*　　*
এড়ায় মঙ্গলকোট উজানি নগর।
খুল্লনার পুত্র সাধু শ্রীমন্তের ঘর ॥
সরাই সরাই করি গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈল দামোদর করি স্নান-দান ॥"

—ভারতচন্দ্র (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ ৪৬৯)

কুব্জিকাতন্ত্রে এই মঙ্গলকোটের কথা আছে। উক্ত তন্ত্রমতে মঙ্গলকোটে দেবী মঙ্গলচণ্ডী ও কপিলাম্বর ভৈরবের অবস্থান-জনিত পীঠস্থান বলিয়া উল্লেখ আছে।

মঙ্গলকোটের বর্ত্তমান দর্শনীয় স্থান

মঙ্গলকোট-পরিক্রমণ

মঙ্গলকোটের পুলিশ-ষ্টেশনটি অতি উচ্চ ভূখণ্ডের উপর অবস্থিত, কুণুর নদীতীরস্থ সমতলক্ষেত্র হইতে এই স্থানের উচ্চতা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ফিট্ হইবে। অতি সুন্দর স্থান। যখন মঙ্গলকোট সজীব ছিল, তখন এই স্থান কোন দেবালয় বা ধনী জনগণের হর্ম্ম্যাবলীতে পরিশোভিত ছিল বলিয়া মনে হয়। স্থানটির চতুর্দ্দিক্ ইষ্টক-সমাকীর্ণ ও ভূপরি ইষ্টক-নির্ম্মিত বহু গৃহভিত্তির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই স্থানটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর-

ভাগে নিম্নভূমি। পুলিশ-ষ্টেশনটি যেন একটি অন্তরীপের নাসাগ্রে অবস্থিত। এই স্থান হইতে চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর। এই স্থানের পশ্চিমাংশে অশ্বত্থবৃক্ষ, খেজুর ও বিবিধ বন্যবৃক্ষে একটি কুঞ্জবাটিকার সৃষ্টি করিয়াছে। সেই স্বভাবজাত কুঞ্জবনের মধ্যে কয়েকটি ইষ্টক-নির্ম্মিত সমাধি ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে

গোলাম পঞ্জতন

নামক পাঁচ জন গাজী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত আছেন। তাঁহারা মঙ্গলকোট অধিকার করিতে আসিয়া জনৈক হিন্দু নরপতির হস্তে নিহত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মৌলবী মহম্মদ ইসমাইল সাহেব আমাদিগকে মঙ্গলকোটের মোসলমান অধিকারকাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত বহু কাহিনী সংগ্রহ করিয়া দেন। উক্ত মৌলবী সাহেব মঙ্গলকোট-পরিক্রমের প্রধান পাণ্ডা হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যে মঙ্গলকোটের দর্শনীয় স্থানগুলি অনায়াসে দর্শন এবং প্রত্যেক স্থানের প্রাচীন কাহিনী শ্রবণ করিয়াছি।

গোলাম পঞ্জতনের সমাধিস্থান হইতে পূর্ব্বমুখে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি গ্রাম্য পথের সহিত আমাদের গন্তব্য পথ মিশাইয়া গেল। এই স্থানের ঠিক পূর্ব্বদিকে চতুর্দ্দিকে ইষ্টক-বিক্ষিপ্ত ভগ্ন প্রাচীর-বেষ্টিত একটি নূতন মস্‌জিদ্ দেখা গেল। মস্‌জিদ্‌টির বাহিরের প্রাঙ্গণে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া মূল মস্‌জিদ্-প্রাঙ্গণে উত্তর-মুখে প্রবেশ করিতে হয়। এই মস্‌জিদের নাম

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্

প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টি ভগ্ন হইবার পর উহার স্থানে এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদের সম্মুখে একখানি খোদিত শিলাফলক সংবদ্ধ রহিয়াছে। ইহা হইতে হিঃ ১২২৫ সালে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে বলিয়া অবগত হওয়া যায়।

মসজিদের উত্তর অংশ প্রাচীর-বেষ্টিত। তথায় কয়েকটি প্রাচীন ধরণের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে চারিটি প্রস্তরগ্রথিত পয়ঃপ্রণালী বিদ্যমান রহিয়াছে।

মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্‌জিদ্

কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদ্ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণদিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বমুখে খানিক পথ অতিবাহিত করিলেই ডাহিন ভাগে একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ নয়নগোচর হয়। এই মস্‌জিদের দ্বার পূর্ব্বমুখে। মস্‌জিদ্‌টি প্রাচীন ধরণের ও বহির্দ্দেশ বাঙ্গালা ঘরের আকারে নির্ম্মিত। গৌড়ের কদমরসুল মস্‌জিদ্ যে ধরণের, ইহার আকার ও গঠন কতকটা সেই প্রকার। অনেকে এই মস্‌জিদের নাম বলিতে পারিলেন না। কেহ বলিলেন, "মৌলবী সাহেব ফকিরের মস্‌জিদ্।"

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ] মৌলানা দানেশমন্দের সমাধি ও মস্‌জিদ্‌ [১৭৭ পৃঃ

মঙ্গলকোটের হাট

এই মস্‌জিদের নিকট হইতে পূর্ব্বমুখে আন্দাজ এক রশি গমন করিলে বামে দাতব্য চিকিৎসালয় এবং তাহারই পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়। ভগ্নস্তূপের উত্তরে একটি ক্ষুদ্র হাট, সেই দিন বসিয়াছিল।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের মস্‌জিদ্

মঙ্গলকোটের হাটের দক্ষিণেই দুই শত পঞ্চাশ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূখণ্ডের উপর একটি বাসভবনের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাসভবন তিন ভাগে বিভক্ত,—সর্ব্ব পশ্চিমের অংশে মস্‌জিদ্ ও সমাধিক্ষেত্র, তৎপরে দুই খণ্ড দুই জনের সদর ও অন্দর-বিশিষ্ট বাসভবন ছিল। হাটের উপর দিয়া দক্ষিণমুখে উক্ত প্রাচীন বাসভবনে প্রবেশ করা যায়। যে স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, সেই স্থানটি উক্ত বাটী-প্রবেশের প্রধান দ্বার। দ্বারের উপর

নাকারাখানা

ছিল। উক্ত নাকারাখানা ১৮ বর্গ ফিট্ পরিমাণ ভূমির উপর নির্ম্মিত ছিল। এই দ্বার দিয়া দক্ষিণ মুখে কয়েক হস্ত অগ্রসর হইলেই একটি কাঠচাঁপা বৃক্ষ দেখা যায়। এই স্থানের পশ্চিমাংশেই একটি নবনির্ম্মিত মসজিদ। মস্‌জিদ্‌প্রাঙ্গণে পশ্চিম মুখে প্রবেশ করিতে হয়। প্রাঙ্গণটি বাঁধান। প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জিদ্‌টির ইষ্টকরাশি অপসারিত করিয়া সেই স্থানে, সেই প্রাচীন মস্‌জিদ্ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের এই মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে। অদ্যাপি সেই প্রাচীন মস্‌জিদের কোণের একটি স্তম্ভ বা মিনার বিদ্যমান রহিয়াছে। ছায়াচিত্রে বৃক্ষশাখার মধ্য দিয়া উক্ত মিনারেটটি সুন্দর দেখা যাইতেছে। এই নূতন মস্‌জিদে একখানি তোগড়া-অক্ষরমালা-খোদিত শিলাফলক আবদ্ধ রহিয়াছে। এই শিলা-লিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১০৬৫ হিজরিতে সম্রাট্ সাজাহানের রাজত্বকালে প্রাচীন মস্‌জিদ্‌টী নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদের দক্ষিণপার্শ্বে কারুকার্য্য-খচিত বাঙ্গালা ধরণের একটি ক্ষুদ্র গৃহের মধ্যে

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি

বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহার দ্বারদেশ কাষ্ঠের খুপ্‌রিকাটা কপাটদ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। এই সমাধির ছায়াচিত্রে কপাটটি সুন্দর দেখাইতেছে। সমাধিগৃহটি দীর্ঘে ২২ ফিট্ ২ ইঞ্চি। এই সমাধিগৃহের সম্মুখভাগে মৃত্তিকোপরি বাঙ্গালার স্বাধীন রাজা সুলতান হোসেন সাহের সময়ে উৎকীর্ণ লিপিযুক্ত একখানি প্রস্তর পতিত রহিয়াছে। এই প্রস্তরের খোদিত লিপিটি বাঙ্গালার সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজত্বকালে ৯১৬ হিজিরায় নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মৌলানা দানেশমন্দের সমাধির দক্ষিণে আর একটি ক্ষুদ্র সমাধিগৃহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহাতে

মিঞা হজ্জৎ উল্লা শাহ

নামক জনৈক ব্যক্তি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। ইহার সম্মুখে তাঁহার স্ত্রী সাহেলা বিবির সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানের দক্ষিণভাগ বহু সমাধি-চিহ্নে চিহ্নিত রহিয়াছে। তাহার দক্ষিণে একটি চতুষ্কোণ পুষ্করিণী, একদিন এই পুষ্করিণীটির চারিদিক্ সোপান-শ্রেণীতে শোভিত ছিল, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর নাম

মাইনে পুকুর

মাইনে পুকুরে স্নান করিয়া মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধিপ্রাঙ্গণে দেহ লুণ্ঠন করিলে বহুপ্রকার চর্ম্মরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে, এ প্রকার বিশ্বাস এতদঞ্চলে বিশেষভাবে বদ্ধমূল রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়ে সুবৃহৎ বহু ইষ্টকগৃহ-শোভিত

কাজি খোদা নওয়াজ

সাহেবের বাসভবন ছিল। এক্ষণে ইহার বহু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কাজি সাহেব একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন।

বাঁধাপুকুর ও হামামখানা

মৌলানা হাজি দানেশমন্দের ও মিঞা শা হজ্জৎ উল্লার বাসভবনের উত্তরে প্রায় ৭৫ ফিট্ দীর্ঘ এবং ৫০ ফিট্ প্রস্থ জলভাগময় একটি সুন্দর পুষ্করিণী রহিয়াছে। যখন এই সকল স্থান সৌধমালায় শোভিত ছিল, তখন এই পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শ্ব ইষ্টক-গ্রথিত সোপানাবলীতে পরিশোভিত ছিল। আজও তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজিও জলের উপর ৩০টি সোপান বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই বাঁধা পুষ্করিণীর বিশেষ কোন নাম নাই। দেশের লোকে বাঁধাপুকুর বলিয়া থাকে। ইহার পূর্ব্বদিকে সুন্দর ইষ্টকময় হাউজখানা বা হামামখানা বিদ্যমান ছিল। এখন তাহার কতক চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই পুষ্করিণীর জল নলপথে উক্ত গৃহে প্রবেশ করিত। এই পুষ্করিণীর জল অন্য এক প্রকাণ্ড বাঁধান সুরঙ্গপথে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া আট দশ রশি দূরে

ফুলবাগে

জল সরবরাহ করিত। প্রবাদ,—মাইনে পুকুর, বাঁধাপুকুর ও ফুলবাগের পুকুর এই তিনটি পুষ্করিণীতে মৃত্তিকাভ্যন্তর দিয়া নলপথে জলের সংযোগ ছিল। বাঁধাপুকুর হইতে পূর্ব্বভাগে 'ফুলবাগে' যাইবার পথ। বর্ত্তমানকালে ফুলবাগে আর ফুল-গাছ নাই, ইক্ষুক্ষেত্র, আলুর ক্ষেত্র ইত্যাদিতে শোভিত রহিয়াছে। ফুলবাগে একটি ছোটখাট পুষ্করিণী আছে। তাহার উত্তর দিকের ঘাটটি বাঁধান ছিল। ঘাটটি প্রস্থে ৭১ ফিট্ ৬ ইঞ্চি। পুষ্করিণীর পশ্চিম ধারে একটি সুন্দর ইষ্টকগৃহ ছিল। সাধারণে সেই গৃহটিকে

ফুলবাগের হাউজঘর

বলিয়া থাকে। ইহা অতি প্রাচীন। এই হাউজঘরটি দীর্ঘে ৫০´ ফিট্ এবং প্রস্থে ৪০ ফিট্ মাত্র। পুষ্করিণীর দিকে হাউজগৃহের মধ্যগত একটি বাঁধান "ইঁদারা" দেখা যায়। ইহা ইষ্টক ও লতাপাতায় বুজিয়া গিয়াছে। ইঁদারার ব্যাস ৫´ পাঁচ ফিট্ ৮´´ আট ইঞ্চি। হামামখানার পশ্চিমে ভিত্তিগাত্রে তিনটি মৃত্তিকানলের ছিদ্রমুখ পর পর উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। উক্ত নল দিয়া হাউজঘরে ফোয়ারার জল উঠিত এবং তথা হইতে ফুলবাগে বিতরিত হইত। উক্ত নলের মুখের ব্যাস ৬´ ইঞ্চি। ফুলবাগের হাউজঘরের ছায়াচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে। গাছের পার্শ্ব দিয়া একটি স্তূপের মত দেখা যাইতেছে।

গ্রামের পূর্ব্ব-দক্ষিণভাগ বেষ্টন করিয়া আসিবার সময় আমরা একটি নামহীন ভগ্ন মস্‌জিদ্ দেখিতে পাই। তথায় কয়েকটি বাঁধান কবর ছিল। তৎপরে পুনশ্চ পুলিশ-ষ্টেশনে আসিয়া বিশ্রামের পর অপরাহ্নে মঙ্গলকোটের উত্তরাংশ পরিভ্রমণে গমন করা গেল। কোয়ার সাহেবের মস্‌জিদের উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বমুখে সুউচ্চ ভূভাগের উপর দিয়া গমনকালে বহু বাসভবনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি উন্মুক্ত উন্নত ক্ষেত্র, তথায় বৃক্ষাদি নাই। খোলামকুচি, ইটের কুচিতে সেই স্থানটি বিছান রহিয়াছে। ডাঙ্গার মধ্যস্থলে বৃষ্টির জলপরিমাণ-জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। এই স্থানটির নাম

বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বিক্রমজিতের বাড়ী

বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের আর কোন চিহ্ন বর্ত্তমান নাই। চিহ্নগুলি বিবিধ কারণে কালের স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। কেবল স্মৃতি জাগাইবার জন্য নামটি বর্ত্তমান আছে। পতিত উন্নত ভূমিটির পরিমাণ আন্দাজ কুড়ি পঁচিশ বিঘা হইবে। ইহার আয়তন আরও বৃহৎ ছিল, এই স্থলের অবস্থা-দর্শনে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাদিত্যের বাসভবনের অধিকাংশ অংশ সাধারণের বাসভবনে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে মধ্যে মধ্যে অনেক উদ্‌বাস্তু হইয়া পড়িয়া আছে। চতুর্দ্দিক্ ঘুরিয়া দেখিলে বোধ হয়, অনুমান দুই শত বিঘা লইয়া একটি বাড়ী ছিল। গ্রামবাসীর অধিকারে আসিতে আসিতে এই সামান্য মাত্র স্থান পতিত রহিয়াছে। এই স্থানের উত্তর-পশ্চিমাংশ আরও উচ্চ, তথায় ইষ্টকমণ্ডিত কতকগুলি সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই স্থানে নাকি

গজনবী গাজী

চিরনিদ্রায় নিদ্রিত রহিয়াছেন। তাঁহার পরিবারবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনের মৃতদেহও এই স্থানে সমাহিত করা হইয়াছে। ইহাও বিক্রমাদিত্যের গড়ের এক অংশ। এই বিক্রমাদিত্যের বাড়ী নামক ডাঙ্গাটি মঙ্গলকোটের অর্থাৎ প্রাচীন গড়বেষ্টিত স্থানের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে রাজার প্রাসাদ ছিল। এই রাজপ্রাসাদ মঙ্গলকোট নামক দুর্গ দ্বারা অভিরক্ষিত ছিল।

"উজানি নগর অতি মনোহর . .
বিক্রম-কেশরী রাজা।"

এই সেই উজানিরাজ বিক্রমকেশরীর রাজবাড়ীতে আমরা দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। উজানির "মঙ্গলকোট" নামক দুর্গ অধিকার করিবার জন্য

সপ্তদশ গাজী বা পীরের

প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়; তবে মঙ্গলকোট মোসলমানের হস্তগত হয়। মঙ্গলকোটের অধিবাসিগণ বর্ষাকালে বা খুব এক পসলা বৃষ্টি হইলে পর এই রাজবাড়ীর উপর, পথে ঘাটে সোনা খুঁজিয়া বেড়ায়। অনেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণকণা প্রাপ্ত হয়। এই স্থানে অনেকে অনেক প্রকার ধাতব দেবদেবী-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বা মঙ্গলকোটের বহু স্থান হইতে অনেকে অনেক অর্থও প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বিক্রমাদিত্যের ডাঙ্গা বা বাড়ী খনন করিলে বহু প্রাচীন নিদর্শন প্রাপ্তির সম্ভব রহিয়াছে। উচ্চ ভূখণ্ড হইতে জল গড়াইয়া নিম্নভূমিতে পড়াতে অনেক স্থানের মৃত্তিকা কর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। উন্নত ডাঙ্গা কাটিয়া একটি পথও নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই পথের ধারে ডাঙ্গার একাংশে প্রাচীন প্রথায় গ্রথিত ইষ্টকের সুবৃহৎ স্তূপের নিম্নভাগ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, দেখা গিয়াছে। এই স্থানে সুবৃহৎ ইষ্টকালয় থাকার ইহাই একটি চিহ্ন বলিতে হইবে। এই ডাঙ্গাটি অন্য জমি হইতে বিশ ফুট্ উচ্চ হইবে এবং যে অংশে কবর রহিয়াছে, সেই অংশের উচ্চতা ত্রিশ ফিটের কম হইবে না।

বামে 'ভাদুপাড়' দৃষ্ট হয়। উত্তর মুখে কয়েক রশি পথ অতিক্রম করিয়া উত্তর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ একটি প্রকাণ্ড দীঘি দেখা গেল। তাহা যথেষ্ট জলচর পক্ষীতে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই দীঘির নাম

মজলিসদীঘি

এই মজলিসদীঘির পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া উত্তরমুখে দীঘি অতিক্রম করিলেই সম্মুখে উন্নত ভূখণ্ডের উপর সুবৃহৎ একটি ভগ্ন মস্‌জিদ্ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মস্‌জিদের উপর বটতরু বিরাজ করিতেছে। এই মস্‌জিদের নাম

বড়বাজারের মস্‌জিদ্ বা হোসেনশাহী মস্‌জিদ্

প্রায় কুড়ি পঁচিশ ফিট্ উচ্চ ভূখণ্ডোপরি লোহিতবর্ণের এক বৃহৎ মস্‌জিদ্ ছাদহীন-প্রায় ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণের মস্‌জিদগাত্র ধূলিতে মিশাইয়া গিয়াছে। মস্‌জিদের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে

রাজদীঘি

নামক একটি চতুষ্কোণ বৃহৎ পুষ্করিণী বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কাটোয়া গমনের পাকা রাস্তা প্রসারিত রহিয়াছে। মস্‌জিদ্‌টি যে স্থলে নির্ম্মিত হইয়াছে, এই স্থানটি

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ] বড়বাজার বা নূতন হাটের মসজিদ [১৮০ পৃঃ

উন্নত করিবার জন্য রাজদীঘির কর্ত্তনকালে সমুদায় মাটি পশ্চিম পাহাড়েই জমা করা হইয়াছিল। অন্য তিনটি পাড়ে আদৌ মাটীর স্তূপের চিহ্ন নাই।

মস্‌জিদ্‌টি চতুষ্কোণ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পাঁচটি করিয়া খিলান বিদ্যমান রহিয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তরদিকের দেওয়ালে দুইটি করিয়া দ্বার ছিল। সম্মুখভাগের দেওয়ালের বাহির দিকে বিবিধ প্রকারের খোদিত ইষ্টক-সমবায়ে আম্রশাখা ও লতা-পুষ্প-পাতার আকৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে। মস্‌জিদের এই সব অলঙ্কার এখন একে একে খসিয়া পড়িতেছে। গত ভীষণ ভূমিকম্পে এই মস্‌জিদের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

প্রত্যেক খিলানের অধোদেশে পাথরের "হাসকল" ও কবাট পরাইবার স্থানচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে বোধ হয়, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট দ্বারা মস্‌জিদের প্রবেশপথ বন্ধ করিয়া রাখা হইত।

খিলানগুলি প্রায় ১৫ ফুট্ উচ্চ। উত্তরদিকের খিলানটি পড়িয়া গিয়াছে। প্রত্যেক খিলানের অভ্যন্তরদেশ সুন্দর কারুকার্য্যবিশিষ্ট। অভ্যন্তরদেশে ইষ্টক দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার ঊর্দ্ধে প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত রহিয়াছে। দুই খিলানের মধ্যস্থিত প্রাচীরগাত্রের স্তম্ভ প্রস্তর দ্বারা গঠিত। স্তম্ভের পাদদেশে একখানা প্রশস্ত প্রস্তর, তাহার উপরে তদপেক্ষা আকৃতিতে ছোট আর একখানা প্রস্তর। এইরূপ পরস্পর প্রশস্ত ও অপ্রশস্ত প্রস্তরের সমষ্টিতে সমস্ত স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভসকলের পাদদেশের প্রস্তরগুলি গৃহতলের উপর স্থাপিত এবং তাহার সমসূত্রে আর একসারি প্রস্তর ভিত্তিগাত্রে সংবদ্ধ থাকিয়া গৃহতলের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইরূপভাবে আর এক সারি প্রস্তর স্তম্ভসকলের শিরোদেশস্থ প্রস্তরের সমান্তরালে চতুর্দ্দিকের প্রাচীরের গাত্রে বিদ্যমান ছিল। ভিত ৭´ সাত ফিট্ ৩´´ তিন ইঞ্চি পুরু। এই মস্‌জিদ্‌টি দীর্ঘে ৯১´ ফিট্ ও প্রস্থে ৪১´ ফিট্; চারি কোণে চারিটি মিনারেট ছিল। মস্‌জিদের অভ্যন্তরভাগে দেওয়ালগাত্রে কয়েকটি কুলুঙ্গী ছিল।

এই মস্‌জিদে যে সমুদায় প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা এক শ্রেণীর নহে এবং সমস্ত প্রস্তরগুলি সমানভাবে মসৃণ করা হয় নাই। প্রস্তরগুলির আকৃতি ও গঠন দেখিলেই মনে হইবে, ইহা এই মস্‌জিদের জন্য প্রস্তুত হয় নাই। পূর্ব্বে এই সমুদায় প্রস্তর অন্য কোন গৃহে ব্যবহার করা হইয়াছিল। তথায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ প্রস্তরসমূহের ব্যবহার হইয়াছিল। এ স্থানে আনিয়া মস্‌জিদের উপযোগী করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা যথাযথস্থানে সংবদ্ধ করা হয় নাই।

চন্দ্রসেন রাজার নামাঙ্কিত শিলাফলক

মস্‌জিদের সম্মুখভাগের অভ্যন্তরদিকে, মধ্যপ্রবেশদ্বারের বামদিকের স্তম্ভের পাদদেশের প্রস্তরখণ্ডে "শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতি"র নাম প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে। এইরূপ অক্ষরমালা-খোদিত আর চারিখানি প্রস্তর উক্ত মস্‌জিদ্ অভ্যন্তরের দেওয়ালস্থিত প্রস্তরে দেখা গিয়াছে।

বোধ হয় একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তরে শ্রীচন্দ্রসেন রাজার একটি খোদিত লিপি পূর্ব্ববর্ত্তী কোন দেবালয়ের কোন প্রস্তরখণ্ডে উৎকীর্ণ ছিল। মুসলমানগণ তাহা ভাঙ্গিয়া, কয়েক খণ্ডে বিভাগ করিয়া বর্ত্তমান মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণকালে ব্যবহার করিয়াছিল। এই অক্ষর-মালাখোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি মস্‌জিদের উপযোগী করিয়া লইবার জন্য শিল্পিগণ পল তুলিতে গিয়া অক্ষরমালার অধিকাংশ কর্ত্তন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। যাহা সামান্য অবশিষ্ট আছে, তাহা হইতেই শ্রীচন্দ্রসেন নৃপতির নাম উদ্ধার হইয়াছে। যে অংশে উক্ত রাজার নাম খোদিত আছে, সেই অংশের ছায়াচিত্র গ্রহণ করা হইয়াছে।

মিহ্‌রাব

পশ্চাদ্ভাগের দেওয়ালের ভিতরদিকে তিনটি মিহ্‌রাব আছে। মিহ্‌রাবের কতক অংশ প্রস্তরে ও কতক অংশ ইটকে নির্ম্মিত। ইহা একার্দ্ধ কর্ত্তিত গম্বুজের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এবং ইষ্টকময় প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দ্বারা সুশোভিত। নীচে এক সারি কলকা ও তন্নিম্নে দুই সারি চৌখুপী কাজকরা আছে। উত্তর ও দক্ষিণদিকের মিহ্‌রাব দুইটি সম্পূর্ণভাবে ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত এবং পূর্ব্ববৎ কারুকার্য্যে শোভিত।

গাড়ার গাঁথুনি

মস্‌জিদের দেওয়ালের মধ্যভাগ ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইষ্টকরাশি দিয়া পূর্ণ করা হইয়াছিল এবং উক্ত অংশের গাঁথুনির জন্য 'খোলামকুচি'বিশিষ্ট মৃত্তিকা ব্যবহার হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে উক্ত অংশে চিত্রবিচিত্র করা পূর্ণ ও সমস্থল ইষ্টকও দেখা যায়।

এই মস্‌জিদে আরবি ও পারস্য ভাষায় লিখিত কোন লিপি দৃষ্ট হয় না। মঙ্গলকোটের বৃদ্ধ মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব বলেন যে, এই মস্‌জিদের শিলালিপিটি সাজাহানের সময়ে নির্ম্মিত মস্‌জিদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত শিলালিপির কথা বলা হইয়াছে। উহা সুলতান্‌ আলাউদ্দীন্‌ হোসেন শাহের রাজত্বকালে ৯০৬ হিজরিতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই মস্‌জিদটির নির্ম্মাণপ্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, উহা বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান্‌গণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা হোসেন শাহ বা নসরৎ শাহ এতদুভয়ের রাজত্বকালে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় দেখা যায় যে, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক ব্লকম্যান কর্ত্তৃক মঙ্গলকোট হইতে একটি শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে লিখিত আছে যে, ৯৩০ হিজিরাতে মহম্মদ নসরত সাহের রাজত্বসময়ে মির্জ্জা মুয়জ্জম কর্ত্তৃক একটি মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকোটের পরিশিষ্ট

মঙ্গলকোট অর্থে দুর্গ বুঝায়। উজানি নগরের দুর্গ মঙ্গলকোট ছিল। এই মঙ্গলকোটে রাজার রাজধানী সংস্থাপিত ছিল। যে স্থানে মঙ্গলকোট দুর্গ ছিল, হিন্দুরাজগণের সময়ে এই

স্থানে মঙ্গলচণ্ডী দেবী দুর্গ-রক্ষয়িত্রীরূপে অবস্থান করিতেন বলিয়া এই দুর্গের নাম মঙ্গল-কোট হইয়া থাকিবে। এই উজানি নগরের চারিদিকে গড় ও বেড়াবাঁশের বন ছিল। ইহা একটি বড় নগর ছিল। সেই জন্য কবিকঙ্কণে লিখিত,—

"রাজার সামন্ত　　　　নাহি পায় অন্ত
যদি ভ্রমে এক মাস।"

এই দেশের এক রাজা বিক্রমকেশরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাকেই সকলে 'বিক্রমাদিত্য' বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবে। এই বিক্রমকেশরী রাজার পূর্ব্বে 'শ্বেত' রাজা নামে এক রাজার রাজত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। বক্রেশ্বরমাহাত্ম্যে উক্ত শ্বেত রাজার কিঞ্চিৎ কথা লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থ প্রামাণ্য না হইলেও উহা হইতে শ্বেত রাজার কথা উদ্ধৃত হইল,—

মঙ্গলকোটের প্রাচীন রাজা 'শ্বেত'

"শ্বেতরাজা মহানাসীৎ সত্যবক্তা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সত্যসন্ধো মহোদারঃ সত্যবাগ্‌দানতৎপরঃ॥
রাজা কৃতযুগে আসীৎ শিবপাদার্চ্চনে রতঃ।
মঙ্গলকোটকং নাম পুরং অস্য প্রতিষ্ঠিতম্।
নিত্যং বক্রেশমারাধ্য ভুক্তোঽসৌ শ্বেতপার্থিবঃ।
আয়াতি নিত্যং স রাজা পঞ্চযোজনমাত্রকম্।
পুনরেব গৃহং যাতি দিনেনৈকেন ভূপতিঃ।
তদেবাসৌ বরং প্রাদাৎ বক্রেশো ভক্তবৎসলঃ॥"

বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য, শ্বেতগঙ্গোপাখ্যান, ৫ম অধ্যায়

অনুবাদ—

সত্যযুগে নৃপ এক অতি পুণ্যবান্।
শ্বেতনামে খ্যাত তিনি হন সর্ব্বস্থান॥
অতিশয় দানশীল ছিল সেই রাজা।
করিতেন বিধিমত মহাদেবপূজা॥
মঙ্গলকোটকে তাঁর ছিল রাজধানী।
তথা হ'তে প্রতিদিন সেই নৃপমণি॥
বক্রেশ্বর আসিতেন প্রভাত সময়ে।
শিবপূজা করিতেন প্রফুল্ল হৃদয়ে॥

ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্বেত রাজা শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি শিবপূজা উদ্দেশে বক্রেশ্বরতীর্থে গমন করিতেন। ইহা ব্যতীত আর কিছু অবগত হইবার উপায় নাই।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী অনুসারে উজানির ধনপতি দত্ত ও শ্রীমন্তের সময়, চম্পানগরীর চাঁদ সদাগরের সময় মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমকেশরী বিদ্যমান ছিলেন। কবিকঙ্কণ হইতে আর একটু জানিতে পারি যে, রাজা বিক্রমকেশরীর পাত্র হরিহর, পুরোহিত জনার্দ্দন এবং তাঁহার সদাগর ধনপতি ও শ্রীমন্ত ছিলেন।

"পাত্র তাঁর হরিহর জনার্দ্দন দ্বিজবর
পুরোহিত বিদ্যার বিধান॥
রাজার কৃপায় রায়, আমি সদাগর তায়,
ধনপতি দত্ত অভিধান।"

এতদ্ব্যতীত বিক্রমকেশরীর আর কোন লিখিত প্রমাণ নাই। মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল সাহেব মঙ্গলকোট মোসলমান অধিকারে আসিবার যে কাহিনী শুনাইয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে লিখিত হইল।

"মঙ্গলকোটে বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে এক রাজা ছিলেন। তখন মঙ্গলকোট মোসলমান-অধিকারে আইসে নাই। বিক্রমজিৎ খুব যোদ্ধা ছিলেন। সেই সময়ে সতের জন ধর্ম্মযোদ্ধা অর্থাৎ গাজী (যাঁহারা কাফের বধ করিয়াছেন) একে একে এই মঙ্গলকোট অধিকার করিতে আগমন করেন। মঙ্গলকোটের রাজার নিকট তাঁহারা নিহত হন। মঙ্গলকোটের স্থানে স্থানে তাঁহাদের সমাধি বিদ্যমান রহিয়াছে। শেষে গজনবী নামক গাজী বা পীর (জ্ঞানী ব্যক্তি) মঙ্গলকোট অধিকার করেন এবং সেই যুদ্ধে বিক্রমজিৎ নিহত হইয়াছিলেন।"

তিনি পীরগণের মধ্যে যে কয়জনের নাম করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল—

(১) মহম্মদ
(২) হাজি ফিরোজ
(৩) গোলাম পঞ্জতন
(৪) মহম্মদ ইস্মাইল গাজী
(৫) আব্দুল্লা গুজরাটী
(৬) মকদম বিলায়েৎ পানা
(৭) গজনবী

এই গজনবীই মঙ্গলকোট অধিকারে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মযুদ্ধের পর মঙ্গল-কোটের অধিবাসিগণকে মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণে বাধ্য হইতে হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই সময়ে মঙ্গলকোটের দেবদেবীমূর্ত্তিসমূহ কতক চূর্ণিত ও কতক জলমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। মধ্যে মধ্যে বহু মূর্ত্তি আবিষ্কার হইতেছে। নিকটবর্ত্তী কুণুর নদী হইতে জৈন, বুদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবী পাওয়া যাইতেছে।

* মঙ্গলকোট-নিবাসী মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল সাহেব উজানি ও মঙ্গলকোটে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান সম্বন্ধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলকোটের উল্লেখযোগ্য স্থান সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা মৌলবী সাহেবের মুখে শ্রবণ করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। "খাজানা আমিরত" নামক গ্রন্থে শেষ বাদসাহ দ্বিতীয় সাহ আলম্ ও তাঁহার সেনাপতি কাম্‌গার খাঁর সহিত মঙ্গলকোটে আগমনের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে মৌলবী সাহেবের মুখেই শুনিয়াছিলাম। তাহার পরে দেখিয়াছি, "সয়রুল মুতাক্ষরিণ"-প্রণেতাও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

মৌলবী মহম্মদ ইস্‌মাইল আরও বলিয়াছিলেন যে, যে মৌলনা হামিদ দানেশমন্দের সমাধি মঙ্গলকোটে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি শিয়ালকোটে আব্দুল হাকিম নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তখন সাহ্‌জাহান দিল্লীর অধীশ্বর। কোন বিশেষ ঘটনায় দানেশমন্দের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সম্রাট্ তাঁহাকে ৯৪০০০ হাজার মুদ্রা প্রদান করেন। উক্ত অর্থ দ্বারা তিনি মঙ্গলকোটে মস্‌জিদ্ ও তাঁহার নিজ আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।

খোদিত লিপি

মঙ্গলকোটের প্রান্তস্থিত বড়বাজার বা নূতন হাটের মস্‌জিদের বিষয় পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এই মস্‌জিদ্‌মধ্যে চন্দ্রসেন নামক জনৈক রাজার নামাঙ্কিত খোদিত লিপিযুক্ত কয়েকখণ্ড প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। মস্‌জিদের প্রত্যেক খিলানের পার্শ্বে যে দুইটি স্তম্ভ আছে, তাহা ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে যে স্থানে খিলানের ইষ্টক শেষ হইয়াছে, সেই স্থানে এক এক খণ্ড প্রস্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই প্রস্তরগুলিতে স্থানে স্থানে খোদিত লিপি আছে। খোদিত লিপিগুলির অধিকাংশই অস্পষ্ট; অনুমান হয়, যে স্থানে মস্‌জিদ্‌টি নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই স্থানে পূর্ব্বে কোন দেবালয় ছিল, তাহারই খোদিত শিলাফলকখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া মস্‌জিদ্-নির্ম্মাণকালে ব্যবহার হইয়াছে। নূতন হাট বা বড়বাজারের মস্‌জিদ্‌টি একটি উচ্চ মৃৎপিণ্ডের উপরে নির্ম্মিত, চতুষ্পার্শ্বস্থিত সমতল ক্ষেত্র হইতে বিংশতি হস্ত উচ্চে ইহার ভিত্তি অবস্থিত। ইহার সম্মুখে ও দক্ষিণ পার্শ্বে অনেকগুলি উচ্চ মৃৎপিণ্ড ও বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। তিন খণ্ড প্রস্তরের খোদিত লিপি এখনও পাঠ করা যায়:—

(ক) ১। ... শ্রীচন্দ্রসেন নৃপ ত (?) রণ সেন্ নাম্না

২। ... ... শ্রী ... ...

বাঙ্গালার ইতিহাসে চন্দ্রসেন রাজার নাম নূতন। ইতিপূর্ব্বে কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বা খোদিত লিপি হইতে চন্দ্রসেনের নাম পাওয়া যায় নাই। নূতন হাটের মস্‌জিদের খোদিত লিপি হইতে তাঁহার অস্তিত্বমাত্র প্রমাণিত হইতেছে, তাঁহার বংশ-পরিচয় ও তারিখ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার উপায় নাই। ভরতমল্লিক-প্রণীত "চন্দ্রপ্রভা" নামক বৈদ্যকুলগ্রন্থে চন্দ্রসেন নামক একজন রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়,—

"ধন্বন্তরিকুলে বীজী রাজা বিমলসেনকঃ।
তস্য বংশাবলীং বক্ষ্যে সেনভূমিনিবাসিনঃ॥
একো বিমলসেনস্য পুত্রোঽভূৎ পরমেশ্বরঃ।
পরমেশ্বরতো জজ্ঞে বাসুদেবো গুণিপ্রিয়ঃ॥
চিকিৎসাকার্য্যনৈপুণ্যাৎ শিখরেশাশ্রয়ং গতঃ।
সম্মানপূর্ব্বকং তেন স্থাপিতোঽয়ং মহীভুজা॥
বাসুদেবস্য তনয়োঽনন্তসেন ইতি স্মৃতঃ।
উভাভ্যাং শস্ত্রশাস্ত্রাভ্যাং পণ্ডিতো রাজপূজিতঃ॥
তস্যৈবানন্তসেনস্য নাথসেনঃ সুতোঽজনি।
বাঙ্গকুমারসংসর্গাদস্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ॥
তস্যাস্ত্রবিদ্যামালোক্য প্রীতোঽভূৎ শিখরেশ্বরঃ।
হরিশ্চন্দ্রো দদৌ তস্মৈ তদ্দেশস্যৈকরাজতাম্॥
ততঃ পূর্ব্বার্জ্জিতং দেশং বিহায় খণ্ডসাধিতম্।
পাহাড়দেশখণ্ডে চ নাথসেনোঽভবন্নৃপঃ॥
তদীয়াঃ পূর্ব্বপুরুষাঃ রাজানস্তত্র চ স্থিতাঃ।
ইতি মত্বাভবদ্রাজা নাথসেনোঽতিযত্নতঃ॥
নৃপতের্নাথসেনস্য পুত্রো বিজয়সেনকঃ।
স এব সর্ব্বসংগ্রামে মহারাজোঽভবদ্বলী॥
রাজ্ঞো বিজয়সেনস্য তনয়ৌ দ্বৌ বভূবতুঃ।
চন্দ্রবচ্চন্দ্রসেনোঽভূদ্বুধসেনো বুধোপমঃ॥"

বাঙ্গালা বিশ্বকোষে তিন জন চন্দ্রসেনের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একজন হেমাচার্য্য সূরির শিষ্য, দ্বিতীয় অশ্বত্থামার হস্তে নিহত হন এবং তৃতীয় পরশুরামের সমসাময়িক।

খোদিত লিপির অক্ষরগুলি খৃষ্টীয় দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরমালার অনুরূপ।

(খ) ১। ... গ ... ন্ত্যায়সঃ (?) f ... বাগ ... তেম ...
২। ... সু ... ম্যাস্তিথৌ ... যাব
৩। শ্রী ... করকে ... ঠী

খোদিত লিপির এই অংশে তারিখ ছিল, প্রস্তরখণ্ডকর্ত্তনকালে তাহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

(গ) ১। ... ষ্য নি ...
২। ... ষাং পমি ...
৩। চর্য্য সহি ...

(ঘ) ১। ... মণ্ডলপদ্ধতি ...
২। ... মায়াব (?) হেতুম ...

• নূতন হাটের মসজিদের সম্মুখে যে দীঘি আছে, তাহার অপর পার্শ্বে একটি দর্গা আছে। এই দর্গার সোপানে খোদিত লিপিযুক্ত একখণ্ড প্রস্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(ঙ)　　১।　…দ আ

　　　২।　নী

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির সম্মুখে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন্ হোসেন সাহের রাজ্যকালে হিজরী ৯১৬ অব্দের খোদির লিপির অনুবাদ ;—

"ঈশ্বর বলিয়াছেন　…　…,　…　সং　…

মাননীয় আলাউদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্ফর হুসেন শাহ সুল্তান, হুসেনবংশীয় সৈয়দ আস্রফের পুত্র, ভগবান্ তাঁহার রাজত্ব ও গৌরব চিরস্থায়ী করুন। ৯১৬ সালে নির্ম্মিত হইল"।

মৌলানা হামিদ দানেশমন্দের সমাধির পার্শ্বে একটি পুরাতন মস্জিদের ভিত্তির উপরে মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইলের যত্নে যে নূতন মস্জিদ্ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার দ্বারের উপরে পুরাতন মস্জিদের খোদিত লিপিটি গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তাঁহার উপরে ঈশ্বরের অনুগ্রহ হউক) বলিয়াছেন—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার জন্য স্বর্গে একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিবেন। এই মস্জিদ্ দ্বিতীয় সাহেব করাণ সম্রাট্ সাহার-উদ্দীন মহম্মদ শাহজহান বাদশাহ গাজির রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি ইহার নির্ম্মাণের তারিখ তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে উহাকে বয়তুল আতিক বলিবে বলিয়া সম্বোধন করিবে, হিঃ ১০৬৫।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, পুরাতন মস্জিদ্‌টি ১০৬ঃ হিজরি অর্থাৎ ১৬৫৪-৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার এইচ্ ব্লকম্যান মঙ্গলকোটে আর একখানি খোদিত লিপি আবিষ্কার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।* আমরা অনেক সন্ধান করিয়াও এই খোদিত লিপির সন্ধান পাই নাই।

খোদিত লিপির অনুবাদ,—

"ঈশ্বরের প্রেরিত (তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হউন) বলিয়াছেন,—যে কেহ ঈশ্বরের নিমিত্ত কোনও মস্জিদ্ (উপাসনাস্থান) নির্ম্মাণ করিবে, ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত সেই প্রকারের একটি গৃহ স্বর্গে নির্ম্মাণ করিবেন। এই জামেমস্জিদ্ হুসেনসাহের পুত্র প্রংশসিত সুলতান্, সুলতানের পুত্র সুলতান্ নাসের উদ্দুনিয়া ও অদ্দিন আবুল মজফ্ফর নসরৎ শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত। ঈশ্বর তাঁহার রাজত্ব ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী করুন। ইহার নির্ম্মাণকারী খান্ মিয়া মুয়জ্জম, মোরাদ হায়দর খানের পুত্র, তাঁহার সম্ভ্রম বৃদ্ধি হউক, নয় শত ত্রিশ সালে নির্ম্মিত।"

বন্ধুবর মৌলবী শ্রীযুক্ত আবুল মজফ্ফর জমালুদ্দিন মহম্মদ অনুগ্রহ করিয়া আরবী খোদিত লিপিগুলির অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

---

* J. A. S. B. 1876. Pt. 1. P. 296.

১। শাহজাহানের রাজত্বকালের খোদিতলিপি—

قَالَ النَّبِيُّ عليه الصَّلوٰةُ والسلام مَنْ بَنیٰ لِلّٰه مَسْجِدًا بَنَى اللّٰه لهٗ بيتًا فِي الجنَّة بَنیٰ هذا المسجدُ فِي عهدِ سلْطانَ الاعظم وَالخاقان الاكرم صاحب قرآن ثاني شهاب الدين محمد شاه جهان بادشاه غازي اِذا سُئِلْتَ عن تاريخ بنائه فقُلْ هُوَ البيتُ العتيق سنه ١٠٦٥ هـ ✱

২। হুসেনশাহের রাজত্বকালের খোদিতলিপি—

قَالَ اللّٰه.........حسنة.........المعظّم المكرّم عَلاوالدنيا والدّين ابو المظفّر حسين شاه السلطان بن سيّد اشرف الحسيني خلدَ اللّٰه ملكهٗ وسلطانهٗ في سنة ستّ عشر وتسعمائة

৩। নসরৎ শাহের রাজত্বকালের খোদিতলিপি—

قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللّٰه عليه وسَلَّم مَنْ بنى مسجدًا للّٰه بنى اللّٰه لهٗ بيتاً مثلهٗ فِي الجنّة بنى هٰذا المسجدُ الجامع في عهدِ السُّلطان المعظّم السلطان بن السلطان ناصر الدنيا وَالدّين ابو المظفّر نصرت شاه السلطان بن حسين شاه السُّلطان خَلَدَ اللّٰه مُلكهٗ وسُلطانهٗ وَ بانيهٗ خان ميان معظّم بن حيدر خان دامَ عِزّهٗ فِي سنة ثلثين وتسعمائة ✱

শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু
শ্রীহরিদাস পালিত
শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তর-রাঢ়-ভ্রমণ]　　বড়বাজার বা নূতন হাট মস্‌জিদ মধ্যে আবিষ্কৃত শিলালিপি সমূহ
(ক) ১৮৫ পৃঃ, (খ) (গ) ও (ঘ) ১৮৬ পৃঃ এবং (ঙ) ১৮৭ পৃঃ

(১) হুসেন সাহের খোদিতলিপি
(২) সাহ জাহানের খোদিতলিপি

প্রাচীন কামরূপের রাজমালা

আসামের পুরাবৃত্তানুসন্ধানে অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীযুক্ত ই, এ, গেইট্ বাহাদুরের প্রযত্নে ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ সালে বলবর্ম্মা ও ইন্দ্রপালের এক একখানি এবং রত্নপালের দুইখানি তাম্রশাসন এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ১৮৪০ সালে বনমালদেবের একখানি শাসন সোসাইটির পত্রিকায় এবং বৈদ্যদেবের একখান তাম্রশাসন ১৮৯৩ সালের এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইদানীং দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে; একখানি ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন—আজ তিন বৎসর হইল, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় গৌহাটিস্থ বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভায় আলোচনা করিয়াছিলেন; আর একখানি শ্রীহট্টের পঞ্চখণ্ডে অচিরপ্রাপ্ত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন; কামরূপ অনুসন্ধান-সমিতির—তথা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে আলোচিত হইয়াছে।*

এখন এই সকল তাম্রশাসনের সাহায্যে প্রাচীন কামরূপের একটি রাজমালা গ্রথিত করিবার নিমিত্ত এতৎপ্রবন্ধে প্রয়াস করা যাইতেছে। বৈদ্যদেব বঙ্গাধিপ কুমারপালের ব্রাহ্মণ অমাত্য ছিলেন; তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসন ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত তাম্রশাসন নরক-ভগদত্তের বংশজ বলিয়া প্রখ্যাত নরপতিগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। এতন্মধ্যে ভাস্কর-বর্ম্মার তাম্রশাসনখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। ইহাতে ভাস্করবর্ম্মার ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম আছে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :—

(আনুমানিক) ৪র্থ শতাব্দী — পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা (দত্তদেবী)
|
বলবর্ম্মা (রত্নবতী)
|
৫ম শতাব্দী — কল্যাণবর্ম্মা (গন্ধর্ব্ববতী)
|
গণপতিবর্ম্মা (যজ্ঞবতী)
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা (সুব্রতা)
|
নারায়ণবর্ম্মা (দেববতী) (পরপৃষ্ঠায়)
|

---

* ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নাই। ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসন "বিজয়া", ১ম বর্ষ, দশম সংখ্যায় (১৩২০ আষাঢ়) প্রকাশিত হইয়াছে।

† রাজমহিষীগণের নাম পার্শ্বে বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত হইল।
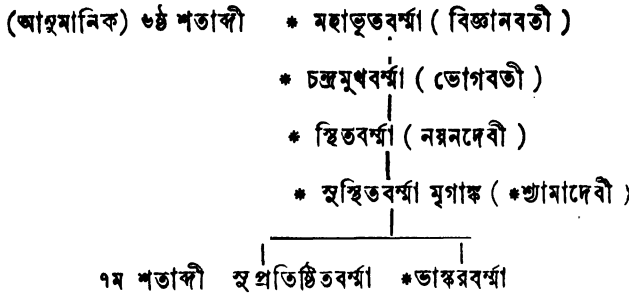
ভাস্করবর্ম্মা আনুমানিক ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। শতাব্দীতে চারিপুরুষ ধরিয়া নিলেও পুষ্যবর্ম্মা হইতে ভাস্করবর্ম্মা পর্য্যন্ত তিন শতাব্দীকালের কামরূপাধিপতিগণের নাম আমরা এই শাসনখানি হইতে পাইতেছি। এই তাম্রশাসন যে অন্যান্য শাসনের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহার লিপিভঙ্গিই তাহার প্রমাণ। অন্যান্য তাম্রশাসন খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া লিপিদৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল পরবর্ত্তী শাসনগুলির বিষয় বলিবার পূর্ব্বে আর একটি লিপির উল্লেখ করিতে হইবে। ইহা তেজপুর শহরের সন্নিকৃষ্ট ব্রহ্মপুত্র-তীরস্থিত পর্ব্বত-গাত্রলিপি। লিপি এ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ পঠিত হয় নাই; পরলোকগত ডাঃ কীল্‌হর্ণ কেবল দুই একটি শব্দমাত্র পাঠ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাতে নরপতি "হর্জ্জরে"র নাম এবং লিপির সন "৫১০" অব্দ, এই দুইটি প্রয়োজনীয় কথা পাওয়া গিয়াছে। এই অব্দ গুপ্তাব্দ বলিয়া ডাঃ কীল্‌হর্ণ অনুমান করিয়াছেন, তাহাতে খৃষ্টীয় ৮২৯ অব্দ হয়। এখন বনমালদেব ও তৎপ্রপৌত্র বলবর্ম্মদেবের এবং রত্নপালদেব ও তৎপৌত্র ইন্দ্রপাল দেবের তাম্রশাসনে এবং নবাবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে আমরা যে যে রাজার উল্লেখ পাই, তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইতেছে :—

* চিহ্নিত নামগুলি হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাসে পাওয়া যায়। তবে উহাতে 'মহাভূতবর্ম্মা' স্থলে 'ভূতিবর্ম্মা', স্থিতবর্ম্মা স্থানে "স্থিতিবর্ম্মা", 'সুস্থিতবর্ম্মা' স্থানে 'সুস্থিরবর্ম্মা', এইরূপ ঈষৎ ব্যতিক্রম দেখা যায়। স্বয়ং ভাস্করবর্ম্মার আদেশে লিখিত দলিলে (অর্থাৎ তাম্রশাসনে) তদীয় বৃদ্ধপ্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতার নাম যে বিশুদ্ধভাবে লিখিত হইয়াছিল, ইহা আমরা ধরিয়া নিতে পারি। অপিচ বিগত আশ্বিন সংখ্যায় "সাহিত্য"পত্রে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জনৈক গুপ্তবংশীয় নরপতির শিলালিপিতে ভাস্করবর্ম্মার পিতার নামোল্লেখ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে 'সুস্থিরবর্ম্মা' না হইয়া নামটি "সুস্থিতবর্ম্মা" এইরূপ আছে। ফলতঃ প্রভেদস্থলে হর্ষচরিতেই যে প্রমাদ ঘটিয়াছে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত এতদ্দ্বারা সমর্থিত হইল।

(আনুমানিক) শতাব্দী	বনমালের তাম্রশাসন	বলবর্ম্মার তাম্রশাসন	রত্নপালের তাম্রশাসন	ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন	ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন
৭ম শতাব্দী—		সালস্তম্ভ	সালস্তম্ভ		
			বিগ্রহস্তম্ভ		
		পালক			
৮ম শতাব্দী-		বিজয়			
	শ্রীহরিষ				
৯ম শতাব্দী—	প্রালম্ভ (জীবদা)				
	হর্জ্জর (তারা)	হর্জ্জর (৮২৯খৃঃ)			
	বনমাল	বনমাল			
		জয়মাল			
		বীরবাহু (অম্বা)			
১০ম শতাব্দী—		বলবর্ম্মা			
			(২১ তম রাজা) শ্রীত্যাগসিংহ (নিঃসন্তান)		
			ব্রহ্মপাল (কুলদেবী)	ব্রহ্মপাল	ব্রহ্মপাল
১১শ শতাব্দী-			রত্নপাল	রত্নপাল	
				পুরন্দরপাল (দুর্লভা)	
				ইন্দ্রপাল	
					গোপাল (নয়না)
					হর্ষপাল (বা হর্ষমাল)
১২শ শতাব্দী—					ধর্ম্মপাল

বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, কামরূপাধিপতি তিষ্যদেবকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তিনি কামরূপের শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয় যে, তিষ্যদেবই তথাকথিত নরক-ভগদত্তের বংশীয় শেষ রাজা। তিনি অবশ্যই ধর্ম্মপালের অব্যবহিত না হইলেও অল্পব্যবহিত পরবর্ত্তী রাজা ছিলেন।

প্রবীণ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় বিগত বর্ষের পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "গৌহাটির নূতন তাম্রশাসন" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কামরূপের একটি রাজমালা সঙ্কলিত

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি সেই নূতন তাম্রশাসনের হর্ষমাল বা হর্ষপালকে নেপালের শিলালিপি-বিশেষে উক্ত শ্রীহর্ষদেবের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনাপূর্ব্বক পালরাজগণকে হর্জ্জরবংশীয়গণের অগ্রবর্ত্তী করিয়া পালোপাধিক প্রথম নৃপতি ব্রহ্মপালকে ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরবর্ত্তী করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু তিনি যদি রত্নপালের তাম্রশাসনখানি পড়িতে পাইতেন, তবে বোধ হয়, এইরূপ বলিতেন না। তাহাতে স্পষ্ট আছে,—

> এবং বংশক্রমেণ ক্ষিতিমথ নিখিলাং ভুঞ্জতাং নারকাণাং
> রাজ্ঞাং ম্লেচ্ছাধিনাথো বিধিচলনবশাদেব জগ্রাহ রাজ্যম্।
> সালস্তম্ভঃ ক্রমেহস্যাপিহি নরপতয়ো বিগ্রহস্তম্ভমুখ্যাঃ
> বিখ্যাতাঃ সংবভূবুর্দ্বিগুণিতদশতা-সংখ্যয়া সংবিভিন্নাঃ ॥
> নির্ব্বংশং নৃপমেকবিংশতিতমং শ্রীত্যাগসিংহাভিধং
> তেষাং বীক্ষ্য দিবং গতং পুনরহো ভৌমো হি নো যুজ্যতে।
> স্বামীতি প্রবিচিন্ত্য তৎপ্রকৃতয়ো ভূভাররক্ষাক্ষমং
> সাগক্ষ্যাৎ পরিচক্রিরে নরপতিং শ্রীব্রহ্মপালং হি যম্ ॥

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রহ্মপাল সালস্তম্ভ হইতে একবিংশতি জন রাজার পর সিংহাসনস্থ হন। কৈলাসবাবু ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরেই ব্রহ্মপালকে আনিয়াছেন, কিন্তু ব্রহ্মপালের পুত্র রত্নপালের তাম্রশাসনের মতে তিনি সালস্তম্ভবংশীয় শ্রীত্যাগসিংহের অব্যবহিত পরেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তবে তর্কস্থলে কৈলাসবাবু বলিতে পারেন যে, হয় ত ভাস্করবর্ম্মাকে রত্নপাল সেই ম্লেচ্ছাধিনাথ সালস্তম্ভের পরবর্ত্তী "দ্বিগুণিতদশ"-সংখ্যক নৃপতিমধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীত্যাগসিংহকে ভাস্করবর্ম্মার অব্যবহিত পরবর্ত্তী নৃপতি ধরিয়া এবং "গৌহাটির নূতন তাম্রশাসনে" উক্ত 'গোপালদেবকে' (কৈলাসবাবুর ন্যায়) ইন্দ্রপালের আসন্নতম উত্তরাধিকারী মনে করিয়া নিলেও ব্রহ্মপাল হইতে ইন্দ্রপাল ৪ পুরুষ এবং গোপাল হইতে হর্ষপাল দুই পুরুষ—এই ছয় পুরুষের আবির্ভাব বড় জোর ৭৫ বৎসরের মধ্যে ধরিয়া নিতে হয়; কেন না, ভাস্কর-বর্ম্মাকে আমরা ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে চীন-রাজদূত "ওয়াং হিউয়েন-চি"র সহায়তাকারিরূপে দেখিতে পাই।* তাঁহাকে সুতরাং ৬৫০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগামী এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রীত্যাগসিংহকেও যদি তাঁহার অব্যবহিত পরেই শমনভবনের অধিবাসী ধরিয়া লই, তাহা হইলে হর্ষপাল—যাঁহার আবির্ভাবকাল কৈলাসবাবুর মতে ৭২৫ খৃষ্টাব্দ মাত্র—ব্রহ্মপালের সিংহাসনারোহণের অনধিক ৭৫ বৎসর কাল পরবর্ত্তী হইয়া পড়েন। পূরা শতাব্দীতে বড় জোর পাঁচ পুরুষ কল্পনা করা চলে—ত্রিপাদ-শতাব্দীতে ছয় পুরুষের সংস্থান নিতান্তই অসম্ভাবিত। বিশেষতঃ যদি সালস্তম্ভাদি ভাস্করবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতেন, তবে এই অচিরাবিষ্কৃত তদীয় তাম্রশাসনে উল্লেখিত দ্বাদশ পুরুষের মধ্যে বিগ্রহস্তম্ভ বা 'পালক' অথবা 'বিজয়,' ইহাঁদের অন্ততঃ একজনের উল্লেখ দেখিতে পাইতাম। তবে যদৃচ্ছাক্রমে উল্লেখিত এই তিন জনের

* Vincent A Smith's Early History of India, ৩২৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সকলেই যদি ভাস্করের দ্বাদশ পুরুষেরও পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা নাচার; কিন্তু ব্যাপারটা আশ্চর্য্যজনক হইয়া পড়ে না কি ?

শ্রীযুক্ত কৈলাসবাবু আরও একটি কথা বলিয়াছেন। প্রাচীন লিপিতত্বজ্ঞ ডাঃ হর্ণলি শাসনগুলির লেখার ছাঁদ দেখিয়া বলবর্ম্মার তাম্রশাসন আনুমানিক ৯৭৫ খৃষ্টাব্দের, রত্নপালের তাম্রশাসন ১০১০ খৃষ্টাব্দের এবং ইন্দ্রপালের তাম্রশাসন ১০৫০ খৃষ্টাব্দের বলিয়া অনুমান করেন। কৈলাসবাবু হর্ণলি সাহেবের এই মত অনুমোদন করেন না। তিনি বলেন,—"বলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অক্ষর দৃষ্টে তাহা ব্রহ্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া কিছুতেই অনুমান করা যাইতে পারে না।"

প্রত্নলিপিবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞত্বের দাবি আমার কিছুই নাই। তবে বলবর্ম্মার শাসনলিপি ও রত্নপালের শাসনলিপি পাশাপাশি করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয় যে, উভয়েই প্রায় একসময়কার লিপি; তাহাতে বোধ হয়, ডাঃ হর্ণলির মত দূষণীয় হইবে না। আবার কৈলাসবাবুর মতে ভাস্করবর্ম্মা ও রত্নপাল দুই পুরুষের ব্যবহিতমাত্র অর্থাৎ প্রায় একই সময়ের। কিন্তু রত্নপালের তাম্রশাসনের ও ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনের লিপির তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে আকাশপাতাল প্রভেদ দেখা যায়। ডাঃ হর্ণলির মতে রত্নপাল একাদশ শতাব্দীর লোক—ভাস্করবর্ম্মার প্রায় চারিশত বৎসর পরবর্ত্তী। লিপিও যেন ইহারই সাক্ষ্য প্রদান করে।

কৈলাস বাবু হর্জ্জরবংশীয়দিগকে যে কারণে ধর্ম্মপালের পরে ঠেলিয়া ফেলিতে চান, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি; হর্ষপাল (বা হর্ষমাল) নৃপতিকে তিনি শ্রীহর্ষদেব হইতে অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু শিলালিপিতে আছে,—"গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোসলপতি শ্রীহর্ষদেবাত্মজা… যেনোঢ়া ভগদত্তরাজকুলজা লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাভুজা।" ইহাতে শ্রীহর্ষদেবকে তো স্পষ্ট কামরূপাধিপতি বলা হয় নাই, কেবল "ভগদত্তরাজকুল" হইতে উৎপন্ন গৌড়াদি-দেশাধিপতি বলা হইয়াছে। এই হর্ষদেব আনুমানিক ৭২৫ খৃষ্টাব্দের লোক। তিনি সালস্তম্ভ কর্ত্তৃক বিতাড়িত ভৌমবংশীয় কেহ হইবেন—যাঁহার বহু পরে তদ্বংশীয় ব্রহ্মপাল পুনশ্চ প্রকৃতিবর্গ কর্ত্তৃক সাদরে কামরূপের সিংহাসনে কৃতাভিষেক হইয়াছিলেন।* অতএব দেখা গেল যে, নরক-ভগদত্ত বজ্রদত্তের বংশধরগণ বহু বহু শতাব্দী একাদিক্রমে রাজত্ব করিয়া ভাস্করবর্ম্মার অল্পব্যবহিত পরে সালস্তম্ভ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন; তৎপর এই ম্লেচ্ছরাজগণের একবিংশতি জন রাজা রাজত্ব করিলে পর ব্রহ্মপাল রাজা হন এবং বোধ হয়, বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক নির্জ্জিত ও নিহত তিষ্যদেব পর্য্যন্ত এই বংশীয়রাই দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্য্যন্ত কামরূপের রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন।

এখানে আরও একটি কথার আলোচনা বোধ হয়, অবান্তর বিবেচিত হইবে না। হর্ষচরিতে

* আর যদি শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবু নিতান্তই শ্রীহর্ষদেবকে "কামরূপাধিপতি" না করিলে অতৃপ্ত হন, তবে তাঁহাকে ইহাও বলিতে পারি যে, বনমাল দেবের তাম্রশাসনে একজন "শ্রীহরিষ" নৃপতির উল্লেখ আছে—তিনি সালস্তম্ভবংশীয়। তিনি প্রালম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সালস্তম্ভের পরবর্ত্তী ছিলেন এবং আসামের ইতিহাসপ্রণেতা শ্রীযুক্ত গেইট সাহেব তাঁহাকে নেপালের লিপিতে উল্লিখিত শ্রীহর্ষদেব হইতে অভিন্ন মনে করেন। বলা বাহুল্য যে, রত্নপাল যাঁহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাঁহারাও আপনাদিগকে নরক-ভগদত্তবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

আছে,—"মহাত্মনস্তস্য (নরকস্য) অন্বয়ে ভগদত্ত-পুষ্পদত্ত-বজ্রদত্তপ্রভৃতিষু ব্যতীতেষু বহুষু মহীপালেষু" ইত্যাদি। এই যে ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের মধ্যে 'পুষ্পদত্ত' প্রক্ষিপ্ত হইয়াছেন, ইনি কে? যে পর্য্যায়ে নামটি আছে, তাহাতে ইনি হয় ভগদত্তের উত্তরাধিকারী ভ্রাতা, নয় তাঁহার পুত্র, বজ্রদত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। আবার বনমাল, বলবর্ম্মা ও রত্নপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে ভগদত্তের 'ভ্রাতা' বলা হইয়াছে, অথচ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে এবং রত্নপালের পৌত্র ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনে বজ্রদত্তকে স্পষ্ট ভগদত্তের পুত্র বলা হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু বিতর্ক আর এক প্রবন্ধে করিয়াছি।* অতএব এ স্থলে ইহার বাহুল্যে উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু পুষ্পদত্ত বা বজ্রদত্ত ভগদত্তের ভ্রাতা হইতে পারেন না; কেন না, নরকের চারিটি পুত্র ছিল, তাহাদের নাম—ভগদত্ত, মহাশীর্ষ, মদবান্ এবং সুমালী। কালিকাপুরাণ ৪০ অধ্যায়ে আছে,—

ঋতুমত্যাস্তু জায়ায়াং কালে স নরকঃ ক্রমাৎ।
ভগদত্তং মহাশীর্ষং মদবন্তং সুমালিনম্।
চতুরো জনয়ামাস পুত্রানেতান্ ক্ষিতেঃ সুতঃ॥

ইহাতে পুষ্পদত্ত তথা বজ্রদত্তের নাম নাই। অথচ মহাভারতে (অশ্বমেধ পর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ে) বজ্রদত্তের নাম ভগদত্তের পুত্র বলিয়া উল্লেখ আছে—অপর কোনও পুত্রের নাম নাই। তবে পুষ্পদত্ত কে? শ্রীযুক্ত কৈলাস বাবু সরাসরিভাবে পুষ্পদত্তকে কিঞ্চিৎ সরাইয়া আনিয়া বজ্রদত্তের পরবর্ত্তী করিয়াছেন। কিন্তু কোনও ইতিহাস পুরাণে কি পুষ্পদত্তের উল্লেখ আছে? আমরা হর্ষচরিত ভিন্ন পুষ্পদত্তের উল্লেখ কুত্রাপি দেখি নাই—কোনও তাম্রশাসনেও পাইতেছি না।

এ স্থলে অনুমানতঃ একটি কথা বলিতে চাই এবং প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের পক্ষে অনুমান অনেক সময় অপরিহার্য্য। মহাকবি বাণভট্ট যে স্থলে ভগদত্তপুষ্পদত্তাদির কথা বলিয়াছেন, তাহা ভাস্করবর্ম্মার প্রেরিত দূত হংসবেগের উক্তি; সেই উক্তি বাণভট্ট যে খুব যথাযথভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। মহাভূতবর্ম্মা স্থানে ভূতিবর্ম্মা, স্থিতবর্ম্মার স্থলে স্থিতিবর্ম্মা, সুস্থিতবর্ম্মা স্থলে সুস্থিরবর্ম্মা ইত্যাদি অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম তাঁহার লেখায় দেখা যাইতেছে। এই 'ভগদত্ত-পুষ্পদত্ত-বজ্রদত্তে'ও সেইরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে। হয় তো হংসবেগ বলিয়াছিলেন,—"ভগদত্ত-বজ্রদত্ত-পুষ্যবর্ম্মপ্রভৃতিষু" ইত্যাদি; বাণভট্ট ভুল করিয়া 'পুষ্য' স্থলে 'পুষ্প' করিয়া, অনুপ্রাসানুরোধে ('বর্ম্ম'টাকে ক্ষত্রিয়ের সাধারণ উপাধি বলিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক) পুষ্পের পরে 'দত্ত' যুড়িয়া দিয়া ভগদত্ত ও বজ্রদত্তের মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়াছেন। 'পুষ্প' ও 'পুষ্য' যে অনেক সময় একার্থবোধক, তাহা 'পুষ্যমিত্র' বা 'পুষ্পমিত্র', † 'পুষ্যরথ' বা 'পুষ্পরথ' দেখিলেই বুঝা যাইবে। তারপর 'অনুপ্রাসে সর্ব্বনাশ' ঘটিয়াছে—পুষ্যবর্ম্মা পুষ্পদত্ত হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটা একটা অনুমান মাত্র। ইহা কতদূর সঙ্গত, তাহা সুধীভির্বিভাব্যম্।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা

---

* বলবর্ম্মার তাম্রশাসন—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৭ সালের ২য় সংখ্যা, ১২২ পৃঃ (৪৩) নম্বর ফুট-নোট দ্রষ্টব্য। (ঐ ফুটনোটেও কিছু প্রমাদ আছে; এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)।

† শুঙ্গবংশীয় নৃপগণের বীজী পুরুষ; কালিদাসের 'অগ্নিমিত্রে'র পিতা।

চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার সহিত বঙ্গভাষার বর্ণমালার তুলনা করিলে, বঙ্গভাষায় দুইটি বর্ণের অভাব পরিলক্ষিত হয়—মূর্দ্ধন্য ল (ळ) ও অন্তঃস্থ ব (ব)। আবার বর্ণসমূহের উচ্চারণ পর্য্যালোচনা করিলে মূর্দ্ধন্য ণ-কার, দন্ত্য স-কার, মূর্দ্ধন্য ষ-কার ও অন্তঃস্থ য-কারের অভাব দৃষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ দিতে গিয়া প্রবন্ধের দীর্ঘতা সম্পাদন বাঞ্ছনীয় নহে। পূর্ব্ববঙ্গের কথিত ভাষার আলোচনা করিলে চারিটি* অতিরিক্ত বর্ণের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়—তাহা চ, ছ, জ ও ঝ-বর্ণের দন্ত্য উচ্চারণ।† চ, ছ, জ ও ঝ-বর্ণের তালব্য উচ্চারণ করিতে হইলে, জিহ্বাগ্রদ্বারা তালু স্পর্শ করত তালু ও জিহ্বাগ্রের মধ্য দিয়া বায়ু নির্গত করিতে হয়; কিন্তু জিহ্বাগ্র কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়া তদ্দ্বারা তালুর নিম্নস্থ দন্তমূল ঈষৎ স্পৃষ্ট করিয়া তন্মধ্য দিয়া বায়ু নির্গত করিলে, এই বর্ণচতুষ্টয়ের দন্ত্য উচ্চারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। দন্ত্য চ ও জবর্ণের উচ্চারণ যথাক্রমে ইংরাজী s ও z বর্ণের উচ্চারণানুরূপ এবং এই উচ্চারণে একটু যতি (accent) দিলেই পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত দন্ত্য ছ ও ঝ-বর্ণের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় ছ ও ঝ-বর্ণ অল্পপ্রাণতা প্রাপ্ত হওয়ায় এই দুই বর্ণের অস্তিত্ব নাই বলিলেও চলে। স্বর্গীয় রজনীকান্ত সেনের সঙ্গীত হইতে উদাহরণ সংগৃহীত হইল। দন্ত্য চ ও জ-বর্ণের উচ্চারণ লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমরা এই দুই বর্ণের পার্শ্বে বিন্দু ব্যবহার করিব।‡

যুবতী ভার্য্যার প্রতি বৃদ্ধ স্বামীর উক্তি,—

বাজ.ার হুদ্দ্যা কিন্ন্যা আ'ন্যা ডা'ল্যা দিচি. পায়।
তুমার লগে ক্যাম্‌তে পারুম্ ঐয়্যা উট্‌চে. দায়॥
আর্শি দিচি. কাঁউই দিচি., গাও মাজ.নের হাবান দিচি.,
চু.ল বান্দনের ফিতা দিচি., আর কি হাওন জ.ায়?
ব্যালওয়ারি চু.রি দিচি., পাচ.াপাইর‍্যা কাপর দিচি.,
পিরান দিচি. মজা কৈর‍্যা, দিবার লাগ্‌চে.া গায়॥

* দুইটি বলিলেও চলে।

† তিব্বতীয় ভাষায় তালব্য ও দন্ত্য উচ্চারণের ভেদ করিবার জন্য দুই শ্রেণীর চ-বর্গ অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। যথা—

চ ছ জ ঝ। চ̍ ছ̍ জ̍ ঝ̍। এই উচ্চারণের দ্বৈবিধ্য থোন্-মি-সম্ভোট নামক তিব্বতীয় পণ্ডিতদ্বারা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতদেশে প্রবর্ত্তিত হয়। বলা বাহুল্য, উক্ত পণ্ডিত বাঙ্গালা দেশ হইতেই এই প্রকার উচ্চারণের ভেদ শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—পত্রিকাধ্যক্ষ।

‡ হিন্দী ভাষায় দন্ত্য ও তালব্য বর্ণের উচ্চারণ নিম্নে বিন্দুযুক্ত অক্ষর দ্বারা প্রকাশিত হয়। যথা,—

च़, छ़, ज़, झ़, ञ़।

উলের হ'ত্যা দিচি. আ'ল্যা, কিসের লা'গ্যা মনডা পাইল্যা ?
ওজ.ন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি., পরাণ দিচি. ফায় ॥
বুরা বুরা কৈর‍্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়্যা ক্যান করচে.া পাগল ?
জ.হন বিহা কোরচে.া ফ্যালবা ক্যামতে কৈয়া ত্তাও আমায় ॥

উদ্ধৃত পদ্যে বাজ.ার, মাজ.ন, জ.ায়, মজ.া, ওজ.ন ও জ.হন শব্দের জ. দন্ত্য উচ্চারণ-বিশিষ্ট। এবং দিচি., উট্‌চে., চু.রি, পাচ.া, লাগচে.া ও করচে.া শব্দে দন্ত্য চ-কারের উচ্চারণ পরিস্ফুট। কেবলমাত্র পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় যে এই দন্ত্য তালব্য বর্ণদ্বয়ের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়, তাহা নহে ; উত্তরবঙ্গের (রাজসাহী-বিভাগের) ভাষাতেও এই বর্ণদ্বয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। উদাহরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

চুরি করিতে নিষেধ করায় চোর-পত্নীর প্রতি চোরের উক্তি ;—(রাজবংশী ভাষা)

চু.ন্নি, বাধা না দিস্‌ বারে বার,
দে আজি. জ.াবার।
আজি. বরো তাক মিলিচে. ওমাবস্তার অন্ধকার ॥
মন করিচুঁ. ঢুকিম্‌ সহর.
পাঁও জ.দি এক বাক্স মুহোর,
বসি খা'ম্‌ আঠার বচ্চ.র,
ডুকুজ.ালা না রবে আর।
গিরস্তি সাজ. করোঁ পূরা,
কিমোঁ চ.াট্টা গরু ঘোরা,
তোর জি.নিস্‌লা গরেয়া কনেক
মন আচে. মাটি নিবার ॥
জ.া কহিলু তামানে ঠিক,
ভাল নোয়ায় কুন কাম অধিক,
আজি. মুই কইর‍্যা চু.রি,
হীলা কাম না করিম্‌ আর।
সগাঁই থাকিচে. খায়া,
ভাত নিন্দাৎ পরিচে. জ.ায়া,
মোক খন্তাখান আনি দিয়া,
খাকেক জ.ায়া দে ডুয়ার ॥*

* চু.ন্নি—চোরপত্নী। জ.াবার—যাইতে। বরো—বড়। তাক—সুবিধা। করিচু—করিয়াছি। ঢুকিম্‌—ঢুকিব, প্রবেশ করিব। পাঁও—পাই। মুহোর—মোহর। খা'ম্‌—খাব। বচ্চ.র-বৎসর। ডুকুজ.ালা—

• এই চ-বর্গ ও জ-বর্গের উৎপত্তি কোথায়, তাহা বিচার্য্য। সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে* অধ্যাপক গ্রীয়ার্সন (G. A. Grierson) প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, মহারাষ্ট্রী ও শৌরসেনী ভাষায় এই দন্ত্য-তালব্য বর্ণসমূহের উচ্চারণ হইত এবং মাত্র মাগধী ভাষায় তালব্য বর্ণসমূহের প্রকৃত উচ্চারণ সংরক্ষিত ছিল। নিম্নে তদীয় প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করা হইল ;—

"মাগধী ভাষার ব্যাকরণে বররুচি লিখিয়াছেন,—"চবর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ।১১।৫।" ভামহ তাহার টীকায় লিখিয়াছেন,—"মাগধী ভাষায় চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের স্পষ্ট উচ্চারণ হয়।" ল্যাসেন (Lassen) 'স্পষ্টতা" স্থানে "অস্পষ্টতা" ও কাউএল্ (Cowell) "অস্পৃষ্টত" পাঠের অনুমোদন করিয়াছেন। সূত্রের অর্থ যেরূপই হউক না কেন, এই সূত্র হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র-প্রাকৃতে চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের যেরূপ উচ্চারণ হইত, মাগধী প্রাকৃতে সেরূপ হইত না—অন্যরূপ হইত।

বিজগপটম্ (Vizagapatam) হইতে সম্প্রতি প্রকাশিত মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের প্রাকৃত ব্যাকরণের মাগধী প্রকরণে একটি সূত্র আছে,—"চজয়োরুপরি যঃ স্যাৎ। ১২।২১।" অর্থাৎ মাগধী ভাষায় চ ও জ-বর্গের পূর্ব্বে য্-বর্ণের আগম হয়। যথা—য্চিঅং, চিরম্। তদীয় ব্যাকরণে লক্ষিত হইয়াছে যে, শৌরসেনী ভাষায় চিট্ঠ ধাতু স্থানে মাগধী ভাষায় শ্চিণ্ট হয়—"চিট্ঠস্য শ্চিণ্টঃ। ১২। ৩২।" তাহা আবার মাগধীপ্রকৃতিকা শাকারী ভাষায় "য্চিশ"-রূপ ধারণ করে। সিন্ধুপ্রদেশে প্রচলিত ব্রাচড় অপভ্রংশেও এইরূপ "চজোরুপরি যো ভবেৎ।১৮। ২।" যথা,—য্-চলই (চলতি), য্জলই (জ্বলতি)। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে প্রচলিত শৌরসেন-পৈশাচিকী ভাষায়ও এইরূপ "চবর্গস্যোপরিষ্টাদ্যঃ। ২০।৪।" হইত। যথা,—য্ছলে (ছলম্), লয্ছণে (লক্ষণম্), পয্ছে (পক্ষম্)। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র তালব্য বর্ণসমূহের দ্বিবিধ উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়াছেন। এই উচ্চারণদ্বৈতের নির্ণয় কি সম্ভবপর ? মার্কণ্ডেয়-মতে ঐ দ্বিবিধ উচ্চারণ নিম্নলিখিত বর্ণসমূহ দ্বারা ব্যঞ্জিত হইত। যথা—

সাধারণ তালব্য বর্ণ—অস্পষ্ট উচ্চারণ—চ, ছ, জ, ঝ, ঞ।
মাগধী তালব্য বর্ণ—স্পষ্ট উচ্চারণ—য্চ, য্ছ, য্জ, য্ঝ, য্ঞ।

দুঃখ-জ্বালা। গিরস্তি সাজ—গৃহস্থালীর আসবাব। করোঁ—করিব। তোর জি.নিস্‌লা—তোমার জিনিষ (অর্থাৎ অলঙ্কার) গুলি। গরেয়া—গড়াইয়া। কমেক—কিঞ্চিৎ। মাটি—জমি। মাটি নেওয়া—জমি খরিদ করা। কহিলু—বলিলি। তামানে—সমুদায়ই। নোয়ায়—ন হয়, না হয়, নহে। কুন—কোন। হীলা—এই সকল। সগাই—সকলেই। থাকিচে—শয়ন করিয়াছে। ভাত নিন্দাৎ পরিচে. জ.য়া—ভাত-ঘুমে পড়িয়াছে অর্থাৎ আহারের পর গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। থাকেক—শয়ন কর। এই গানটি জলপাইগুড়ির বাসুদেব-বিরচিত। চোয়া-চুন্নির গান গাওয়া তাহার ব্যবসায়।

• Journal of the Royal Asiatic Society, April, 1913, pp 391-96.

বিহার ও গঙ্গার উপত্যকায়* চ-বর্গের সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজী church শব্দের ch-এর ন্যায় এবং জ-বর্ণের উচ্চারণ judge শব্দের j-বর্ণের ন্যায়। এই সীমানায় মাগধী ও অর্দ্ধ-মাগধী ভাষা প্রচলিত ছিল। রাজপুতানা ও গুজরাটে চ ও ছ-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজী S-বর্ণের ন্যায়। যথা—হিন্দী চক্কী (যাঁতা) স্থানে মারবারী সক্কী, হিন্দী উচো (উচ্চ) স্থানে গুজরাটী উসো এবং পুছ্যো (জিজ্ঞাসা করিয়াছিল) স্থানে পুস্যো। গুজরাটের উত্তর অঞ্চলে জ ও ঝ-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজী z-বর্ণের উচ্চারণের অনুরূপ। যথা—ঝাড় (বৃক্ষ) স্থানে জ়াড়, (zad)। মারাঠী ভাষায় চ ও ছ যথাক্রমে ৎস ও স-বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। এবং জ ও ঝ তালব্য স্বর ভিন্ন অন্য স্বরের পূর্ব্বে (dz) (দ্জ়) বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়। সিন্ধী ভাষায় গ়, জ়, ড ও বর্গীয় ব (ব) বর্ণের এক বিচিত্র উচ্চারণ প্রচলিত আছে। কাশ্মীরী ভাষায় দ্বিবিধ তালব্য বর্ণেরই অস্তিত্ব আছে। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে দন্ত্য তালব্য বর্ণের উচ্চারণ প্রকটিত করিবার জন্য তালব্য বর্ণের নিম্নে বিন্দু প্রদানের প্রথা ঈশ্বর কৌলকর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে; যথা,—

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—তালব্য।

চ়, ছ়, জ়, ঝ়, ঞ়,—দন্ত্য তালব্য।

ঈশ্বর কৌলকর্ত্তৃক এই বিন্দুযুক্ত বর্ণমালা আবিষ্কারের পূর্ব্বে কাশ্মীরী ভাষার লেখকগণ হয় এই দ্বিবিধ উচ্চারণের পার্থক্য লক্ষ্য করিতেন না অথবা বিশুদ্ধ তালব্য বর্ণের পরে য-বর্ণ যোগ করিতেন। যথা,—

চ বা চ্য, ছ বা ছ্য, জ বা জ্য, ঝ বা ঝ্য, ঞ বা ঞ্য—তালব্য।

চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—দন্ত্য তালব্য।

ইহা মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের উল্লিখিত য্-যুক্ত তালব্যবর্ণ লিখন প্রথার অনুরূপ বলা যাইতে পারে; প্রভেদ মাত্র য-বর্ণের পৌর্ব্বাপর্য্যে; অতএব অনুমিত হইতেছে যে, মহারাষ্ট্র ও শৌরসেন প্রাকৃতে তালব্য বর্ণসমূহের দন্ত্য উচ্চারণ হইত এবং মাগধ-প্রাকৃতে ঐ বর্ণগুলি বিশুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইত।"

এই গেল অধ্যাপক গ্রীয়ার্সনের উপপত্তি। ইহা সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, একটু আলোচনা আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মারাঠী, সিন্ধী ও কাশ্মীরী ভাষায় এই দন্ত্য-তালব্য বর্ণসমূহের অস্তিত্ব পরিদৃষ্ট হয়। আমরা উদাহরণদ্বারা প্রথমতঃ সেই কথা পরিস্ফুট করিব।

সংস্কৃত ছ-বর্ণ ও সংস্কৃত ক্ষ-বর্ণের বিকৃতি প্রাকৃত ছ-বর্ণ স্থানে মারাঠী ভাষায় স ও শ-বর্ণের প্রয়োগ বিরল নহে। যথা,—

সং	ইক্ষু,	প্রা° উচ্ছু,	ম° উস,	হিন্দী উখ,	বা° আ'ক
সং	ঋক্ষ,	প্রা° রিচ্ছো,	মা° রীস,	হি° রীছ,	বা° ঋক্ষ (রিক্খ)

* হিন্দী ভাষায়।

সং	কুক্ষি,	প্রা° কুচ্ছী,	মা° কুস,	হি° কোখ,	বা° কোঁখ
সং	ক্ষেত্র,	প্রা° ছেত্ত,	মা° শেত,	হি° খেত,	বা° খেত
সং	ক্ষুর,	প্রা° ছুরী,	মা° স্থরী,	হি° ছুরী.	বা° ছুরী
সং	প্রচ্ছ,	প্রা° পুচ্ছ,	মা° পুসণে°,	হি° পুছনা,	বা° পুছা
সং	মৎস্য,	প্রা° মচ্ছ,	মা° মাসা,	হি° মাছ,	বা° মাছ
সং	মক্ষি,	প্রা° মচ্ছী,	মা° মাসী,	হি° মাছী,	বা° মাছী
সং	কচ্ছপ,	প্রা° কচ্ছব,	মা° কাসব,	হি° কশ্ছব.	বা° কাছিম
সং	ষণ্ণবতি,	প্রা° ছঅণবে,	মা° শহাণ্ণব,	হিং ছিয়ানব্বই,	বা° ছিয়ানব্বই
সং	ষট্সপ্ততি,	প্রা° ছহত্তর,	মা° শহাত্তর,	হিং ছিহাত্তর,	বা° ছিয়াত্তর
সং	ষড়শীতি,	প্রা° ছআসী,	মা° শায়শী,	হিং ছিয়াশী,	বা° ছিয়াশী
সং	ষট্চত্বারিংশৎ,	প্রা° ছআলিস,	মা° শেচাল্লীস,	হিং ছিয়ালিস,	বা° ছেচল্লিশ
সং	ষট্	প্রা° ছঅ,	মা° সাহা, সহা,	হিং ছয়,	বা° ছয়
সং	ষট্ষষ্টি,	প্রা° ছ'সঠ,	মা° সাসষ্ট.	হিং ছসট্,	বা° ছেষট্টি

বাং	ছিটা,	মা°	শিডা (প্রক্ষেপ)
বা°	ছিনার, ছেনাল,	মা°	শিনল., শিংদল. (ভ্রষ্টচরিত্র লোক)
বা°	ক্ষেপণ,	মা°	শিংপণে°
বা°	ছড়া,	মা°	সড়া (গোময়জল-প্রক্ষেপ)
বা°	ছাগল,	মা°	সাগল (ছাগচর্ম্ম)
বা°	ছাতু,	মা°	সাতু (শক্তু)
বা°	ছাঁদ (বন্ধন),	মা°	সাংধ
বা°	ছাল,	মা°	সাল (বৃক্ষত্বক্)
সং	ক্ষণ(উৎসব)	মা°	সন
স°	ছায়াবৎ,	মা°	সাবট (ছায়াযুক্ত স্থান)
	—	মা°	সাবলী (ছায়া)
বা°	ছুটী,	মা°	সুটী (বিদায়)
বা°	ছুট,	মা°	সুট (দায়মুক্তি release from bond)
বা°	ছোকরা,	মা°	সোকড়া (অল্পবয়স্ক যুবক)
বা°	ছুকরী,	মা°	সোকড়ী (অল্পবয়স্কা যুবতী)
বা°	ছোলা,	মা°	সোলণে° (ত্বক্মুক্ত করা)
হি°	ছোড়না,	মা°	সোডণে° (পরিত্যাগ করা)

অধ্যাপক বীম্‌স্ (John Beames) সিন্ধী ভাষায় গ., জ., ড, ও ব বর্ণের বিচিত্র উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন,—এরূপ উচ্চারণ অন্য ভাষায় নাই। অধ্যাপক ট্রাম্প (Trumph) বলেন যে, এই বর্ণচতুষ্টয়ের উচ্চারণে বিচিত্রতা কিছুই নাই। ইহাদের উচ্চারণ অতি সরল। ইহারা গ্‌গ, জ্জ, ড্ড ও ব্ব বর্ণের প্রতিনিধি বর্ণ। যুক্ত বর্ণ হইতে এই বর্ণ-চতুষ্টয়ের উৎপত্তির উদাহরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল ;—

গ্‌গ—সং উদ্‌গমন, হিং উগনা, মাং উগবুং, সিং উগবুং
সং উদ্‌গার, হিং উগাল, পাং উগাল্‌হ্‌না, সিং উগারণুং
সং অগ্নি, প্রাং অগ্‌গি, হিং আগ, সিং অগি, বাং আগুন
সং যজ্ঞ, হিং জাগ, পাং জগ্‌গ, বাং জাগ, সিং জগু.
সং যোগ্য, প্রাং জোগ্‌গ, হিং জোগ, সিং জোগু.
জ্জ—সং গর্জ্জন, প্রাং গজ্জণ, হিং গাজনা, সিং গজ.ণু
সং মার্জ্জন, প্রাং মজ্জণ, হিং মংজনা, সিং মাজ.ণু, বাং মাজা
সং অদ্য, প্রাং অজ্জ, হিং আজ, পাং অজ্জ, সিং অজু.
সং বিদ্যা, প্রাং বিজ্জা, সিং বিজ.া
সং বিদ্যুৎ, প্রাং বিজ্জু, পাং বিজ্জুমা, হিং পাং বাং বিজলী, সিং বিজু.
ড্ড—সং গর্দ্দভ, প্রাং গড্ডহ, হিং গধা, বাং গাধা, সিং গডহ
সং নিদ্রা, প্রাং ণেদ্দা, হিং নীদ, মাং নীদ, নীজ, সিং নিংড
ব্ব—সং চর্ব্বণ, প্রাং চব্বণ, হিং চাবনা, বাং চিবান, সিং চব.ণু
সং দুর্ব্বল, প্রাং দুব্বল, হিং দুবলা, সিং ডুবি.রো, ডবলো
সং কর্ব্বুর, হিং কাবর, কবরা, পাং কব্রা, সিং কুবি.রো
ইত্যাদি ইত্যাদি

এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া অধ্যাপক বীম্‌স্ বলিতেছেন যে, এই বর্ণচতুষ্টয় যে যুক্তবর্ণ-সমূহের বিকৃতি নহে, তাহারও যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা,—

সং	জগৎ	স্থানে	সিং	জগু.	বা জগ.টু
সং	জঙ্ঘা	স্থানে	সিং	জ.ংঘ	
সং	জতু	"	"	জ.উ	
সং	জম্বু	"	"	জ.মুং	
সং	জলৌকস্	"	"	জে.ার, জ.রু	
সং	জামাতৃ	"	"	জ.াটে.া	
সং	জাল	"	"	জ.ারু	
সং	জল	"	"	জরু	
সং	জিহ্বা	"	"	জি.ভ	ইত্যাদি

অধ্যাপক গ্রীয়ারসন অনুমান করেন যে, সিন্ধী ভাষার এই জ.-বর্ণের উচ্চারণ দন্ত্য তালব্য অর্থাৎ ইংরাজী z-বর্ণের উচ্চারণানুরূপ। বীম্‌স্‌ বলেন যে, তিনি গ্রন্থপাঠে সিন্ধী ভাষার সহিত পরিচিত; সুতরাং তিনি সে ভাষার উচ্চারণ বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন না।

কাশ্মীরী ভাষার উদাহরণ দিতে পারিলাম না। ভারতের প্রাচীন বর্ণমালা আলোচনা করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বিস্মিত হইয়াছেন। বর্ণমালার এরূপ বৈজ্ঞানিক আলোচনা অন্য কোনও আর্য্য-ভাষায় হয় নাই;* কিন্তু ইহা অতীব বিচিত্র যে, এরূপ বৈজ্ঞানিক বর্ণমালায়ও ইংরাজী Z-বর্ণের উচ্চারণানুরূপ উচ্চারণবিশিষ্ট কোনও ব্যঞ্জনের অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, আমাদের সংস্কৃতভাষী পূর্ব্বপুরুষগণের জিহ্বা ওরূপ বর্ণের উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিল না। অন্যান্য ভাষাতেও এই Z-বর্ণের উচ্চারণ বিভ্রাট উৎপাদন করিয়াছে। অধ্যাপক বীম্‌স্‌ বিস্মিত হইয়াছেন,—চ ও জ-বর্ণের সরল উচ্চারণ ইউরোপের বহু জাতির বিশেষ অসুবিধার কারণ হইয়াছে। জর্ম্মনীতে য-বর্ণের জন্য j-বর্ণের ব্যবহার হয় এবং ح (খ) বর্ণের জন্য ch ব্যবহার করা হয়। সুতরাং জ ও চ লইয়া বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। জ-বর্ণের জন্য সুপণ্ডিত জর্ম্মনবাসিগণ dsch লিখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং চ-বর্ণের জন্য tsch বিহিত হইয়াছে। সম্প্রতি k ও g দ্বারা সংক্ষিপ্ত ভাবে এই দুই বর্ণের উচ্চারণ উপলক্ষিত হয়। ফরাসী দেশে j বর্ণের উচ্চারণ অর্দ্ধ-z (ژ) বর্ণের ন্যায় হইয়াছে; সুতরাং জ-বর্ণের জন্য dj ব্যবহৃত হয় এবং chএর উচ্চারণ ش (শ) বর্ণের অনুরূপ হওয়ায় চ-বর্ণের জন্য tch লিখিত হয়। অন্যান্য জাতির মধ্যেও এইরূপ হইয়াছে।†

যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, ভারতের প্রাচীন বর্ণমালায় জ. (zژ) ও ঝ. (zhژ) বর্ণের অস্তিত্ব ছিল না। প্রধানতঃ এই কারণেই বররুচির ব্যাকরণে মাগধী ভাষায় চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের উচ্চারণ-স্পষ্টতার উল্লেখ পাইয়া পণ্ডিত গ্রীয়ারসন অনুমান করেন যে, মহারাষ্ট্র ও শূরসেন প্রদেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষায় চ-বর্গীয় বর্ণসমূহের অস্পষ্ট অর্থাৎ দন্ত্য উচ্চারণ হইত। কিন্তু তালব্য বর্ণের অস্পষ্ট উচ্চারণ বলিলে কি প্রকারে দন্ত্য উচ্চারণ বুঝাইতে পারে, তাহা আমাদের যুক্তিগোচর হইল না। অস্পষ্ট উচ্চারণ শব্দের অর্থ ক্ষীণ (faint, indistinct)

* (It) is arranged on a thoroughly scientific method, the simple vowels (short and long) coming first, then the dipthongs, and lastly the consonants in uniform groups according to the organs of speech with which they are pronounced. + + + +. We, Europeans, on the other hand, 2500 years later, and in a scientific age, still employ an alphabet which is not only inadequate to represent all the sounds of our lauguages, but even preserves the random order in which vowels and consonants are jumbled up as they were in the Gk. adaptation of the primitive Semitic arrangement of 3000 years age.

Macdonell's History of S. Literature P. 17

† Beames' Comparative Grammar Vol I. p. 70-71.

বা অর্দ্ধ উচ্চারণ বলা যাইতে পারে। (তাহা হইলে আমি আর যাইতেছি না), "তা হ'লে আমি আর যাচ্ছিনে", এই বাক্যটি তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিলে "তা'লা'ম্ আর যাচ্ছিনা" হয়। "তা হ'লে" পদের হ-বর্ণ ও এবর্ণ এবং "আমি"র ই-বর্ণ অস্পষ্ট উচ্চারিত হয় অর্থাৎ অর্দ্ধ উচ্চারিত হয়। এইরূপ ঘরে এলে (ঘরে'লে), নিয়ে এসে (নে এসে, নেসে), খা এসে (খেসে) প্রভৃতি বাক্যে যথাক্রমে একার, ইয়কার ও আকারের অস্পষ্ট উচ্চারণ বা অর্দ্ধ উচ্চারণ হয়। যশোহর, খুলনার প্রাদেশিক হইতে অস্পষ্ট বা অর্দ্ধ উচ্চারণের উদাহরণ উদ্ধৃত হইল।

মুমূর্ষু কন্যা-দর্শনে মাতার উক্তি :—

"এমন পোড়াকপাল ক'রেলাম! আহা হা! হারাণ যে মোর মউর-চড়া কাত্তিক। মুই হারাণের রূপ ভোলবো ক্যামন ক'রে! বাপো! বাপো! বড় বাবু মোরে বাগের মুখে থেকে ফিরে এনে দিয়ে'লো। আঁটকুড়ির ব্যাটা এমন কিলো মেরি'লি, বাছার পেট খ'সে গেল। তারপর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা হা! দোউত্র হ'য়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়ে'লো, আঙ্গুলগুলো পর্য্যন্ত হয়ে'লো। ন'মীর আং বুঝি পোয়া'লো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি? মোরে মা ব'লে ডাক্‌বে কেড়া? ই-কত্তি নিয়ে এই'লে"।

—দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ।

উদ্ধৃত অংশে "করে'লাম" (করিয়াছিলাম) পদে ছ-বর্ণের অস্পষ্ট বা অর্দ্ধ উচ্চারণবশতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী এ-বর্ণে যতি পড়িয়াছে। এ উচ্চারণ লিখিত অক্ষর দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। উক্ত পদে ছ-বর্ণ লুপ্ত হইয়াছে, এ কথা বলা যায় না, তবে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে বলিলে দোষ হয় না। এইরূপ "দিয়ে'লো" (দিয়াছিল), দোউত্র (দৌহিত্র), হয়ে'লো (হইয়াছিল), ন'মীর (নবমীর), পোয়া'ল (পোহাইল), ই (এই), এইলে (এসেছিলে) প্রভৃতি পদে বর্ণবিশেষের অস্পষ্ট উচ্চারণ বা অর্দ্ধলুপ্তির উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব বলা যাইতে পারে যে, উচ্চারণে অস্পষ্টতার আধিক্য হইলেই বর্ণলুপ্তি হয়।

এক্ষণে দ্রষ্টব্য এই যে, ব্যঞ্জন-লুপ্তি বা উচ্চারণের অস্পষ্টতাই প্রাকৃত ভাষার বিশেষত্ব। মহারাষ্ট্রী ভাষায় অনাদি অযুক্ত ক, গ, চ, জ, ত, দ, প, ব ও য-বর্ণের প্রায় লোপ হইত। যথা,—বচন স্থানে বঅণ; সূচী—সূঈ; গজ—গঅ; কাচ—কাঅ; ভুজ—ভুঅ; ইত্যাদি। শৌরসেনী ভাষায় ঘোষবর্ণগুলি (বিশেষতঃ দ ও ব) প্রায়শই সংরক্ষিত হইত। যথা,—প্রভবতি—পভবদি; স্মরতি—সুমরেদি; গতা—গদা; প্রিয়ম্বদা—পিয়ম্বদা; নৃপ—ণিব; কৃপা—কিবা; অপরঃ—অবরো ইত্যাদি এবং শৌরসেনী-প্রকৃতিকা মাগধী ভাষায় চবর্গীয় বর্ণের লোপ হইত না।

এক্ষণে মাগধী ভাষায় চ-বর্গবিষয়ক বররুচির সূত্রের পর্য্যালোচনা করা যাউক।

বররুচির সূত্র—চবর্গস্য স্পষ্টতা তথোচ্চারণঃ ॥ ১১। ৫ ॥

ভামহের টীকা ও উদাহরণ—চবর্গো যথা স্পষ্টস্তথোচ্চারণো ভবতি। পলিচএ। গহিদ-ছলে। বিয়লে। ণিঝলে ॥ পরিচয়ঃ। গৃহীতছলঃ। বিজলঃ। নির্ঝরঃ ॥

মহারাষ্ট্রী ভাষার নিয়মানুসারে "পরিচয়" শব্দের "চ" ও "বিজল" শব্দের জ-কারের লোপ হইত; কিন্তু মাগধী ভাষায় তাহা হইল না।

মহারাষ্ট্রী ভাষায় যে জ-বর্ণ ও চ-বর্ণের লোপ হইত, তাহা সাহিত্য হইতেও দেখা যায়। "সেতুবন্ধ" মহারাষ্ট্রীভাষায় লিখিত মহাকাব্য। এই মহাকাব্যের ভাষাই পুরাকালে প্রকৃষ্ট প্রাকৃত বলিয়া অভিহিত হইত।* বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য এই "সেতুবন্ধ"কাব্যের প্রথম আশ্বাসে যতগুলি অনাদি অযুক্ত জ ও চ-বর্ণযুক্ত পদ আছে, তাহা একত্র করিয়াছিলাম। জ-বর্ণসম্পৃক্ত ২২টি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম—এই ২২টিতেই জ-বর্ণের লোপ হইয়াছে। চ-বর্ণসম্পৃক্ত ১৭টি পদ পাইয়াছিলাম; সবগুলিতেই চ-বর্ণের লোপ হইয়াছে। সংস্কৃত "চ" অব্যয়টি ছয় বার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে পাঁচবার ইহা "অ"-রূপ ধারণ করিয়াছে আর মাত্র এক স্থানে সংস্কৃত রূপ সংরক্ষিত হইয়াছে। ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, সুপণ্ডিত গ্রীয়ার্‌সন কেবল ব্যাকরণের সূত্র দেখিয়াই ভাষাতত্ত্ববিষয়ক এই অভিনব সত্যের আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ, সাহিত্যের সাহায্য গ্রহণ করিলেই তাঁহার নিকট বররুচির স্পষ্ট সূত্র অস্পষ্ট হইত না এবং তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, বররুচির স্পষ্ট শব্দের অর্থ "distinct." এবং অস্পষ্ট শব্দের অর্থ "indistinct."

এখনও একটা সমস্যা আছে। মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের উদাহরণে চ-কার ও জ-কার পদের আদিস্থিত বর্ণ; কিন্তু মহারাষ্ট্রী ভাষায় পদাদি-বর্ণের লোপ হয় না। ইহার মীমাংসা জটিল নহে। ইংরাজী change শব্দের ch এবং match শব্দের tch এ যদি কোনও উচ্চারণ-পার্থক্য থাকে, তবে সাধারণ জ ও মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্রের য্‌জ বর্ণেও সেইরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে। কিন্তু মার্কণ্ডেয় কবীন্দ্র মাগধী ভাষায় য্‌জবর্ণের অস্তিত্ব দেখিয়াছেন বলিয়া মহারাষ্ট্রী ভাষায় জ-বর্ণের উচ্চারণ ইংরাজী z-বর্ণের অনুরূপ হইবে, এরূপ অনুমান আমরা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি না।

তবে ভারতের আধুনিক ভাষাসমূহে চ. ও জ. উচ্চারণ কি প্রকারে আসিল? অতি প্রাচীনকালের আর্য্য-সাহিত্যের দুইখানি গ্রন্থের ভাষা (ঋগ্বেদ ও আবেস্তা) পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন ভারতের ভাষায় জ. (z, j) ও ঝ. (zh, j) বর্ণের উচ্চারণ না থাকিলেও জেন্দ আবেস্তা গ্রন্থের ভাষায় এই জ.-বর্ণের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। কতিপয় উদাহরণ নিম্নে সংগৃহীত হইল।

* মহারাষ্ট্রাশ্রয়াং ভাষাং প্রকৃষ্টং প্রাকৃতং বিদুঃ।
সাগরঃ সূক্তিরত্নানাং সেতুবন্ধাদি যন্ময়ম্‌ ॥—দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ।

সংস্কৃত—	জে.ন্দ—
জামাতরম্	জ.ামাত্রেম্
জঙ্ঘা	জ.ংগ
জানু	জ.ানু
তেজঃ	তএঝ.ঃ
জন	জ.ন
জন্তু	জ.ন্তু
অজাত	অজ.াত
প্রতিজ্ঞা (ধাতু)	পইতিজ.ন্ (ধাতু)
জ্ঞাত	জ.্নাত
জোষ	জ.ওশ (ইচ্ছা)
যজতে	যজ.ইতে
অজতি	অজ.ইতে
ঋজু	এরেজু.
রজিষ্ঠ	রজি.শ্ত
রজত	এরেজ.ত
ইত্যাদি	ইত্যাদি।

৩ ছ.-বর্ণের উচ্চারণও জে.ন্দ ভাষায় অবিরল। যথা—

সংস্কৃত—	জে.ন্দ—
পৃচ্ছতি	পেরেচ.ইতি
গচ্ছতি	জচ.ইতি
অচ্ছায়	অচ.য় (ছায়াবিহীন
	ইত্যাদি।

সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই পারস্য দেশের ভাষায় যে চ. ও জ.-বর্ণের উচ্চারণ সমুদ্ভূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। অধিকন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, পারস্য ভাষায় জ. উচ্চারণ লক্ষিত করিবার জন্য চারিটি (ذ-ز-ض-ظ) ও চ. উচ্চারণ লক্ষিত করিবার জন্য তিনটি (ث-س-ص) বর্ণের উদ্ভাবন হইয়াছে। এই উচ্চারণ ভারতীয় আধুনিক ভাষাসমূহে সংক্রামিত হইয়াছে বলিলে কি অযৌক্তিক হইবে?

আমাদের বিশ্বাস, মুসলমানদিগের প্রাদুর্ভাব-সময়ে যেমন ভারতে উর্দ্দু নামক মিশ্র-ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে, সেইরূপ ভারতীয় বর্ণমালাও পারস্য ভাষার বর্ণমালার প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। সিন্ধু ও কাশ্মীরদেশে মুসলমানদিগের সংখ্যাবাহুল্য বলিয়া, তত্তৎপ্রদেশে এই

দন্ত্য তালব্য বর্ণসমূহের সমধিক প্রাদুর্ভাব। বর্ত্তমান মারাঠী ভাষায় দন্ত্য তালব্য বর্ণের উৎপত্তির কারণও অভিন্ন। বঙ্গদেশের পূর্ব্বভাগে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাবাহুল্য হেতু সে স্থানে চ. ও জ.-বর্ণের উচ্চারণের এত প্রভাব; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় এই দুই বর্ণ অপরিচিত।

অতঃপর বঙ্গভাষার অভিধান হইতে কতকগুলি আরবী ও পার্সী শব্দ সংগৃহীত হইল। এই শব্দগুলিতে ছ. ও জ.-বর্ণের উচ্চারণ ছিল। বঙ্গভাষায় ঐ উচ্চারণ বিকৃত হইয়াছে।

আরবী	ওছি.	বাঙ্গালা	অছি	(কর্ম্মাধ্যক্ষ)
আ°	ওসিলা	বা°	অছিলা	(ওজর, ব্যপদেশ)
আ°	আরজ.ী	বা°	আরজী	(আবেদন)
আ°	এজ.াহার	বা°	এজাহার	(সাক্ষ্য, Deposition)
আ°	ওজ.র	বা°	ওজর	(আপত্তি)
আ°	কাজ.ী	বা°	কাজি	(বিচারক)
পা°	খাজ.ান্‌চি	বা°	খাজাঞ্চি	(কোষাধ্যক্ষ)
আ°	খাজ.ানা	বা°	খাজনা	(রাজস্ব)
আ°	হাজে.র	বা°	হাজির	(উপস্থিত)
আ°	ছ.ানি	বা°	ছানি	(পুনর্ব্বিচার)
আ°	জে.ম্মা	বা°	জিম্মা	(দায়, দায়িত্ব, Custody)
আ°	জু.লুম্	বা°	জুলুম্	(অত্যাচার)
পা°	জে.রবার	বা°	জেরবার	(ধ্বংস)
আ°	তৌজি.	বা°	তৌজি	(রাজস্ব-তালিকা)
আ°	নজ.র	বা°	নজর	(দৃষ্টি, উপহার)
আ°	নজ.ীর	বা°	নজীর	(পূর্ব্বদৃষ্টান্ত)
আ°	নাজে.ম	বা°	নাজিম	(বিচারক)
পা°	বাজ.ার	বা°	বাজার	(হাট)
পা°	জ.খম	বা°	জখম	(অঙ্গক্ষতি)
পা°	জ.বর	বা°	জবর	(উত্তম)
পা°	জ.বানী	বা°	জবানী	(বাচনিক)
পা°	জ.ানানা	বা°	জানানা	(স্ত্রীলোক, অন্দর)
আ°	জ.ামেন	বা°	জামিন	(প্রতিভূ)
আ°	জ.াহের	বা°	জাহির	(প্রচার)
পা°	জ.ন্‌জির	বা°	জিঞ্জীর	(শিকল)
পা°	জি.ন্দগী	বা°	জিন্দগি	(প্রাণ)

পা°	রোজ.	বা°	রোজ	(দিন)
আ°	লফ্জ.	বা°	লব্জ	(কথা, শব্দ, মর্ম্মার্থ)
আ°	হোজু.র	বা°	হুজুর	(ধর্ম্মাবতার)

বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় এই সকল শব্দে জ. ও ছ.-বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে জ-বর্ণের মৌলিক উচ্চারণ তালব্য হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের ভাষায় তাহা দন্ত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এজমাল	(যৌথ সম্পত্তি)
এজারা, ইজারা	(অধিকার-পত্র)
ওয়াজেব, জিব	(যথার্থ, ন্যায্য)
জোমুল, জুমুল	(যোগফল, Total)
তেজারত	(ঋণদান-ব্যবসায়)
ফৌজ	(সৈন্য)
মৌজুদ, মজুত	(জমা, সঞ্চিত, সংগৃহীত)
জওয়াব, জবাব	(উত্তর)
জনাব	(প্রভু)
জরিমানা	(অর্থদণ্ড)
রুজু	(দাখিল, file)
রেওয়াজ	(প্রচলন)

পারস্য ভাষার ذ (জ.াল্) বর্ণের উচ্চারণ একটু বিচিত্র। কেহ কেহ বলেন, ইহার উচ্চারণ জ. (z) বর্ণের ন্যায়; আবার কেহ কেহ বলেন, ইহার প্রকৃত উচ্চারণ দ-বর্ণের ন্যায়। সম্ভবতঃ ইহার উচ্চারণ দ ও জ.-বর্ণের মধ্যস্থ। ফলে নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে বঙ্গভাষায় জ ও মারাঠী ভাষায় দ-বর্ণের দ্বারা এই ذ (জ.াল্) বর্ণের উচ্চারণ উপলক্ষিত হইয়াছে।

মূল শব্দ	বাঙ্গালা শব্দ	মারাঠী শব্দ
کاغذ	কাগজ	কাগদ
گذران	গুজরান	গুদরণেং
گذشته	গুজস্তা	গুদস্তা
[illegible]	জিম্মা	দিম্মত

অতঃপর আর একটি উদাহরণদ্বারা বঙ্গভাষায় মুসলমানী ভাষার প্রভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রবন্ধের উপসংহার করিব। মুসলমানী ভাষার প্রভাবে বঙ্গভাষার যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, "বিবি জোবেদা খাতুন" নামক গ্রন্থ হইতে তাহার আদর্শ সংগৃহীত হইল।—

বিবি জোবেদা ছওদাগরিতে জাইয়া অয়রান
দিপে[১] পৌছিবার বয়ান[২]।*

ত্রিপদী ছন্দ।

বুঝাইয়া ছুই বুনে থাকি খোসালিত মনে[৩]
তাথে আর কিছু না কহিল।
গুজরিল এক সাল হিসাব করিনু মাল
তাথে এত্তা মোনাফা মিলিল॥
এরাদা[৪] করিনু তবে জাহাজ চালাব এবে
ছওদাগরি করিব তাহাতে।
মাল আছবাব লিয়া মুল্লুকে মুল্লুকে গিয়া
বানিজ্য করিব ভাল মতে॥
এহা ভেবে পরিনাম ছওদাগরি ছরঞ্জাম
জত মাল মৌজুদ[৫] করিয়া।
ছাড়িয়া বোগদাদ জমি রওানা হইনু আমি
ছু বুনে হামরাও লইয়া[৬]॥
গিয়া আবু সহরেতে খরিদ করিনু তাতে
নয়া এক জাহাজ মানওার[৭]।
লইয়া আল্লার নাম ছওদাগরি-ছরঞ্জাম[৮]
ওঠাইনু উপরে তাহার॥
লঙ্গর তুলিয়া লিনু জাহাজ খুলিয়া দিনু
সুবাতাস পেয়ে দরিয়ায়।[৯]
থোরা দিন সেথা হৈতে পারেসের[১০] মহানাতে
পৌছে গিয়া ফজলে খোদার।[১১]
নজর করিয়া তাকি বড়া এক দিপ দেখি
ছিল তার মহানা কেনারে।
উঠিনু জাহাজ হৈতে দেখি তার উপরেতে
সহর পাইনু দেখিবারে॥

* কলিকাতা মেছুয়াবাজার ১২ নং হইতে ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "বিবি জোবেদা খাতুন" গ্রন্থ—৯৩ পৃঃ।

(১) দ্বীপে। (২) বর্ণনা। (৩) হৃষ্টচিত্তে। (৪) সঙ্কল্প। (৫) সংগ্রহ। (৬) লোকজন লইয়া, বহু অনুচরবর্গের সহিত। (৭) উজ্জ্বল, সুদৃশ্য, চমকদার আসল; অর্থ সম্ভবতঃ man-of-war যথা মানোয়ারী গোরা, জাহাজী পল্টন, নৌসেনা। (৮) পণ্যদ্রব্য। (৯) সমুদ্রে। (১০) পারস্যের। (১১) ভগবদনুগ্রহে।

সেই সহরের আর বয়ান না হয় তার
রাস্তা ঘাট[১] আলিসান[২] ঘর।
মাকুল[৩] সহর দেখি মনে বড়া হৈনু খুখি
কেনারায় করিয়া লঙ্গর ॥
সহর দেখিব বোলে খাহেস[৪] করিয়া দেলে
তৈয়ার হৈনু আপনায়।
মেরা দু বহিন তাহে পহেলা হইতে দোহে
তৈয়ার হৈয়াছিল তায় ॥
আমি এক ডিঙ্গিপরে ছেড়ে দুই বহিনেরে
একেলা চড়িয়া তাতে জাই।
সেতাবি[৫] কেনারা পাইনু ডেঙ্গি হৈতে উতরিনু
খুস্কি পরে[৬] চলিনু এয়ছাই[৭] ॥
থোড়া দুর পায়ে পায়ে সহরে পৌছিনু গিয়ে
গেনু দরওাজার নজদিগেতে[৮]।
তফাত হইতে তাকি[৯] বাদসার মহল দেখি
বড়া দরওাজা তাহাতে ॥
সেই দরওাজার পরে লাঠি সোটা হাতে কোরে
খাড়া আছে ছেপাহি তামাম।[১০]
কেহবা বসিয়া ঠায় কেহ খাড়া আছে তায়
তার বিচে আছে খাছ আম ॥[১১]
এয়ছাই ওজুদ[১২] তার দেখে লাগে ভয়ঙ্কার
দেখিয়া আমায় হৈল ডর।
হেলা দোলা নাহি করে নাহি চলে নাহি ফেরে
কথা নাই জোবান[১৩] উপর ॥
পলক না মারে আর এ হাল দেখিয়া তার
আগে বাড়ি করিয়া হেম্মত।[১৪]
নজ দিগে পৌছিনু জবে তাকাইয়া দেখি সবে
খাড়া আছে পাথর মুরত ॥

(১) রাস্তাঘাট। (২) বিভবশালী। (৩) মনোহর। (৪) আকাঙ্ক্ষা। (৫) সেখানেও। (৬) স্থলে। (৭) এমনিই। (৮) নিকটে। (৯) দৃষ্টিপাত করি। (১০) বহু সিপাহি। (১১) সেই সেপাহীগণের মধ্যে কেহ খাসমহলে চাকুরী করে, কেহ আমমহলে চাকরী করে। (১২) ওজুদ—বীরত্ব ও ভীতিব্যঞ্জক আকৃতি। (১৩) বাগিন্দ্রিয়। (১৪) সাহস।

বাজার দোকান জত　　　　বন্দ করা আছে কত
　　তাথে কেহ না আছে দোকানী।
কোন ঘর বিচে তার　　　　ধুঙা না নেকলে আর
　　আবাদির না দেখি নেসানি॥[১]
দেখে এহা নজরেতে　　　　মালুম[২] করিনু তাতে
　　তজবিজ[৩] করিল দেল বিচে।
বুঝি লোগ জন সব　　　　নাহি করে কলরব
　　ঘরের ভিতরে সবে আছে॥
বাহিরের লোগ জারা　　　　পাথর হৈয়াছে তারা
　　দেলে আমি বুঝিনু এয়ছাই।
সহরের নজদিগেতে　　　　মাকুল ফটক তাতে
　　আলিসান দেখিবারে পাই॥
সেই দরওাজায় ভাল　　　　পর্দ্দা এক পোড়ে ছিল
　　রেসমের কারচুবি[৪] তাহাতে।
ডর ভয় ছেড়ে দিয়া　　　　সেই পর্দ্দা ওঠাইয়া
　　জাইয়া পৌছিনু ভিতরেতে॥
আন্দরে পৌছিনু জবে　　　　দেখিতে পাইনু তবে
　　খাড়া আছে কতেক চোবদার।[৫]
কেহ বৈসে আছে তায়　　　　কেহ খাড়া আছে ঠায়
　　আছে সব কাতারে কাতার॥[৬]
তার বিচে এক বিবি　　　　আপ্তাপ[৭] সমান ছবি
　　রহিয়াছে পাথর হইয়া।
বাদসার বেগম বোলে　　　　পছন্দ করিনু দেলে
　　জানা গেল করতুব[৮] দেখিয়া॥
মাণিক জড়াউ তাজ　　　　আছে তার ছের মাঝ[৯]
　　গলায় মোতির মালা আর।
সে মোতি এয়ছাই মোতি　　　　আপ্তাব সমান জুতি
　　ছিল এয়ছা মোতি আবদার॥
জেওরাত[১০] ভাঁতি ভাঁতি　　　　জওহেরাত[১১] নানা জাতি
　　লাল হিরা মাণিক রতন।

(১) চিহ্ন, লক্ষণ। (২) জ্ঞান। (৩) বিবেচনা, বিচার। (৪) নকসা, বিচিত্র চিত্র। (৫) প্রহরী। (৬) সারি সারি। (৭) সূর্য্য। (৮) বেশ-বৈচিত্র্য। (৯) মস্তকোপরি। (১০) অলঙ্কার। (১১) মণিমাণিক্যাদি।

জমররূদ[১] আর কত রাসি রাসি শত শত
জবরজদ[২] রজত কাঞ্চন ॥
এক তক্ত তার বিছে বিছাইয়া রাখিয়াছে
ছিল তাহা খালেছ[৩] সোনার।
সে তক্ত জমিন হৈতে আছিল জে দারাজিতে[৪]
ছিল বড়া বোলন্দি[৫] তাহার ॥
সেই জে তক্তের পরে দেখি আমি নেযা[৬] করে
ছিল এক রওসনি[৭] এয়ছাই।
কিসের রওসনি এহা মালুম করিতে তাহা
থোড়া তুর আগে বেড়ে জাই ॥
দেখি আমি তাকাইয়া তক্তের উপর দিয়া
ছিল এক তেপায়া সোনার।
সেই তেপায়ার বিচে আল্‌মাছ[৮] তাহাতে আছে
আলো হয়ে রওসনিতে তার ॥

* * * * *

ফজর[৯] হইলে কালি জাহাজে জাইব চলি
দেরি না করিব কোন মতে।
রাহাঘাট পাছানিয়া[১০] জাহাজে পৌছিনু গিয়া
এহা বলে ফরাস[১১] পরেতে ॥
দেলে না করিয়া গমি[১২] শুইয়া রহিনু আমি
আখে মেরা নিন্দ[১৩] না আইল।
ছিল ঘর বেগানার[১৪] একেলা থাকায় আর
আধা রাত গুজরিয়া[১৫] গেল ॥
হীন কবিকার কয় নেক রাহে[১৬] জেবা রয়
তার ভাল হয় কালে কালে।
তার দিগে জায় মন চাহে তাহে নিরাঞ্জন
তারে আল্লা রাখে পা'নাতলে ॥[১৭]

বারান্তরে বঙ্গভাষায় মুসলমানী ভাষার প্রভাব বিষয়ে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

(১) মূল্যবান্ প্রস্তরবিশেষ। (২) মূল্যবান্ প্রস্তরবিশেষ। (৩) খাঁটি। (৪) দৈর্ঘ্যে। (৫) উচ্চতা। (৬) দৃষ্টিপাত। (৭) আলোক। (৮) হীরক। (৯) প্রাতঃকাল। (১০) চিনিয়া। (১১) শয্যা। (১২) চিন্তা। (১৩) নিদ্রা। (১৪) অপরিচিত লোকের। (১৫) কাটিয়া। (১৬) সুপথে! (১৭) জুতার তলে, চরণাশ্রয়ে।

বাণীকণ্ঠের "মোহমোচন" নামক প্রাচীন গ্রন্থ

আমি গ্রন্থখানির যে প্রতিলিপি পাইয়াছি, তাহা সামান্য দিন পূর্ব্বের লিপি, তবে এখানি যে একখানি অধিকতর পুরাতন লিপির প্রতিলিপি, তাহার প্রমাণ লেখকের লিখিত "যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং" প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈগুণ্যসমাধান শ্লোকদ্বারা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। গ্রন্থখানি ফুলস্ক্যাপ আকারের কাগজের লম্বালম্বী সিকি পাতার উভয় পৃষ্ঠায় লেখা ১৯ পাতা মাত্র। কাগজ কিন্তু বাঙ্গালা কাগজ, হরিতাল-মণ্ডিত। অবস্থা ভাল। প্রতিলিপির সময় ১২৩১ সাল। লিপিকারকের নাম—ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার নিবাস ও পুথিখানির আবিষ্কারস্থান বিক্‌না গ্রাম হইতে দেড় ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ভূতেশ্বর গ্রাম। এই ভূতেশ্বর গ্রাম একসময় ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রাম ছিল। বিষ্ণুপুররাজের বহু সেনা ও সেনাপতিরা এই গ্রামে অবস্থিতি করিতেন। গ্রামখানির একদিকে গন্ধেশ্বরী নদী ও অন্য দিকে দারুকেশ্বর নদ থাকায় সেনানিবাসের উপযোগী ছিল। (এই গ্রামেরই নিকটে ঐ দুই নদ-নদীর মিলন হওয়ায় গ্রামটি বেশ স্বভাবতঃ সুরক্ষিত।)

পুথিখানির শেষ ভণিতা এইরূপ,—

"বাণীকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ কর সর্ব্বজন।
সমাপ্ত হইল গ্রন্থ এ মোহমোচন॥
ইতি শ্রীনারদসংবাদে গ্রন্থ সমাপ্ত।"

কবি বাণীকণ্ঠ স্বীয় কাব্যের নাম কেবল যে এইখানেই মোহমোচন বলিয়াছেন, তাহা নহে, প্রতি অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের শেষে ঐ নাম দেখা যায়। নারদ সম্বন্ধে গ্রন্থসমাপ্তির কথা পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম, এখানি বুঝি, নারদপঞ্চরাত্রি নামক গ্রন্থের আর একখানি অনুবাদ; কিন্তু তাহা নহে। নারদপঞ্চরাত্রের অনুবাদ যাহা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নামই নারদ-সংবাদ এবং তাহার কবির নাম কৃষ্ণদাস। ইহা সেকালে কলিকাতার বটতলায় মুদ্রিতও হইয়া গিয়াছে এবং এখনও তাহার অশুদ্ধ সংস্করণ মুদ্রিত লিপি পাওয়া যায়।

মোহমোচনের আরম্ভ এইরূপ,—(মূল পুথির শুদ্ধাশুদ্ধ বানান অবিকল রাখিলাম।)

"৺৭শ্রীশ্রীরাম॥ অথ মোহমোচন লিক্ষতে।
নারাঅনং নমসকীত্রং নরচৈব নরত্রমং দেবিং
সরেস্বতিং চৈব ততোজএৎ মুদিরএং॥
প্রথমেতে আদিসর্গে কোহিল যে সব।
তাহাতে বুঝিবে সব কোরি অনুভব॥
দিতিএতে মর্দ্ধসর্গে জে সকল কথা।
ক্রমে নারদে হইল জে সব বেবস্তা॥

তিতিএতে সুন সভে সেস সগর্গ পুথি।
জাহার স্রবনে হয় নারাঅনে মতি ॥
এমোহমোচন সুন সুর্দ্ধি হব মন।
অবস্ত সে জনে কৃপা করে নারাঅণ ॥
এ মোহমোচন সুনী জার নাই ডর।
তাহার পাসান হিআ বড়ই বর্ব্বর ॥
অল্পকালে পাপি সব ফিরে রাত্রিদিণে।
সঙ্গে ২ ফিরে কাল ইহা নাই জানে ॥
বৎসরেতে তিনকাল অবসেস জজ্ঞান (?)।
সিতকাল গ্রিস্রকাল আর বরসাকাল ॥
দিবসেতে তিনকাল জান সভে ভালে।
স্বকাল মর্দ্ধান্নকাল আর সন্ধাকালে ॥
ঘরমর্দ্ধে তিনকাল জান সত্ত করি।
শ্রীকাল (স্ত্রীকাল) পুত্রকাল জ্ঞাতিকাল ধরি ॥
দেহমদ্ধে তিনকাল কালেতে পুর্ণতা।
কালেতে পুর্ণতা সব তার মর্দ্ধে বাঁসা (বাঁধা) ॥
ইহা জানি সর্ব্বজন ভজ নারাঅন।
কাটিবে সকল কাল জিনিবে সমন ॥
আপুনি অবুঝা আমি বুঝাইব কারে।
ইহা শুনি ক্রোধ কেহ না কোরিহ মোরে ॥
অধমের আসির্ব্বাদ কর সর্ব্বজন।
ভৃতভাবে ভাবি জেন রামের চরন ॥
বিনাসঙ্গ নাই হঅ ইশ্বর ভজনা।
সুনে বা সুনাঅ গুন নাহি * * * ॥
এইত কহিল আমি ভজন উপায়।
বাণিকণ্ঠ বলে মোর ব্রেথা জন্ম জায় ॥"

কবি বাণীকণ্ঠ এইরূপে স্বীয় কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে হইতে আমরা বুঝিলাম, কাব্যখানি তিন সর্গে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্বর্গে যমনারদ-সংবাদে যে সব "বেবস্থা"র কথা কহিয়াছেন, তাহা হইতেই গ্রন্থের শেষ ভণিতায় উল্লিখিত নারদসংবাদে গ্রন্থসমাপ্তি কথিত হইয়াছে। কবি বাণীকণ্ঠ হনুমান্‌পন্থী ভক্ত ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন,—

"ভৃত্যভাবে ভাবি যেন রামের চরণ ॥"

উদ্ধৃত অংশের মধ্যে ভাষা ও বানানগত বিশেষত্বগুলি প্রবন্ধশেষে বর্ণনা করিব।

অতঃপর গ্রন্থের কথারম্ভ এইরূপে সূচিত হইয়াছে,—

"একদিন সভাতে বসিএ পুরন্দর।
চারি দিকে দেবগণ আছে থরে থর ॥
গন্ধর্ব্বে করএ গান নাচে বিদ্যাধরি।
নানা জন্ত্র বাজাএ গাঅ কির্ন্নর কির্ন্নরি ॥
নিত্য গীত কৌতুক হএছে কত ধ্বনি।
বসিএ কৌতুক ইন্দ্র দেখিছে আপুনি ॥
চিন্তাযুক্ত হইআছেন সর্ব্বজন।
হেনকালে নারদ আসি দিলা দরসন ॥
নারদ দেখিএ ইন্দ্র আনন্দ অপার।
বোসিতে আসন দিএ কৈল নমস্কার ॥
নিত্য গীত বাদ্যে ইন্দ্র রাখি হাতঠারে।
কহ কহ বোলি জিজ্ঞাসিল নারদেরে ॥
হাসিতে ২ মুনি কহেন ইন্দ্রেরে।
তব দরসন হেতু আইলাম হেথারে ॥
ইন্দ্র বলে আজি সুবদিন ধন্য মার্নি।
অতএব কৃপা করি আইলা গুনমনি ॥
খিরোদেতে ছিলে কি ব্রহ্মার সদনে।
পাতালে গেছিলে কি বাসুকি সম্ভাসনে ॥"

নারদ এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, না বাপু! ক্ষীরোদে, ব্রহ্মলোকে বা পাতালে যাই নাই। তুমি সেদিন 'দেআনে' (দরবারে) বসিয়া যমের বড় প্রশংসা করিয়াছিলে, তাই শুনিয়া যমলোকে গিয়াছিলাম। যম আমায় দেখিয়া চরণে লোটাইয়া পাদ্যার্ঘ দিয়া আপনার জন্ম সার্থক মানিয়া আমার বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিল। তাহার পর তাহার আদেশে বীণায় হরিনাম গান করিলাম। একাসনে দুই জনের দিবারাত্রি কাটিয়া গেল। যম আতিথ্য করিল; তাহার পর যমপুরী দেখাইতে লইয়া গেল। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর দিকে পুরীর শোভা যাহা দেখিলাম, তাহা ইন্দ্র, তোমার অমরাবতী তাহার তুল্য নহে। অবশেষে যমপুরীর দক্ষিণ দ্বারে গেলাম। সেখানে যমের কেবল অতিমাত্র নিষ্ঠুরতার ভূরি ভূরি নিদর্শন দেখিলাম। তোমার যেমন বুদ্ধি, তাই যমের প্রশংসা করিয়াছিলে। যাহার শরীরে দয়া নাই, তাহার আবার প্রশংসা কি? ইন্দ্র বলিলেন, মুনি! সে কি কথা! তুমি ত শুনিয়াছ, নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন, তিনি নিজেই যমদেহে অবস্থান করেন। মুনি বলেন, প্রভু যে কি গুণে তাহার দেহে থাকেন, তাহা একবার তাঁহার নিজ মুখে

শুনিতে হইবে। ইন্দ্রও হাসিয়া সঙ্গী হইলেন এবং উভয়ে ক্ষীরোদে গেলেন। সেখানে অনন্তশয্যায় রমাপতি শয়ান আছেন, কবি বাণীকণ্ঠ এইখানে আমাদের কিছু নূতন কথা শুনাইলেন। তিনি বলিতেছেন,—

"জেখানে অনন্ত সর্য্যায় দেব গদাধর।
দ্বারে উচ্চৈঃস্বরে গান করে মুনিবর॥
নারদের সব্দ প্রভু জানিআ সাদরে।
আইস আইস মহামুনি ডাকেন গদাধরে॥
প্রভুর বচনে ডাকে জত পারিসদ।
ধীরে ২ সম্মুখেতে চলিলা নারদ॥
ভুমে বিনা ফেলি মুনি হইলা দণ্ডবত।
সহস্র প্রণাম করে দেখি রমানাথ॥"

আমরা কবির কৃপায় দেখিতেছি, অনন্ত ক্ষীরোদসাগরের চারিদিকে প্রাচীর ঘেরা এবং তাহা একটি দ্বারদ্বারা আবদ্ধ। নারদ ও ইন্দ্র সেই দরজায় আসিয়া হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিলেন, উচ্চৈঃস্বরে ভজন গাহিতে লাগিলেন। নারায়ণ তখন পারিষদ পাঠাইয়া দিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। নারদ সেই অগাধ অনন্ত জলরাশির উপর ভাসমান অনন্তশয্যার ধারে কবি বাণীকণ্ঠের কৃপায় একটু ভূমি পাইলেন, বীণাটি তাহার উপর রাখিয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিলেন (এই বর্ণনায় যদি আমরা মনে করি যে, কবি বাণীকণ্ঠ সে কালে মানস-নয়নে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রহ্লাদচরিত্র অভিনয়ে প্রস্তাবনার দৃশ্যে অনন্তশয্যা দর্শন করিয়াছিলেন এবং ষ্টেজের গেটউইঙ্গস্ আচ্ছাদিত দৃশ্যমুখ হইতে ক্ষীরোদের দ্বার এবং কার্পেট-বিভূষিত ষ্টেজের প্লাটফর্ম্ম হইতে অনন্ত-শয্যার ধারে একটু ভূমির কল্পনা করিয়া থাকিবেন, তাহা হইলে বোধ হয়, বর্ণনাটার সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে।) আসল কথা, কবি কখনও সাগরের দৃশ্য বা তাহার বেলাভূমি চর্ম্মচক্ষে দর্শন করেন নাই, অনন্তশয্যার স্থানকেও তিনি বৈকুণ্ঠপুরীর মত কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।

তাহার পর নারদকে সম্ভাষণ করিয়া নারায়ণ বীণা বাজাইতে বলিলেন। নারদ বসিয়া (ভাগ্যে ভূমিটুকু পাইয়াছিলেন!) বীণা বাজাইতে লাগিলেন। বীণা বেসুরা বাজিতে লাগিল,—

"কান্দে (কান্ধে) বিণা করি মুনি জত টানে গুণা।
এক রাগ বাজাইতে আর বাজে বিনা॥

কাজেই নারায়ণ এই অন্যমনস্কতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন নারদ স্বীয় প্রশ্ন জানাইলেন। শেষে বলিলেন,—

"দেখিআ আইলুঁ জত লোকের ক্রন্দন।
সে সব পড়য়ে মনে উড়য়ে জীবন ॥
দেখিআ জিবের দুঃখ তাই পড়ে মনে।
তে কারণে চিত্র না প্রকাসে বিনা গানে ॥
আপনার নিবেদন জানাব চরণে।
জমের জাতনা দেখি ভাবে রাত্রি দিনে ॥
এত জদি কহিলা নারদ মহামুনি।
হাসিয়া উত্তর তবে দিলা চক্রপানি ॥
নারদ কৃষ্ণেতে কথা উত্তম কাহিনি।
বিরচিল বাণিকণ্ঠ সেবি চক্রপাণি ॥"

এখানে "যমের যাতনা" কথাটিতে কবির বেশ শব্দযোজন-কৌশল দেখা যায়। যমের যাতনা অর্থে এখানে 'যমদত্ত জীবের যাতনা' এবং 'জীবকে দণ্ড দিয়া যমভুক্ত যাতনা' উভয় অর্থই বেশ সুসঙ্গত হয়।

ইহার পরের পরিচ্ছেদে নারদ-নারায়ণ-সংবাদে মনুষ্যের প্রকৃতি-বিচারের কথা হইতে লাগিল। নারায়ণ উপসংহারে বলিলেন,—

"জতক্ষণ ভোগাভোগ আপন সাধন।
সাধনে অবস্য সির্দ্ধি জানহ কারণ ॥
না জানিঞা সর্ব্বজন মিছা কার্য্যে ফিরে।
জানিঞা না জানে জদি কি বলিব তারে ॥"

তখন নারদ সূত্র পাইয়া ধরিয়া বসিলেন; বলিলেন,—

"নারদ বলেন প্রভু ক আছ আপনে।
তুমি বল লোকে কেহো জানিঞা না জানে ॥
লোক কি জানে প্রভু তোমার কত দআ।
জানিআ না জানে জদি সে তুমার মায়া ॥"

নারায়ণ নারদের প্রথম আরজির খেলাপ হইল দেখিয়া বলিলেন,—

"প্রথমে কহিলে কথা জমে করি রোস।
জমেরে ছাড়িয়া মোরে লইবে সেই দোষ ॥"

তারপর নারায়ণ যে জীব জন্মাইবার আগে মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়া তাহার রক্ষার ব্যবস্থা করেন, সে জীবকে তিনি কখন ছাড়েন না। যদি ছাড়েন, তবে নবজাত জীব স্তনে মুখ দেয় না, তখন মানুষে নারায়ণকে স্মরণ না করিয়া—

"তাহা দেখি কাতর হয় সর্ব্বপ্রাণি।
আনায় ঔষধ কেহো ডাকয়ে বেতনি ॥

মনুষ্য ডাকিআ আনে করিআ যতন।
কখন না বলে রক্ষা কর নারায়ণ॥
চণ্ডিকে উচ্ছব মানে সষ্টিকে ছাগল।
আমারে না মানে সব মনুষ্য পাগল॥
আপনার গুণে রক্ষা করি আমি তায়।
আমি রক্ষা করি মাত্র অন্যে পূজা খায়॥"

এই বলিয়া নারায়ণ আপনার এত কালের অভিমান ও আক্রোশের কথা জানাইয়া দিলেন, কিন্তু তিনি একটু একটু বুদ্ধিও ধরিতেন, তাই বুঝিলেন, এ কথাগুলা ফুটিয়া না বলাই ভাল ছিল, কারণ, ইহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতেছে, অতএব ইহা সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিলেন,—

"তবেত সকল লোক সেই দেবে পুজে।
একক দেবতা রাখি আছে এক কাজে॥
সে দেবেতে পূজা খায় বিড়ম্বনা করি।
জতেক দেবতা দেখ মোর আজ্ঞাকারি॥
দেবতা পাইলে পূজা মোর প্রিত মনে।
রাখিতে মারিতে কেহো নাঞি আমা বিনে॥"

তাহার পর "শিশু যৌবনে পড়িয়া স্ত্রীসেবায়, প্রৌঢ়ে পরিজন-পোষণে, অর্থচিন্তায় এবং বার্দ্ধক্যে বিষয়-চিন্তায় আমায় ভুলিয়া যায়", এই সূত্র ধরিয়া জীবের ইচ্ছায় স্বাধীনতা, কর্ম্ম-স্বাধীনতা দেখাইয়া নারায়ণ নারদকে প্রবোধ দিলেন। তারপর তাঁহার মনুষ্যের ভক্তিতে, সেবায় বিশেষ প্রীতি আছে, তাহাও জানাইয়া দিলেন। এবং এই সকল মোহান্ধ কর্ম্মান্ধ জীবের প্রতি যমদণ্ড ব্যবস্থা না করিয়া আর কি করিবেন, তাহাও বলিলেন। এই স্থানে তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে নারদ বলিলেন,—ঠাকুর! চালাকি করিয়া উত্তর দিলে হইবে না, কারণ,—

"তুমার মায়ায় ভব অজ নহে স্থির।
কোন চর্চ্চায় বুঝিবেক মনুস্য স্বরির॥
তুমি জারে জানহ করি আপনার।
অনায়াসে সব মায়া খণ্ডেয়ে তাহার॥
তুমি জারে সদয় নহিবে কোন কালে।
কত সিক্ষা পয়ে তবু তিলে ২ ভুলে॥
কুম্ভকার নড়িতে ফিরয়ে জেন চাকে।
ষড় ২ ফিরে সেই কর্ম্মের বিপাকে॥

• নারায়ণ এই চাপানের আর উত্তর না দিতে পারিয়া নারদের জ্ঞানের প্রশংসা, নিজের সহিত নারদের অভিন্নতা এবং নারদের প্রতি নিজের প্রীতি জানাইয়া বলিলেন,—

"তুমি জে কহিলে সব মায়া অনিবার।
কারে ভিন্ন ভাব কয় কারে আপনার ॥
সেই কথা সত্য মুনি তুমি কি না জান।
আমার মায়ার কথা মন দিয়া শুন ॥
আমার মায়ার ছাড়া নহে কোন জন।
আমার মায়ার কথা মন দিয়া শুন ॥
মায়াতে মোহিত সেই সব জিব আছে।
তথি মদ্ধে মায়াতে জে জন ভক্তি ইচ্ছে ॥
মায়া মিছা করি জানি আমাকে করে সার।
জেই জন আমার হয় আমি হোই তার ॥"

ইহার পর নারায়ণ ভগবদ্‌গীতার শ্লোকাবলীর মর্ম্মার্থ আওড়াইয়া নারদকে নিরস্ত করিলেন। তারপর বুঝাইয়া দিলেন, আমার প্রিয়-অপ্রিয়-নির্ব্বিশেষে যমকে যেরূপ ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিয়াছি, যম সেইরূপ করিতেছে, সুতরাং তাহার নিষ্ঠুরতা নিন্দনীয় নহে। তাহার পর নারায়ণ কৃত্যাকৃত-বিচার করিয়া জীবের মোহমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; নারায়ণের কথা এইরূপে শেষ হইল,—

"জে কার্য্যে সঞ্চারে পাপ করে সেই কাম।
পাপ খণ্ডাইতে চাহে করি মোর নাম ॥
মনে জানে নাম লইলে পাপ নাঞি থাকে।
করিআ অশেষ পাপ নাম করে সুখে ॥
করিআ আমার নাম নানা পাপ কাটে।
মুখেতে করএ নাম অন্তরে পাপ বাটে ॥
সিআন বলিআ সভাকে কথা কহি।
সেই সে অধম লোক সেই মোর দ্রোহি ॥
এ সভার জপ তপ মনে নাহি বাসে।
তাহা সভার পরিত্রান নহে জম পাসে ॥"

এই সকল "দেবত্রা"র কথা শুনিয়া নারদ বলিলেন,—

"নারদ কহেন প্রভু জে কহ আপুনি।
পুনর্ব্বার সেই কথা অন্নামত জানি ॥
এখনি কহিলে প্রভু নামের মহিমা।
ত্রিভুবনে দিতে নাঞি এক নাম সিমা।

হেলায় সন্ধ্যায় জে আমার নাম জপে।
কি করিতে পারে তারে কোটি ২ পাপে ॥
জমের সকতি তার কি করিতে পারি।
সে কেমনে তুমার দ্রোহি কহিলা শ্রীহরি ॥”

নারায়ণ নামের মাহাত্ম্য বর্ণাইয়া পরে বলিলেন,—

“আগে নাম জপি জদি পাপে হইল মন।
কি করিতে পারে তারে নামের কারণ ॥
ত্রিভুবনে পাপ নাঞি ইহার সমানে।
এক গুনে নামে মন পাপি সতগুনে ॥
তিল এক মর্দ্ধেতে করে সত ২ পাপে।
লোক ভাণ্ডিবারে সেই মিছা নাম জপে ॥
মানব ভুলিল বলি আমি নাঞি ভুলি।
জে ভাবেতে নাম বলে জানিত সকলি ॥”

তারপর রামভক্ত, হনুমান্‌পন্থী কবি বাণীকণ্ঠের ভাবের খাতির রাখিয়া নারায়ণ বলিয়া দিলেন,—

“আজন্ম করিআ পাপ মরে শেষ কালে।
মরণ সময়ে জদি এক নাম বলে ॥
রাম নাম উচ্চারি আমারে জেই ব্যক্তি।
সেই জনে আনিতে আপুনি সারথি ॥”

এত কথার পর নারদ যদিও নিজের প্রশ্নের বেশ সরল সোজা উত্তর পাইলেন না, কিন্তু আর প্রবোধ না মানিলে ঠাকুরের কাছে ভদ্রতা থাকে না, ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে, কাজেই বলিলেন,—

“নারদ বলেন প্রভু পাইলাম বোধ।
আর কিছু জিজ্ঞাসিব করি উপরোধ ॥”

তারপর নামী হইতে নাম বড় কেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুর তখন রামাবতারের একটা ঘটনাদ্বারা তথ্যটা বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন,—

“প্রভু বলেন করহ অবধান।
জে কারণে নহি আমি নামের সমান ॥
আপনে ইশ্বর আমি সংসারের সার।
রামরূপে করিলাম বনেতে বেহার ॥
সঙ্গেতে লইয়া জত অসংখ্য বানর।
কতেক উপায় করি বাঁন্ধিনু সাগর ॥

সতেক জোজন হঅ সাগর পাথার।
সেতুবন্ধ করিআ তাহাতে হইলু পার॥
বড়ই দুষ্কর নাঞি জাঙ্গালেতে স্থান।
উভয় সাগর জার নাঞি পারিলাম॥
আমি সে সাগর বান্ধি গেলু এক মাসে।
মোর নামে তরে সিন্ধু চক্ষুর নিমিসে॥
নাম হইতে পায় লোক মোর নিজ স্থান।
অতএব নহি আমি নামের সমান॥"

তারপর নারায়ণ নারদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন,—

"বারে বারে কি আর জিজ্ঞাসহ মুনিবর।
নিশ্চয় জানিহ আমি নামের কুরুপর॥

*　　*　　*　　*

এমন নামের কথা শুন মহামুনি।
নামের মহিমা আমি আপুনি না জানি॥"

তারপর নারদের পুনরায় দণ্ডবৎ প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন এবং নারদের প্রতি প্রীতিপ্রকাশে এ প্রস্তাব শেষ হইল। নারদ বিদায় লইয়া পুনরায় ইন্দ্রালয়ে আসিলেন। উভয়ের তখন একত্র যম-প্রশংসায় দিন গেল। তারপর কবি গ্রন্থমহিমা কীর্ত্তন অর্থাৎ গ্রন্থ শুনিলে যম-ভয় থাকে না, যম শ্রোতার পাপ লেখে না ইত্যাদি কীর্ত্তন করিয়া সীতারামের পদে কোটি প্রণাম জানাইয়া গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি গৃহস্থের পক্ষে কতকটা মোহ-মোচন-কর হইয়াছে।

কবির কবিত্বের বা বর্ণনা-শক্তির বিশেষ একটা চমৎকারিত্ব কিছু নাই, কিন্তু সরল সহজ কথায় অসাধুতা ত্যাগ করিয়া গৃহস্থকে ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ ও তাঁহার নামের মহিমায় আস্থাবান্ করিবার জন্য বাণীকণ্ঠ কবি যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে সফল হইয়াছে। কবি স্থকৌশলে সমস্ত উপদেশগুলি ভগবদ্ভক্তিরূপে সন্নিবিষ্ট করাইয়া গীতার ন্যায় গ্রন্থখানিকে পবিত্র করিয়া তুলিয়াছেন।

গ্রন্থখানির প্রথম কয়েকটি কবিতায় কহিল, করি, বলিল প্রভৃতি কয়েকটি ক্রিয়ার প্রথম বর্ণটিতে রাঢ়ীয় উচ্চারণ-সুলভ ওকার দেওয়া আছে, কিন্তু গ্রন্থের সর্ব্বত্র সে রীতি রক্ষিত হয় নাই। গ্রন্থের কোথাও ঈ-কার ও ঊ-কারের ব্যবহার নাই। দুটি একটি ঈ বা ঊ-কারের যে দেখা পাওয়া যায়, তাহা লিপিকরের অনবধানতা বলিতে হইবে। অসমাপিকা—করিয়া, বলিয়া, দিয়া প্রভৃতি এবং সমাপিকা—হয়, নয়, কয় প্রভৃতি ক্রিয়ার য়-স্থলে সর্ব্বত্র 'অ' ব্যবহৃত হয় নাই। 'মায়া' শব্দ কোথাও 'অ' দিয়া লেখা হয় নাই, কিন্তু 'দয়া' শব্দ অধিকাংশ স্থলে 'অ' দিয়া লেখা হইয়াছে। অধিকরণ-বিভক্তির 'য়' স্থানে "অ" ও "য়" উভয়ই দেখা যায়; কতক

স্থানে 'এ'ও আছে। 'শ্রী' শব্দ ব্যতীত শ-এর ব্যবহার কোথাও নাই। দুই একটা 'ষ'এর অন্যায় প্রয়োগ দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও লিপিকরের অনবধানতা বলিতে পারা যায়।

মনুস্ব্য, পুন্ন্য, অন্ন্য, ভিন্ন্য, তর্ত্ত, খিরোদ, নিত্য্য, পৃত, পুনরূপি প্রভৃতি কতিপয় শব্দে বানান ভুল স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সেগুলি কবির, কি লিপিকরের, তাহা বলা বড় কঠিন। দ্ধ-বর্ণটি যেখানে ব্যবহার হইয়াছে, সেইখানেই তাহাতে রেফ যুক্ত হইয়াছে, তাহা কে জানে 'মর্দ্ধে,' কে জানে 'জুর্দ্ধে,' আর কে জানে 'উর্দ্ধায়ে'। 'জ' বা 'য' স্থানে শব্দের আদিতে নির্বিশেষে 'জ' সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইয়াছে। কোথাও 'তোমায়', 'তোমাকে' বা 'তোমার' নাই, সর্ব্বত্র 'তুমায়', 'তুমাকে', 'তুমার' আছে। 'কার্য্য'-টি কিন্তু কোথাও 'কার্জ্জ' হয় নাই, 'কাজ' বা 'কায' শব্দের প্রয়োগ নাই। 'ঋষি'—রিসি ও 'ঋণ'—রিণ হইয়া উচ্চারণমূলক বানানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে। বানানের আর একটি বিশেষত্ব—'র' লিখিতে 'ব'-এর নীচে বিন্দু ব্যবহার হইয়াছে, 'ড়' লিখিতে কোথাও ড-এ বিন্দু ব্যবহার হয় নাই, আর 'য়' লিখিতে য-এ হসন্তবৎ চিহ্ন দিয়া বিন্দুর কাজ করা হইয়াছে। ইহাকে বানানের বিশেষত্ব না বলিয়া লিপিকরের লেখার বিশেষত্ব বলাই সঙ্গত।

গ্রন্থখানির ভাষা দেখিয়া উহার প্রাচীনত্ব কত, তাহা নির্ণয় করা কিছু দুষ্কর। করিলুঁ, বলিলুঁ, দিলুঁ প্রভৃতি উত্তমপুরুষের ক্রিয়ার প্রাচীনাকার এবং দুস্থ, স্মঙরি, নাঞি, ধেআন, বেভার প্রভৃতি শব্দের প্রাচীন রূপও আছে। আবার ব্যাধিল (পীড়িল), ইচ্ছি (ইচ্ছা করি) প্রভৃতি নবীন ক্রিয়াও দুই চারিটি দেখা যায়। নহি—নই, চাহি—চাই, রহি—রই প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বিবিধ রূপই ব্যবহার হইয়াছে। করিলুঁ, বলিলুঁ রূপের সমকালীন পাইলাঙ, করিলাঙ ইহাতে নাই, কিন্তু পাইলাম, করিলাম আছে।

আর বিশেষ কথা কিছু বলিবার নাই, কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডারে আর একজন নূতন কবি ও একখানি নূতন কাব্যের আবিষ্কার হইল। বঙ্গভাষার জয় হউক।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী

তাড়িতবিজ্ঞানের পরিভাষা*

বঙ্গভাষায় পদার্থ-বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ একখানিও নাই। সম্ভবতঃ এই অভাবের অন্যতম কারণ পারিভাষিক শব্দের অসদ্ভাব। বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পদার্থবিদ্যাবিষয়ক উল্লেখ-যোগ্য পুস্তকের সংখ্যা অধিক নহে। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়-প্রণীত "যন্ত্রবিজ্ঞানে" পদার্থ-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্ট অংশ—ইংরাজীতে যাহাকে mechanics বলে, ঐ অংশ আলোচিত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্ এ মহাশয়ের সম্পা-দকতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী হইতে "পদার্থবিজ্ঞানের স্থূলমর্ম্ম" নামধেয় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। উহাতে জড়ের গতি, শব্দ, তাপ, আলোক, চুম্বক ও তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ-বিজ্ঞানের বিভিন্ন অধ্যায় আলোচিত হইলেও উহা পদার্থবিজ্ঞানের "স্থূলমর্ম্ম" মাত্র। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় প্রণীত পদার্থবিদ্যাবিষয়ক পুস্তকখানিও বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পুস্তক মাত্র। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়-প্রণীত "পদার্থবিদ্যা" নামক স্কুলপাঠ্য পুস্তক শিক্ষাপ্রদ, কিন্তু উহার আলোচ্য বিষয়ের পরিসর অত্যন্ত অল্প, শুধু গতি ও তাপবিজ্ঞানের কিয়দংশ। "প্রকৃতি" ও "জিজ্ঞাসা" নামক পুস্তকদ্বয়ে সঙ্কলিত রামেন্দ্র বাবুর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ বঙ্গভাষায় গৌরবের সামগ্রী; কিন্তু ঐ গ্রন্থদ্বয় বিপুল বিজ্ঞান-শরীরের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অঙ্গের সমাবেশ মাত্র, বিজ্ঞানের সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন পূর্ণমূর্ত্তি নহে। রামেন্দ্রবাবুর "জগৎকথা" প্রকাশিত হইলে, হয়ত, এই অভাব অনেকটা দূরীভূত হইবে। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়-প্রণীত "প্রকৃতি-পরিচয়" নামক পুস্তকখানি বিবিধ তথ্যপূর্ণ হইলেও উহাদ্বারা বঙ্গভাষার সাহায্যে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীর অভাব দূরীভূত হয় না। মোটের উপর এ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় যে সকল তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে গতি-বিজ্ঞান, তাপ-বিজ্ঞান ও আলোক-বিজ্ঞানের কিয়দংশ মাত্র আলোচিত হইয়াছে।† বর্ত্তমানে এই সকল বিষয় লইয়া যাঁহারা গ্রন্থ লিখিবেন, ভরসা হয়, পারিভাষিক শব্দের জন্য তাঁহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না; কিন্তু তাড়িতবিজ্ঞান ও চুম্বকবিজ্ঞান সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় আলোচনা এ পর্য্যন্ত একরূপ কিছুই হয় নাই বলিতে হয়। অথচ তাড়িতবিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞানের একটা প্রধান অঙ্গ; সুতরাং এই সভায় তাড়িতবিজ্ঞানের আলোচনা সম্ভবতঃ নিরর্থক হইবে না। প্রবন্ধে লিখিত বাঙ্গালা প্রতিশব্দগুলি সম্বন্ধে উপস্থিত ভদ্র-মহোদয়গণ মতামত প্রকাশ করিলে, কিংবা কোন নূতন শব্দের প্রস্তাব করিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গৌহাটী-শাখায় ১৩১৯ সালের ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

† ৺অক্ষয়কুমার দত্ত, ৺মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ও শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার অধিকারী মহাশয়গণের পদার্থবিদ্যাবিষয়ক পুস্তক দেখিবার সুযোগ আমার ঘটে নাই।

কতকগুলি প্রতিশব্দ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় মহাশয়দ্বয়ের লেখা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। অপরগুলির অধিকাংশই সম্ভবতঃ নূতন। প্রতিশব্দগুলি যাঁহারা প্রস্তাব করিয়াছেন বা যাঁহাদের লেখায় পড়িয়াছি, তাঁহাদের নাম ডাহিন দিকে এবং অধিকাংশ স্থলে সংক্ষেপে লেখা হইল। যথা :—

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ... ... রা সু ত্রি
„ জগদানন্দ রায় ... ... জ রা
„ অমরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ... ... অ চ
„ সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ... ... সু না চ

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
১।	Electricity	তড়িৎ, তাড়িত,	
২।	Positive and Negative Electricities	ধনাত্মক তাড়িত, ঋণাত্মক তাড়িত	জ রা
		ধন-তাড়িত, ঋণতাড়িত,	মন্মথমোহন বসু
৩।	Frictional Electricity	ঘর্ষণজ তাড়িত	
৪।	Statical Electricity	অচল তড়িৎ	জ রা
		স্থির তাড়িত	সু না চ
৫।	Current Electricity	প্রবহমান তাড়িত	
৬।	Electric Current	তাড়িতপ্রবাহ বা স্রোত	রা সু ত্রি
৭।	Quantity of Electricity	তাড়িত পরিমাণ	
৮।	Current Strength	প্রবাহমান, স্রোতপরিমাণ	সু না চ
		ধারা	অ চ
৯।	Magnet	চুম্বক	
১০।	Magnetic needle	চুম্বকশলাকা	
১১।	Magnetic	চৌম্বক	
১২।	Electric	তাড়িত	
১৩।	Electro-magnetic	তাড়িতচৌম্বক	
১৪।	Force	বল	রা সু ত্রি
১৫।	Field	ক্ষেত্র	
১৬।	Field of Force	বলক্ষেত্র	সু না চ (?)
১৭।	Electric Field	তাড়িতক্ষেত্র	ঐ
১৮।	Magnetic field	চৌম্বক ক্ষেত্র, চুম্বকক্ষেত্র	ঐ
১৯।	Electro-magnetic field	তাড়িত-চুম্বকক্ষেত্র	

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
২০।	Line of Force	বলরেখা	সু না চ (?)
২১।	Electric line of Force	তড়িতরেখা	ঐ
২২।	Magnetic line of Force	চুম্বক রেখা	ঐ
২৩।	Tube of Force	বলরেখা, বলগুচ্ছ, বলরজ্জু বলসজ্য, বলবীথী, কলম, চুঙ্গী তূণ, তূণীর	ঐ
২৪।	Electric tube of Force	তাড়িত তূণ	ঐ
২৫।	Magnetic tube of Force	চৌম্বক তূণ	ঐ
২৬।	Work	কার্য্য	রা স্থ ত্রি
২৭।	Energy	শক্তি	ঐ
২৮।	Power	ক্ষমতা	সু না চ
২৯।	Potential Energy	স্থিতিশক্তি প্রচ্ছন্নশক্তি	রা সু ত্রি ?) সু না চ (?)
৩০।	Kinetic Energy	গতিশক্তি	ঐ
৩১।	Potential	প্রভব, অনুভাব, বিভব	ঐ
৩২।	Electric and Magnetic Potential	তাড়িতপ্রভব ও চৌম্বকপ্রভব	ঐ
৩৩।	Difference of Potential	প্রভবান্তর, বিভবান্তর	ঐ
৩৪।	Gradient, Slope	প্রবণতা	রা সু ত্রি
৩৫।	Potential Gradient	প্রবণতা	
৩৬।	Equipotential	সমপ্রভ	সু না চ
৩৭।	Equipotential line or surface	সমপ্রভ রেখা বা তল	ঐ
৩৮।	Conduction	সঞ্চালন	
৩৯।	Convection	পরিবাহন সংবাহন	 রা সু ত্রি
৪০।	Radiation	বিকীরণ	
৪১।	Conductor	সঞ্চালক	

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
৪২।	Conductivity	সঞ্চালনক্ষমতা, সঞ্চালনশীলতা	
৪৩।	Resistance (Mechanical)	ঘর্ষণ, বিঘর্ষণ, বাধা	
৪৪।	Resistance (Electrical)	রোধ	সু না চ
		প্রতিরোধ	অ চ
৪৫।	Resistivity	রোধশীলতা	সু না চ
৪৬।	Specific Resistance	আপেক্ষিক রোধশীলতা	ঐ
		আপেক্ষিক প্রতিরোধ	অ চ
৪৭।	Induction	প্রবর্ত্তন	সু না চ
৪৮।	Magnetic Induction	চৌম্বক প্রবর্ত্তন	ঐ
৪৯।	Electric Induction	তাড়িত প্রবর্ত্তন	অ চ
৫০।	Electro-magnatic Induction	তাড়িত-চৌম্বক-প্রবর্ত্তন	সু না চ
৫১।	Self Induction	আত্মপ্রবর্ত্তন	ঐ
		স্বপ্রবর্ত্তন, স্বতঃপ্রবর্ত্তন	অ চ
৫২।	Mutual Induction	দ্বৈতপ্রবর্ত্তন	সু না চ
		পরস্পর প্রবর্ত্তন	শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী
৫৩।	Inductance	প্রবর্ত্তনা, প্রবর্ত্তনফল	অ চ
৫৪।	Specific Inductive Capacity	আপেক্ষিক প্রবর্ত্তনফল	ঐ
		তাড়িতনমনীয়তা	সু না চ
৫৫।	Capacity	ধৃতিমান্	ঐ
		প্রস্থি	শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৫৬।	Induction Current	প্রবর্ত্তন প্রবাহ	সু না চ
৫৭।	Extra Current	ঝলক	ঐ
		বেগপ্রবাহ	অ চ
৫৮।	Eddy Current	আবর্ত্তনপ্রবাহ	সু না চ
৫৯।	Medium	মধ্যস্থ, মধ্যগ, ঘটক	ঐ
		আকাশ	অ চ

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
৬০।	Dielectric	অঙ্গন	সু না চ
		আধার	শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য
৬১।	Dielectric Constant	অঙ্গনাঙ্ক	সু না চ
		অঙ্গনফল	অ চ
৬২।	Dielectric Current	অঙ্গনপ্রবাহ	সু না চ
৬৩।	Element	মূল পদার্থ	
৬৪।	Compound	যৌগিক পদার্থ	
৬৫।	Mixture	মিশ্রণ	
৬৬।	Decomposition	বিশ্লেষণ	
৬৭।	Electrolysis	তাড়িত বিশ্লেষণ	
		বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ	
৬৮।	Electrolyte	তাড়িত বিশ্লেষ্য	ক্ষে বনমালী চক্রবর্ত্তী
৬৯।	Solution	দ্রবীভবন	রা সু ত্রি
		দ্রবণ	
৭০।	Solvent	দ্রাবক	রা সু ত্রি
৭১।	Solute	দ্রাব্য	
		দ্রবণশীল পদার্থ	
৭২।	Valency	মিলনসংখ্যা, মিশ্রণসংখ্যা	সু না চ
		মিলনাঙ্ক	অ চ
৭৩।	Molecule	অণু	
৭৪।	Atom	পরমাণু	
৭৫।	Ion	কণা	সু না চ
৭৬।	Corpuscle	কণিকা	ঐ
৭৭।	Particle		
৭৮।	Electron	অতিপরমাণু	জ রা
		তাড়িতবিন্দু, তাড়িতাণু	সু না চ
৭৯।	Anion and Cation	সুকণা ও কুকণা	সু না চ
		বিকণা ও নিকণা	অ চ

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
৮০।	Electrode	তড়িদ্দ্বার	সু না চ
		তড়িদ্‌গম	অ চ
৮১।	Anode and Cathode	আগম বা বিগম ও নির্গম	অ চ
		সুদ্বার ও কুদ্বার	সু না চ
৮২।	Electroplating	তাড়িতরঞ্জন	অ চ
৮৩।	Electrotyping	তাড়িতাঙ্কণ	ঐ
৮৪।	Gas	অনিল	রা সু ত্রি
		মরুৎ	জ রা
		গ্যাস, বায়ু	
৮৫।	Liquid	তরল	
৮৬।	Fluid	সরিল	রা সু ত্রি
৮৭।	Solid	কঠিন	
৮৮।	Rigid	দৃঢ়	রা সু ত্রি
৮৯।	Elastic	স্থিতিস্থাপক	ঐ
৯০।	Rarefied air	বিরলীকৃত বায়ু	
৯১।	Spark	স্ফুলিঙ্গ, বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ	
		বিস্ফুলিঙ্গ	শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
৯২।	Electric discharge	বিদ্যুৎস্ফুরণ	সু না চ
		তাড়িতত্রাণ	অ চ
		তাড়িন্মোচন	শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী
৯৩।	Electric oscillation	তাড়িত-কম্পন, বিদ্যুৎকম্পন	
৯৪।	Electric wave	তাড়িততরঙ্গ, তাড়িতোর্ম্মি	
৯৫।	Oscillatory discharge	কম্পত্রাণ	অ চ
৯৬।	Alternating Current	পর্য্যায়গত প্রবাহ	সু না চ
		বর্ত্তিত প্রবাহ	অ চ
৯৭।	Mass	জিনিস, বস্তুমান	রা সু ত্রি
		জড়মান	শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত
		সামগ্রী	

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
৯৮।	Momentum	গতিপরিমাণ	সু না চ
৯৯।	Density	গাঢ়তা, সান্দ্রত্ব	
		ঘনত্ব	জ রা (?)
		নিবিড়তা	রা সু ত্রি
১০০।	Cathode rays	বিয়োগরশ্মি, ক্যাথোড রশ্মি	
		কুরশ্মি	সু না চ
১০১।	Rontgen Rays	রঞ্জনরশ্মি	
১০২।	a, β, r rays	ক, খ, গ, রশ্মি	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু
১০৩।	Response	সাড়া	রা সুত্রি (?)
		উত্তর	অ চ
১০৪।	Resonance	রণন	শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী
		প্রতিকম্পন, অনুকম্পন	সু না চ
		অনুজ্ঞাপন	অ চ
১০৫।	Resonator	অনুরণক	শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী
		অনুজ্ঞাপক	অ চ
১০৬।	Cell	বিদ্যুৎকোষ, তাড়িতকোষ	
		প্রবাহকোষ	অ চ
১০৭।	Battery	ব্যাটারি	
		প্রবাহভাণ্ডার	অ চ
১০৮।	Condenser	বিদ্যুৎভাণ্ড	সু না চ
১০৯।	Leyden Jar	বিদ্যুৎকুম্ভ	ঐ
		লিডেন ভাণ্ড বা কুম্ভ	অ চ
১১০।	Accumulator	প্রবাহভাণ্ডার, বিদ্যুৎভাণ্ডার	সু না চ
১১১।	Poles of a Battery	যোগপ্রাপ্ত, বিয়োগপ্রাপ্ত	
		সুপ্রান্ত, কুপ্রান্ত	সু না চ
		বিপাত, নিপাত	অ চ
		পুংমেরু, স্ত্রীমেরু	শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু

	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
১১২।	Poles of a magnet	উত্তরধ্রুব ও দক্ষিণধ্রুব	
		উত্তরমেরু ও দক্ষিণমেরু	
১১৩।	Constant	ধ্রুব	শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় (?)
১১৪।	Wire	তার	
১১৫।	Coil of wire	তারের গুটি	স্থ না চ
		বেষ্টন, বেষ্টিকা	অ চ
		বেষ্টন	শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী
১১৬।	Circuit	কুণ্ডলী	স্থ না চ
		সূত্র	অ চ
১১৭।	Open circuit and closed circuit	মুক্তকুণ্ডলী, যুক্তকুণ্ডলী	স্থ না চ
		মুক্তসূত্র, বদ্ধসূত্র	অ চ
১১৮।	Make and Break	বন্ধন ও মোচন	ঐ
১১৯।	Cycle	চক্র	
১২০।	Network (of Conductors)	ব্যূহ, জাল, পাশ	স্থ না চ
১২১।	Shunt	সেতু	ঐ
১২২।	Branch	শাখা	
১২৩।	Connection in series	পর পর সজ্জা	ঐ
		যুক্তসজ্জা	অ চ
১২৪।	Connection in parallel	পাশাপাশি সজ্জা	স্থ না চ
		যুক্তসজ্জা	অ চ
১২৫।	Primary Coil	প্রধান গুটি	স্থ না চ
		প্রধান বেষ্টন	অ চ
১২৬।	Secondary Coil	অধীন গুটি	স্থ না চ
		অধীন কুণ্ডলী	অ চ
১২৭।	Induction Coil	বর্ত্তনগুটিকা	স্থ না চ
		বর্ত্তনবেষ্টিকা	অ চ
১২৮।	Tesla Coil	টেস্‌লা বেষ্টিকা	ঐ
১২৯।	Electroscope	তাড়িদ্দর্শক	স্থ না চ (?)

° ১	ইংরাজী	বাঙ্গালা	
১৩০।	Electro-meter	তাড়িন্মাপক	ঐ
১৩১।	Galvanoscope	প্রবাহদর্শক	সু না চ
		গ্যালভানজ্ঞাপক	অ চ
১৩২।	Galvanometer	প্রবাহমাপক	সু না চ
		গ্যালভানমাপক	অ চ
১৩৩।	Electric machine	তড়িতোৎপাদক যন্ত্র	
		তাড়িতযন্ত্র	
১৩৪।	Efficiency		শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১৩৫।	Induction machine	প্রবর্ত্তন-যন্ত্র	সু না চ
১৩৬।	Dynamo	ডাইনামো	
১৩৭।	Motor	মোটর	
১৩৮।	Electro-phorus	তাড়িদ্বর্দ্ধক যন্ত্র	সু না চ
১৩৯।	Electro-magnet	তাড়িতচুম্বক	
১৪০।	Solenoid	বেষ্টনী	অ চ
১৪১।	Electric wave apparatus	তাড়িতোর্ম্মি যন্ত্র	
১৪২।	Emitter, sender	প্রেরক যন্ত্র	
১৪৩।	Receiver	গ্রাহক যন্ত্র	
১৪৪।	Coherer	সমবায়ী গ্রাহক, সংশ্লেষগ্রাহক	সু না চ
		মারকনিগ্রাহক	অ চ
১৪৫।	Commutator	বর্ত্তক	সু না চ
১৪৬।	Amalgamation	পারদমণ্ডল	সু না চ
১৪৭।	Contact	স্পর্শ	
১৪৮।	Contact potential	স্পর্শপ্রভব	সু না চ
১৪৯।	Permeability	(চৌম্বক) ভিদ্যতা	অ চ
১৫০।	Thermo-electricity	তাপতাড়িত	সু না চ
		তাপজ তাড়িত	
১৫১।	Thermo-electric Current	তাপ-তাড়িত-প্রবাহ	

ইংরাজী	বাঙ্গালা	
১৫২। Electromotive force	প্রবাহোৎপাদক শক্তি, প্রবাহজ শক্তি	সু' না চ
	তাড়িত-তাড়না	

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

———

অসমীয়া সাহিত্যের

একখানি পুস্তক দেবজিত*

(১)

এই পুস্তকখানি পদ্যছন্দে রচিত। ইহাতে পাঁচ রকমের ছন্দ আছে। ইহার রচয়িতা খ্যাতনামা মাধব কন্দলি। তাঁহার পরিচয় গ্রন্থশেষে সামান্য মাত্র পাওয়া যায়। ইহা কোন্ শকাব্দে লিখিত, তাহা জানা যায় না। ইহার ভাষা খুব সরল ও সুললিত। ইহার বিষয়, দেবতাগণের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ। ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর ও ইন্দ্রাদি দেবগণ সমস্তই অর্জ্জুনের নিকট পরাজিত হয়েন।

যুদ্ধের কারণ এই :—যে সময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্র-মধ্যে গিয়া লুক্কায়িত থাকেন। তথায় ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃত সমুদ্র-ভার্য্যার জন্য সমুদ্র একাগ্র-মনে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার স্তুতিতে তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক অপহৃতা সমুদ্রভার্য্যাকে উদ্ধার করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। তাহার প্রমাণস্বরূপ নিম্নে কতকগুলি পদ্য উদ্ধৃত করা গেল :—

পঞ্চিশ অধিক ভৈল† শতেক বৎসর।
দেবক দমিবে মন ভৈলা ঈশ্বরর॥
পৃথিবীর ভার সংহারিয়া দামোদরে।
মহা অসন্তোষে আছে দ্বারকা নগরে॥
সাগরর আগে আছোঁ অঙ্গীকার করি।
সাগরর ভার্য্যা দেঁউ বিলম্ব ন করি॥
এহি অঙ্গীকার স্মরি মাধব আছন্ত।
ইন্দ্রর ধিকার মুনি কৃষ্ণ আগে কন্ত॥
হেন শুনি কৃষ্ণর যে ক্রোধ ভৈলা বর।
ইন্দ্রক যুজিবে মন ভৈলা মাধবর॥
মাধবে বোলন্ত ইন্দ্র নাহি কিছু লাজ।
মোক নিন্দা করা তই দেবতার মাজ॥
ইন্দ্রক জুঝিয়া মই দেঁউ বর ভয়।
আরো যেন লোকক ন করে উপদ্রয়॥

---

* গোহাটী বঙ্গ-সাহিত্যানুশীলনী সভায় পঠিত।

† ভৈল—হইল।

যদি মই ইন্দ্র সমে ন করু সমর।
তেবে সবে প্রাণীক মারিবে পুরন্দর ॥
এহি মতে কৃষ্ণে গুণি করিলন্ত সার ।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় দুই ভৈলা অবতার ॥
নর নারায়ণ দুই ভৈলা উতুপন।
ইন্দ্রর লগত আমি করো ঘোররণ ॥
অর্জ্জন সহিতে যুদ্ধ করাঁউ আজি মই।
যুদ্ধ হারি স্বর্গ চারি যান্ত হরি হই ॥
গোকুলবাসির যে দুখর মান সারু।
অর্জ্জনর হাতে দেবসেনা সব মারু ॥
মোহর স্রজনা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর।
মোহর দৃষ্টিতে হয়ে যত চরাচর ॥

ইহার দ্বারা জানা যায় যে, ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত সমুদ-ভার্য্যার উদ্ধারের জন্যই এই যুদ্ধের আরম্ভ হয় এবং তাঁহাকে উদ্ধার করত শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রের প্রীতিসাধন করেন।

এই গ্রন্থের আরম্ভ অন্যান্য গ্রন্থের মতই লিখিত। তাহা সকলের অবগতির জন্য নিম্নে কতকগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

জয় জয় জগতর আত্মা ভগবন্ত।
ব্রহ্ম হর অনন্তে না পায় যার অন্ত ॥
জয় জয় জগতপালক নারায়ণ।
অচ্যুত অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যাহার স্রজন।
যাহার উদরে আছে চৈদ্ধর ভুবন ॥
তোমার স্রজনা প্রভু সুরাগণ।
কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডর তুমি নারায়ণ ॥

এই গ্রন্থের নাম যে দেবজিত, তাহা নিম্নলিখিত পদ্যের দ্বারা জানিতে পারা যায় :—

কৃষ্ণ যে সারথি অর্জ্জুনক করি রথি।
অর্জ্জনে ইন্দ্রক রণে করিলা বিরথি ॥
গুরুর চরণ দুই হৃদয়ত ধরি।
গুরুর আজ্ঞাক মনে শিরোগত করি ॥
কৃষ্ণর চরণে মই পশিলোঁ শরণ।
দেবজিত পদক ভণিলোঁ সুশোভন ॥

এই পুস্তকখানি পাঁচ রকম ছন্দে লিখিত হইয়াছে। তাহা পরপৃষ্ঠায় দেওয়া গেল।

প্রথম পদ—পন্থ।

এহি মতে কৃষ্ণর অনেক কাল গৈলা।
স্বর্গত ইন্দ্রর পাছে বর গর্ব্ব ভৈলা॥
অমৃতক খাই ভৈলা অজয় অমর।
সিকারণে গর্ব্ব বারি গৈলেক ইন্দ্রর॥
অষ্টাদশ পুরাণ কথা অনুসার।
দেবজিত পদক মই করিলো প্রচার॥
স্বর্গত নিন্দিলা মাধবক ইন্দ্রে যত।
সমস্তে কহিলা মুনি কৃষ্ণর আগত॥
কৃষ্ণর ইন্দ্রর যেন লাগিলা বিবাদ।
মাধবে রচিলা পদ শুনা সভাসদ॥

দ্বিতীয় ছন্দ—দোলুড়ি।

এহি মতে ইন্দ্রে   বলন্তে আছয়
দেবতাগণক চাই।
আবে কি করিবু   শুনাদেব জাক
কহিয়ো মোত বুঝায়॥

তৃতীয় ছন্দ—চই, চোই বা ছবি।

শুনিয়ো মাতুলি ওই   মোর রথ সাজা গোই
দেখন্তে লাগয় জাক ডর।
হাজারেক ঘোড়া জুরি   সাজা রথ শীঘ্র করি
দিব্য রথ সূর্য্য সম বর॥

চতুর্থ ছন্দ—লেছারি।

অর্জ্জুনত সবে হারি রণ   লাজ ভয় হুয়া দেবগণ
কোন দিশে জাবু ন পান্ত একো উপায়।
ঘোর রণে দেব ভৈলা লাজ   কোনে সাধিবেক মোর কাজ
এহি বুলি ইন্দ্রে ভৈলন্ত মৃত্যু পরাই॥
দশ দিগপাল আছে যত   সবে হারি রণ অর্জ্জুনত
একাদশ রুদ্রগণে হারিলেক রণ।
বাসুকি যে আদি সর্পচয়   সমরত সবে ভৈলা ভয়
পলালা বাসুকি সর্প রক্ষা করি প্রাণ॥

পঞ্চম ছন্দ—ঝুমুরি।

দেখি দুখ দেবতার,
ক্রোধে কাম্পে মহেশ্বর।
দেবতাক চাই হর,
দিলন্ত নির্ভয় বর।
মহেশে বোলন্ত চাই,
শুনা দেব হরি হই।
ন করিবা ভয় মন,
মঞি হেরা যাঞো রণ।
শুনা সবে দেবচয়,
ন করা মনত ভয়।

ইহা যে প্রসিদ্ধ কবি মাধব কন্দলির দ্বারাই রচিত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত কবিতা-পাঠে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় :—

পাণ্ডবর মুক্ত কথা দেবজিত পদ।
পাপ এড়ি শুনা সবে যত সভাসদ॥
বাঢ়া টুটা নাই পদ শুনা সভাচয়।
এহি পদ শুনি যায়া বৈকুণ্ঠনিলয়॥
মাধব কন্দলি কহে এড়ি আন কাম।
দেবজিত পদক ভণিলোঁ মনোরম॥

গ্রন্থের শেষ :—

দেবজিত পদ এহি মানে সমাপতি।
রাম হরি বোলা পাপ যাউক অধোগতি॥

ইতি দেবজিত পদসমাপ্তং॥ শকাব্দা ১৭৯৭। বাং সন ১২৭৮। তাং ২৬ কার্ত্তিক॥

এই পুথিখানি ১২২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১।১২ লাইন করিয়া লিখিত হইয়াছে। ইহা হস্তলিখিত পুস্তক। ইহা যে প্রখ্যাত কবি মাধব কন্দলির দ্বারাই রচিত হইয়াছে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহার পদাবলী সুমিষ্ট ও সুন্দর পরিপাটীতে সজ্জিত, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। এই পুস্তকখানা ১৪০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে। ইনি কাঁচারি রাজা মহামাণিক্য বরাহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি পূর্ব্বোক্ত রাজার আদেশেই সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মূল হইতে আসামীতে পদ্যানুবাদ করেন। ইনি লঙ্কাকাণ্ড রামায়ণের শেষে লিখিয়াছেন যে,—

কবিরাজ কন্দলিয়ে আমাকে সে বুলি কয়
করিলোহোঁ সর্ব্বজন বোধে।
রামায়ণ পুপয়ার শ্রীমহামানিকে যে
বরাহ রাজা অনুরোধে॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ
লম্ভা পরিহরি সারোধৃত।
মহামাণিক্যর বোলে কাব্যরস কিছো দিলোঁ
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত॥

*   *   *   *

অগণিত পরিক্ষিয়া সীতাক অযোধ্যা নিয়া
সকুটুম্ব ভলা এক ঠাই।
মাধব কন্দলি গাইলা শ্রীরামে অযোধ্যা পাইলা
জয় জয় আনন্দ বধাই॥

দ্বিতীয়তঃ শঙ্করদেব পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দে প্রধান কবি বলিয়া এই দেশে খ্যাত হন। শঙ্করদেব উত্তরাকাণ্ড রামায়ণে মাধব কন্দলির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন :—

পূর্ব্বকবি অপ্রমাদী মাধব কন্দলি আদি
তেঁহে বিরচিলা কৃষ্ণকথা।
তাহান পদক চাই নিবন্ধিলোঁ পদ আমি
ইত্যাদি।

সুতরাং মাধব কন্দলি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ হইতে সমস্ত কবিগণের আদর্শস্বরূপ হইয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

আদর্শখানা ১৭৯৬ শকাব্দে লিখিত, তাহার কাগজগুলি প্রায় জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা একজন সাধারণ চাষীর বাড়ীতে রক্ষিত হইতেছে। সে কখনও স্নান না করিয়া উহা স্পর্শ করে না। আমি যখন উক্ত পুস্তকখানি আনিতে যাই তখন সে প্রথমতঃ আমাকে বলিল যে, আমি স্নান না করিয়া দিতে পারিব না। পরে আমার বিশেষ অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া সে অগত্যা স্নান করত পুস্তকখানা গৃহ হইতে বাহির করিয়া আমাকে দিল। আমি তখনই আমার আবশ্যকীয় কথাগুলি নকল করিয়া লইলাম। আমার এইরূপ কাজ দেখিয়া তাহারা একটু বিরক্ত হইল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল না যে, আমি তথা হইতে নকল করিয়া আনি। তাহারা ভাবে যে, কোন ব্যক্তি যদি ইহা হইতে নকল করিয়া নিয়া যায়, তবে পুস্তকের মাহাত্ম্যের হানি হয়। আর এক কথা। তাহারা আমাকে বলিয়াছিল যে, বসন্ত

বা গ্রীষ্মকালে যদি অনেক দিন হইতে বৃষ্টি না হয়, তবে পূর্ব্বদিবস হবিষ্য করিয়া, পরদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঐ পুথি পাঠ করিয়া শেষ করিতে পারিলে অবশ্য অবশ্য বৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহা অতি সযতনে পাঠ করা হয়।

শ্রীকালীকান্ত স্মৃতি-বেদান্ততীর্থ

ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণ

রামায়ণের পুণ্যকাহিনী আলোচনার জন্য আমাদের ময়মনসিংহে পূর্ব্বে পাঠ, গান ও অভিনয় এই ত্রিবিধ উপায় অবলম্বিত হইত। তখনকার দিনে ছাপাখানা ছিল না বলিয়া সর্ব্বসাধারণে রামায়ণের পুথি সংগ্রহ করিতে পারিত না। সঙ্গতিসম্পন্ন ভদ্র পরিবারে কচিৎ এক একখানা হস্তলিখিত পুথি থাকিত। তাহা স্নানাহার-শেষে একজন পাঠ করিতেন, বাটীস্থ সকলে এবং পাড়া-প্রতিবাসিগণ সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। ইহাতে শুধু সর্ব্বসাধারণের রামায়ণ শ্রবণেচ্ছার তৃপ্তি সাধিত হইত না, সম্ভবতঃ ইহা হইতেই রামায়ণগাণ এবং "রামরাবণের তামাসা"র উৎপত্তি।

রামায়ণের গায়েন কোনও আসরে 'রামবনবাস', 'রাবণবধ', 'হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ', 'লবকুশের পরিচয়', অথবা 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' প্রভৃতি রামায়ণবর্ণিত কোনও একটি পালা গাহিতেন। প্রত্যেক হিন্দু-পরিবারেই বৎসরে একবার রামায়ণ-গান দিতে পারিলে, অতিশয় পুণ্যকার্য্য মনে করিতেন। বিশেষতঃ ময়মনসিংহে সংস্কার আছে যে, বাড়ীতে কেহ পরলোক-গমন করিলে, রামায়ণগান না দিলে সে বাড়ী অপবিত্র থাকে এবং মৃত ব্যক্তির আত্মার সদ্গতি হয় না। খোল, করতাল, মন্দিরা এবং বেহালা রামায়ণ-গানের প্রধান বাদ্য-যন্ত্র। গায়েন ব্যতীত দলে বাইন (বাদক), পাইল (সঙ্গীত-গাথক) এবং ছোকরা থাকিত। গায়েনের হস্তে চামর ও ছোকরাগণের পায় নূপুর শোভা পাইত।

গায়েন প্রথমতঃ "রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং" প্রভৃতি সংস্কৃত শ্লোকটি গাহিয়া পরে গ্রাম্য কবির রচিত বন্দনা-সঙ্গীত গাহিতেন। এই সঙ্গীতে রামায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইত এবং দেবদেবী, মুনি-ঋষি, পর্ব্বত-সমুদ্র, গুরুজন এবং সমাগত শ্রোতৃবর্গের বন্দনা করা হইত। গায়েন কোন ভুল করিলে পাছে সভাস্থ কেহ তাহা বলিয়া দিয়া জনসমাজে, তাঁহার সুখ্যাতি নষ্ট করেন, তজ্জন্য গায়েন পূর্ব্বেই সকলকে দিব্য দিতেন।

বন্দনা-সঙ্গীত শেষ হইলে, গায়েন শ্রোতৃগণের পছন্দমত একটি পালা গাহিতে আরম্ভ করিতেন; সুবিধামত কোনও স্থল গাহিয়া এবং কোনও স্থল আবৃত্তি বা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। গায়েন গানের পদ গাহিলে ছোকরা ও পাইল দিশা (burden) গাহিত, সময় সময় ছোকরাগণ বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গিক্রমে নৃত্যও করিত এবং এই প্রকারে বিষয়টিকে শ্রোতৃগণের চিত্তাকর্ষক ও প্রীতিজনক করিতে চেষ্টা করা হইত।

পূর্ব্বোক্ত দুই উপায় ভিন্ন ময়মনসিংহে "রামরাবণের তামাসা" অভিনয় দ্বারাও রামায়ণের আলোচনা হইত। রামরাবণের তামাসা অনেকটা ইংরেজী মাস্কের (Masque) সদৃশ। অভিনেতৃগণ মুখোস পরিয়া অভিনয় করিত, কিন্তু তাহাতে ইংরেজী মাস্কের ন্যায় কোনও দৃশ্যপট (Scene) থাকিত না। সাজ-ঘর হইতে আসিয়া যাত্রাগানের ন্যায় প্রকাশ্য

আসরেই অভিনয় করা হইত। ইহাতেও রামায়ণগানের পালার ন্যায় এক একটি পালা থাকিত। সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণই এই অভিনয় করিত এবং অভিনয়ের ভাষা চলিত সাধারণ গ্রাম্যভাষারই অনুরূপ ছিল। অধুনা এই 'তামাসা' প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অভিনীত পালাগুলির উদ্ধার দুরূহ ব্যাপার। তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণের ভাব ও ভাষা উভয়েই তামাসার ভাব ও ভাষার ন্যায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন; কিন্তু গীতিরামায়ণের ভাষা 'তামাসা'র ভাষা হইতে সাধু। কৃত্তিবাসের রামায়ণ গানের পক্ষে সুবিধাজনক নহে বলিয়াই, বোধ হয়, স্বতন্ত্র গীতিরামায়ণ রচনা হয়। এই গীতিরামায়ণের লেখক কে, তাহা স্থির করিবার উপায় নাই। কারণ, লেখার কোথাও লেখকের প্রকৃত নাম উল্লিখিত নাই, বরং লেখক স্থানে স্থানে কবি কৃত্তিবাসেরই দোহাই দিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ' পালার নিম্নলিখিত শেষ পংক্তিদ্বয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

"কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বচন।
মহানন্দে হরি হরি বল সর্ব্বজন॥"

কৃত্তিবাস নিজেই যে দুইটি রামায়ণের ন্যায় মহাকাব্যের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই সম্ভবপর হয় না। গীতিরামায়ণের ভাব ও ভাষা আলোচনা করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। রামায়ণের সঙ্গে কবি কৃত্তিবাসের নাম এরূপ ভাবে সংমিশ্রিত যে, লোকে কৃত্তিবাস ভিন্ন অন্য কোন রামায়ণ-রচকের নাম বড় একটা জানেন না এবং তাহাদের উপর তেমন আস্থা স্থাপনও করিতে পারেন না। গীতিরামায়ণের লেখক এই বিপদ্ দেখিয়াই বোধ হয় নিজে গা-ঢাকা দিয়াছেন। আবার গীতিরামায়ণের সবগুলি পালা একজনের রচিত কি না, এ বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। আমরা একটি পালাই বিভিন্ন গায়েনের মুখে বিভিন্ন রূপ শুনিয়াছি।

গীতিরামায়ণের 'হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ' পালাটির সহিত কৃত্তিবাসী রামায়ণোক্ত উক্ত উপাখ্যানের তুলনা করিয়া উভয়ের বিভিন্নতা একটুকু দেখান যাইতেছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই উপাখ্যানটি আদিকাণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু গীতিরামায়ণকার উত্তরাকাণ্ডে অগস্ত্য মুনির মুখ হইতে তাহা নিঃসৃত করাইয়াছেন।*

গীতিরামায়ণের বিশ্বামিত্র স্বয়ং ব্রহ্মা, দেবতাদের মন্ত্রণায় প্রেরিত এবং যিনি ব্রাহ্মণ-বেশে শৈব্যাকে ও চণ্ডালরাজ-বেশে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি ছদ্মবেশী ভগবান্ বিষ্ণু।

* "শুন হে ভক্তগণ হয়ে একমন।
উত্তরাকাণ্ডেতে হবে গীতরামায়ণ॥
উত্তরাকাণ্ডের কথা শুন সর্ব্বজন।
যে মতে স্বর্গে গেলেন হরিশ্চন্দ্র রাজন॥"

কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে এরূপ কিছু উল্লিখিত হয় নাই। কৃত্তিবাসের রুহিদাস, আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পুষ্পচয়নে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎকালেই তাঁহাকে সর্পে দংশন করে। কিন্তু গীতিরামায়ণের রুহিদাস গঙ্গার ধারে গোচারণে যাইত,—সেখানে রাখালগণের সহিত 'গেরুয়া' খেলিত। খেলা হইতে গৃহে ফিরিলে রজনীতে তাহাকে সর্পে দংশন করে। এ স্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, এই 'গেরুয়া' খেলা ময়মনসিংহে প্রচলিত 'গুটী-ছিনানি' খেলার সদৃশ। এই খেলায় রাখালগণের মধ্য হইতে একজন 'রাজা' নির্ব্বাচিত হয়। সে খেলোয়ারগণের মধ্যে একটি গুটী নিক্ষেপ করে। কেহ এই গুটী হস্তগত করিলে অপর বালকেরা তাহার নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া নিতে চেষ্টা করে এবং যে গুটীটি নিয়া রাজার হস্তে দিতে পারে, সেই জয়ী বলিয়া গণ্য হয়। গীতিরামায়ণের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টিতে ইহা সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে;—

"চক্ষু মুদি দাঁড়াইল যত রাখালগণ।
হেনকালে হইল গেরু ভূমিতে পতন॥
চতুর্ভিতে রাখালগণ করে অন্বেষণ।
রুহিদাস পাইল গেরু মেলিতে নয়ন॥
রুহিদাস হাতে গেরু লইল যখন।
তাহাকে সাপুটি ধরে বার চৌদ্দ জন॥
হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি যতেক করিল।
গেরু হস্তে রুহিদাস রাজারে ছুইল॥"

কৃত্তিবাসের এক একটি উপাখ্যান হইতে গীতিরামায়ণের পালাগুলি অনেক দীর্ঘ। এইরূপ অনেকাংশেই কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত গীতিরামায়ণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত গেরুয়া-খেলার উল্লেখ এবং রচনার মধ্যে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার দৃষ্টে ময়মনসিংহের গীতি-রামায়ণ ময়মনসিংহের গ্রাম্য কবির রচিত বলিয়াই অনুমিত হয়।

ময়মনসিংহের গীতিরামায়ণের পালাগুলি লিপিবদ্ধ অবস্থায় না পাওয়া যাওয়ায় তাহা সংগ্রহ বিশেষতঃ এক জনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কিন্তু সমবেত চেষ্টা দ্বারা গায়েনগণের নিকট হইতে লিখিয়া লইলে তাহা সংগৃহীত হইতে পারে। ময়মনসিংহের সমগ্র গীতিরামায়ণ সংগৃহীত হইলে কৃত্তিবাসের রামায়ণ অপেক্ষা বৃহদাকার একখানা মহাকাব্যের উদ্ধার করা হয়। শুধু ময়মনসিংহে কেন, বাঙ্গালার অনেক স্থলেই এই প্রকারের এক একটি মহাকাব্যের সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা আলোচনা করাও কৌতূহল-জনক, সন্দেহ নাই। সুতরাং এ বিষয়ে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।*

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ভৌমিক

---

* প্রবন্ধ-লেখক নিজে যে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ পালা ও বন্দনা-সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে প্রেরিত হইয়াছে।

দেশভেদে বাঙ্গালা ভাষার আকারভেদ

প্রথমে শ্রীহট্টের বাঙ্গালা লইয়াই প্রবন্ধটি আরম্ভ হইতেছে। শ্রীহট্টের বাঙ্গালা অন্যান্য জেলার বাঙ্গালা হইতে কতকটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা অকারণে নহে, কারণ যথেষ্ট রহিয়াছে; নানা দেশীয় লোকের সহিত শ্রীহট্টের নানা কারণে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া সংসর্গ স্থায়ী হওয়াতেই ঐরূপ হইয়াছে; ভিন্ন ভিন্ন বিদেশীয় ভাষার বা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার অনেকগুলি কথা এখানকার বাঙ্গালার সহিত সংমিশ্রিত হইয়া ইহাকে এমনই বিকৃতভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছে যে, সহসা শুনিলে উহাকে বাঙ্গালা-মিশ্রিত একটা বিদেশী ভাষা বলিয়াই ধারণা হয়, কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত শুনিলে, ঐ ধারণা অনেকটা শিথিল হইয়া আসিবে, সন্দেহ নাই। শ্রীহট্টের বাঙ্গালার মধ্যে যদি বিদেশীয় ভাষার শুধু বিশেষ্য পদসমূহ-মাত্র প্রবেশ করিত, অন্যান্য পদ বা বিভক্তি যদি উহাতে মিশ্রিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহা এতটা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া অন্যান্য জেলার লোকের নিকটে তত তীব্রভাবে তিরস্কৃত হইত না; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা বহুলপরিমাণেই হইয়াছে;—পারসী, হিন্দি প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষার বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া ও অব্যয় এই সমুদয় পদই উহাতে বৈধ এবং অবৈধ উভয়বিধ প্রকারে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে এমনও ঘটিয়াছে যে, বাঙ্গালার অস্মদ্ শব্দের কর্ত্তৃপদের সহিত হিন্দির ক্রিয়াপদ বিকৃত আকারে সংযুক্ত হইয়া একটা বঙ্গ-হিন্দি বাক্যের সৃষ্টি করিয়াছে; যথা,—আমি যারহাহম্, এই বাক্য বিকৃত হইয়া আমি 'যারাম্' অর্থ আমি 'যাইতেছি' বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে; এই দৃষ্টান্তে 'আমি' শব্দ বাঙ্গালার কর্ত্তৃপদ, 'যা রহ' শব্দ হিন্দির ক্রিয়াপদ, 'হম্' আবার হিন্দির কর্ত্তৃপদ; এখানে প্রথমে বাঙ্গালার 'আমি' পদ এবং অন্তে আবার হিন্দির 'হম্' (আমি) পদ—এই দুইটি কর্ত্তৃপদের মধ্যবর্ত্তী 'যা রহা' এই হিন্দি ক্রিয়াটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ অনেক পদ শ্রীহট্টের ভাষায় গঠিত ও স্থান পাইয়াছে।

আমি কোনও ইতিহাস অবলম্বন না করিয়া অথবা ইতিহাসজ্ঞাপক কোনও পুরাতন লিপি হস্তগত না করিয়া, উহার শুদ্ধ আকৃতি-প্রকৃতি বিবেচনাপূর্ব্বক অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াই এতদ্দেশীয় বাঙ্গালার মৌলিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিয়াছি; কিন্তু মৌলিক অনুসন্ধানের প্রকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি নাই। আশা করি, পাঠক আমার সে ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, কারণ, এ ক্ষেত্রে সে ত্রুটি অপরিহার্য্য। পারস্য, হিন্দি, তামিল, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার কথাসমূহ এ দেশের বাঙ্গালার মধ্যে প্রবেশ করিবার কারণ অনুসন্ধানে যদিই স্পষ্ট না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কোন কারণ যে থাকা একেবারে অসম্ভব, ইহা হইতে পারে না। কে বলিতে পারে যে, পারসী,

হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার আলোচনা এ দেশে কোন কালেই হয় নাই বা হইবার সম্ভাবনাও ছিল না? উক্ত ভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের প্রভাব এ দেশে কোন কালেই বিস্তৃত হয় নাই, এ কথা মুক্তকণ্ঠে বলিবার পক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার ত বোধ হয় না; পরন্তু সেই সকল ভাষার প্রকৃতি যে এ দেশের বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়াছে অথবা ঐ দেশের বাঙ্গালা শব্দাবলী সেই সকল ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষার বিকৃত দশা এ দেশে যেমন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালার অন্যান্য দেশেও সেইরূপ ঘটিয়াছে। তবে ভাষার একই অঙ্গের বিকৃতি সকল দেশে সমানভাবে দেখা যায় না; কোন দেশে বা বিশেষ্য-অঙ্গে অধিক, কোন দেশে বা বিশেষণ-অঙ্গে অধিক; কোন দেশে ক্রিয়া-অঙ্গে অধিক, কোন দেশে বা সর্ব্বনাম-অঙ্গে অধিক বিকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীহট্টের বাঙ্গালায় ক্রিয়া-অঙ্গেরই অধিক বিকৃতি দৃষ্ট হয়; কুমিল্লা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও ক্রিয়া অঙ্গের কতক পরিমাণে বিকৃতি ঘটিয়াছে।

স্থানভেদে ভাষার পরিবর্ত্তন চারি প্রকারে হইয়া থাকে;—(১) উচ্চারণগত, (২) শব্দগত, (৩) রূপগত, (৪) স্বরগত বা যতিগত;—যেমন (১) ইংরেজী j-বর্ণের উচ্চারণ যে স্থানে বিশুদ্ধ শুনিতে পাওয়া যায়, সে স্থান হইতে কিছু দূরদেশে সরিয়া গেলে z-বর্ণের উচ্চারণের ন্যায় হইয়া পড়ে; 'যাওয়া' শব্দের য-বর্ণের উচ্চারণ কোন স্থানে j-বর্ণের উচ্চারণের ন্যায়, কোন স্থানে বা z-বর্ণের উচ্চারণের ন্যায় হইতে দেখা যায়। এ অঞ্চলের সহরমাত্রেই j-প্রধান উচ্চারণ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মফস্বল অঞ্চলে z-প্রধান উচ্চারণের ব্যবহারই দৃষ্ট হয়। (২) কোন স্থানে 'আম্র' শব্দের প্রতিশব্দ 'আম', কোন স্থানে 'আঁব'; 'সম্মার্জ্জনী' শব্দের প্রতিশব্দ স্থানভেদে 'ঝাঁটা', 'ঝাড়ু', 'খেংরা', 'হুরইন', 'হাছইন'। এখানে শব্দগত প্রভেদ জানিতে হইবে। (৩) যা ধাতুর রূপ স্থানভেদে 'যাইব', 'যাইবাম', 'যাইমু', 'যামু', 'যারাম'; কিন্তু 'যাব' শব্দ 'যাইব' শব্দেরই সংকোচন মাত্র। 'যাইতেছি', 'যাচ্ছি', 'যাছুছি', 'যাইরাম', 'যারাম' ক্রিয়ার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়। (৪) 'কোঁ'-থা যাচ্ছ, 'কোথা যা-চ্ছ́', 'কো-থা́ যাচ্ছ', 'গে́-ছে', 'গে ছে́', 'কি ক́-রূছ', 'কি করূছ́' 'কি́-করূছ';* এই প্রকারে স্থানভেদে বর্ণের স্বর বা ধ্বনি (accent) ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প দূরবর্ত্তী স্থানে গেলে বর্ণের উচ্চারণ-ভেদ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়, তদপেক্ষা দূরে শব্দভেদ এবং সর্ব্বাপেক্ষা দূরে রূপভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন 'টাকা' শব্দ কিছু দূরে 'টাহা', 'বাজার' (z-জাতীয় জ উচ্চারণ) শব্দ কিছু দূরে 'বাজার' (j-জাতীয় জ উচ্চারণ) এইরূপ উচ্চারিত হয়। 'সেই দিন' কথাটি কিছু দূরে 'হেই দিন' রূপে দেখা যায়। তিন মাইল অন্তরে কিয়ৎপরিমাণে ভাষার পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হইয়াছে, সে পরিবর্ত্তন এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলকর্ণে

* এই দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যে বর্ণের উপর '́' এই ধ্বনিচিহ্ন দেওয়া আছে, উচ্চারণকালে সেই বর্ণটির উপরে ধ্বনির মাত্রা পড়িবে।

তাহা সহসা অনুভূত হওয়া অসম্ভব; আমি সিলেট সহর হইতে তিন মাইল দূরে যাইয়া দেখিয়াছি, তথাকার লোক 'জ'-বর্ণের উচ্চারণ করিতে ইংরেজী 'z'-বর্ণের উচ্চারণ করিয়া থাকে; তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই ইংরেজী j-বর্ণের উচ্চারণ করিতে কখনও বা বাধ্য হইলে, একটু যত্ন করিয়া উচ্চারণটা করে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই সে উচ্চারণ পরিত্যাগ করিয়া আপনাদের স্বাভাবিক সেই z-বর্ণের উচ্চারণের পুনরায় অবতারণা করিয়া থাকে; কিন্তু সহরে z-বর্ণের উচ্চারণ একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, 'বাজার' শব্দটি বাঙ্গালাতে উচ্চারণ করিতে হইলে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ z-বর্ণের উচ্চারণ ভুলিয়া যাইয়া j-বর্ণের উচ্চারণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা 'bazar' শব্দের উচ্চারণ 'bajar' করিয়া থাকেন। এ কেবল বাঙ্গালা বলিবার বেলায়ই হইয়া থাকে, ইংরেজী বলিতে কিন্তু এরূপ হয় না, তখন 'bazar' রূপেই উচ্চারণ করা হয়।

ঈদৃশ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, স্থূল পরিবর্ত্তন সম্বন্ধেও তাহাই। শ্রীহট্টের বর্ণমালার মধ্যেও পারসী বর্ণ প্রবেশ করিয়াছে। ক-বর্ণ পারসী ভাষায় দুইটি;—একটির উচ্চারণ অর্দ্ধরুদ্ধ ق, অপরটির উচ্চারণ পূর্ণরুদ্ধ ک। শ্রীহট্টে ক-বর্ণের ভিতরে এই দুইটি বর্ণ প্রবেশ করিয়া ক-বর্ণটিকে দুইটি স্বতন্ত্র কএর ন্যায় উচ্চার্য্যমাণ করিয়া তুলিয়াছে। এই কারণে শ্রীহট্টের কথায়, ক কা কে কৈ কো কৌ কং কঃ উচ্চারণ করিতে ঐ অর্দ্ধরুদ্ধ ق বর্ণের উচ্চারণ করিতে হয়, তাহার পরিবর্ত্তে যদি کএর উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে একেবারেই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। গলায় কিছু ঠেকিলে গলা পরিষ্কার করিবার জন্য গলা খেকরি দিতে হইলে খেৎকারের যেরূপ একটা অর্দ্ধরুদ্ধ ধ্বনি নির্গত হয়, সেইরূপ ধ্বনিবিশিষ্ট অর্থাৎ পারস্য বর্ণমালার خ-বর্ণের ন্যায় অর্দ্ধরুদ্ধ ও অর্দ্ধবদ্ধ স্বরাশ্রিত খ-কারের উচ্চারণ করাই শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানের রীতি। খ খা খে খৈ খো খৌ খং খঃ এই বর্ণগুলির উচ্চারণ প্রায়ই উক্ত নিয়মে হইয়া থাকে; কিন্তু ইকারান্ত বা উকারান্ত হইলে অর্থাৎ কি কু খি খু এইরূপ হইলে অথবা ইকারাদি বা উকারাদি হইলে অর্থাৎ ইক উক, ইখ উখ, এইরূপ হইলে, উক্ত নিয়ম খাটিবে না, তখন ق বা خ-বর্ণের অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরবিশিষ্ট উচ্চারণ স্বভাববিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। প-বর্ণেরও অর্দ্ধরুদ্ধ স্বরবিশিষ্ট দন্তোষ্ঠ্য উচ্চারণ করা এই সব অঞ্চলের চিরপ্রচলিত রীতি। ক ও খ-বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ এবং প-বর্ণের ওষ্ঠ্য অর্থাৎ ইহাদিগের (ক, খ ও প-বর্ণের) পূর্ণরুদ্ধ উচ্চারণ কেহ কখন করিলে, তাহাকে সাধুভাষাভাষী বলিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া শ্লেষ করিয়া থাকেন।

স-বর্ণ স্থানে বিকল্পে '৳' হয় যথা, [illegible] স; এবং হকারের অল্পপ্রাণ উচ্চারণ করিতে হয়। হকারের অল্পপ্রাণ [illegible] উচ্চারণ কণ্ঠাস্বরটি একটু চড়াইয়া ও একটু পড়াইয়া দিলেই সম্পন্ন [illegible] শব্দের হকার মহাপ্রাণ, এখানে হা-বর্ণের উচ্চারণ আ-বর্ণে। উদাহরণে [illegible] হাতী; যথা,—হাতীর উচ্চারণ হইবে 'আত্তী',

কিন্তু এই আ-বর্ণটি মহাপ্রাণ হইবে অর্থাৎ ইহার অন্ত্য স্বরটির একটু পড়া উচ্চারণ হইবে। যেমন গ ও ঘ বর্ণদ্বয়ের মধ্যে গান্ত স্বরটি চড়া বলিয়া গ অল্পপ্রাণ এবং ঘান্ত স্বরটি পড়া বলিয়া ঘ মহাপ্রাণ, তেমনি অ আ এই দুইটিও একবার অল্পপ্রাণ ও একবার মহাপ্রাণরূপে উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক, যথা—অতি, অত, এখানে অ অল্পপ্রাণ; আতী (হাতী), আত (হাত), অইছে (হইয়াছে), এখানে অ আ বর্ণের মহাপ্রাণ উচ্চারণ হইবে। 'সপ্তাহ' শব্দের পারসী 'হপ্তা', 'সপ্ত' শব্দের পারসী 'হপ্ত', সিন্ধু শব্দের পারস্য উচ্চারণ হিন্দ্ ইত্যাদি শব্দগুলি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, স্থলভেদে স-স্থানে হ করা পারসী ভাষারই রীতি; এই রীতি অবলম্বন করিয়া কবে, কি কারণে শ্রীহট্টের কয়েকটি বাঙ্গালা শব্দের উচ্চারণবিকৃতি ঘটিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; কিন্তু এক সময়ে না এক সময়ে, কোন না কোন কারণে যে তাহা ঘটিয়াছিল, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জন্যই শ্রীহট্ট প্রভৃতি কয়েক জেলার কথার মধ্যে স-স্থানে হ ব্যবহার করিয়া 'শর'কে 'হর', 'সের'কে 'হের', 'সকল'কে 'হকল' ইত্যাদি রূপে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু সমুদ্র, সুদ, সূর্য্য, শিকল* শিব, সীমা, সিংহ ইত্যাদি অনেকগুলি শব্দ প্রকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া থাকে, স-স্থানে হ করিয়া উচ্চারণ করিবার ব্যবহার ইহাদিগের নাই। সিংহ শব্দের স স-ই থাকে, কিন্তু শিং শব্দের শ হ হইয়া হিং উচ্চারিত হইতেও শুনা যায়। স শ স্থানে হ উচ্চারণ করার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, সেগুলি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক জেলায় শুনা যায়; কিন্তু এ স্থলে তাহা আলোচ্য নয় বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

ক্রিয়া।—'যাইতেছি' ক্রিয়ার স্থলে 'যাই-আর' † 'যাইরাম্', 'যারাম্', 'যাইএাম্'—স্থানভেদে এই কয়টি রূপ হইয়া থাকে। 'যাইতেছ'—এই ক্রিয়াপদটি স্থানভেদে 'যাইরায়', 'যাইএায়', 'যারায়'—এই কয়টি রূপ ধারণ করে। 'যাইতেছে'—এই রূপটি শ্রীহট্টের কথায় 'যায়ের' হয়। যাইতেছেন—এই রূপটি 'যাইরা', 'যাইএা', 'যারা' এই কয় আকারে ব্যবহৃত হয়।

উপরিলিখিত ধাতুরূপগুলির ব্যাকরণ-শুদ্ধি বিচার করিবার পূর্ব্বে এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, শ্রীহট্টের কথার ভিতরে হিন্দি, পারসী প্রভৃতি ভাষার শব্দগুলি যেমন প্রবেশ করিয়াছে, তেমনি শব্দরূপ, ধাতুরূপ (inflection)ও তাহাতে যথেষ্ট প্রবিষ্ট হইয়াছে। যাইতেছি ক্রিয়াপদটির হিন্দি রূপ 'যাতা হোঁ ময়্', 'যা রহা হম্'; 'যাইতেছিলাম' ক্রিয়ার হিন্দি রূপ—'যাতা থা ময়্, যাতা রহা হম্', যাৎ রহা হম্,—এইরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু হিন্দি ভাষায় বর্ত্তমান কালের রূপ—'যা রাহা হম্' এবং অতীত কালের রূপ—'যা তা রাহা হম্'

---

* তালব্য শ-স্থানেও শব্দভেদে হ হয়, যেমন শুয়া স্থানে 'হুয়া'।

† যাই-আর-গি বলিলে 'চলিয়া যাইতেছি' বুঝায়। এইরূপে গি (যাইয়া চলিয়া) যুক্ত করিয়া—যাইরামগি, যাইএামগি, যারামগি এইরূপ ব্যবহার হয়।

বা 'যাৎ রাহা হম্' বা 'যাইৎ রহা হম্'—এই কয়টি রূপ লইয়া শ্রীহট্টের কথায় বর্ত্তমান কালের রূপ 'যা রাম্', 'যাইরাম্' 'যাইএাম'—এই তিনটি পদ সাধিত হইয়াছে। 'যাইতেছ' পদের হিন্দি রূপ 'যাতে হোঁ', 'যাতা হায়'—এই কয়টি হয়। 'যাইতেছিলে'—ইহার হিন্দি 'যাতা থা', 'যাতা রহা হায়, যাৎ রহা হায়'—এই কয়টি পদ লইয়া শ্রীহট্টের 'যাইতেছ' শব্দের রূপান্তর 'যারায়', 'যাইৎরায়' ও 'যাইরায়'—এই রূপগুলি দাঁড়াইয়াছে, সন্দেহ নাই। 'যাইআর' রূপটি বোধ হয় 'যাই আর কি', ক্রমে 'যাই আর গি', পরে 'যাই আর' পদ দাঁড়াইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে কি না, জানি না।

Indicative Mood, Present Progressive formএ ক্রিয়াপদের রূপ নিম্নলিখিত রূপে হয় ;—

আমি, আমরা—যাই আর* যাইরাম, যাইএাম, যারাম।

তুমি, তোমরা—যাইরায়, যাইৎরায়, যারায়।

আপনে, আপনারা—যাইরা, যাইএা, যারা।

তুই, তোরা—যাইরে, যাইএ, যারে।

সে, তারা—যায়ের, যায়।

তাইন, তেনি, তারা—যায়রা, যারা, যাইএা।

Past Progressiveএর রূপ ;—

আমি, আমরা—যাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম,—যাইতাম লাগছিলাম, যাইতাম আছিলাম, যাওন ধরছিলাম, যাই (তুমি যখন আও, আমি তখন যাই—এখানে অতীত কালে বর্ত্তমান কালের রূপ 'আও' এবং 'যাই' ব্যবহৃত হইয়াছে)।

তুমি, তোমরা—যাইতে আছিলায়, যাইতায় আছিলায়, যাইতায় লাগছিলায়, যাওন ধরছিলায়, যাইতে আরম্ভ করছিলায়, যাও।

তুই, তোরা—যাইতে আছিলে, যাইতে লাগছিলে, যাওন ধরছিলে, যাইতে আরম্ভ করছিলে, যাস্।†

তিনি, তাইন, তাঁরা—যাইতা আছিলা, যাইতা লাগছিলা, যাইতে লাগছিলা, যাওন ধরছিলা, যাইতে আরম্ভ করছিলা, যাইন।

সে, তারা—যাইত আছিল্ বা আছিল, যাইত লাগ্ছিল্ বা লাগ্ছিল, যাওন ধর্ছিল্ বা ধর্ছিল, যাইতে আরম্ভ কর্ছিল্ বা কর্ছিল, যায়;

* এই আর শব্দের কোন ঐতিহাসিক মূল ধরিতে পারা যায় নাই।

† তোমরা কর্ত্তা হইলে—যাইতে আছলায়, যাইতে লাগছিলায়, যাইতে আরম্ভ করছিলায়, যাওন ধরছিলায়, যাও ইত্যাদি রূপ হইবে।

Future Progressive-এর রূপ ;—

আমি আমরা—যাইতে রইমু, যাইতাম লাগমু, যাইতে আরম্ভ করমু।

তুমি, তোমরা—যাইতে রইবায়, যাইতায় লাগবায়, যাইতে আরম্ভ করবায়।

তুই, তোরা—যাইতে রইবে, যাইতে আরম্ভ করবে, যাইতে লাগ্‌বে, যাওন ধরবে।

তিনি, তাঁরা—যাইতে রইবা, যাইতে আরম্ভ কর্‌বা, যাইতে লাগ্‌বা, যাওন ধরবা।

সে, তারা—যাইতে রইব, যাইতে লাগ্‌ব, যাইতে আরম্ভ কর্‌ব, যাওন ধর্‌ব।

Present Indefinite-এর রূপ ;—

আমি, আমরা—যাই

তুমি, তোমরা—যাও।

তুই, তোরা—যাস্‌।

তিনি, তাইন, তাঁরা—যাইন্‌।

আপনি, আপনারা—যাইন।

Past Indefinite-এর রূপ ;—

আমি, আমরা—গেছিলাম বা গেছলাম।

তুমি, তোমরা—গেছিলায় বা গেছলায়।

তুই, তোরা—গেছিলে বা গেছ্‌লে।

তাইন (তিনি), তাঁরা—গেছিলা বা গেছ্‌লা।

আপনে, আপনারা—গেছিলা বা গেছ্‌লা।

Future Indefinite এর রূপ ;—

আমি, আমরা—যাইমু।

তুমি, তোমরা—যাইবায়।

তুই, তোরা—যাইবে।

তিনি, তাঁরা—যাইবা।

আপনে, আপনারা—যাইবা, যাইবাইন।

'নহে' শব্দের যোগে ধাতুর অন্তে ভবিষ্যৎ কালে তাম, তায়, তা, তে, ত বিভক্তি প্রযুক্ত হয় এবং 'নহে' স্থানে 'নায়' হয় ; যথা,—

আমি, আমরা—যাইতাম নায়।

তুমি, তোমরা—যাইতায় নায়।

তুই, তোরা—যাইতে নায়।

সে, তারা—যাইত নায়।

তাইন, তাঁরা—যাইতা নায়।

তিনি, তাঁরা—যাইতেন নায়, যাইতা নায়।

আপনে, আপনারা—যাইতেন নায়, যাইতা নায়।

জিজ্ঞাসা এবং তদুত্তর বুঝাইলেও ভবিষ্যৎকালে বিকল্পে তাম, তায়, তা, তে, ত বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—

প্রশ্ন।　　আমি, আমরা কই যাইতাম (কই যাব)?
তুমি, তোমরা কই যাইতায়?
তুই, তোরা কই যাইতে?
সে, তারা কই যাইত?
তাইন, তাঁরা কই যাইতা?
তিনি, তাঁরা কই যাইতেন, কই যাইতা?
আপনি, আপনারা কই যাইতেন, কই যাইতা?

উত্তর।　　আমি, আমরা বাড়িৎ যাইতাম।
তুমি তোমরা বাড়িৎ যাইতায়।
তুই, তোরা বাড়িৎ যাইতে।
সে, তারা বাড়িৎ যাইত।
তাইন, তাঁরা বাড়িৎ যাইতা।
আপনি, আপনারা বাড়িৎ যাইতা।

আদেশ প্রাপ্ত হইয়া করার আবশ্যক হইলেও এইরূপ হয়, যথা,—'আমাকে বাড়ি যাইতে আদেশ করা হইয়াছে, এই অর্থে—'আমি বাড়িৎ যাইতাম'; 'তোমাকে আদেশ করা হইয়াছে'—'তুমি যাইতায়'; 'তাহাকে আদেশ করা হইয়াছে'—'সে যাইত'; 'আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে'—'আপনি যাইতা, যাইতেন'; 'তোকে আদেশ করা হইয়াছে'—'তুই যাইতে' ইত্যাদি। কিন্তু যাও, খাও, দেও, কর, লেখ এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উত্তর দিতে হইলে ভবিষ্যৎকালে তাম, তায় প্রভৃতি বিভক্তির পরিবর্ত্তে মু, বায়, বে, ব প্রভৃতি বিভক্তির ব্যবহার করিতে হয়, যথা—'বাড়িৎ যাও', ইহার উত্তর—'দুই দিন বাদে যাইমু' হইবে; 'দুই দিন বাদে যাইতাম' বলিলে অশুদ্ধ হইবে; এইরূপে 'খাও' আদেশ করিলে 'খাইমু', 'যাও'—বলিলে 'যাইমু'—'লেখ' বলিলে 'লেখিমু' ইত্যাদি।

ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও তাম, তায় প্রভৃতি বিভক্তিগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা,—'আমি খাইতাম'—আমার খাবার ইচ্ছা হইয়াছে; 'সে ঘুমাইত'—তাহার ঘুমাইবার ইচ্ছা হইয়াছে; 'তুমি ভাগিতায়'—তোমার পলাইবার ইচ্ছা হইয়াছে; 'তারা যাইতা'—তাদের যাবার ইচ্ছা হইয়াছে ইত্যাদি। কিন্তু তাম, ত প্রভৃতি অতীত কালের বিভক্তিগুলি কিরূপে ভবিষ্যৎকালে চলিয়া গেল, এই প্রশ্নটি মীমাংসার একটি সূত্র পাওয়া গিয়াছে; ঐ সূত্র ধরিয়া মীমাংসা করিলে বোধ হয়, করা যাইতে পারে। তাহা এই যে—'আমি যাইতাম', 'তুমি যাইতায়', 'সে যাইত', এই দৃষ্টান্তে তাম, তায়, ত এই তিনটি বিভক্তি 'তে' এবং 'হইবে' এই দুইটির যোগে উৎপন্ন হইয়া 'যাইতে হইবে' অর্থে 'আমি যাইতাম', অর্থ—'আমার যাইতে

হইবে'; 'তুমি যাইতায়', অর্থ—'তোমার যাইতে হইবে বা যাইতে হয়'; 'সে যাইত', অর্থ—'তাহার যাইতে হইবে বা হয়' ইত্যাদি রূপ বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার অতীত কালেও এই রূপটির ব্যবহার আছে; যথা—আগে আমি যাইতাম, এখন আর যাই না; আগে তুমি যাইতায়, এখন যাও না কেনে?' আগে সে যাইত, এখন যায় না ইত্যাদি। অতীত কালের বিভক্তিগুলি ভবিষ্যৎকালে ব্যবহৃত হইবার যুক্তি এই যে, 'আমি যাইতে পারি' স্থানে আমি যাইতাম পারি, 'তুমি যাইতে পার' স্থানে তুমি যাইতায় পার, 'সে যাইতে পারে' স্থানে সে যাইত পারে, এইরূপ ব্যবহার এবং আমার যাইতে, বা যাইবার প্রয়োজন ছিল, এই বাক্য স্থানে আমি যাইতাম আছিল্, তোমার যাইতে বা যাইবার প্রয়োজন ছিল, এই বাক্যস্থানে তুমি যাইতায় আছিল্ বা আছিলায়, তাহার যাইতে বা যাইবার প্রয়োজন ছিল, ইহার স্থানে সে যাইত আছিল্ বা আছিল, এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে, 'তে' বিভক্তি স্থানেই শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানের 'তাম', 'তায়', 'ত', 'তা', 'তে' বিভক্তির ব্যবহার বিহিত হইয়াছে। এইজন্য 'আমি যাইতাম' কথাটি আমার যাইবার প্রয়োজন আছে, আমি যাইতে বাধ্য আছি, আমার যাইবার ইচ্ছা আছে, আমি যাইতে সংকল্প করিয়াছি, ইত্যাদি অর্থে ভবিষ্যৎকালেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে গিয়া, গিয়াহারি (সারিয়া), এইরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু 'যাইয়া' পদের ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না। 'বলা' ক্রিয়ার ব্যবহার ত কোথাও দৃষ্ট হয় না, 'কহা' ক্রিয়াই সর্ব্বত্র প্রচলিত। 'দাঁড়াও' অর্থে 'খাড়াও' (খাড়া হও), 'উবাও'—এই দুইটি কথাই প্রচলিত; চল অর্থে হাট, ব'স অর্থে বও, শোও অর্থে হোও ইত্যাদি।

Indicative, Present-perfect-এর রূপ;—

গম্ ধাতু

আমি, আমরা—গেছি।

তুমি, তোমরা—গেছ।

তুই, তোরা—গেছস্।

সে, তারা—গেছে।

তাইন, তাঁরা—গেছইন।

আপনি, আপনারা—গেছইন।

Past-perfect-এর রূপ;—গিয়া হার্‌ছিলাম্, হার্‌ছিলায়, হার্‌ছিল্।

Indicative, Present continuous-এর রূপ;—

দেখ্ ধাতু

আমি, আমরা—দেখি আইয়ার, আইরাম্, আরাম্।

তুমি, তোমরা—দেখি আইরায়, আরায়।

তুই, তোরা—দেখি আইরে, আরে।

সে, তারা—দেখি আয়ের।

তাইন, তারা—দেখি আইরা, আরা, আইএা।

আপনি, আপনারা—দেখি আইরা, আরা, আইএা।

Imperative Mood (অনুজ্ঞার) রূপ ;—

আমি, আমরা—যাই, যাইগি, যাইগিয়া।

তুমি, তোমরা—যাও, যাওগি, যাওগিয়া।

তুই, তোরা—যা, যাগি, যাগিয়া।

সে, তারা—যাউক, যাউক্‌গি, যাউক্‌গিয়া।

তাইন, তাঁরা—যাউকা, যাউকাগি, যাউকাগিয়া।

আপনি, আপনারা—যাউকা, যাউকাগি, যাউকাগিয়া।

অনুজ্ঞায় উত্তম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার অন্তে করিমগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে কখন কখন 'দ' 'দন', 'দে' 'দেন'—এই কয়টি অব্যয় পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে, যথা—আমি 'যাইদ', যাইগিদ, 'যাইগিয়াদ',—দন—দে—দেন, সে যাউক দ, 'যাউক গিদ, যাউকগিয়াদ,—দন—দে। এই দে দেন, দ দন—দেও বা দেন কথার সংকোচন ভিন্ন আর কিছুই নয়। ফলতঃ যাইতে দেও, যাইতে দেন, যাইতে দে এই কথাগুলি সঙ্কোচিত হইয়াই যাইদ, যাইদেন, যাইদে, যাইদন কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। দে শব্দের তুচ্ছার্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে ; যথা—চল্ যাইদে। অন্য সবগুলি সর্ব্বাবস্থাতেই ব্যবহৃত হয় ; যথা,—চল্ যাইদ, যাইদন, যাইদেন, চল যাইদে হয় না। চলইন্ যাইদ,—দন—এইরূপই ব্যবহার।

এই অব্যয় পদগুলি ব্যবহার করিবার বিশেষ বিশেষ সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। কেহ কেহ ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলে, সেই ঘটনার ফলাফল তুচ্ছ করিয়া শ্রোতা তদুত্তরে এই অব্যয়টি যোগ করিতে পারেন। ঘটনা যথা—গোপাল চলিয়া গিয়াছে, রাম মরিয়া গিয়াছে, বিড়াল দুধ খাইয়া ফেলিয়াছে, এই সব ঘটনার ফলাফল তুচ্ছ করিয়া শ্রোতা উত্তরে বলিতে পারেন, যাউকদ, যাউকগিদ, খাউকদ, খাউকগিদ, মরুকদ, মরুকগিদ, মরি যাউকগিদ, খাইলাউকদ (খাইয়া ফেলুক গিয়া, খাইয়া লউক গিয়া, খাইয়া নিক গিয়া)। যাউক দে, খাউক দেন, তুচ্ছার্থে অর্থাৎ পূর্ব্ববক্তা সামান্য লোক হইলে তাহার কথার উত্তরেই কেবল এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ হয়। যখন কোন একটি কার্য্য বা ঘটনা হইবার কথা ছিল না, পরন্তু তাহা হইয়া গিয়াছে, সেই কার্য্য বা ঘটনার ফল তুচ্ছ করিয়াই এইরূপ বাক্যের ব্যবহার হইয়া থাকে ; যথা,—মহাশয় ! গোপালের থাক্‌বার লাগি (জন্য) কত কইলাম, রৈল না, গেলগিয়া ; ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—যাউকগিদ (যাইতে দেও), কিতা ঐত থাকিয়া (থাকিয়া কি হইবে)।

দ, দন প্রভৃতি কথাগুলি অন্যান্য ভাবপ্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনুরোধার্থে যথা—'চাইট্টা ভাত খাউকাদন (চারিটা ভাত অনুগ্রহ করিয়া খান, মহাশয়)।' বাধা অপনোদনার্থে, যথা,—মারিও না, খাউকদ (তাড়াইও না, খাইতে দেও)। শ্রেষ্ঠতা বা যোগ্যতা প্রকাশার্থে, যথা—না, সে পারত নায়, আমি যাই দন (না, সে পারবে না, আমি যাই দেখি), তুমি পারতায় নায়, গোপাল যাউক দ, তুই পারতে নায়, সে যাউক দে (তুমি পারবে না, গোপাল যাউক; তুই পার্‌বি নে, সে যাক্)।

সর্ব্বনাম-পদ।—আমি, তুমি, তুই, আপনে, তিনি সে (হে), তাইন, ই, হি, ইটা, হিটা, ঔ, হৌ, ওটা, হৌটা, ওটা, ও, ওগু, ওগুয়া, হোগু, হোগুয়া, ইগুয়া, হিগুয়া, কে, কেগু, কেগুয়া, কেটা, কেলা, ইলা, হিলা, যে, যাইন, যেটা, যেগু, যেগুয়া, যেতা, ইতা, ওতা, হতা, এইতা, ঐতা, হেই, হেইতা, হোতা, ঔতা, এই, হেই, এই সর্ব্বনামগুলি শ্রীহট্টের প্রায় সকল স্থানেই প্রচলিত।

'আমি' শব্দ বৃদ্ধ মহিলা-মহলে আত্মদুঃখ বা আত্মগ্লানি প্রকাশ করিবার সময়ে 'মুই'-রূপ ধারণ করিয়া ক্রিয়াপদটারও বিকৃতি সাধন করে, যথা,—হায়, মুই কপালপুড়ী কি কুক্ষণে আইয়া পাড়া দিছ্‌লু। অর্থ—হায়, আমি হতভাগিনী কি কুক্ষণেই এ মাটীতে পা দিয়াছিলাম। এই দৃষ্টান্তের দিছ্‌লুর সহিত কলিকাতা অঞ্চলের দিছিলুম্ বা দিছিনু কথার তুলনা করা আবশ্যক।

'তুমি' শব্দস্থানে সম্ভ্রমার্থে আপ্‌নে হয়, তদ্ শব্দ স্থানে সম্ভ্রমার্থে তাইন বা তিনি হয়, কিন্তু তুচ্ছার্থে সে বা হে হয়। ইহা শব্দ স্থানে ই, ইতা, ইটা, ইলা, ইগু, ইগুয়া, ওগু, ওগুয়া, ওতা, এইতা, ঔতা, এই সমস্ত সর্ব্বনামের ব্যবহার স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। ই, হি, ও, হো প্রভৃতি নির্দ্দেশবাচক সর্ব্বনামগুলি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইলে বিশেষ্য পদ যদি কোন চেপ্টা বস্তুর প্রতিপাদক হয়, তাহা হইলে উহাদের সঙ্গে খান শব্দ ব্যবহার করিতে হয়; নতুবা গু, গুয়া, টা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ করাই আবশ্যক। ফলতঃ ইদম্ শব্দ স্থানে স্থানভেদে ই এবং এ, এই দুই পদ হয়, যথা—ইবার, এবার, অর্থ—এইবার। ইবছর, এবছর, অর্থ—এই বৎসর। দক্ষিণ শ্রীহট্টে 'এ' শব্দের ব্যবহারই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সেই শব্দস্থানে হেই, হি, হ, হয়। যথা—হিদিন, হেই দিন, হদিন। খান শব্দ জিনিষ এবং স্থানবাচক; যথা,—এইখান, অর্থ—এই জিনিষ বা এই স্থান। তা শব্দ জিনিষ ও বিষয়বাচক; যথা—ইতা, অর্থ এই জিনিষ বা এই বিষয়, হিতা অর্থে সেই জিনিষ বা সেই বিষয়; হুতা অর্থেও তাহাই।

কিম্ শব্দস্থানে কি এবং কিতা—এই দুইটি পদ হয়। কিতা শব্দ 'কি তাহা', এই বাক্যেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়। কি তা তুমি চাও, অর্থ—কি তাহা, তুমি যাহা চাহিতেছ? কিতা কও; অর্থ—কি তাহা, তুমি যাহা কহিতেছ? কিতা খাও, অর্থ—কি তাহা, তুমি যাহা

খাইতেছ? এই রকম ব্যাখ্যা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কিতা শব্দের তা ভাগের অর্থ তাহা; কিন্তু ইতা শব্দের তা ভাগের অর্থ তাহা হইলেও এখানে তা ভাগের অর্থ বস্তু বা বিষয়; ইতা শব্দ এতদ্ শব্দেরই অপভ্রংশ, ই অর্থ এ এবং তা অর্থ তদ্ বা তাহা হইলেও এখানে তদ্‌বস্তু বা তদ্‌বিষয় বুঝিতে হইবে। কিতা শব্দের অর্থ যেমন কি+তাহা, সেইরূপ কি+বস্তু বা কি+বিষয়ও হইতে পারে, কিন্তু ইতা শব্দের অর্থ শুধু এই বস্তু বা এই বিষয় ভিন্ন 'এই তাহা' অর্থ হইতে পারে না। এইরূপ যেতা- যে বস্তু বা যে বিষয়; নানানতা—নানা বস্তু বা নানা বিষয়; একতা—এক বস্তু বা এক বিষয়; অততা—অত বস্তু বা অত বিষয়; যততা—যত বস্তু বা যত বিষয় ইত্যাদি।

আবার অততা শব্দে অতটা এবং এই পরিমিত—এই দুই রকম অর্থও বুঝায়; যততা, কততা, বহুৎতা প্রভৃতি শব্দেরও এইরূপ অর্থ হয়। অতএব দেখা যায়, তা-শব্দ স্থলভেদে বিশেষ্য এবং সর্ব্বনাম, এই দুই পদ হয়। যিনি শব্দ সম্ভ্রমার্থে যাইন বা যেইন হয়, যথা—যেইন বা যাইন আমারে শিক্ষা দেইন, তাইন আমার গুরু হইন্; এই যাইন শব্দের রূপ, যথা;—

	একবচন	বহুবচন
১মা—	যাইন	যাঁরা।
২য়া—	যাঁনে, যাঁরে, যাএ	যারারে, যানরারে।
৩য়া—	যাঁরে, যান্‌রে দিয়া*	যাঁরারে দিয়া,
	যাঁররা, যান্ দ্বারা (দুয়ারা)	যাঁরার হাতে,
	যাঁর, যান হাতে,	যাঁরার হাতানে,
	যাঁর, যান হাতানে, যাঁর, যান	যাঁরার দ্বারা (দুয়ারা) যারার,
৪র্থী—	যাঁরে, যানে	যাঁরারে, যানরারে।
৫মী—	যাঁর, যান্ তনে,	যাঁরার থাকি, যাঁরার
	ঠান, তন্, ত, থাকি†	ঠান থাকি (স্থান হইতে)।
৬ষ্ঠী—	যান, যাঁর	যাঁরার, যানরার।
৭মী—	যাঁর মাঝে, যার ভিতরে	যাঁরার মাঝে, যারার ভিতরে।

যে সে অর্থে যেছা হয়, যথা—যেছায় ইতা করত পারে, অর্থ—যে সে ইহা করিতে পারে। যাহা তাহা অর্থে যেতা হতা হয়, যথা—আপনে যেতা কইবা, হতা করমু, অর্থ—আপনি যাহা বলিবেন, তাহা করিব। যার যার অর্থে যারযির হয়, যথা—যাও, যারযির

* ণিজন্ত ক্রিয়ার যোগেই কেবল দিয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয়; যথা,—চিঠি তোমারে দিয়া লেখাইমু।

† তনে, তন্, ত—সংস্কৃত—তস্ (তসিল্)।

জাগাৎ গিয়া বও, অর্থ—যাও, যার যার জায়গায় গিয়া বস। কোন কোন স্থানে যায়, যার শব্দও ব্যবহৃত হয়। 'যে কোন' শব্দের স্থানেও যেছা শব্দ হয়, যথা—যে কোনটা ইচ্ছা হয়, লইয়া যাও, এই বাক্যের স্থানে যেছাটা ইচ্ছা হয় (অয়), লই যাও, এইরূপ হইবে। যাহা কিছু স্থানে যেছাতা, অর্থ—যে কোন জিনিষ, যতটুকু স্থানে যতখান বা যতখিনি, আবার কোন কোন সময়ে যততা এবং যতটুক্ শব্দও ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বনামের রূপ ক্রমে দেখান যাইতেছে।

অস্মদ্‌শব্দ।

	একবচন	বহুবচন
১মা	—আমি, মুই	আমরা
২য়া	—আমারে, মোরে	আমরারে
৩য়া	—আমার, মোর হাতে দিয়া* হাতানে বা দুয়ারা	আমরার হাতে হাতানে† বা দুয়ারা (দ্বারা)
৪র্থী	—আমারে, মোরে	আমরারে
৫মী	—আমার ঠানত (স্থান হইতে) আমার মাঝতনে, আমার কাছ থাকি, আমার থাকি	আমরার ঠানত ইত্যাদি
৬ষ্ঠী	—আমার, মোর	আমরার
৭মী	—আমার মাঝে, আমার ভিতরে	আমরার ভিতরে ইত্যাদি

যুষ্মৎশব্দ

	একবচন	বহুবচন
১মা	—তুমি, তুই, আপনে	তোমরা, তোরা, আপনারা
২য়া	—তোমারে, তোরে, আপনারে	তোমরারে, তোরারে, আপনারারে।
৩য়া	—তোমারে দিয়া, তোমার দুয়ারায়, তোমার হাতে, তোমার হাতানে ইত্যাদি	তোমরারে দিয়া ইত্যাদি
৪র্থী	—তোমারে	তোমরারে

* 'দিয়া' ব্যবহার করিলে সর্ব্বনামে এ যোগ করিতে হয়; যথা,—আমারে দিয়া ইত্যাদি।

† হাতানে—হাত+হনে—হাত হইতে=হাত দিয়া=হাতে।

একবচন	বহুবচন
৫মী—তোমার থাকি, তোমার কাছ থাকি, তোমার কাছ ত, তনে	তোমরার থাকি ইত্যাদি
৬ষ্ঠী—তোমার ইত্যাদি	তোমরার ইত্যাদি
৭মী—তোমার ভিতরে ইত্যাদি	তোমরার ভিতরে ইত্যাদি

তদ্ শব্দ

একবচন	বহুবচন
১মা—সে, হে, তিনি, তাইন	তারা, তাঁরা, তানরা
২য়া—তারে, তানে, তানরে	তারারে, তাঁরারে, তানরারে
৩য়া—তারে দিয়া, তানে দিয়া	তারারে দিয়া ইত্যাদি
৪র্থী—তারে, তানে, তানরে,	তারারে, তানরারে ইত্যাদি
৫মী—তার মাঝ্ থাকি, তান মাঝ্ থাকি*	তারার মাঝ্ থাকি ইত্যাদি
৬ষ্ঠী—তার, তানরার, তাঁর	তারার, তানরার
৭মী—তার মাঝে ইত্যাদি	তারার মাঝে ইত্যাদি

এতদ্ শব্দ

একবচন	বহুবচন
১মা—এ, এইন (সম্ভ্রমার্থে)	এরা, এনরা, এঁরা
২য়া—এরে, এনে বা এনরে (সম্ভ্রমার্থে)	এরারে, এনরারে
৩য়া—এরে দিয়া, এনে দিয়া, এনরে দিয়া ইত্যাদি	এরারে দিয়া ইত্যাদি
৪র্থী—এরে, এনে	এরারে ইত্যাদি
৫মী—এর থাকি ইত্যাদি	এরার থাকি ইত্যাদি
৬ষ্ঠী—এর ইত্যাদি	এরার ইত্যাদি
৭মী—এর মাঝে ইত্যাদি	এরার মাঝে ইত্যাদি।

এইরূপে সকল সর্ব্বনামেরই রূপ হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে সাধারণ অর্থে, সম্ভ্রমার্থে ও তুচ্ছার্থে যুষ্মৎ, তদ্, এতদ্, অদস্ প্রভৃতি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হয়, যথা,—যুষ্মৎ শব্দের সাধারণ

* মাঝ থাকি—ভিতর হইতে ; কাছ থাকি—নিকট হইতে ; হাত থাকি—হাত হইতে

অর্থে 'তুমি', সম্ভ্রমার্থে 'আপনি', তুচ্ছার্থে তুই। তদ্ শব্দের সাধারণ অর্থে 'ও', সম্ভ্রমার্থে 'তিনি' বা 'তাইন', তুচ্ছার্থে সে বা 'হে'। এতদ্ শব্দের সাধারণ অর্থে ও সম্ভ্রমার্থে 'এইন', ইনি, তুচ্ছার্থে 'এ', 'হটা', 'ইগুয়া', 'ইগু', 'ওগু', 'ওটা', 'ইলা', 'এইটা'। অদস্ শব্দের সাধারণ অর্থে 'ও', সম্ভ্রমার্থে 'হি', 'হেইন', 'হেই' (সেই), তুচ্ছার্থে 'হি', 'হিগুয়া'. 'হিটা', 'হেইটা', 'হ', 'হটা', 'হগুয়া', হৌটা, হেইট, ঐটা, এইরূপ আকৃতি ধারণ করিয়া প্রথমাদি বিভক্তির রূপ হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃপদের ব্যবহার।—কর্ত্তৃপদে কখন বা একার যুক্ত হয়, কখন বা হয় না; যাওয়া, আসা, শুয়া, ঘুমান, দাঁড়ান, বসা, চলা, মরা, বাঁচা, উঠা, পড়া প্রভৃতি ক্রিয়ার যোগে বিশেষ্য পদের অন্তে একার যোগ হয় না, যথা,—'তার বাপে আইছে', 'রামে যায়', 'গোপালে মরি গেছে', 'নবীনে বাঁচিত নায়' এইরূপ হয় না, 'তার বাপ আইছে', 'রাম যায়', 'গোপাল মরি গেছে', 'নবীন বাঁচিত নায়', এইরূপ হইবে। অন্যান্য ক্রিয়ার যোগে প্রায়ই কর্ত্তায় একার যোগ হইয়া থাকে; যথা,—'গোপালে কইছে', 'রামে লেখিছে', 'নবীনে দিছে', 'শ্যামে খায়' ইত্যাদি। নিকৃষ্ট জন্তু কর্ত্তৃপদ হইলে প্রায়ই একার যুক্ত হয়, যথা,—'গরুয়ে ঘাস খায়', 'ঘোড়ায় লেদে (হাগে)', 'পাখীয়ায় ডিম পাড়ে' (পাখীয়ায় উড়ে হয় না, কিন্তু পাখীয়ায় উড়া দেয় হয়) ইত্যাদি। আবার অপ্রাণিবাচক শব্দ কর্ত্তৃপদ হইলে একার যুক্ত হয় না, যথা,—'টেবিল লড়ে' (টেবিলে বাধা দেয়—হয়, কারণ, টেবিল দেয় ক্রিয়ার কর্ত্তা হওয়াতে এখানে মানুষের কাজ করিতেছে), 'জুতায় মচ্ মচি ডাকে' হইতে পারে। কারণ, জুতা 'ডাকে' ক্রিয়ার কর্ত্তা হওয়াতে এখানে প্রাণিবাচক বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

সম্বোধন-পদের ব্যবহার।—স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিতে প্রায়ই গো শব্দ ব্যবহৃত হয়; যথা,—কি গো মা! কিতা কয় গো! মা গো, ই কে গো মা? অবায় আও গো;* তুমি কই গেলায় গো, তুই কে গো? তোরে ত চিন্‌লাম না গো। 'কে গো'—কথাটি অনুসন্ধান বুঝাইলে শুধু স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিবার সময়েই ব্যবহৃত হয়। 'কেগু', 'কেগুয়া', 'কেটা', 'কে', 'কেলা', 'কে-ও', এইগুলি দ্বারা স্থানভেদে স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই সম্বোধন করা যায়; যেহেতু এই গুলির অর্থ—'কে হে'। এখানে 'গু' বা 'গুয়া' 'গুটা' শব্দেরই রূপান্তর বলিয়া বোধ হয়; কারণ, 'কেটা' অর্থাৎ 'কোনটা' বা 'কোন লোকটা'—এই বাক্যের 'টা' ভাগ 'গুটা' শব্দ হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে, এ সিদ্ধান্তে অনেক পণ্ডিতের মত আছে দেখা যায়। তন্মধ্যে 'কিগু' বা 'কিগুয়া' শব্দ তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয়, যথা,—কিগুরে!—অর্থ 'কে রে!' 'কেটারে', 'কেলারে'ও এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু 'কেটারে', 'কেলারে' এইরূপ সম্বোধনের ব্যবহার বড় একটা শুনা যায় না।

'বে' সম্বোধনটি যে হিন্দি ভাষা হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কৈ রে বে, কেগুরে বে—এইগুলি 'কে রে বাবু' কথার সঙ্কোচন বলিয়াই বোধ হয়,

* 'অ' অর্থ এ, 'বায়' অর্থ বাগে বা দিকে।

কারণ, বাবু শব্দ দ্রুতবেগে উচ্চারিত হইলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া দূরস্থিত কর্ণে গিয়া পহুঁছে, তাঁহাতেই উহা ঠিক 'বো' বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে; এই নিয়মে 'ওরে বাবু'—'ওরে বো', 'কি রে বাবু'—'কি রে বো' বা 'কিতা রে বো' (কি তাহা রে বাবু) হইয়া পড়িয়াছে। 'না রে বাবু, পারব না', এই কথাটি খুব তাড়াতাড়ি উচ্চারণ করিয়া দেখিলেই উপরিউক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা হৃদয়ঙ্গম হইবে, সন্দেহ নাই।

'বা' সম্বোধন।—কে রে বা? ও বা, কই যাও? হুন রে বা, হুনি যাও বা, কি রে বা—এই সম্বোধনগুলির অন্তস্থিত 'বা' কথাটা 'বাবা' শব্দের দ্রুত উচ্চারণজনিত সঙ্কুচিত ধ্বনি ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সিদ্ধান্তে আমার উপনীত হইবার কারণ এই যে, 'বাবু' ও 'বাবা' শব্দের অন্তস্থিত ব-কারটি অন্তস্থ ব-কার হওয়াতে উহা ইংরেজী v-বর্ণের বা পারসী 'و' বর্ণের দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ প্রাপ্ত হইয়া লোপাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই 'বাবু' শব্দের অন্ত্য 'বু'-ভাগের 'ব' লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উকার মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া 'বাবু' শব্দকে 'বাউ' করিয়া তুলিয়াছে; কালে ঐ 'বাউ' 'বো'রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 'বাবা' শব্দেরও ঐরূপেই শেষের 'বা'-ভাগটি অন্তস্থ উচ্চারণ গ্রহণ করিয়া 'ওয়া'রূপ ধারণ করাতে 'বাওয়া'রূপে পরিণত হইলে পরে কালে দ্রুত উচ্চারণবশতঃ অন্তস্থিত 'ওয়া'-ভাগ লুপ্ত হইয়া আদ্য 'বা'-ভাগ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া বাবা শব্দকে বা-রূপে পরিণত করিয়াছে; এই কারণে 'কি রে বা' অর্থ—'কি রে বাবা' এবং 'কি রে বো' অর্থ—'কি রে বাবু', এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সাহস করা যাইতে পারে।

লিঙ্গভেদ।—পুরুষ মাইয়া, বেটা বেটী, মুনি ঝেলা, নর মাদি বা মাদা, লিঙ্গ-ভেদ করিবার জন্য এই যুগ্ম পদগুলির ব্যবহার হইয়া থাকে। এইগুলি বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসিয়া ঐ বিশেষ্যের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়; যথা,—পুরুষ মানুষ, মাইয়া মানুষ, বেটা ছাবাল, বেটী ছাবাল; মুনি ছাবাল, ঝেলা ছাবাল; নর বাচ্চা, মাদি বাচ্চা ইত্যাদি। বেটা ও বেটী, পুরুষ ও মাইয়া, এইগুলি বিশেষ্যরূপেও ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে বেটা-বেটী, মুনি-ঝেলার সঙ্গে 'গু' শব্দ যুক্ত হইয়া বেটাগু, বেটীগু, মুনিগু, ঝেলাগু এইরূপ ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উহার সঙ্গে আর বিশেষ্য পদ যোগ করিবার নিয়ম নাই, যথা,—সে মুনিগু, চাম্পা ঝেলাগু; কিন্তু সে মুনিগু মানুষ, চাম্পা ঝেলাগু মানুষ, এইরূপ ব্যবহার নাই; সে মুনি, চাম্পা ঝেলা—এইরূপ ব্যবহার আছে। নর-মাদি পদদ্বয় নিকৃষ্ট জন্তুর প্রতি প্রযুক্ত হয়, মানুষে হয় না—নর ছাবাল, মাদি ছাবাল, এইরূপ হয় না।

বিভক্তি ও বচন।—প্রথমা বিভক্তি স্বাভাবিক, উহার আকৃতি বাঙ্গালার অন্যান্য জেলার যেরূপ, শ্রীহট্টেও ঠিক সেইরূপ। নামবাচক বিশেষ্যের ষষ্ঠী বিভক্তি স্থানভেদে বা সবডিবিজান-ভেদে এর এবং অর, বহুবচনে রার, এরার বা তারার—এইরূপ আকৃতি ধারণ করে; যথা—গোপালের বা গোপালর বাপ, রামের বা রামর বউ। বহুবচনের দৃষ্টান্ত যথা,—রাম এরার বাড়ী যাইমু, গোপাল এরার দেশ যাইমু, ই নিয়ম নাই। মানুষবাচক

বিশেষ্যের ষষ্ঠীর বহুবচনে সকলর বা হকলর, সকলের বা হকলের—এই আকৃতিও হইয়া থাকে; যথা—ঠাকুর সকলের বা ঠাকুর সকলর বা ঠাকুর হকলের বা ঠাকুর হকলর নিমন্ত্রণ। পণ্ডিত হকলর বা হকলের, সিপাই হকলর বা হকলের, সাহেব হকলর বা হকলের, তেলী হকলর বা হকলের, মালী হকলর বা হকলের, হিন্দু হকলর বা হকলের ইত্যাদি। নিকৃষ্ট প্রাণীর একবচন ও বহুবচনের রূপ সমান; যথা,—

একবচন	বহুবচন
১মা—গরু	গরু*
২য়া—গরুরে	গরুরে
৩য়া—গরু দিয়া	গরু দিয়া
৪র্থী—গরুরে	গরুরে
৫মী—গরু থাকি	গরু থাকি
৬ষ্ঠী—গরুর	গরুর
৭মী—গরুর মাঝে	গরুর মাঝে

কখন কখন গরুগুণ্, ছাগলগুণ্ ঘোড়াগুণ্, কুক্কুরগুণ্,—এইরূপে বহুবচনান্তও হইয়া থাকে, যথা—গরুগুণ ডাকাই দেও (তাড়াইয়া দেও)। এই গুণ-শব্দ গুনো বা গুল শব্দেরই রূপান্তর। অপ্রাণিবাচক শব্দের বহুবচন 'গুণ' ও 'টাইন' দিয়া হয়। চেপ্টা জিনিষ হইলে, খানাইন, খিনি—এইরূপ শব্দদ্বারা গঠিত হয়, যথা—চাউলগুণ, পাতিলগুণ কাপড় খানাইন বা খিনি। বস্তুবাচক বিশেষ্যের বহুবচনের ব্যবহার না থাকিলেও পানী ফুটাইন, দুধ ফুটাইন, রস ফুটাইন, তেল খামাইন, ঘি খামাইন, এইরূপে বহুবচনান্ত করিয়া ব্যবহার করা হয়। লাকড়ি খানাইন ভিজি গেল, চিনি খানাইন খাই লাও, ফালাইও না; দুধ ফুটাইন পড়ি গেল, মসলা খানাইন পিশি লাও, পাওর পেক খানাইন ধই লাও—এইরূপ বাক্যগুলি কেবল বস্তুটির অল্পতা বুঝাইলেই বহুবচনান্ত করিয়া ব্যবহার করিবার নিয়ম। লাকড়ি খানাইন ভিজি গেল্—ইহার অর্থ অল্পকয়েকখানা লাকুড়ি, তাহাও ভিজে গেল। চিনি খানাইন খাই লাও, অর্থ—অল্প একটু চিনি রয়েছে, খেয়ে ফেল ইত্যাদি।

দ্বিতীয়া বিভক্তি।—'রে' বা 'এরে' বা 'এ' যথা—রাম রে, রাম এরে; কিন্তু এ বিভক্তি কেবল সর্ব্বনামেই ব্যবহৃত হয়, যথা—তানে. (তাঁরে), এনে (এঁরে) ইত্যাদি।

তৃতীয়া বিভক্তির দিয়া, দুয়ারা, হাতে, হাতানে, র—এই কয়টি রূপ যথা,—ই কর্ম্ম আমার দুয়ারা হইত নায়, তারে দি লেখাই দিমু, রামর হাতানে পাঠাই দিমু, এই চিঠি আমার

---

* ইতর প্রাণীর বহুবচন ক্রিয়াপদ দেখিয়া স্থির করিতে হয়,—এই নিয়ম সকল স্থানে প্রচলিত নাই। যথা,—এই পথে গরু যায় বা গরু যাইন, ঐ গরু আয় বা ঐ গরু আইন। এখানে প্রথম দৃষ্টান্ত বহুবচনের, দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত একবচন ও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

হাতে লেখা, ইখান কার লেখা? কখন কখন বিশেষ্য পদে 'এ' বিভক্তি যোগ করিয়াও তৃতীয়ার রূপ হইয়া থাকে; যথা,—মুখে কথা কও, হাতে কাজ কর। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে তদ্ শব্দের অন্তে এ যোগ হয়; যথা,—তানে ডাক। এ স্থলে তদ্ শব্দস্থানে সম্ভ্রমার্থে তাঁ ও এ-কার যোগে চন্দ্রবিন্দু স্থানে ন হইয়া তানে (তাঁহাকে) শব্দ নিষ্পন্ন হইল।

চতুর্থী বিভক্তি—রে ও নে, এই দুইটি রূপ ধারণ করিয়া থাকে; যথা,—ফকিররে ভিক্ষা দেও, তানে বা তাঁরে কিছু খাইবার দেও।

পঞ্চমী বিভক্তির থাকি, তনে, তন, ত এই কয়েকটি আকৃতি; যথা,—কই থাকি, কই তনে, কইতন, কইত আও। অর্থ—কোথা হইতে আস? সংস্কৃত ব্যাকরণে পঞ্চমী বিভক্তিতে যে 'তসিল্' প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে, ঐ তসিলের তস্ভাগের স্-স্থানে নে বা ন হয়, অথবা স লোপ পায়; যথা,—গাছত লাম, গাছতনে লাম, গাছতন লাম, এখানে 'বৃক্ষতঃ' পদের অন্তস্থিত বিসর্গের লোপ করিয়া বৃক্ষত বা গাছত শব্দ দাঁড়াইয়াছে।

সপ্তমী বিভক্তিতে স্থানভেদে বিভক্তিলোপ বা অন্ত্যবর্ণে এ, অ, ৎ যোগ বা অন্ত্যবর্ণ হসন্তযুক্ত করিতে হয়; যথা,—বাজারে, বাজার বা বাজার্ যাইমু; ঢাকায়, ঢাকাৎ বা ঢাকা গেছ্লাম; বাড়ী বা বাড়ীৎ কোন্ দিন যাইবায়? মাটীৎ বা মাটীর মাঝে বইছ কেনে? এখানে মাটী শব্দের অন্তে ত-কারের পর এ বা অ বিভক্তি ব্যবহৃত হয় না। ঢাকাতে, বাড়ীতে, মাটীতে প্রভৃতি পদের তে বিভক্তির এ-কার সংক্ষেপার্থ লোপ করিয়া ঢাকাৎ, বাড়ীৎ, মাটীৎ, এই পদগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ক্রিয়াবিশেষণ।—কোথায়—এই ক্রিয়াবিশেষণটি সংস্কৃত ক-শব্দের অপভ্রংশ কই বা কাই, এই দুইটি রূপ ধারণ করিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে, অথবা কোন্খান* কি খান,† কিয়ান (খ লোপ পাইয়াছে), এই পদগুলিরও স্থানভেদে ব্যবহার হইয়া থাকে; যথা—কই যাও? কাই‡ যাও, কোন্খান যাও, কোনান যাও, কিখান যাও, কিয়ান যাও ইত্যাদি। সকাল সকাল, জলদি জলদি (পারসী جلد শব্দ হইতে), চালাক করিয়া, তাড়াতাড়ি, ত্বরাত্বরি, শীগ্রি শীগ্রি, এইগুলির ব্যবহার সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় এবং অবিলম্বে অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 'কোন্ দিন' অর্থ—কবে, 'কোন্ কালে' অর্থ—কখন। কি রকম, কেম্নে, কি রকমে, কেমন লাখান (কেমন লক্ষণ), কেমলাহাম, কি লাখান, কি লাহান, কিলা (কি লাখানের সংকোচ), এইগুলি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়। এব (হিন্দি অবহুঁ শব্দ হইতে উৎপন্ন), এবতক্ (অবতলক শব্দ হইতে উৎপন্ন), এব পর্য্যন্ত, অখন পর্য্যন্ত, অখনতক, এইগুলি এখনো অর্থে ব্যবহৃত হয়। অখন, এব্লা (এ বেলা), অতিল (এ তিলে বা এ মুহূর্ত্তে), অখনে, অহনে, অনে (খ লোপ করিয়া)

* খ লোপ করিয়া 'কোনান' শব্দেরও স্থানভেদে প্রয়োগ দেখা যায়।

† খান শব্দে এখানে স্থান বুঝিতে হইবে।

‡ ইহার উচ্চারণ কবাই অর্থাৎ অন্তস্থ বএ আকার দিয়া 'কোয়াই' এইরূপ উচ্চারণ।

—এইগুলি এক্ষণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যখন ও তখন শব্দের ব্যবহারও যথেষ্টই আছে;* যথা,—যখন আমি আইমু, তখন মন করিয়া দিও।

বিশেষ্য বিশেষণ।—ভাল স্থানে 'ভালা' এই হিন্দি শব্দের ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দ স্থানে মন্দ, মান্দা, খরাব, বুরা—এই কয়টিরই ব্যবহার দেখা যায়। কাল স্থানে কালা (বর্ণ অর্থে), কালা স্থানে কাল (বধির অর্থে), লম্বা স্থানে লাম্বা, বেঁটে স্থানে বাট্টি, ছোট স্থানে ছুট, চিকণ স্থানে হুরু, শক্ত স্থানে শক্ত্, মজবুৎ (পারসী) ডাট, দৃঢ় স্থানে দঢ়, কচি স্থানে কাচা ও কচ্‌মা হয়।

কতকগুলি ডাকের কথা।—হাটইন্না মুরগী বিটইন বিস্তর, ভাগনাই মান্‌ষের বড় কথা; অন্না কচুর দীঘল লতা; ভাগ নাই বেটীর নাম চাম্পা—এই কথাগুলি 'অসারের তর্জ্জন-গর্জ্জন সার' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লেখিবার ভাগ নাই মিটাইবার আহ্মি—কথাটি—কাজ করিবার সাধ্য নাই, নষ্ট করিবার ঠাকুর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এইরূপ আরও অনেক কথা আছে; অধিক উদ্ধৃত করা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

লিপিপাঠ-বিষয়ে দুই চারিটি কথা।—বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিবার সময়েও শ্রীহট্টবাসী কোন কোন শিক্ষিত লোকও দেশী উচ্চারণটি ত্যাগ করিতে লজ্জা বোধ করিয়া আপন মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়া থাকেন; বিশেষতঃ ক খ এবং প ফ—এই বর্ণগুলি অর্দ্ধরুদ্ধ স্বর-সংযোগে উচ্চারণ করাই সুধীর মনীষাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। এইরূপ উচ্চারণ যে পারস্য বর্ণমালা হইতে বাঙ্গালায় সংক্রামিত হইয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে; পারস্য ف-বর্ণের উচ্চারণ অর্দ্ধরুদ্ধ অর্থাৎ দন্তদ্বারা ওষ্ঠ স্পর্শ পূর্ব্বক ف-বর্ণের দন্তৌষ্ঠ্য উচ্চারণ করাই নিয়ম, এই ف-বর্ণের সংসর্গেই বাঙ্গালা প-বর্ণেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এই প্রকারে বাঙ্গালা খ-বর্ণও পারস্য خ-বর্ণের সংসর্গবশতঃ ঐরূপ বিকৃতভাবে উচ্চারিত হইয়া বিড়ম্বিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রীহট্টের কথিত ভাষা সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে। সেই কথিত ভাষা সহরের উপরে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—(১) সহরবাসী কায়স্থদিগের ভাষা, (২) সহরবাসী সাহাদিগের ভাষা, (৩) সহরবাসী মুসলমানদিগের ভাষা। কায়স্থ ও সাহাদিগের ভাষার মধ্যে অল্পমাত্রই তফাৎ, কায়স্থেরা যেখানে ভবিষ্যৎ কালে ক্রিয়ার অন্তে য়-প্রত্যয় করিয়া বলেন,—তুমি বাড়ীৎ যাইবায় কোন্ দিন? সাহারা সেখানে ঐ য়-প্রত্যয় স্থানে ই-প্রত্যয় করিয়া বলিয়া থাকেন,—তুমি বাড়ীৎ যাইবাই কোন্ দিন? এইরূপ "বাড়ীৎ যাইতায় নি মো (মিয়া)" স্থলে "বাড়ীৎ যাইতাই নি মো?" আইজ যাইতায় পারতায় নায় (আজ যাইতে পারিবে না) স্থলে আইজ যাইতাই পারতাই নায়, কইছলায় আইতায়, আইলায় না দু* (যে) স্থলে কইছলাই

* ইংরেজি j র মত জ-বর্ণের উচ্চারণ সহরের সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায়ই শুনিতে পাওয়া যায়।

আইতাই, আইলাই না দু? (বলেছিলে আসবে, এলে না যে) ইত্যাদি। কায়স্থ ও সাহাদের ভাষার মধ্যে শব্দ উচ্চারণকালে ধ্বনিপাতের (accentuation) কোন তফাৎ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু মুসলমানদিগের ও হিন্দুদিগের মধ্যে এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ তফাৎ আছে; হিন্দুগণ ভবিষ্যৎ কালে যেখানে তায়, তাম, তা, ত প্রত্যয় যোগ করিয়া বলিবেন, পারতায় নায় (পারবে না) অর্থাৎ পদের প্রথমাংশে (first syllableএ) ধ্বনি (accent) রাখিয়া উচ্চারণ করিবেন, সেখানে মুসলমানেরা পদের দ্বিতীয়াংশে ধ্বনি রাখিয়া বলিবেন—পার-তায় নায়। এইরূপ হিন্দু বলিবেন,—পার্‌মু (পারব), মুসলমান বলিবেন,—পার্‌মু; হিন্দু বলিবেন,—কর্‌মু, মুসলমান বলিবেন,—কর-মু। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে শব্দের বানান ও উচ্চারণগত প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দু বলেন,—'পয়সা' (স্থান-ভেদে পৈসাও) বলিয়া থাকেন, মুসলমান বলেন,—পায়ছা। কোন জিনিষের দর জিজ্ঞাসা করিলে হিন্দু বিক্রেতা উত্তর দিবে,—এক (পারসী ~এর ন্যায় ক-বর্গের উচ্চারণ করিতে হয়) পয়সা, মুসলমান উত্তর দিবে,—এক পায়ছা। হিন্দুরা র-ফলার উচ্চারণ করিয়া যেখানে বলিবেন,—প্রকৃতি, প্রসন্ন, প্রণাম, প্রমদা,—মুসলমানেরা সেখানে র-ফলার স্থলে হসন্ত র্‌ বা রেফ "ʼ" দিয়া বলিবেন,—পর্‌কির্‌তি বা পর্কির্তি, পর্‌সন্ন বা পর্সন্ন, পর্‌ণাম বা পর্ণাম, পের্‌মদা বা পের্মদা। কিন্তু সুশিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুতে বড় এতটা তফাৎ দেখা যায় না, এমন কি, অনেক সুশিক্ষিত মুসলমানের কথাও হিন্দুর কথার সঙ্গে তুলনা করিলে উচ্চারণগত বৈষম্য কিছুমাত্র টের পাওয়া যায় না।

শ্রীহট্টের কথায় লিখিত কবিতাও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সব কবিতা বা গান সেকেলে লোকের মুখে এবং অশিক্ষিত আধুনিক লোকের মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। সমালোচনার জন্য পরিশিষ্টে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতেই শ্রীহট্টের বাঙ্গালার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে এবং তাহা যে বাঙ্গালা ভাষারই রূপবিশেষ (আংশিক বিকৃতি সত্ত্বেও), এ কথা সূক্ষ্ম সমালোচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন, সন্দেহ নাই।

মানব-ভাষা যে আবহমানকাল ক্রমে বিকার প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, ইহা একটা জাজ্বল্যমান সত্য। অনুসন্ধানে দেখা যায়, বিকৃতি ক্রিয়াপদে বিভক্তি যোগ করিবার সময়েই ঘটিয়াছে এবং এইরূপ বিকৃতি সুদূর অতীত কালে প্রায় সকল ভাষায়ই ঘটিয়াছিল। তবে কবে কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; ইতিহাস তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজও সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই এবং কখনও যে হইবে, এরূপ আশাও সুদূরপরাহত। ভাষাবিজ্ঞান (Philology) যে সমস্ত প্রমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নহে; শুধু অনুমান প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার যাহা কিছু সিদ্ধান্ত। সেই ভাষা-বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে কি বলিতেছেন, দেখা যাউক;—

1. "The shifting of accent and the vowel changes connected therewith are nowhere more distinctly traceable than in the verb."

ধ্বনিপরিবর্ত্তন ও তৎসম্বন্ধীয় স্বরবর্ণ পরিবর্ত্তন ক্রিয়াপদে যতদূর স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে, এমন আর কোন পদে দৃষ্ট হয় না।

2. "None of the individual languages seems to have preserved the original stock of Aryan verbal form to its full extent. The oldest Sanskrit seems to come nearest to Aryan. Greek has also been very conservative in one way ; it has lost hardly any thing that was original, but has, like Latin, created a host of apparently new forms, some of which still continue to baffle all attempts at an explanation."

কোন স্বতন্ত্র ভাষাই মৌলিক আর্য্যভাষার ধাতুরূপগুলি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারে নাই। তন্মধ্যে পুরাতন সংস্কৃত ভাষা আর্য্যভাষার অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। গ্রীক-ভাষা এক দিকে অত্যন্ত রক্ষণশীল বটে, ইহা মৌলিক সম্পত্তির অতি অল্পাংশই ত্যাগ করিয়াছে মাত্র, তথাপি ল্যাটিনের মত আপাতনূতন তিঙন্ত রূপ অনেকগুলি সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার কতকগুলি সাধন করিতে এ পর্য্যন্ত যত চেষ্টা করা হইতেছে, সমস্তই ব্যর্থ হইতেছে।

3. "The differences thus exhibited by the different languages make it a difficult task to determine which formations belong to the primitive Aryan stock and which where added at late periods."

বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন প্রকারের রূপ-ভেদ থাকাতে কোন্‌গুলি যে আদিম আর্য্যরাশিভুক্ত এবং কোন্‌গুলি পরবর্ত্তী কালে যোগ করা হইয়াছে, তাহা স্থির করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীহট্টের কথায় 'আমি যারাম' (আমি যাইতেছি) কথাটার মধ্যে বাঙ্গালা 'আমি' পদ ও হিন্দি 'যা রহা হম্‌' (উভয়ে মিলিয়া 'যা-রা-ম্‌' পদ), এই দুইয়ের মধ্যে বাঙ্গালা 'আমি' পদটা উঠাইয়া দিয়া শুদ্ধ হিন্দি 'যারাম' পদটা ব্যবহার করিলেও 'আমি যাইতেছি' এই অর্থেরই প্রতীতি হইবে; কারণ, 'যারাম' পদের মধ্যে 'যা-রহা' (যাইতেছি) ও 'হম' (আমি), এই দুইটি পদ সম্মিলিত রহিয়াছে। এখন ক্রমোন্নতির ন্যায় অনুসারে দেখা যায় যে, শ্রীহট্টের কথা সৃষ্টির সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবিষ্ট হিন্দি কথাগুলি ছাটিয়া ফেলিয়াও অনেকগুলি রহিয়া গিয়াছিল, সেইগুলিও ক্রমে ছাটা হইয়া আসিতেছে; এখনও যে কয়েকটা রহিয়াছে, তাহাতেই বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইতে শ্রীহট্টের বাঙ্গালার কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে; কাজেই উহা অন্যান্য দেশীয় বাঙ্গালার সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে মিলিতে পারে নাই।

উপরিলিখিত বাক্যটির মধ্যে কোন্‌ পদটি মৌলিক ও কোন্‌ পদটি পরে প্রযুক্ত, তাহা স্থির করিবার জন্য কেবল এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, শ্রীহট্টের বাঙ্গালার মধ্যে অধিকাংশই যখন বাঙ্গালা কথা, তখন হিন্দি কথাগুলি উহাতে অনেক পরেই প্রবেশ করিয়াছিল এবং উন্নতি ন্যায় অনুসারে সেইগুলি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। এই অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহা হইলে শ্রীহট্টের ভাষা বাঙ্গালা ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। নানা

কারণে শ্রীহট্টকে বাঙ্গালাভাষাভাষি-শ্রেণীভুক্ত না করিয়া আসামভুক্ত করা হইয়াছে, সেই জন্য এই জেলার ভাষার বঙ্গত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিতে দুই একটি চিন্তাশীলকে সময় সময় কোমর বাঁধিয়া আসরে নামিতে দেখা যায়। তাঁহাদের যুক্তি এইরূপ,—'গভর্মেণ্ট যখন শ্রীহট্টকে বঙ্গভাষাভাষি-শ্রেণীভুক্ত করেন নাই, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, শ্রীহট্টের ভাষা বঙ্গভাষা নহে।' এইরূপ সিদ্ধান্ত সকলের গ্রহণীয় হইতে পারে না।

পূর্ব্ববঙ্গ এক সময়ে আসাম প্রদেশের শাসনকর্ত্তার শাসনাধীন হইয়াছিল, তখন ত এইরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কেহ করেন নাই। শ্রীহট্টকে বঙ্গ-ভাষাভাষী জেলাসমূহের ভিতর হইতে বহিস্কৃত করিয়া আসামী-ভাষা-ভাষী জেলাগুলির ভিতরে জোর করিয়া ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম কারণ ব্যাখ্যা করিবার আবশ্যক নাই। শ্রীহট্টের কথায় লিখিত সাহিত্য-গ্রন্থেরও একেবারে অসদ্ভাব নাই। 'মনসার পাঁচালী' বা 'পদ্মাপুরাণ' পাঠ করিলে শ্রীহট্টের কথার পরিচয় অনেকটা পাওয়া যাইবে; উহা বাঙ্গালা, কি অন্য কোন ভাষা, ঐ পুরাণই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে; উহার প্রতি পদেই শ্রীহট্টের মৌলিক ও পরিবর্ত্তিত কথাগুলি জড়িত রহিয়াছে। তদ্ভিন্ন অনেকগুলি জাদুমন্ত্র, সাপের মন্ত্র ও ভূতের মন্ত্র রহিয়াছে, তাহাতেও শ্রীহট্টের কথা অনেকগুলি পাওয়া যায়। পুরাতন দলিল-পত্র আলোচনা করিলেও দেখা যায়, মধ্যে মধ্যে শ্রীহট্টের কথার বুকনি রহিয়াছে। অনেকগুলি গল্পও ধারাবাহিকক্রমে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাহাতেও এই জেলার আদিম ভাষার পরিচয় বিশদভাবে পাওয়া যায়। পাঠক মহাশয়কে অনুরোধ করি, যেন বিশেষ মনোযোগের সহিত উল্লিখিত রচনাগুলি আলোচনা করেন, পরিশিষ্টে তাহার কতকগুলি উদ্ধৃত করা হইল।

সুশিক্ষিত লোকের মধ্যেও কেহ কেহ আপন যুক্তির বলে শ্রীহট্টের ভাষাকে আসামী ভাষামূলক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে চাহেন! একজন পরিচিত শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন;—

"The Ahoms subjugated the country in the begining of the 13th century."

এই শতাব্দীতে কিন্তু অহমেরা আসামের কিয়দংশ মাত্র অধিকৃত করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন শ্রীহট্ট প্রভৃতি অনেকগুলি রাজ্য স্বাধীন ছিল। যাহা হউক, উপরে উদ্ধৃত বাক্যটির বলে অথবা There is a place in Sylhet known as Assampara ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রীহট্টের ভাষা যে পূর্ব্বে আসামী ভাষা ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া, বরং শ্রীহট্টের ভাষার মধ্যে আসামী ভাষার ধাতুরূপের বা শব্দরূপের ভেল মিশ্রণের বাহুল্য দেখাইয়া যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন, তাহা হইলে লেখক মহাশয়ের সিদ্ধান্তে ততটা দোষ মনে হইত না। একমাত্র স স্থানে হ উচ্চারণ করা, তাহা শুধু শ্রীহট্টের কেন, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, নওয়াখালী প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই এই দোষটুকু দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আসামীর সহিত এইরূপ দুই একটি বর্ণের উচ্চারণসাম্য ধরিয়া, একা শ্রীহট্টের ভাষাকে আসামী-মূলক বলিতে যাওয়া সুবিবেচনার পরিচায়ক নহে।

সুযোগ্য 'সুরমা'-সম্পাদক মহাশয় এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তই হইয়াছে ; কারণ, শ্রীহট্টে যেমন "আসাম পাড়া" আছে, তেমনি 'মণিপুরী পাড়া'ও আছে এবং 'ফিরিঙ্গী পাড়া' বলিয়াও একটা পাড়া কালীঘাটে বহুদিন হইল ছিল ; অতএব শ্রীহট্টের ভাষা 'পূর্ব্বে তিনটা ভাষা-মিশ্রিত একটা কিম্ভূতকিমাকার ভাষা ছিল', এইরূপ না বলিয়া কেবল আসামী ভাষাকেই প্রাধান্য প্রদান করা সমীচীন হয় নাই।

প্রস্তাবিত বিষয়টি এতাধিক বিস্তার করা এ ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া, এই-খানেই ইহার উপসংহার করা গেল।

পরিশিষ্ট

[লিখিত ভাষায় কয়েকটি পদাবলী]

সুবল ! বল বল বল বাই (দেখি)
কেমন আছে কমলিনী রাই।
আমি যার কারণে বৃন্দাবনে রে সুবল !
কাঁদিয়া সদায় বেড়াই ॥
গিয়াছিলাম মানসাগরে
রৈলাম রাইয়ের চরণ ধরে,
নয়ন তোলে চাইল সে রাই।
আমার ছিল আশা দিল দাগা
(নিরাশ করিল) রে সুবল !
আমার আর পীরিতে কার্য্য নাই ॥

মনসার পাঁচালী হইতে উদ্ধৃত

[লিখিত ভাষা]

শুন গো মনুসা মাও গো !
মাও আরে মহাদেবের ঝী !
মোর মনে হেন লয় গো
শিতল জল পি (পান করি)।
বৈশাখ মাসেতে মাও গো !
মাও আরে লখাইরে কৈল বিয়া
কালরাত্রি খাইল প্রভু লোহার বাসর গিয়া।
রাম কলা কাটিয়া মাও গো
মাও আরে ভেরুয়া (ভেলা) বাঁধাইলু
ইষ্ট মিত্র ভাই বন্ধু ফিরিয়া না চাইলু।

সুন্দরী দেশে যায় রে বিপুলা দেশে যায়।
নেতার সহিতে দুঃখ ভাবইন মনসায় ॥
ছয় কুমার সোয়ারী হইলা ছয় ডিঙ্গার উপর।
চন্দ্রধর সোয়ারী হৈলা ডিঙ্গা মধুকর ॥

* * * *

সাবিত্রীব্রতকথা হইতে উদ্ধৃত

[অপেক্ষাকৃত আধুনিক লিখিত ভাষা]

পৃথিবীতে ছিলা অশ্বপতি নরবর।
পুত্রহীন হইয়া দুঃখিত বিস্তর ॥
বহু দিন কৈলা তাই শিব আরাধনা।
জনমিলা কন্যা এক রূপে অনুপমা ॥
দেখিয়া কন্যার মুখ রাজা অশ্বপতি।
রাখিলা সাবিত্রী নাম হয়ে হর্ষ অতি ॥
কি বলিব তাঁর গুণ বিশুদ্ধাচারিণী।
সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা মধুরভাষিণী ॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন শুক্ল শশি।
বিবাহসময় ক্রমে দেখা দিল আসি ॥
একদা সমবয়সী সহচরী সনে।
সানন্দে ভ্রমেণ তিনি রথ আরোহণে ॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মুনির আশ্রম।
দেখিলা তথায় নানা দৃশ্য মনোরম ॥
মুনিপুত্র সহ এক রাজার সন্তান।
খেলে অতি পরিপাটী রূপে রূপবান্ ॥
তাঁর রূপে বিমোহিতা হৈলা রাজসুতা।
জিজ্ঞাসিলা মুনি স্থানে ইহার বারতা ॥

* * * *

কথিত ভাষায় কয়েকটি পদাবলী

১

শিব আইল রে আইল রে ভাঙ্গড় (ভাং খুর) বিনোদিয়া।
বম্ বম্ বব বম্ ধ্রিমিক্ ধ্রিমিক্ শিবে ডুম্বুর বাজাইয়া ॥
বৃষে ভর করিয়া শিবে শিঙ্গায় দিল সাড়া।
সকল কুচুনীয়ে বলে আইল ভাঙ্গেড়া (ভাংখুর) ॥
হীরা কুচুনীয়ে আসি মেনাইল হাত।
বৃষে ভর করিয়া রে নামিলা ভোলানাথ ॥

২

শিব বাহির হো, বাহির হো !
বাহির হো রে গণাইর (গণেশের) বাপ।
গৌরী আসি লাগাল পাইব তোর।
শিব তুইনি গনাইর বাপ ?
তোর জটার মাঝে সাপ
তোর সাপে ধরে ফণা।
এমন ভাঙ্গড়ের ঘরে বঞ্চে কোন জনা ?
শিবে আধারি (মালার আধার) বিচারে, (দেখে),
ঝুলুনা (ঝুলি) বিচারে,
ভাং না পাইল তাৎ (তাহাতে)
ঘস্ ঘস্ ঘস্ ঘসার ঘসার
কাট্ল ভাঙ্গের গাছ।

শিব সথিং থিঙ্গা
আমার শিব নাথিং থিঙ্গা,
ক্ষণ্কে (ক্ষণে) বাজায় কনক ডুম্বুর
ক্ষণ্কে বাজায় শিঙ্গা।

কথিত ভাষায় একটি সারী

সর লনী হাতে লৈয়া ডাকে তোর মায়।
যাদু রে হরিধন আয় ঘরে আয়॥

কথিত ভাষায় একটি গল্প

এক জন রাজা আছ্লা ; রাজা রাজসভায় বইছইন্, এমন সময় একটা পাখী আইল ; এক জন গণকও এই সভায় আছলা ; গণকরে রাজায় জিগাইলা (জিজ্ঞাসা করিলেন),— এ পাখীটা কি জাৎ ? গণকে কহিলা—এইটার নাম বিক্রমপাখী ; এই পাখী রাজা সকলে শিকার করতা পাইন না (পারেন না), এ পাখীর মাংস খাইতে খুব ভাল। রাজায় কহিলা,— এই পাখীটা আমি মারমু,—কহিয়াই বন্দুক লইয়া ঘুড়ার উপরে উঠ্লা, আর যে গাছে পাখী বই ছিল, হেই গাছের তলে তাইন গেলা, পরে পাখীটা উড়া দিয়া কতক খান দূর গিয়া আর এক গাছে বইল, তার পরে রাজা হেইখানেও গেলা, পরে হেই খান থাকিও উড়া দিয়া পাখীটা গিয়া আর এক গাছে বইল, হেইখানে রাজা যাইতেই পাখীটা এক রাক্ষসের

রূপ ধরিয়া রাজারে গিলি লাইল (গিলে ফেলিল)। পরে ঐ রাজার রূপ ধরিয়া রাক্ষসটা ঘুড়ার উপরে উঠি গেল ; উঠিয়া বন্দুক হাতে লইয়া রাজার বাড়ীবায় (বাড়ীর বাগে) পথ দিল (চলিল)। হেই খানে গিয়া হারিয়া (সারিয়া) কহিল যে, পাখী মারতাম পারলাম না ; উ কথা কহিয়া রাজসিংহাসনে উঠি বই গেল ; আর ঘুড়াটা নিয়া আর এক জনে আস্ত্যবলে রাখি দিল। এই গরামের মাঝে পর্ত্তি (প্রতি) রাইতই মানুষ এক একজন পাওয়া যায় না, হারাই যায় ; এ আইয়া কয়,—আমার বাড়ীর একজন মানুষ আইজ নাই, হেও আইয়া কয়,—আমার বাড়ীর এক জন নাই ;—উ লাখান (এই রকম) পর্ত্তি দিন আইয়া আইয়া মানুষে খবর দেয়। রাজায় এই কথা হুনিয়া কহিলা,—পাহারা দিয়া দেখ, কাই যায় (কই যায়) মানুষ।

এই রাজার একটি মাইয়া ও একটি ছেলিয়া আছে ; এক দিন রাজমাইয়া বাহার বাড়ীর পুষ্করিনীতে হিনান (হ্নান=স্নান) করতা যাইন, এমন সময় হেই ঘুড়ায় ডাকিয়া কহিল,—ওগো রাজমাইয়া ! হুনি যাও। রাজমাইয়ায় এই কথা হুনিয়া আগুবনে গিয়া মুকুর দিই (উকি দিয়া) দেখলা, মানুষ নাই, খালি একটা ঘুড়া আছে। তাইন তখন ফিরিয়া আইয়া হিনান করতা গেলা গিয়া ; হিনান করিয়া আইবার সময় ফিরিবার (আবার) ঘুড়ায় ডাকিয়া কহিল,—রাজমাইয়া ! হুনি যাও। তাইন এই বারত গিয়া ঘরে মুকুর দিয়া দেখলা, ঘরে মানুষ নাই। খালি ঐ ঘুড়াটা আছে। তাইন ঘরর ভিতরে ডাকিয়া জিগাইলা,— কে ডাকলায় আমারে ? ঘুড়ায় উত্তর দিল,—আমি ডাকৃছি। রাজমাইয়ায় কহিলা,—কিয়ের লাগি ডাকছ কও। ঘুড়ায় কহিল,—এই রাজা তোমার বাপ নায় (নহে), এ রাক্ষস, তোমরা ভাইয়ে ভোইনে এ দেশ থাকি ভাগিয়া যাওগি, নাইলে তোমরারে খাইলাইব। রাজমাইয়া এই কথা শুনিয়া ডরাইয়া জিগাইলা,—তে আমরা কিঁ লেখান ভাগতাম ? ঘুড়ায় কহিল,—আইজ রাইত, সকল মানুষ ঘুমাইলে আমার এইখানে তোমরা আইও। রাজমাইয়া এই কথা হুনিয়া বাড়ীত গিয়া তান ভাইর কাছে ঐ কথা কহিলা যে, শুন্ছনি দাদা ! এইন্ বুলে (নাকি লোকে বলে), আমরার পিতা নায়। ভাইয়ে কহিলা,—কিতা কও, বাবা নাতে এইন কে ? ভোইনে কহিলা,—এইন রাক্ষস। ভাইয়ে উত্তর দিলা,—রাক্ষস কি লেখনে জানলায় ? ভোইনে কহিলা,—শুন্ছ না নি, মানষে পর্ত্তেক রোজ আইয়া যে কয়, তার বাড়ীতে আইজ একজন নাই ? তার বাদে (তা ছাড়া) আইজকয়া (আজকে) আমি বাহারবাড়ীর পুকুরীতে হিনান করতাম গেছলাম, ঘুড়ায় আমারে ডাকিয়া কহিল যে, এই রাজা আমরার বাবা নায়, এ রাক্ষস ; আমরার বাবারে এ খাইলাইছে। ঘুড়ায় কহিছে, আইজ সকল মানুষ ঘুমাইলে আমরা দুই জনে তার কাছে যাইতাম। ভাইয়ে এই কথা শুনিয়া কহিলা,—তে চল যাই, আমি আগে ঘুমাই গিয়া, তুমি আমারে জাগাইয়া দিও। তার পরে তারা দুই জনে খাওয়া দাওয়া করিয়া হারিয়া রাজার ছেলিয়া ঘুমাই রইলা, আর মাইয়া জাগিয়া রইলা। তার পরে অনেক রাত্র হইল, তখন সকল মানুষ ঘুমাই রহিছইন্। রাজমাইয়ায় মনে করলা, এখনই

যাইবার সময় হইছে; এই তান ভাইরে জাগাইতা গেলা; গিয়া কহিলা,—ভাই, উঠি যাও। তাইন জাগিয়া উঠলা, উঠিয়া সারিয়া, কহিলা—দিদী! আমারে কিয়ের লাগি জাগাইলায়? মাইয়ায় কহিলা—তোমার কি হেই কথাটা মনে নাই? ভাইয়ে কইলা,—হুঁ হুঁ, মনে আছে, চল চল, যাই গিয়া। এই কথা কহিয়া দুই জন বাহির হইলা; দুই জনই আস্তবলে গেলা, পরে ঘুড়ায় কহিল—তোমরা আইছ নাকি? তারা কহিলা—হুঁ, আইছি, কিতা করতাম কও। ঘুড়ায় কহিল,—তোমরা এই দেশ ছাড়ি দি যাও গি। তারা কহিলা,—কি লেখান যাইতাম? ঘুড়ায় কহিল—আমার পিঠিতে উঠ, আমি তোমরারে লইয়া যাইমুগি। কহিতেই তারা দুই জন ঘুড়ার উপরে উঠি গেলা, আর ঘুড়ায় লইয়া চলল। যাইতে যাইতে অনেক দুর এই রাজার দেশ ছাড়াইয়া আর এক রাজার দেশে গেল গিয়া। এমন সময় রাজার পুয়ায় (পুত্রে) কইলা,—দিদী! আমার জলতিরাষ হইছে, জল খাইমু। রাজকন্যায় কইলা,—একটুকক্ষণ থাক। তাইন কইলা,—না, গলা শুকাই গেছে। ঘুড়ায় তখন কহিল,—সামনে জল আছে, ঐ যে এক বাড়ী দেখা যায়, ওখানে গেলেই জল পাইমু; এই বাড়ীতে এক রাক্ষসী থাকে, গেলেই সে জল দিব, তোমরা হেই জল খাইও না, কহিও কি, আমরা এই জল খাই না, তোমার গল্লাসটা দেও, আমরা জল তুলি আনমু। গল্লাস দিলে পরে তোমরা জল আনিয়া খাইও। তার পরে রাক্ষসী তোমরার লগে কুটুম্বিতা করব, তোমরারে কইব—তোমরা আমার ভোইনপুৎ ভোইনঝী, বহুৎ দিনে তোমরারে দেখলাম, তোমরা আইজ আমার এইখানে থাক। তোগরা কহিও,—থাকতাম পারি, কিন্তু তুমি বাহারে থাকবায়, আমরা ঘরে থাকমু আর আমরার ঘুড়া তোমার ধাইরে (দাওয়ায়) থাকব, তা হইলে থাকতাম পারি। এই কথা কইতে কইতে তারা রাক্ষসনীর বাড়ীতে আইয়া পছিল। দেখিয়া রাক্ষসনী কহিল,—আ! আমার ভোইনপুৎ ভোইনঝীএ আইছে দেখি! আ! বহুৎদিনে তোমরারে দেখলাম! রাজারপুয়ায় জল চাইল বাদে রাক্ষসনী যে জল আনিয়া দিল, হেই জল তারা পালাই দিয়া নিজে জল আনিয়া খাইল, তার পরে তারা ঘুড়ার উপরে উঠিয়া যাইত গিয়া চাইল, পরে রাক্ষসনী তারার ইচ্ছা মতে তারারে ইদিন তার বাড়ীত রাখল। * * *

উল্লিখিত রচনাগুলি আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, শ্রীহট্টের বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষাটা বহুকাল পূর্ব্বে সংসর্গদোষে আপনার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিয়া আপনাকে যে একটা কিম্ভূতকিমাকার সাজাইয়া তুলিয়াছিল, সেই অদ্ভুত মূর্ত্তিটি বর্ত্তমান সময়ে অনেকটা পালিস হইয়া আসিয়াছে; আধুনিক রচনাগুলি পুরাতন রচনাগুলির সঙ্গে পাশাপাশি রাখিয়া সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উক্ত সিদ্ধান্তটির সত্যতা স্বতই প্রতীয়মান হইবে।

শ্রীকুঞ্জকিশোর চৌধুরী

বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ

[বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রদত্ত ১৩১৯ সালের "বীরেশ্বর পাঁড়ে পুরস্কারে"র জন্য এই প্রবন্ধ লিখিত হয়। প্রবন্ধের বিষয় "বেদের সংহিতাভাগে অদ্বৈতবাদ"। "অদ্বৈতবাদ" ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যের নামেই পরিচিত। অনেক য়ুরোপীয় পণ্ডিত এবং এ দেশেও অনেকে মনে করেন, "অদ্বৈতবাদ" শঙ্করাচার্য্যের স্বকীয় স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত, তিনি ইহা উপনিষদের দোহাই দিয়া চালাইয়াছেন মাত্র, বাস্তবিক বেদ, কি উপনিষৎ তাঁহার প্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদের পরিপোষক নহে; কিন্তু বর্ত্তমানে জার্ম্মাণদেশীয় পণ্ডিত ডিউসন তাঁহার "Philosophy of the Upanishads" গ্রন্থে প্রধান প্রধান উপনিষৎ-গ্রন্থ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন, উপনিষদের ধর্ম্মমত শঙ্করের মত হইতে বিভিন্ন নহে। আজ পর্য্যন্ত বেদের সংহিতাভাগের সহিত শঙ্কর-মতের কতদূর মিল আছে, তাহার কোন বিশেষ আলোচনা হয় নাই; সুতরাং সাহিত্য-পরিষদের এই বিষয়-নির্ব্বাচন নিতান্ত সময়োপযোগী ও সমীচীন হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনায়, উপস্থিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধে উহার সম্যক্ আলোচনা সম্ভবপর হয় নাই, তবে ইহাতে বেদের সংহিতাভাগের প্রধান প্রধান দার্শনিক চিন্তাগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাহার সহিত শঙ্কর-মতের তুলনা করার সামান্য চেষ্টা হইয়াছে। প্রবন্ধকার আশা করেন, যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এ বিষয়ের যথোপযুক্ত আলোচনা করিবেন।]

অদ্বৈতবাদ কি ?

হিন্দু জাতির সাধনায় ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—একভাগের নাম "জ্ঞানকাণ্ড", অপর ভাগের নাম "কর্ম্মকাণ্ড"। হিন্দুদের আদিম শাস্ত্র বেদ এই দ্বিভাগাত্মক। বিশ্বজগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদিবিষয়ক সমগ্রতঃ ব্যাখ্যান ও সমাধান "জ্ঞানকাণ্ডে"র অন্তর্গত, এই ভাগকে বিশেষতঃ দর্শনভাগও বলা যাইতে পারে। আর মানুষের যাহা কিছু ইতিকর্ত্তব্য আছে, তাহার নির্ণয়, ব্যাখ্যা ও সমাধান করা আনুষ্ঠানিক ভাগ বা "কর্ম্মকাণ্ডের" বিষয়। হিন্দুর ধর্ম্মে যেমন জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত, সেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রেও এই দুই ভাগ পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে (Organically) সম্বন্ধযুক্ত, একের অভাবে অন্য ভাগ অসফল ও অসম্পূর্ণ। পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চায় কর্ম্মবিষয়ক ভাগে নীতিশাস্ত্র (Ethics), সমাজতত্ত্ব (Sociology), রাজনীতিশাস্ত্র (Politics), ধর্ম্মশাস্ত্র (Science of Religion) প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে; আর জ্ঞানকাণ্ডে দর্শন (Philosophy) অধ্যাত্মশাস্ত্র (Metaphysics) প্রভৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব। তাঁহাদের অনেকেরই মতে এ সকল শাস্ত্র পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বন্ধযুক্ত নহে, প্রত্যেকেই নিরপেক্ষভাবে আলোচিত হইতে পারে ও হইয়াছে।

"অদ্বৈতবাদ" বলিতে হিন্দুদের সেই জ্ঞানকাণ্ড বা দর্শনভাগের সিদ্ধান্তবিশেষকে বুঝায়। সেই সিদ্ধান্তে এক অদ্বিতীয় বস্তুই তত্ত্বরূপে নির্ণীত হইয়াছেন। একমাত্র সত্তাই সত্য, তাহা হইতে দ্বিতীয় আর কিছু নাই, ইহাই অদ্বৈতবাদের মূলসূত্র। ইহা বিবৃত ও প্রমাণিত করিবার জন্য কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহা য়ুরোপীয় আধুনিক চিদেকত্ববাদ

(Idealistic Monism) নামক অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-বিশেষ হইতে সংক্ষেপতঃ উদ্ধৃত করিয়া ভারতীয় "অদ্বৈতবাদের" সমাধানসমূহ নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

য়ুরোপীয় আধুনিক চিদেকত্ববাদ

"চিদেকত্ববাদ" বা Idealistic Monism জার্ম্মাণদেশীয় দার্শনিক মহাত্মা হিগেলের নামেই বিশেষ পরিচিত। কিন্তু এইপ্রকার চিন্তা অন্যতম জর্ম্মাণ পণ্ডিত কাণ্টের পর হইতেই জার্ম্মাণদেশে প্রচলিত হয় এবং হিগেলের পরেও জর্ম্মণীতে এবং বর্ত্তমানে ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে বিশেষভাবে চলিতেছে। তাঁহাদের মতে এক অনন্ত ও নিরপেক্ষ চিৎপদার্থ হইতে এই জগৎপ্রপঞ্চ উৎপন্ন হইয়াছে; নতুবা এই জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের সাপেক্ষক ক্ষুদ্র চৈতন্যের দ্বারা 'জ্ঞাত' হইত না। আপাতদৃষ্টিতে এই দৃশ্যমান পদার্থপ্রপঞ্চকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; যথা,—চৈতন্য ও জড়। যদিও এই চৈতন্য ও জড়পদার্থ পরস্পর বিপরীতধর্ম্মযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহারা পরস্পরের উপর কার্য্য বিস্তার করিতে পারে। জড় চৈতন্যের দ্বারা "জ্ঞাত" হইতেছে, চৈতন্যও ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জড়ের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিতেছে। পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম পদার্থের এরূপ অন্যোন্যে ক্রিয়াকারিত্ব-শক্তি অত্যন্ত রহস্যময়। জ্ঞান-ক্রিয়ার এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে বলিতে হইবে যে, এই দৃশ্যমান জগৎ—যাহা জড় বলিয়া খ্যাত, তাহা প্রথমে কোন চৈতন্য হইতে চৈতন্যের নিয়মানুসারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আমাদের চৈতন্য-শক্তি ক্ষুদ্র হইলেও সেই চৈতন্য-শক্তি হইতে অভিন্ন, তাহাতেই মূল-চৈতন্য হইতে অভিব্যক্ত এই জগৎ আমাদের ক্ষুদ্র চৈতন্যদ্বারা গৃহীত অর্থাৎ জ্ঞাত হইতেছে। জগতের আদিকারণ চৈতন্য, তাহা যে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিতে হয়, তাহা নহে; ইহা স্বীকার্য্য বা (Postu late)রূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা না করিলে জ্ঞানকার্য্যের ব্যাখ্যা হয় না। যাহা জ্ঞানের মূলে, তাহা সৃষ্টির মূলেও থাকিবে।

অন্য ভাবে দেখিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। মনে করুন, আমার হাতে যে ফুলটি আছে, তাহার রং, রূপ, গন্ধ, আকৃতি, কঠিনত্ব প্রভৃতি কতকগুলি গুণমাত্র আমার মন ইন্দ্রিয়দ্বারে গ্রহণ করিয়া বাহিরে ফুলের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছে। এই কয়েকটি গুণ ভিন্ন এই ফুলের অন্য কিছু আমার দ্বারা গৃহীত হইতেছে না। আর একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহারা আমার মনোদ্বারা গৃহীত হইতেছে বলিয়া এই ফুলের অস্তিত্ব আমার নিকট আছে; সুতরাং এই ফুলের অস্তিত্ব অন্ততঃ আমার নিকট আমার মনের উপর নির্ভর করে। আমার মন না থাকিলে ইহার অস্তিত্ব আমার কাছে থাকিত না। সুতরাং এই ফুল আমার মনের দ্বারা সৃষ্ট মাত্র। কিন্তু অন্য দিকে এই ফুল ত আমার মনের কল্পনামাত্র বলিয়াও বোধ হয় না। ইহার বাস্তব অস্তিত্ব বাহিরে বর্ত্তমান আছে। আমার মন বিনষ্ট হইয়া গেলেও ইহা থাকে ও থাকিবে, এপ্রকার ধারণা ত আমার আছে। সুতরাং এই

ফুল সম্বন্ধে আমার জ্ঞান=আমার মনঃসৃষ্ট কতকগুলি গুণ + ইহা বাহিরে আছে, এই জ্ঞান। এই প্রকারে সমস্ত জড়জগৎ আমার মত চৈতন্যযুক্ত জীবগণের মনোগ্রাহ্য ও মনঃসৃষ্ট, তবে মনের বাহিরে অস্তিত্বযুক্ত এই ধারণার লোপ আমাদের কাহারও হয় না। সুতরাং মনঃসৃষ্ট হইয়াও আমাদের মনের বাহিরে আছে, এই ভাব কোথা হইতে আসে? ইহার একমাত্র মীমাংসা এই যে, ইহা মনঃসৃষ্ট সত্য, কিন্তু শুধু আমাদের মনঃসৃষ্ট নহে, ইহা এক অনন্ত নিরপেক্ষ মনের সৃষ্ট; এ জন্যই মনের সৃষ্টমাত্র হইলেও আমাদের মনের বাহিরে বলিয়া বোধ হয়; কারণ, ইহা এক নিত্য অনন্ত মনে সৃষ্ট ও ধৃত আছে। সেই নিত্য অনন্ত মনোময়ই ঈশ্বর। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই একমাত্র যুক্তিযুক্ত প্রমাণ।

অতএব দেখা গেল, এই জগৎ জ্ঞানসৃষ্ট, জ্ঞানের ব্যাপার মাত্র। সুতরাং জগৎসৃষ্টির প্রক্রিয়া ও ক্রম আমাদের জ্ঞানের প্রক্রিয়া ও ক্রমের অনুরূপ। আমাদের জ্ঞানব্যাপারের বিশ্লেষণ করিলেই জ্ঞানের নিয়ম ও ক্রম পাওয়া যায়। এই বিশ্লেষণে দেখা যায়, আমি আছি, এই অহং-প্রত্যয় সর্ব্বাপেক্ষা মৌলিক, এই অহং-প্রত্যয় সকল জ্ঞানকার্য্যেই সামান্যভাবে আছে। আমি যখন দেখি, শুনি, চিন্তা করি বা যখন সচৈতন্য আছি মনে করি, তখন আমার 'আমি' এই জ্ঞান লাগিয়াই আছে। ভাবনা মাত্র থাকিলেই আমি-ভাব ছাড়ান যায় না। এই যে 'আমি'-ভাব বা আমার অস্তিত্বজ্ঞান, ইহা আমার জ্ঞানমাত্র থাকিলেই আছে। যদি আমি মনে করি যে, আমার আর কোনও জ্ঞান নাই, তখনও আমার জ্ঞানমাত্র আছে এবং সেই ক্ষুদ্র জ্ঞানটুকু 'অহং' জ্ঞানমাত্র। সুতরাং তখন জ্ঞান ও অস্তিত্ব মূলতঃ এক অভিন্ন জিনিস। এই আকারের অন্যান্য যুক্তি দেখাইয়া হিগেল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, জ্ঞানের শুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র ও অস্তিত্বের শুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ সত্তামাত্র এক অভিন্ন পদার্থ। ইহাই হিগেলের প্রসিদ্ধ "Identity of thinking and being" জ্ঞান ও সত্তার একত্ববাদ।

এখন জ্ঞান ও সত্তা শুদ্ধাবস্থায় এক হইল। ইহারা কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে, দেখা যাউক। সত্তা বা বস্তুর স্বভাব কি? আমরা দেখিতে পাই, যাহার ক্রিয়াকারিত্ব নাই, তাহা বস্তুই নহে। আমার হাতের কলমটি একটি বস্তু, কারণ, ইহার ক্রিয়া প্রকাশ আমার মনে হইতেছে। কোন ক্রিয়া নাই, এমন বস্তুর ধারণাই হয় না। ক্রিয়াকারিত্বহীন বস্তু বস্তু নহে, তাহা মৃত বস্তু বা কিছুই নহে। সুতরাং বস্তু হইলেই ক্রিয়াকারিত্ব থাকিবে। অন্য দিকে জ্ঞানের স্বভাব কি? কোন জ্ঞান তাহার বিরুদ্ধ জ্ঞান না হইলে সম্ভব নহে, যথা,—এই কলমের জ্ঞান 'কলম নহে' এমন জ্ঞান সঙ্গে না থাকিলে সম্ভব নহে। কাল জিনিসের জ্ঞান "কাল নহে" এমন জিনিসের জ্ঞান সঙ্গে না থাকিলে সম্ভব নহে। "আমি" এই জ্ঞান 'আমি নহে' এরূপ জ্ঞান সঙ্গে থাকিলেই সম্ভব। সুতরাং জ্ঞান তাহার বিপরীত জ্ঞান না জন্মাইয়া জ্ঞানরূপে গণ্য হয় না। এই কয় কথা মিলাইয়া এই পাওয়া যাইতেছে যে, (১) শুদ্ধসত্তা ও শুদ্ধজ্ঞান এক অভিন্ন পদার্থ; (২) সত্তার নিয়ম ক্রিয়াকারিত্ব অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীলত্ব; (৩) জ্ঞানের নিয়ম বিরুদ্ধ জ্ঞানের সহিত সংলগ্ন

থাকা। সুতরাং সত্তা ও জ্ঞান একবস্তু হইলে, সেই একবস্তু সত্তার নিয়মানুসারে অন্য বস্তুতে পরিণত হইবে এবং জ্ঞানের নিয়মানুসারে সেই পরিণত বস্তু হইবে তৎবিরুদ্ধভাব বা অসত্তা। ইহা আবার মিলিত একটি নূতন জ্ঞানময় সত্তা বলিয়া পরিণত হইবে। হিগেলের ভাষায় ইহা বলিতে গেলে বলিতে হইবে,—শুদ্ধসত্তা (pure being) তৎবিরুদ্ধ অসত্তা (non-being)কে বিক্ষিপ্ত করে, পরে দুইটিতে মিলিয়া তৃতীয় বস্তু ভাব (becoming)এ পর্য্যবসিত হয়। তাহা পুনঃ এই নিয়মে পরিণত হয়। এই প্রকার ক্রমপরিণতিতে দেশ, কাল, এই দৃশ্যমান নিখিল নামরূপের জগৎ বিকশিত হয়। আমাদের প্রত্যেকের জ্ঞান এই নিয়মে পরিণত হইয়া প্রত্যেকের পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপাদন করে।

জ্ঞানের পরিণতি বা বিকাশের এই তিন স্তর যথাক্রমে সত্তা (thesis), অ-সত্তা (antithesis) ও মিলিতাবস্থা (synthesis) নামে কথিত হয়। ইহা শুধু আমাদের জ্ঞানের পরিণতির নিয়ম নহে, জগতের মূলকারণ জ্ঞানময় বলিয়া জগৎস্থষ্টিও এই নিয়মে হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে, দেশ ও কাল এই পরিণতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত মাত্র, মূলে নহে, মূল দেশ ও কালের অতীত। কাজেই জগৎস্থষ্টি কালে ক্রমশঃ চলিতেছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু মূলতঃ স্থষ্টি কালাতীত ভাবে—তৎক্ষণাৎ—নিমেষে—প্রতি মুহূর্ত্তে হইয়াছে। আদিকারণ চৈতন্য কখনও স্থষ্টিছাড়া ছিলেন না। হিগেল বলেন, তাহা থাকিতে পারে না; কারণ, আদিচৈতন্য ও তাহার বিক্ষিপ্ত স্থষ্টি দুইটিতে মিলিয়া একটি সম্পূর্ণ সত্তা। আদিচৈতন্য এই-স্থষ্টিতেই সত্তাবান্, সফলীভূত (realised) হইয়াছে। এই নিমেষে সফলীভূত অর্থাৎ দেশকালাতীত, নিত্য—সত্তাবান্ চৈতন্যই পরমেশ্বর। জগৎ ছাড়া পরমেশ্বর সম্পূর্ণ নহেন, ঈশ্বর হইতে পৃথক্ স্থষ্টিরও অস্তিত্ব নাই। ইহাই প্রধানতঃ হিগেলের মত। এই প্রকারের চিন্তাপ্রণালী বেদান্তের প্রসিদ্ধ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি দ্বারা সংক্ষেপে অভিলক্ষিত হইয়াছে। তাহাতে সুষুপ্তিকালের অহং-মাত্রজ্ঞান স্বপ্নে, স্বপ্নজগতে ও জাগ্রতে—এই নামরূপময় জগতে আমাদের সূক্ষ্ম-স্থূলশরীররূপ উপাধির ভিতর দিয়া সফলীভূত হয় বলা হইয়াছে এবং তৎদৃষ্টান্তে সমান্তরালভাবে সমষ্টিরূপে পরমাত্মার বিকাশ লক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল, আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান প্রাগুক্ত নিয়মে চলিয়া কালের মধ্যে সফলীভূত হইতেছে। কিন্তু অনন্ত-জ্ঞান কালাতীতভাবে প্রতি ক্ষণে তদ্‌বিক্ষিপ্ত এই স্থষ্টির ভিতর দিয়া সফলীভূত হইতেছেন। এই স্থষ্টি ভিন্ন কারণ-চৈতন্যের সত্তা নাই, চৈতন্য ভিন্ন স্থষ্টির সত্তা ত নাই-ই। চৈতন্য ও স্থষ্টি পরস্পর সাপেক্ষক, একের অভাবে অপর নামমাত্র—বস্তু নহে। দুইটিতে মিলিলে প্রত্যেকটি বস্তু। এই প্রতি মুহূর্ত্তে সফলীভূত মহাচৈতন্যই পরমেশ্বর এবং একমাত্র তত্ত্ব,—স্থষ্টি, জড়, চৈতন্য হইতে অবর; চৈতন্য-বিক্ষিপ্ত, চৈতন্যস্থষ্ট, চৈতন্যে স্থিত বলিয়া অসৎ, অন্য কোন অর্থে অসৎ নহে। ইহাই হিগেল-মতবাদিগণের সিদ্ধান্ত। ইহা "চিদেকত্ববাদ" নামে খ্যাত। ইহা বুঝিবার জন্য হিন্দুশাস্ত্র হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

"ন ইব বৈ ইদং অগ্রে অসদাসীৎ ন ইব সদাসীৎ। আসীৎ ইব বৈ ইদং অগ্রে ন ইব আসীৎ। তদ্ হ তৎ মনাঃ ইব আস ॥১॥

তস্মাদ্ এতদ্ ঋষিণাং ভ্যনুক্তং "ন অসদ্ আসীদ্ ন সদ্ আসীৎ তদানীং" ইতি। ন ইব হি সদ্ মনো ন ইব অসৎ ॥২॥

তদ্ ইদং মনঃ সৃষ্টং আভিরবুভূষদ্ নিরুক্ততরং মূর্ত্ততরং। তদ্ আত্মানং অন্বৈচ্ছৎ। তৎ তপোঽতপ্যত। তৎ প্রামূর্চ্ছৎ। তৎ ষট্‌ত্রিংশতম্ সহস্রাণি অপশ্যৎ আত্মানোঽগ্নীন্ অর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিতঃ ॥৩॥ শতপথব্রাহ্মণ—১০ মে ৫,৩য়ে।

অনুবাদ,—অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ইহা সতের মতনও ছিল না, অসতের মতনও ছিল না। ইহা থাকার মতনও ছিল, না থাকার মতনও ছিল। তাহা সেই "মনঃ"এর মত কিছু ছিল।১। তজ্জন্য ঋষিরা ইহা বলিয়াছেন যে, "তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না"। মনঃ সতের মতও নহে, অসতের মতও নহে।২। সেই মনঃ সৃষ্ট হইয়া অধিকতর প্রকাশিত ও মূর্ত্তিমান্‌রূপে আবির্ভূত হইল। তাহা আত্মলাভ করিতে ইচ্ছা করিল। তাহা তপঃ করিল। তাহা মূর্চ্ছিত হইল। তাহা আত্মা হইতে মনোময়, মনশ্চিত ছত্রিশ হাজার শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে দেখিল।৩।

ইহাতে বলা হইতেছে, সৃষ্টির পূর্ব্বে মনের ন্যায় কোনও বস্তু ছিল, তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না। তাহাই মূর্ত্তিমান্‌রূপে আবির্ভূত হইয়া আত্মলাভ করতঃ এ সকল সৃষ্টি করে। এ কথাটির সঙ্গে প্রাগুক্ত মতের "জগৎকারণ চৈতন্য এই প্রপঞ্চসৃষ্টির ভিতর দিয়া সাফল্য লাভ করেন, সৃষ্টি ছাড়া চৈতন্য সত্তাহীন, চৈতন্য ভিন্ন সৃষ্টির সত্তা ত নাই-ই। সৃষ্টি ও চৈতন্য পরস্পর সাপেক্ষক," এই কথাগুলি মিলাইয়া দেখুন। আর একটি কথা বিবেচনা করুন যে, এই শতপথোদ্ধৃত বাক্যানুসারে আমাদের মন বাস্তবিকই কি সৎ নহে, অসৎও নহে এবং আবির্ভূত হইয়াই কি আত্মলাভ বা সাফল্য লাভ করে? একটু নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিলে দেখিবেন, মন যতক্ষণ বিষয়াকারে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তাহা অন্তর্নিহিত শক্তি মাত্র এবং সৎ হইলেও বস্তুতঃ অসৎ মাত্র। আবির্ভূত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা আত্মলাভ বা সাফল্য লাভ করে না। যাহা হউক, এ বিষয় পরে ক্রমশঃ আরও স্ফুট হইবে।

ভারতীয় অদ্বৈতবাদ বা বেদান্ত

হিগেল-দর্শনের সহিত ভারতীয় রামানুজ বা শঙ্করের দর্শনের তুলনায় বিচার এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। তবে হিগেলের দর্শন বলিয়া পূর্ব্বে যাহা বিবৃত হইল, তাহাতে দেখা গেল, ক্রিয়াত্মক চিচ্ছক্তি নিমেষে সফলীভূত হইয়া পরমেশ্বর হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমেশ্বর কালাতীতভাবে আপন সত্তার্থে এই সংসার ধারণ করিয়া আছেন। মানবের চৈতন্যও চিদাত্মক বলিয়া সসীমভাবে জগতে সেই প্রকারে আত্মলাভ বা সাফল্য লাভ করিতেছে। ইহাতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি মহাচৈতন্যের উপর নির্ভর করিলেও জগৎ মহাচৈতন্যের সফলতার অংত,শীভূপরমেশ্বরের অঙ্গীভূত বলিয়া একে-

বারে অসৎ নহে, তবে ইহার সত্তা চৈতন্যের সত্তা হইতে কতক নিকৃষ্ট, অবর হইতে পারে। ইহাতে মহাচৈতন্য ও জগতের মধ্যে সাপেক্ষত্ব এবং বিষয়-বিষয়িত্বভাব (Subject and object relation) আছে বলিয়া কতকটা বিরুদ্ধতা বা দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। ইহাকে পূর্ণ 'অদ্বৈত-বাদ' বলা যায় না। ইহা ভারতীয় রামানুজ-সম্মত "বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ" নামক সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

ভারতে যাহা অদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ, তাহা কাহারও কাহারও মতে শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত; কিন্তু এই অদ্বৈতবাদ বেদের সময় হইতে ভারতের একমাত্র তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত বলিয়া অনেক হিন্দু মনে করেন। তাঁহাদের মতে, শঙ্করাচার্য্য উহাতে দার্শনিক আকার মাত্র দিয়াছেন, বিষয় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল। তন্মতে—

"একমেবাদ্বিতীয়ং সং নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥" পঞ্চদশী, ৫।৫

অর্থাৎ নামরূপবিবর্জ্জিত, এক, অদ্বিতীয়, সৎ, যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন ছিলেন, এখনও তদ্রূপ আছেন, সেই পরব্রহ্মই তত্ত্ব ('তত্ত্বমসি' বাক্যের তৎপদবাচ্য); সুতরাং এই যে নামরূপাত্মক প্রপঞ্চময় বিশ্বজগৎ দেখা যাইতেছে, তাহা পরমার্থতঃ মিথ্যা বা অসৎ, ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মাত্র খণ্ড খণ্ড ও বহুত্বপূর্ণ দেখা যাইতেছে। এই ব্যবহারিক মিথ্যা দৃষ্টির কারণ কি? জীব অনাদি কর্ম্মবাসনা সংস্কার জন্য অনাদি অবিদ্যাযুক্ত বলিয়া—

"সংসারঃ পরমার্থোঽয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি।"

এই সংসার পরমার্থ বলিয়া দেখে ও পরমাত্মার সহিত ইহা সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া মনে করে।

ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্যাং বিদ্যয়ৈষা নিবর্ত্ততে। পঞ্চদশী, ৩।১০

এই ভ্রান্তিই অবিদ্যা, ইহা বিদ্যা দ্বারা নিবর্ত্তিত হয়। বিদ্যা দ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে তখন অবিদ্যাধ্যস্ত এই সকল নামরূপপ্রপঞ্চ স্বপ্নপ্রপঞ্চের ন্যায় বিলীন হয় (শারীরক ভাষ্য ৩য়ে ২, ২১)। তখনকার অবস্থাকে মোক্ষ বলে। তখন জীব "ব্রহ্মবিৎ হইয়া ব্রহ্মবৎ" নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগত, নিত্যতৃপ্ত, নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, বিজ্ঞানানন্দময় হয়। তখন কোন ভেদজ্ঞান থাকে না, এক অখণ্ডব্রহ্মস্বরূপ প্রতিভাত হয়।

অজ্ঞানাধীন জীবের পক্ষে অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থায় জগৎপ্রপঞ্চ আছে, কাজেই তাহার সৃষ্টিও আছে। সৃষ্টির কারণ-শক্তির নাম মায়া, তাহা "অঘটনঘটনপটীয়সী" অর্থাৎ যাহা তত্ত্বতঃ নহে, তাহা ঘটাইতে পটু। এই বহুত্বপূর্ণ, বিভিন্ন প্রপঞ্চের সৃষ্টিকারিকা শক্তি মায়া অনাদিভাবে ব্রহ্মে সংস্পৃষ্টা আছেন। ইহাতে মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে একটি ভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই, কারণ, মায়াও তত্ত্বতঃ নাই; কেবল অবিদ্যাধীন জীবের পক্ষে আছেন মাত্র।

"তুচ্ছানির্ব্বচনীয়া চ বাস্তবী চেত্যসৌ ত্রিধা।
জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভির্বোধৈঃ শ্রৌতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥ প দ ৬।১৩০

অর্থাৎ এই মায়া শ্রৌত দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় ও লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক—এই তিন রূপে জানা যায়।

লৌকিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই মায়িক জগৎ সর্ব্বানুভবসিদ্ধ বলিয়া বাস্তব বোধ হয়। যুক্তি-তর্কে ইহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না বলিয়া ইহা সত্য, কি অসত্য, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু জ্ঞান-দৃষ্টিতে ইহা নিত্য বাধিত হয় বলিয়া ইহা তুচ্ছ।

এখন এই মায়িক সৃষ্টিপ্রক্রিয়া কিরূপ? মায়া বা সৃষ্টিশক্তি যোগ হওয়া মাত্র পরব্রহ্ম আর শুদ্ধচিৎ রহিলেন না। তিনি মায়ালেপমাত্রে উপহিত হইয়া পরমেশ্বর সংজ্ঞা পাইলেন। মায়া-শক্তিতে চিৎ যোগ হইয়া "বহু হইব" এই ইচ্ছাশক্তি জন্মিল, তাহা হইতে সৃষ্টি চলিতে লাগিল। এই পরমেশ্বররূপে সফলীভূত মায়াশক্তিমাত্রোপহিত চৈতন্যের ইচ্ছা-শক্তির সহিত উপরিবিবৃত হিগেলের চিদাত্মক শুদ্ধসত্তা (Pure being which is identical with thinking) মিলাইয়া লউন। ইহাতে তাহা হইতে সফলীভূত পরমেশ্বর-অবস্থা হিগেল ও রামানুজের পরমেশ্বর-সত্তার সঙ্গে মিলিবে।

তাহা হইতে অপঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত উৎপন্ন হইয়া, তাহা হইতে দশেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও পঞ্চ প্রাণ উৎপন্ন হইল। এই সপ্তদশ লইয়া লিঙ্গশরীর হইল, তদুপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞক হইলেন। ইহার পর ভূতসকল পঞ্চীকৃত হইয়া স্থূলভূত-সকল উৎপন্ন হইল, তাহাতে জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এই সব স্থূলশরীরও উৎপন্ন হইল। তাহাতে এই দৃশ্যমান নামরূপপ্রপঞ্চিত জগৎ হইল। তদুপহিত চৈতন্য বৈশ্বানর বিরাট নামে অভিহিত হইলেন। (বেদান্ত-পরিভাষা ও বেদান্তসার হইতে এই সৃষ্টিপ্রক্রিয়া লিখিত হইল)। সুতরাং—

> যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
> পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্॥
> যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
> চিদন্তর্য্যামী সূত্রাত্মা বিরাট্ চাত্মা তথের্য্যতে॥—পঞ্চদশী, ৬-১।২

অর্থাৎ যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে চারিটি অবস্থা দৃষ্ট হয়, যথা,—ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত, তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্যামী (পরমেশ্বর), সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) এবং বিরাট্ এই চারিটি অবস্থা বিবেচিত হয়।

মায়াকল্পিত সৃষ্টিতে যেমন সমষ্টিভাবে ব্রহ্মের এই কয়টি অবস্থায় বিবর্ত্তন হয়, সেরূপ আমাদের ক্ষুদ্র দেহেতেও ব্যষ্টিভাবে তাহার সেই সেই স্তরে বিকশন হয়। আমরা সাধারণ অবস্থায়, নামরূপপ্রপঞ্চিত স্ফুট জগতের জীব। তবে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বেদান্ত-বাক্যে আবেদিত জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অবিদ্যা বাধিতা হইয়া নির্ম্মল পরমব্রহ্ম উপলব্ধি করিতে পারি। পঞ্চদশী বলিতেছেন,—

> পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
> বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥—৫-৩।৪

অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা, (শমদমাদি সাধনদ্বারা) বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য বুদ্ধির সাক্ষিরূপে প্রকাশমান হইয়া অবস্থিতি করতঃ অহং শব্দের বাচ্য হন। স্বতঃসিদ্ধ, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা এখানে ব্রহ্ম শব্দের বাচ্য; 'অস্মি' এই শব্দ দ্বারা এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। তদ্দ্বারাই জীবন্মুক্ত পুরুষের "আমিই ব্রহ্ম" এই ব্যবহার সিদ্ধ হইল। সুতরাং এরূপও এক অবস্থা আছে, তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব উপলব্ধি হয়। সেই অবস্থার নাম "মোক্ষ"। তখন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

অর্থাৎ হৃদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হইয়া যায়। যে আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব বুঝিয়াছে, তাহার মোহই বা কি, শোকই বা কি।

এই অবস্থা যখন জীবের হয়, তখন তাহাকে "জীবন্মুক্ত" বলে। জীবন্মুক্ত দেহপাত বা মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করেন, ইহার পর তাঁহার আর পুনরাবর্ত্তন অর্থাৎ জন্ম হয় না।

অপর দিকে ব্রহ্মজ্ঞান বা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীব নিজের অনাদিকালার্জ্জিত পাপ-পুণ্যাদি অনুসারে ভাল-মন্দ নানা প্রকার জীবরূপে জন্ম ও মৃত্যুর অধীন থাকে। ইহাকে সংসার বলে। জীব বলিতে যেমন মানুষাদি জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চারি প্রকার ভূর্লোকের জীব বুঝায়, তদ্রূপ অন্যান্য লোকবাসী দেবতা প্রভৃতিকেও বুঝায়। কাজেই ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সকলেই জীব এবং এই সকল রকমের জীবলোক ব্যাপিয়াই সংসার, সকলেই জন্ম ও মৃত্যুর অধীন। প্রত্যেক জীবেরই কর্ম্মফলজন্য অনাদি কাল হইতে নানা প্রকারের জীবরূপে সংসার হইতেছে। সুতরাং এই সংসার ও সৃষ্টিধারা অনাদি। প্রলয়কালে ব্রহ্মসংসৃষ্ট মায়ামাত্র আশ্রয় করিয়া কর্ম্মফল থাকে। পরে সৃষ্টির অবস্থায় সেই কর্ম্মফলানুসারে প্রত্যেকের পক্ষে সৃষ্টি নিয়মিত হয়। সুতরাং প্রাণিগণের কর্ম্মফলই সৃষ্টির গতিনির্দ্দেশক কারণ।

ইহাই হইল প্রধানতঃ অদ্বৈতবাদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত। পরে এ সকল বিষয়ে আরও আলোচনা হইবে। এখন এ সকল সিদ্ধান্ত মনে রাখিয়া, তাহা বেদের সংহিতাভাগে কতদূর পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। তবে প্রথমে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জ্ঞানলাভের উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

জ্ঞানলাভের উপায়, স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ।

সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞানলাভের উপায় কি কি আছে, সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তি কালের হিন্দু-

শাস্ত্রে 'প্রমাণ' নামে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। প্রাচীন শাস্ত্রেও এ বিষয়ে যথেষ্ট আভাস দেওয়া আছে। প্রায় সমস্ত শাস্ত্রকারদের মতেই জ্ঞানলাভের উপায়ানুসারে জ্ঞানকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ; তাহা শ্রৌত জ্ঞান ও লৌকিক জ্ঞান। লৌকিক জ্ঞানের উপায় প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়গৃহীত বস্তু প্রত্যক্ষ দ্বারা লব্ধ হয়, অপ্রত্যক্ষ বস্তু প্রত্যক্ষ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকিলে সেই সম্বন্ধের উপর নির্ভর করিয়া অনুমান দ্বারা তাহার জ্ঞান হয়। কিন্তু যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, প্রত্যক্ষ সেখানে ত চলেই না, আর যে বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধও স্থাপিত হয় না, তাহার জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অনুমান কিছু দ্বারাই হয় না। শঙ্করাচার্য্য দেখাইয়াছেন,—ব্রহ্ম শুদ্ধ ও নির্গুণ, তিনি ইন্দ্রিয়বিষয় ত হয়েনই না, পরন্তু তাঁহার সঙ্গে কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বারা কার্য্যমাত্র গৃহীত হয়। কার্য্যের ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ, কি অন্য কিছুর সহিত সম্বন্ধ, তাহা নির্ণীত হয় না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের প্রসার সুধু মায়িক জগতে। কিন্তু অন্য একটি উপায় আছে, তাহা বেদান্তোক্ত "সোঽহং", "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা অভিহিত হয়, তাহাকে শ্রুতি বা বেদপ্রমাণ বলে। সে প্রমাণ ঋষিগণের ব্রহ্মদর্শনের উপর স্থাপিত, তজ্জন্য সত্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মদর্শন নামক এক প্রকার জ্ঞান আছে। তাহা পূর্ব্বোক্ত "মুক্ত" পুরুষদিগেরই সম্ভব। সে জ্ঞান মায়িক উপায় দ্বারা লব্ধ নহে বলিয়া মায়িক ভাষাতেও প্রকাশ্য নহে। তবে ব্রহ্মদর্শী ঋষিরা লোকের শিক্ষার্থ যতদূর পারেন, মায়িক ভাষাতে তাহা বেদাকারে ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মজ্ঞান কি প্রকার, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে কতক আলোচনা করা গিয়াছে। তাহাতে একমাত্র সচ্চিদানন্দাত্মক ব্রহ্ম বস্তুই সত্য, এই জ্ঞান লব্ধ হয়। তবে ব্রহ্মবস্তুকে যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলা যায়, তাহাও মায়িক ভাষায়। সুতরাং আমরা মায়িক জগতে এ সকল শব্দ যে অর্থে ব্যবহার করি, ব্রহ্মে সে অর্থে তাহা প্রযোজ্য নহে। তবে মায়িক জগতের সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিন শব্দই ব্রহ্মস্বভাবকে কথঞ্চিৎ বুঝাইতে পারে, এই মাত্র। পরিবর্ত্তি শাস্ত্রে অনুমান ও প্রত্যক্ষাদির উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্ম বস্তুকে "জগতের সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকর্ত্তা" প্রভৃতি লক্ষণা দ্বারা গৌণ ভাবে লক্ষিত করাকে ব্রহ্মের "তটস্থ"-লক্ষণা বলিয়াছেন, আর আত্মজ্ঞানোপায়ে উপলব্ধ ব্রহ্মস্বরূপকে তাঁহার "স্বরূপ"-লক্ষণা বলিয়াছেন। তাহাতে "সচ্চিদানন্দ" এই ভাব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণা বটে।

বেদের সংহিতা-ভাগ

বৈদিক সাহিত্যকে সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে ;—মন্ত্রভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ, আরণ্যক ও উপনিষদ্‌ভাগ এবং সূত্রভাগ। ইহাকে আবার বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারি বেদে বিভক্ত করা হইয়াছে। সুতরাং প্রত্যেক বেদেই উপরিলিখিত ভাগ-সকল আছে। প্রত্যেক বেদের মন্ত্র-ভাগকে সেই বেদের সংহিতা বলে। সুতরাং বেদের সংহিতা-ভাগ বলিলে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগকে

বুঝায়। অনেক মন্ত্র অবিকল বা সামান্য পরিবর্ত্তিত আকারে একাধিক সংহিতাতে স্থান পাইয়াছে। মন্ত্র ছন্দোবদ্ধ শ্লোকাকারে রচিত। কতকগুলি মন্ত্রে এক এক সূক্ত হয়। প্রত্যেক সূক্তের এক বা অধিক ঋষি ও দেবতা আছেন। ঋক্, সাম ও অথর্ব্ব-সংহিতা এক এক গ্রন্থাকারে আছে। কিন্তু যজুঃসংহিতা কৃষ্ণযজুঃ ও শুক্লযজুঃ, এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে বেদের মন্ত্রব্যাখ্যাত্মক ব্রাহ্মণ-ভাগের মত গদ্যাকারে লিখিত ব্যাখ্যাও আছে। তৈত্তিরীয় ও বাজসনেয়-সংহিতা নামে এই দুই যজুঃসংহিতা যথাক্রমে এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এই সংহিতা-ভাগকে প্রকৃত বেদ বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, মন্ত্র-সকল বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছে এবং যদিও চারি বেদ আকারে আছে, তবুও মূলতঃ এক গ্রন্থ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ইহাতে অতি প্রাচীন মন্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক মন্ত্র-সকলও স্থান পাইয়াছে। যজুঃসংহিতা ও ঋক্‌সংহিতার স্থানে স্থানে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও অথর্ব্বসংহিতায় সর্ব্বাপেক্ষা অর্ব্বাচীন মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

ঋষি ও দেবতা

বেদের সংহিতা-মন্ত্রগুলি যজ্ঞের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ব্যবহার জন্য গ্রথিত, সুতরাং ইহা বেদের কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত। সাধারণতঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ড বা উপনিষদ্ভাগই অদ্বৈতবাদের ন্যায় দার্শনিক মতবাদের স্থান। কর্ম্মকাণ্ডে তাহা মুখ্যভাবে পাওয়া যাইবে না। তবে সংহিতা-মন্ত্রগুলির বর্ণনীয় বিষয় কি, তাহা ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে অধ্যাত্মতত্ত্ব থাকা অসম্ভব নহে, বোধ হইবে। মন্ত্রগুলি ঋষিদের জ্ঞান বাক্যেতে প্রকাশ করিতেছে, এ বিষয়ে কাহারও মত-ভেদ থাকিতে পারে না। তবে সেই জ্ঞানের বিষয় কি, তাহা লইয়া মতভেদ দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলিতেছেন,—ঋষিগণ সভ্যতার প্রারম্ভে প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহকে দেবতা বা মানুষের মত শক্তিমান্ পুরুষের দ্বারা অধিষ্ঠিত ভাবিয়া অতি সরল ভাষায় তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। আবার কখন কখন কল্পনার সাহায্যে এই সকল ভাব হইতে অংশ গ্রহণ করতঃ নূতন ভিত্তিহীন কাল্পনিক ভাব সকল নির্ম্মাণ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঋষিগণের এবং হিন্দু পণ্ডিত-গণের মত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন,—ঋষিগণ আর্ষ ও লৌকিক জ্ঞান-দর্শনে যে সকল সত্য দর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই ভাষাবদ্ধ হইয়াছে, বর্ণিত আর্ষ ভাবসমূহ মিথ্যা নহে, তাহা সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের বস্তু অপেক্ষা সত্যতর। যাস্ক বলিতেছেন,—

ঋষির্দ্দর্শনাৎ। স্তোমান্ দদর্শ ইত্যৌপমন্যবঃ। তৎ যদেনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বভ্যা-নর্ষৎ তে ঋষয়োঽভবন্।—নিরুক্ত ২য়, ১১

অর্থাৎ দর্শন হেতু ঋষি। উপমন্যু বলেন,—'ইহাঁরা তপস্যা করিতে করিতে দর্শন করিয়া-ছিলেন। তজ্জন্য এ সকল ঋষি যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে আর্ষ জ্ঞান দিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তাঁহারা ঋষি হইলেন।'

আবার বলিতেছেন,—

ঋষেদৃ´ষ্টার্থস্য প্রীতিরাখ্যানসংযুক্তা।—নি, ১০ মে, ১০, ৪৬

অর্থাৎ ঋষিগণের দৃষ্ট পদার্থে প্রীতি ও আখ্যান সংযুক্ত হইয়াছে।

ঋকৃসংহিতায়ই আছে,—

"যে চিদ্ধি পূর্বং ঋতমাপ আসন্‌ংসাকং দেবেভিরবদন্নৃতানি"

—১ম মণ্ডল, ১৭৯ সূক্ত, ২য় মন্ত্র

অর্থাৎ পূর্ব্বে যাঁহারা ঋষি ছিলেন, তাঁহারা দেবতাদের সহিত সত্য বলিয়াছিলেন।

ইত্যাদি আরও অনেক কথা আছে, যাঁহাতে ঋষিরা দৃষ্ট সত্য মাত্র লিখিয়াছেন, বলা হইয়াছে। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে আছে,—"ন প্রত্যক্ষমনৃষেরস্তি মন্ত্রম্।"—পরিশিষ্ট, ১২৯

অর্থাৎ অনৃষির (যিনি ঋষি নহেন) মন্ত্র প্রত্যক্ষ হয় না। এই প্রকার আর্ষজ্ঞানবিষয়ক কথায় প্রাচীনতম বেদমন্ত্র হইতে আধুনিক হিন্দুশাস্ত্র পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ।

দেবতাদের সম্বন্ধে যাস্ক বলেন,—

মাহাত্ম্যাৎ দেবতায়াঃ একঃ আত্মা বহুধা স্তূয়তে।
একস্য আত্মনোঽন্যে দেবা প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।
অপিচ সত্ত্বানাং প্রকৃতিভূমভিঃ ঋষয়ঃ স্তবন্তি ইতি আহুঃ।
প্রকৃতিসার্ব্বনাম্ন্যা চ ইতরেতরজন্মানো ভবন্তি
ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ কর্ম্মজন্মনঃ আত্মজন্মানঃ।—নিরুক্ত—১১, ২৩

তিস্রঃ এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো বায়ুঃ বা ইন্দ্রঃ বা অন্তরীক্ষস্থানঃ সূর্য্যঃ দ্যুস্থানঃ।—নিরুক্ত—৭, ৫

অর্থাৎ এক আত্মাকে মাহাত্ম্য হেতু দেবতারূপে অনেক রকমে স্তব করা হয়। সমস্ত দেবগণ এক আত্মার প্রত্যঙ্গস্বরূপ। অপিচ তাঁহাদের অস্তিত্বের নানারূপ প্রকৃতি আছে, এই ভাবে ঋষিরা স্তব করেন বলিয়া বলা হয় এবং তাঁহাদের স্বভাবকে নানা নামে ডাকা যায় বলিয়াও তাঁহাদের একে অন্য হইতে উৎপন্ন, একে অন্যের প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহারা কর্ম্ম হইতে জন্মগ্রহণ করেন, আত্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। নৈরুক্তেরা তিন প্রকারের দেবতা বলিয়া থাকেন। পৃথিবীবাসী অগ্নি, অন্তরীক্ষবাসী ইন্দ্র বা বায়ু ও স্বর্গবাসী সূর্য্য। দেবতা সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমাদের অনর্থক। তবে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে, হিন্দুগণ পরমাত্মার সৃষ্টিপ্রপঞ্চে বিকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্তর ভিন্ন জীব নামে খ্যাত হইয়াছে। তাহার এক স্তরকে যেমন মানুষ বলে, অন্য কয়টি স্তরকে এইরূপে দেবতা বলে। মানুষের যেমন উপাধি (সূক্ষ্ম স্থূল শরীর) ও ক্ষেত্র (surrounding) আছে, তেমন তাঁহাদেরও আছে। হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বকালেই এই দেববাদে আস্থাবান্, সুতরাং ইহা বস্তুতঃ মিথ্যা হইলেও ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা মুছিয়া ফেলিবার নহে। তবে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত মানিয়া নিলেও আমরা উপস্থিত

ক্ষেত্রে দেবতা বলিতে সৃষ্টির অন্তর্গত অতিপ্রাকৃত দৃশ্যমাত্র বুঝিতে পারি ও কতকগুলিকে প্রাকৃত দৃশ্যও বলিতে পারি। সুতরাং ঋষিগণের দেবতাজ্ঞান সৃষ্টির প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত অবস্থা সম্বন্ধে ভাব (ideas) স্বরূপে পরিণত হইতেছে। কাজেই উপস্থিত ক্ষেত্রে দার্শনিক হিসাবে, প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের বিবৃতি মন্ত্রসমূহ হইতে পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইতে, ঋষিদের দার্শনিক ধারণা কি ছিল, তাহা দেখান নিতান্তই সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। তবে তাহা মন্ত্রেতে দার্শনিক ভাষায় বিবৃত না হইয়া থাকিতে পারে।

মন্ত্রের ভাষা সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক। ভাষা সর্ব্বদাই ভাবের বহু পশ্চাতে আসে। অনেক ভাব আছে, তাহার শব্দ হয় ত ভাষায় এখনও সৃষ্ট হয় নাই। ঋষিরা যে সময়ে মন্ত্র রচনা করিতেছেন, তখন সাধারণ ভাবরাশি অনেকটা স্ফুট হইয়া থাকিলেও ভাষা ততটা স্ফুট হইয়াছিল বলিয়া আশা করা যায় না। বিশেষতঃ ঋষিরা যে অতিপ্রাকৃত দর্শনের কথা বলেন, তাহার জ্ঞান অনেকটা ভাষায় প্রকাশ হওয়া সম্ভবই নহে, তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন; আর অনেকটা তখনকার শিশুভাষায় যে প্রকাশিত হইত না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। তজ্জন্য মন্ত্রের ভাষা অতি সাধারণ বা বিশৃঙ্খল হইলেও তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাবরাশি আমাদিগকে অনুমান করিয়া লইতে হইবে। এই কথাগুলি সম্যক্ মনে রাখিয়া এখন আমরা প্রকৃত বিষয়ে প্রবেশ করি।

ঋক্‌সংহিতার নাসদীয় সূক্ত

প্রথমতঃ আমরা ঋক্‌সংহিতার নাসদীয় সূক্তের একটু বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরম্॥১॥
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস॥২॥
তম আসীত্তমসা গুড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্ মহিনা জায়তৈকং॥৩॥
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতিষ্যা কবয়ো মনীষা॥৪॥
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃস্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতধা আসন্মহিমান আসন্‌ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ॥৫॥
কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভুব॥৬॥
ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥৭॥

ঋক্‌সংহিতা—১০ম মণ্ডল, ১২৯ তম সূক্ত।

অনুবাদ ;—(১) তখন অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না, রজঃ* ছিল না, পর যে ব্যোম, তাহাও ছিল না। কাহাকে আবরণ করিবে? কাহারই বা মঙ্গল কোথায় থাকিবে? গহন-গভীর অম্ভই বা কি ছিল? (২) মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, তখন রাত্রি-দিবার পরিচয় ছিল না। সেই অবাত এক স্বধার সহিত ছিলেন, তাঁহা হইতে অন্য, পর কিছুই ছিল না। (৩) তম ছিল, অগ্রে তমসাবৃত এই সমস্ত অপরিজ্ঞায়মান সলিল ছিল। জাত সমস্ত তুচ্ছের দ্বারা আবৃত ছিল, যাহা ছিল, তপের মহিমা দ্বারা জাত সেই একীভূত। (৪) তখন মনেতে সেই কাম জন্মিল, যাহা প্রথম বীজস্বরূপ হইল। ঋষিরা মনীষা দ্বারা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া সতের বন্ধন অসতেতে (আছে) জানিলেন। (৫) ইহাদের তির্য্যক্ বিতত রশ্মি অধে কি ছিল? ঊর্দ্ধে কি ছিল? বীজী হইলেন, মহৎ হইল, নিকৃষ্টে স্বধা হইল, উৎকৃষ্টে প্রযতিতা (ভোক্তা) হইলেন। (৬) কে ঠিক জানে, কে এখানে বলিবে, কাহা হইতে এ সব জন্মিল, কাহা হইতে এই বিসৃষ্টি? ইহার সৃষ্টির পরে দেবতারা হইয়াছিলেন, তখন কে জানে, যাহা হইতে এগুলি হইল? (৭) এই সৃষ্টি যাহা হইতে, তিনি ইহা ধারণ করেন, কি বা নাই করেন, যিনি ইহার অধ্যক্ষ, পরম নির্ম্মল জ্ঞানে তিনি ইহা জানেন বা নাই জানেন।

এই ত হইল কথায় কথায় অনুবাদ। ভাষ্যকারদের সাহায্য না লইয়া আমরা ইহা হইতে কি পাই, দেখা যাক।

প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্র

(১)—প্রথম তিন ছত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে, এমন এক সময় ছিল, তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না; ভুবনাদি লোক, আকাশ, আকাশের আবর্য্য পৃথিবী, মঙ্গলামঙ্গলভাগী জীব, গহন-গভীর জল—কিছুই ছিল না। মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি দিবা-বিভাগ ছিল না। ইহাতে বুঝা যায়, সৃষ্টি তখন ছিল না। আর দেখা যায়,—"অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না" অর্থাৎ যাহা ছিল, তাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না—সদসদনির্ব্বচনীয় কিছু ছিল। কখন্? সৃষ্টির পূর্ব্বে। নিষ্কর্ষ—বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সদসদনির্ব্বচনীয় কিছু ছিল। কিন্তু এই তিন ছত্রে জগতের 'নাসীৎ' ভাবটিই ব্যক্ত হইল। এখন সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হইতেছে।

(২)—চতুর্থ ছত্রে দেখা যায়, সেই এক, যাহা অবাত, তাহা স্বধার সহিত ছিল—তা ছাড়া অন্য পর আর কিছুই ছিল না। প্রথম তিন ছত্রে দেখা গিয়াছে,—"নাসীৎ" যাহা, তাহাই বলিয়াছেন, এই ছত্রে "আসীৎ" যাহা, তাহা বলিতেছেন—তাহা সেই এক অবাত, স্বধার সহিত বর্ত্তমান। স্বধা অপ্রধান বলিয়া তৃতীয়া বিভক্তিতে আছে; সুতরাং একই প্রধানতঃ ছিল—স্বধা তাহার সঙ্গে আছে মাত্র। পরে তাহা আরও স্পষ্ট হইতেছে,—তাহা হইতে অন্য, পর কিছুই ছিল না অর্থাৎ সেই একের আর দ্বিতীয় ছিল না। স্বধা যাহা ছিল, তাহা এত

---

* ভুবনাদি লোক—যাস্ক।

অপ্রধান যে, ইহাতে একের একত্বের হানি হয় নাই। 'আস' এই পদ লিট্ বিভক্তিতে আছে, কিন্তু 'একং আসীৎ'—ইহাতে 'আসীৎ' পদ লঙে আছে; লিট্ বিভক্তি লঙ বিভক্তি অপেক্ষা বেশি অতীতের কথা প্রকাশ করে। সুতরাং "অন্যৎ ন পরঃ ন আস" এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে, একের পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না। সেই একের স্বভাব নির্দ্দেশ করিতেছেন 'অবাত' এই পদদ্বারা অর্থাৎ এক বাতহীন ছিলেন। বাত অর্থে বায়ু, সাধারণতঃ বায়ুহীন অর্থে প্রাণহীন বুঝায়। সম্ভবতঃ বায়ুর গতিশীলত্ব ধর্ম্ম দেখিয়াই একে অবাত বলা হইয়াছে। তাহাতে এক স্থির, নিশ্চল ছিলেন, এই ভাব আসিতেছে। এই ভাব ঋক্‌সংহিতার স্থানান্তরে উক্ত "অক্ষর" এই ভাবের সঙ্গে মিলিবে। স্বধা শব্দের অর্থ পরে আলোচনা করা যাইতেছে। সুতরাং নিষ্কর্ষ—নিশ্চল এক অদ্বিতীয় স্বধার সহিত ছিলেন। এখানে "একং" শব্দের ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিবেন, এ সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে।

(৩)—এখন এই দুই মন্ত্র একত্র করা যাক। প্রথম তিন ছত্রে যাহা 'নাসীৎ" অর্থাৎ ছিল না, তাহাই বলিলেন, চতুর্থ ছত্রে যাহা ছিল, তাহাই বলিলেন। চতুর্থে দেখা গেল, স্থির এক অদ্বিতীয় স্বধা নামক কোন অপ্রধান জিনিষের সহিত ছিলেন। প্রথম তিন ছত্রে দেখা গেল, বিশ্ব-সংসার বা সৃষ্টি ছিল না; কিন্তু সব 'নাসীৎ'এর মধ্য হইতে আমরা কিছু 'আসীৎ'এর মত বাহির করিলাম, তাহা হইল—"কোন কিছু, যাহা আছেও বলা যায় না, নাইও বলা যায় না"। আর এই অনির্ব্বচনীয় জিনিষই যে বিশ্বের না থাকা কালের অবস্থা, তাহারও যথেষ্ট আভাস, রজঃ, ব্যোম প্রভৃতি জগদ্‌বস্তুর সঙ্গে 'সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না', এই বাক্যের একত্র উল্লেখ দ্বারা পাওয়া যাইতেছে। তাহা হইলে এই পাওয়া যাইতেছে—নিশ্চল এক অদ্বিতীয়, স্বধার সহিত—আর জগতের স্থানভূত সদসদনির্ব্বচনীয় আরও কিছু—এই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল।

(৪)—স্বধা শব্দের অর্থ কি? স্বধা শব্দের সাধারণ অর্থ পিতৃগণের খাদ্য। অন্ন আমাদের খাদ্য। স্বধা ও অন্ন প্রায় একার্থক। ভোক্তা ভোগ্য, (খাদক খাদ্য) এই সাপেক্ষক শব্দ-ব্যবহার হিন্দুদর্শনে অনেক আছে; ইহাতে সাধারণ বিষয়ী ও বিষয়-ভাব বুঝায়, ইংরেজিতে তাহাকে (mind & matter, subject & object) এই ভাব বলে। অন্ন শব্দের ভোগ্য (matter বা object) অর্থে ব্যবহার অনেক আছে; যথা,—অন্নময় কোষ। স্বধা অন্ন হইতে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মশরীরী পিতৃগণের খাদ্য। সুতরাং এখানে বোধ হয়, স্বধা শব্দ সূক্ষ্মতর ভোগ্য (more refined matter ?) অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। বেদসংহিতায়ই অন্ন শব্দের এই ব্যবহার দেখাইতেছি।

"যদ্ (ইদং পুরুষঃ) অন্নেন অতিরোহতি।—১০, ৯০, ২ ঋক্‌সংহিতা, পুরুষসূক্ত

সায়নাচার্য্যের অর্থ,—পুরুষ অন্নের দ্বারা আপনাকে অতিরোহণ করেন অর্থাৎ নিজ কারণাবস্থা অতিক্রম করিয়া পরিদৃশ্যমান জগদবস্থা প্রাপ্ত হন।

এতস্মাৎ বৈ ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।

—অথর্ব্ব-সংহিতা—১১, ৩, ৫২

প্রজাপতি এই ওদন হইতে তেত্রিশ দেবতা ও লোক সমস্ত নির্ম্মাণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন 'যজ্ঞের দ্বারা সৃষ্টি', এখানে যজ্ঞের অর্থ অন্ন করা হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে শতপথ-ব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে এবং হেগেল-দর্শনের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বিষয়ি-চৈতন্য (subject) কি প্রকারে বিষয় (object) হইয়া তৃতীয় জিনিষ উৎপাদন করিয়া আত্মবান্ হয়, তাহা বুঝা যায়। সুতরাং এখানে অন্নের দ্বারা সৃষ্টি স্থলে অন্ন অর্থে matter বা object হওয়া এক প্রকার নিশ্চিত। এই সূক্তে 'স্বধা' শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়নাচার্য্য এই স্বধার অর্থ 'মায়া' লিখিয়াছেন, আর পঞ্চম মন্ত্রের স্বধার অর্থ ভোগ্য লিখিয়াছেন। পূর্ব্বেই বেদান্তের মায়া অর্থে যে পরমেশ্বর-চৈতন্যকে বিষয়ী ধরিয়া তাহার বিষয় (object)কে বুঝায়, তাহা বলা হইয়াছে; সুতরাং সায়নের অর্থ অসঙ্গত নহে।

তৃতীয় মন্ত্র

তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—তম ছিল, এই সমস্ত তমসাবৃত অবস্থায় অপরিজ্ঞায়মান 'সলিল' ছিল। 'ইদং সর্ব্বং' বলিতেই জগৎ বুঝা যাইতেছে। তখন জগৎকে চিনিতে পারা যাইত না, তাহা সলিলে অন্ধকারাবৃত ছিল। ইহাতে স্পষ্টতই বোধ হইতেছে যে, জগৎ অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয় অবস্থায় "সলিলে" ছিল। জগতের অব্যক্ত কারণকে "কারণ-সলিল" বলিয়া পুরাণাদিতেও কীর্ত্তিত হইয়াছে। সলিল চলনার্থক সল্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন বলিয়া "চলনোন্মুখ কারণ" অর্থে সায়নাচার্য্য ধরিয়া নিয়াছেন। আভু অর্থাৎ যাহা সমন্তাৎ হইয়াছিল, তাহা তুচ্ছে আচ্ছাদিত ছিল, যাহা হইয়াছিল, তাহা তপের মহিমায় হইয়াছিল। তুচ্ছ অর্থে হেয় বস্তু বুঝায়—যাহা সহজেই নাশ হয়। স্রষ্টব্য জগৎ তুচ্ছে আবৃত ছিল। তপঃএর মহিমাতে জগৎ উৎপন্ন হইল। তপঃশব্দের অর্থ তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের ভাষ্যকার এইরূপ লিখিয়াছেন,—"ন অত্র তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিরূপং, কিন্তু স্রষ্টব্যপদার্থবিশেষবিষয়ং পর্য্যালোচনং। অতএব আথর্ব্বণিকা আমনন্তি—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ ইতি।" অর্থাৎ এখানে তপঃশব্দের অর্থ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি ব্রত নহে, স্রষ্টব্য পদার্থবিশেষের পর্য্যালোচন (ইন্দ্রিয়জ্ঞান—যুক্তিতর্ক নহে)। এজন্যই অথর্ব্ববেদীরা লিখিতেছেন,— যিনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ, যাঁহার তপঃ জ্ঞানময়। বোধ হয়, তপস্যার ফলস্বরূপ যে জ্ঞানোৎপত্তি হইত, সেই জ্ঞানকে লক্ষ্য করিয়া জ্ঞানবিশেষ অর্থে তপঃশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং পাওয়া যাইতেছে, জগৎ কারণাবস্থায় অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয় ছিল ও জ্ঞানের (তপঃএর) মহিমাতে উৎপন্ন হইয়াছিল।

চতুর্থ মন্ত্র

প্রথম মনের উপর কাম হইল, সেই কামই বীজ বা কারণ। কাম অর্থে ইচ্ছাশক্তি, এই ইচ্ছাশক্তিই জগদুৎপাদনে বীজস্বরূপ। আমরা হিগেল-দর্শনের ব্যাখ্যায় বুঝিয়াছি, ইচ্ছাত্মক

চিৎ-শক্তি সকলীভূত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। সুতরাং এখানে ইহা বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞান ও মায়াশক্তি মিলিত হইয়া মনঃ হইল এবং তাহাতে ইচ্ছাশক্তি জন্মিল। সতের বন্ধন-কারণ (গতিনির্ণায়ক কিছু) অসতে ছিল। এখানে সৎ অর্থে সৃষ্ট জগৎ বুঝিতে হইবে। তখনও ব্রহ্মকে বুঝাইতে 'এক' ইত্যাদি শব্দ চলিতেছে। 'সৎ' ব্রহ্মার্থে পরবর্ত্তি কালেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বিবৃত করিয়াছি। এই জগতের সৃষ্টি কি প্রকার হইবে, তাহার নির্ণয় করিবার জন্য কোন কিছু জগতের অব্যক্ত কারণে (অসতে) নিহিত ছিল। ইহা গতি-নির্ণায়ক কারণ, প্রাণিসমূহের পূর্ব্বকর্ম্মফল ব্যতীত আর কিছুই নহে; হিন্দুশাস্ত্রানুসারে অন্য কিছু এ অর্থে নির্দ্দেশ করাই যাইতে পারে না।

পঞ্চম মন্ত্র

এখানে বলা হইতেছে, সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চারিদিকে রশ্মি বিস্তৃত হইয়া ঊর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য ব্যাপিত করিল। তাহাতে রেতধা অর্থাৎ কর্ত্তা ভোক্তা জীব, মহৎ আকাশাদি, স্বধা (ভোগ্য) ভাবে নিকৃষ্ট জিনিষ, প্রযতিতা (ভোক্তা) ভাবে উৎকৃষ্ট জীব সৃষ্ট হইল। সূর্য্য ও রশ্মির মত, রথচক্রের নাভি ও অরের মত, চৈতন্য হইতে সৃষ্টির কথা বেদেই অনেক আছে। তাহা ক্রমশঃ দেখা যাইবে। পরমেশ্বর-চৈতন্য হইতে বিক্ষিপ্ত মায়া হইতে জগৎসৃষ্টির ভাব পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

নাসদীয় সূক্তের তাৎপর্য্য

নাসদীয় সূক্তের সারভাগ বিবৃত হইল। ইহা হইতে মোটামোটি এই পাওয়া যাইতেছে,—(১) এক অদ্বিতীয় স্থিরপদার্থ কোন শক্তি সহ জগতের সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমান আছেন; (২) জগৎ তখন কারণে অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয়, সেই অবস্থা সদসদনির্ব্বচনীয়। (৩) জগৎ তুচ্ছ, জ্ঞানের মহিমায় জাত, ইচ্ছাশক্তিই জগতের বীজ। কোন কিছু জগৎ-কারণে থাকিয়া জগতের গতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। (৪) সূর্য্যরশ্মির মত জগৎ সৃষ্টি হয়, তাহাতে ভোক্তা, ভোগ্য, দেবতা, আকাশ সব আছে।

অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে এই সূক্ত মূলীভূত। ক্রমশঃ ইহার আরও আলোচনা হইবে। এখন এ সকল সিদ্ধান্তানুসারে সমগ্র বেদ-সংহিতায় কি পাওয়া যায়, তাহা একত্র করিয়া, তাহাতে অদ্বৈতবাদের কতদূর লক্ষিত হয়, দেখিতে হইবে। সুবিধার জন্য এখান হইতে অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তানুযায়ী শিরোনাম দিয়া সে সকল সিদ্ধান্তানুসারে আলোচনা করিব।

একমেবাদ্বিতীয়ম্

পূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে, বেদান্ত-মতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই তত্ত্ব। জগতে যে পৃথক্ত্ব, বহুত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা মায়াজনিত। ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই পরমার্থ দৃষ্ট হয়, তখন একত্বের উপলব্ধি হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ব্যবহারিক কালে প্রকটিত জগতের বহুত্ব মাত্র দৃষ্ট হয় এবং প্রলয়েতে জগৎ

অব্যক্তভাবে জগৎকারণ মায়া-শক্তিতে নিহিত থাকে। মায়ার আদি অন্ত নাই। সুতরাং মায়া শক্তিরূপে ব্রহ্মবস্তুতে সংলগ্ন আছে। পূর্ব্বোক্ত নাসদীয় সূক্তের—

আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিং চ নাস।—ঋ সং ১০, ১২৯, ২

অর্থাৎ নিশ্চল এক, স্বধাযুক্ত হইয়া বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহা হইতে অন্য কিছু ছিল না, পরও কিছু ছিল না। ইহার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই মন্ত্রাংশে প্রলয়কালে মায়াশক্তি সহ বর্ত্তমান এক অদ্বিতীয় তত্ত্বের স্বীকার করা হইতেছে। একতত্ত্ব সম্বন্ধে আর আর মন্ত্র এই ;—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিরথো দিব্য স সুপর্ণো গরুত্মান্।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিযমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥—ঋ সং—১, ১৬৪, ৪৬

অর্থাৎ (ঋষি আদিত্যকে বলিতেছেন),—বিপ্রেরা এক সৎ বস্তুকে অনেক প্রকারে বলিয়া থাকেন; যথা,—ইন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অগ্নি, সেই দিব্য শোভনপক্ষ গরুত্মান, অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা।

সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভিঃ একং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।—ঋ সং—১০, ১১৪, ৫

অর্থাৎ ঋষি বিপ্রেরা এক সৎ বস্তুকে সুপর্ণাদিরূপে অনেক রকমে বাক্য দ্বারা কল্পনা করিয়া থাকেন।

এই দুই মন্ত্রেই এক সৎ বস্তুকে ঋষিরা শুদ্ধ বাক্য দ্বারা বহুরূপে কল্পনা করিয়া থাকেন, বলা হইয়াছে।

এক ইবাগ্নি বহুধা সমিদ্ধঃ একঃ সূর্য্যঃ বিশ্বং অনুপ্রভূতঃ।

একৈবোষাঃ সর্ব্বং ইদং বিভাতি একং বৈ ইদং বিবভূব সর্ব্বম্॥—বালখিল্য—১০, ২

অর্থাৎ একই অগ্নি বহুপ্রকারে স্থিত, এক সূর্য্য বিশ্বজগতে অনুপ্রবিষ্ট। একই ঊষা এই সমস্তকে আলোকিত করেন। একই এই নিখিল সমস্ত হইয়াছেন।

এখানে নানা দৃষ্টান্ত দিয়া একতত্ত্বই এই নিখিল সমস্ত "হইয়াছেন", বলা হইতেছে। একতত্ত্ব স্বীকার সম্বন্ধে এগুলি হইতে আর স্ফুটতর কথা কি হইতে পারে? একতত্ত্ব বহু হইবার কথা আরও অনেক আছে, ক্রমশঃ তাহা দেখা যাইবে। কিন্তু কেবলমাত্র একতত্ত্ব-স্বীকারে "অদ্বৈতবাদ" হয় না। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, হিগেল ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত "পরমেশ্বর" ও একতত্ত্ব। সুতরাং প্রকৃত অদ্বৈতবাদ দেখাইতে হইলে দেখাইতে হইবে, বহুত্বাত্মক আর সব মিথ্যা। ইহাই মায়াবাদের বিষয়, সুতরাং বেদ-সংহিতার মায়াবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক।

মায়াবাদ বা জগৎ-মিথ্যাত্ব

ইতিপূর্ব্বেই নাসদীয় সূক্তে দেখান হইয়াছে,—"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং", ইত্যাদিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ভুবনাদি জগৎ কিছুই ছিল না, বলা হইয়াছে।

এখানে ইহাই লক্ষ্য করিতে হইবে যে, এই সূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রোক্ত একতত্ত্ব ভিন্ন জগৎসম্বন্ধীয় সমস্ত "নাসীৎ" (ছিল না) এই বাক্যে ইহার "নাস্তিত্ব" সূচিত করিতেছে। কেবল "নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং"—তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, এই নাস্তিত্ববিষয়ক বাক্য হইতে আমরা জগতের স্বরূপ বুঝিবার জন্য 'যাহা ছিল, তাহাকে সৎও বলা যায়, অসৎও বলা যায়', এই ভাব মাত্র গ্রহণ করিয়াছি। এই ভাবকেই "সদসদনির্ব্বচনীয়" (অর্থাৎ সৎ বা অসৎ কোন কথায়ই নির্ব্বচন করা যায় না যাহাকে, এরূপ) ভাব বলে। বেদান্তবাদে মায়ার 'সদসদনির্ব্বচনীয়' সংজ্ঞা চিরপ্রসিদ্ধ। উদ্ধৃত পঞ্চদশী-বাক্যেতেও দেখা গিয়াছে, মায়া পরমার্থদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় ও লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক। সুতরাং এই মন্ত্রোক্ত বাক্যে জগৎকে যুক্তিমূল 'সদসদনির্ব্বচনীয়' বলা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, পরমার্থদৃষ্টির সত্য লৌকিক যৌক্তিক ভাষাই ব্যক্ত হয়। সুতরাং যদিও ঋষি বিরুদ্ধভাব দ্বন্দ্বকে "নাসীৎ" বলিতেছেন, তথাপি আমরা, কিন্তু কিছু ছিল, তবে অবক্তব্য, এই অর্থ করিতেছি।

আবার উক্ত নাসদীয় সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে বলা হইতেছে,—

"তুচ্ছ্যোনাভ্বপিহিতং"—আভু অর্থাৎ আ সমন্তাৎ ভূত জগৎ তুচ্ছের দ্বারা আবৃত ছিল।

এখানে সৃষ্টির সমস্তাৎ ভূত জগৎ পরমার্থদৃষ্টিতে "তুচ্ছ" অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর, 'স্বপ্নে নাশ্য' বলা হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগৎমূলা মায়াকে বৈদান্তিকেরা পরমার্থ-দৃষ্টিতে 'বাধিতা' হয় বলিয়া 'তুচ্ছ' বলিয়াছেন।

আবার এই সূক্তের চতুর্থ মন্ত্রেতে আর একটু জগতের দিকে নামিয়া ঋষি বলিতেছেন,—

"সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্", সতের বন্ধুভূত (কিছু) অসতেতে (আছে) দেখিলেন।

এখানে জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব অব্যক্ত অবস্থাকে সম্পূর্ণ অসৎ বলিলেন। মায়িক জগতের কারণ অসৎ, তাহা ইঙ্গিত হইল। পঞ্চদশীও এই অর্থে বলিয়াছেন ;—

দ্বৈতস্য প্রাগভাবস্তু চৈতন্যেনানুভূয়তে।
প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ ॥
তথাপি রচনাচিন্ত্যা মিথ্যাত্বেনেন্দ্রজালবৎ।—চিত্রদীপ—২৫৪।২৫০

অর্থাৎ দ্বৈত জগতের প্রাগভাব (পূর্ব্বের অনস্তিত্ব) চৈতন্যের দ্বারা অনুভূত হয়, দ্বৈত প্রাগভাবযুক্ত ঘটাদির ন্যায় রচিত হয়। তথাপি রচনা অচিন্ত্যা ও ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং" ইহার অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপেই ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্ভাগে গৃহীত হইয়াছে। আমরা ইহা ইতিপূর্ব্বে শতপথ-ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে,—

"যদা পূর্ব্বসৃষ্টিঃ প্রলীনা উত্তরসৃষ্টিশ্চ ন উৎপন্না, তদানীং সদসতী দ্বে অপি নাভূতাম্। নামরূপবিশিষ্টত্বেন স্পষ্টপ্রতীয়মানং জগৎ সৎ শব্দেন উচ্যতে নরবিষাণাদিসমানং শূন্যং

অসুদিতি উচ্যতে। তদুভয়ং নাসীৎ। কিন্তু কাচিৎ অব্যক্তাবস্থাসীৎ। সা চ বিস্পষ্টত্বাভাবাৎ ন সতী জগদুৎপাদকত্বেন সত্ত্বাবাৎ নাপ্যসতী।”—২, ৮, ৯, ৩

অর্থাৎ যখন পূর্ব্বসৃষ্টি লীন হইয়াছে, পরসৃষ্টি উৎপন্ন হয় নাই, তখন সৎ বা অসৎ দুই-ই ছিল না। নানারূপবিশিষ্ট স্পষ্টপ্রতীয়মান জগৎকে সৎ বলা হইয়াছে, মানুষের শৃঙ্গের মত শূন্যকে অসৎ বলে। এই উভয়ই ছিল না। কিন্তু কোন অব্যক্তাবস্থা ছিল। তাহা বিস্পষ্ট নহে বলিয়া সৎ নহে এবং জগদুৎপাদকত্ব তাহাতে আছে বলিয়া অসৎও নহে।

অসৎ হইতে এই দৃশ্যমান সৎ জগৎ উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে,—

দেবানাং পূর্ব্বে যুগে অসতঃ সদজায়ত ॥ ২ ॥
দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদাপরি ॥ ৩ ॥ ঋ সং, ১০, ৭২

দেবতাদের পূর্ব্বযুগে অসৎ হইতে সৎ জন্মিয়াছিল। তাহা হইতে আশা (দিক্) পরে জন্মিয়াছিল, তাহা হইতে উত্তানপদ (বৃক্ষ) জন্মিয়াছিল। অথর্ব্বসংহিতায় আছে ;—

বৃহন্তো নাম তে দেবাঃ যেঽসতঃ পরিজজ্ঞিরে।
—অ সং, ১০, ৭, ২৫

অর্থাৎ যে দেবতারা অসৎ হইতে জন্মিয়াছিলেন, তাঁহারা বৃহৎ (বলবান্)। ইহার পরের ছত্র এই,—

একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য অসদাহুঃ পরো জনাঃ।

শ্রেষ্ঠ জনেরা স্কম্ভের সেই এক অঙ্গকে অসৎ বলেন। আরও আছে,—

একং যদঙ্গং অকৃণোৎ সহস্রধা কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র।—অ সং, ১০, ৭, ৯

অর্থাৎ স্কম্ভের যেই এক অঙ্গ সহস্রধা করিলেন, তাহাতে স্কম্ভ কত দূর প্রবেশ করিয়াছেন ?

অথর্ব্বসংহিতার এই সূক্তে ‘স্কম্ভ’ বিষয়ে বলা হইতেছে। স্কম্ভ অর্থে আধার, আশ্রয় বুঝায়। সূক্ত স্কম্ভকে এইভাবে দাঁড় করাইতেছেন ;—

কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য (স্কম্ভস্য) কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি অন্তরিক্ষম্।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি আহিতা দ্যৌঃ কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ স্কম্ভের কোন্ অঙ্গে ভূমি, কোন্ অঙ্গে অন্তরীক্ষ, কোন্ অঙ্গে দ্যুলোক, কোন্ অঙ্গে অন্যান্য স্বর্গ থাকে ?

আবার বলিতেছেন,—

‘অসচ্চ যত্র সচ্চান্তঃ স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদ্ এব সঃ ॥১০॥

অর্থাৎ যাহার ভিতরে অসৎ ও সৎ আছে, সেই স্কম্ভ কিরূপ, বল। ইহাতে স্পষ্টতঃ দেখা যাইতেছে, জগতের মূল আধারকে স্কম্ভ বলা হইতেছে। তাহাতে অসৎও আছে, সৎও আছে। অসৎ আগে বলা হইতেছে, লক্ষ্য করিবেন।

অথর্ব্ববেদের "উচ্ছিষ্ট সূক্ত" নামক সূক্তে (অথর্ব্ব-সংহিতা—১১, ৭) উচ্ছিষ্টকে (উৎ+শিষ্ট) জগতের কোন প্রকার আশ্রয়ভাবে—

উচ্ছিষ্টে দ্যাবাপৃথিবী বিশ্বঃ ভূতং সমাহিতম্।

আপঃ সমুদ্রঃ উচ্ছিষ্টে চন্দ্রমাঃ বাতঃ আহিতঃ॥—অ সং, ১১, ৭, ২

অর্থাৎ 'উচ্ছিষ্টে পৃথিবী, স্বর্গ বিশ্বভূত সমাহিত আছে। উচ্ছিষ্টে আপঃ, সমুদ্র, চন্দ্রমা, বায়ু সমাহিত, এই সকল কথায় কল্পনা করিতেছেন। তাহাতে বলিতেছেন,—

সন্নুচ্ছিষ্টে অসংশ্চোভৌ—অ সং, ১১, ৭, ৩

উচ্ছিষ্টে সৎ ও অসৎ দুই-ই আছে। ইহাতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্ত্রেতে দ্যৌঃ, পৃথিবী ইত্যাদির কথা বলায় সৎ আগে বলিয়া অসৎকে পরে উল্লেখ করিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদের অন্য সূক্তে আছে,—

অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতম্।

ভূতং হ ভব্যে আহিতং ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতম্॥—অ সং, ১৭, ১, ১৯

অর্থাৎ অসতেতে সৎ স্থাপিত, সতে ভূত স্থাপিত, ভূত আবার ভবিষ্যতে স্থিত, ভবিষ্যৎও ভূতে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এই দৃশ্য সৎ জগৎ যে অসৎ হইতে উৎপন্ন, তাহা বার বার বেদ-সংহিতায় স্বীকৃত আছে।

এই আলোচনায় জগৎ কারণাবস্থায় 'সদসদনির্ব্বচনীয়' এবং জগৎ অসৎ হইতে উৎপন্ন, এই দুইটি সত্য পাওয়া গিয়াছে। জগতের প্রকটিত অবস্থায় এই বহু প্রপঞ্চকে যে আমরা সত্য বলিয়া মনে করি, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, বেদসংহিতাও জগৎকে সৎ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া লোকের ব্যবহারিক ধারণা কি, তাহা দেখাইতেছেন। এখানে উল্লিখিত পঞ্চদশীধৃত মায়ার ব্যবহারিক ও যৌক্তিক লক্ষণ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পারমার্থিক অবস্থায় জগৎ তাহার কারণ মায়ার সহিত বাধিত হইয়া যায়, তাহার আশ্রয়ভূত একমাত্র ব্রহ্মপদার্থ মাত্র থাকে, তাহা এখনও দেখান হয় নাই। পারমার্থিক অবস্থায় জগৎ "তুচ্ছ" বা বাধিত হয়, ইহার প্রমাণার্থে আমরা নাসদীয় সূক্তের তৃতীয় মন্ত্রে "তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং" আভু তুচ্ছের দ্বারা আবৃত ছিল, এই মাত্র কথার পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ইহা কোন ক্রমেই এ বিষয়ে যথেষ্ট নহে, পরে 'ব্রহ্মবাদে' ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব।

সৃষ্টির মূল

দেখান হইল যে, বেদসংহিতা অনেক মন্ত্রেই জগৎকে অসৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন। অসৎ শব্দের অর্থ যদি তৈত্তিরীয় আরণ্যকের মতে মানুষের শৃঙ্গের মত শূন্য হয়, তবে জগৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন, এইটি পাওয়া যায়। তবে কি ইহা শূন্যবাদ? ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে।

অসতের পরেও সৎ ও অসৎ সমুদায়ের আধার বেদসংহিতায় স্বীকৃত আছে, ইহা পূর্ব্বে

ইঙ্গিত করা হইয়াছে। "স্কম্ভ" ও "উচ্ছিষ্ট"কে সং ও অসং সমুদায়ের আধার বলিয়া অথর্ব্ব-সংহিতার মন্ত্রগুলি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। নাসদীয় সূক্তেও স্বধাযুক্ত এক জগতের মূলে অবস্থিত, তাহার ইঙ্গিত আছে। অথর্ব্ব-সংহিতায় "স্কম্ভ"-সূক্তেই আছে,—

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমং ইব জনাঃ বিদুঃ।

উতো সন্ মন্যন্তেঽবরে যে তে শাখাং উপাসতে॥—অ সং, ১০, ৭, ২

'তোমার (স্কম্ভের) অসং শাখাকে পরমপ্রতিষ্ঠাকারিণী (জগংপ্রতিষ্ঠাকারিণী) বলিয়া মানুষ জানে। অধম যাহারা তোমার শাখাকে উপাসনা করে, তাহারা ইহাকেই সং বলিয়া মনে করে।' ইহাতে 'জগৎ স্কম্ভের অসৎ শাখাতেই প্রতিষ্ঠিত, অধম লোকেরাই তাহাকে সৎ বলে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক সৎ নহে, মূল স্কম্ভ সৎ', ইহা বলা হইতেছে। ইহাতে জগৎকে স্কম্ভের অসৎশাখাস্থিত বলিয়া পরিষ্কার ভাবে অসৎই বলা হইল এবং শাখার মূলই যে সত্য, তাহাও স্বীকৃত হইল। আবার আছে,—

যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ অরাঃ নাভাবিব শ্রিতাঃ।

অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি যত্র তৎ মায়য়া হিতম্॥—অ সং, ১০, ৮, ৩৪

যেখানে মানুষ ও দেবতা (রথচক্রের) নাভিতে অরার ন্যায় আশ্রয় করিয়া আছে, যাহা মায়া দ্বারা স্থাপিত, সেই জলের পুষ্পের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। ইহাতে দেবতা ও মনুষ্যদিগকে অরার ন্যায় রথচক্রের নাভিতে সংলগ্ন বলিয়া বলিতেছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সূক্তকে ব্রহ্মসূক্ত বলে এবং এই মন্ত্রের পূর্ব্বমন্ত্র কয়টি ব্রহ্মবিষয়ক। সুতরাং সেই নাভি ব্রহ্ম। আর এই মন্ত্রে দেবতা ও মানুষ অরার মত মায়য়া (মায়া দ্বারা)ই স্থাপিত, ইহা বলা হইতেছে। ঋগ্‌বেদসংহিতায় আছে,—

রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়া কৃণ্বানস্তন্বং পরি স্বাং।—ঋ সং, ৩, ৫৩, ৮

অর্থাৎ মঘবা ইন্দ্র নিজ শরীরের উপর মায়া করিয়া রূপ রূপ বহুরূপ হয়েন। আরও,—

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ॥—ঋ সং, ৬, ৪৭,১৮

অর্থাৎ তাঁহার রূপ প্রতিনিয়ত দেখাইবার নিমিত্ত ইন্দ্র রূপ রূপ প্রতিরূপ হইয়াছেন। ইন্দ্র মায়া দ্বারা বহু রূপ প্রাপ্ত হন, তাঁহার রথে দশ শত অশ্ব যোড়া আছে।

এই দুই মন্ত্রে ঋষি ইন্দ্রের মধ্যে ব্রহ্মরূপ দর্শন করিতেছেন এবং বলিতেছেন,—ইন্দ্রই মায়া দ্বরা নানারূপে সংসারে পরিচিত হইতেছেন ; জগংকে ইন্দ্রের 'বহুরূপ' বলা হইতেছে। ইন্দ্র চেতন বলিয়া জগতের মূল চেতন, এরূপ ইঙ্গিত হইতেছে। এই দ্বিতীয় মন্ত্রে আরও বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রের রথে দশ শত ঘোড়া যোড়া আছে। ইহা সৃষ্টি নাভি হইতে অরার মত, এই আকারের কথা।

নাসদীয় সূক্তে পঞ্চম মন্ত্রে আছে,—"তিরশ্চিনঃ বিততঃ রশ্মিরেষামধঃ" ইত্যাদি, অর্থাৎ

ইহাদের রশ্মি সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া রেতধা প্রভৃতি সৃষ্টি করিল। ইহাতে সৃষ্টি এক মূল পদার্থ হইতে বিস্তৃত, তাহা স্বীকার করা হইতেছে।

ইহাতে সামান্যতঃ দেখান হইল যে, জগৎসৃষ্টির মূলে শূন্য নহে। তাহার আধার ও মূল দুই-ই স্বীকৃত আছে। এখন জগতের আধার ও মূল সেই এক ব্রহ্ম কি না, সে বিষয়ে আলোচনা সৃষ্টিতত্ত্বে ও ব্রহ্মতত্ত্বে করা যাইবে। ব্রহ্মতত্ত্বালোচনার কালেই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বেদসংহিতায়ই মায়িক জগতের বাধিতত্ব ও ব্রহ্মের নির্গুণত্ব স্বীকৃত আছে। অতঃপর বেদান্তের ভাষা পর্য্যন্তও প্রধানতঃ বেদসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া উপসংহার করিব।

সৃষ্টিতত্ত্ব

বেদসংহিতার সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্ব-বিষয়ক যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা আবার মনে করিয়া নিতে হইবে। নাসদীয় সূক্তের মন্ত্র-গুলির তাৎপর্য্য একত্র করিয়া এই পাওয়া যায়,—এই প্রপঞ্চসৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ, সৎ সৃষ্টি কিছুই ছিল না। নিশ্চল, এক, অদ্বিতীয় বস্তু স্বধা নামক গুণের সহিত বর্ত্তমান ছিলেন। জগৎ তখন অব্যক্ত, অপরিজ্ঞেয়, সলিলে তমসাবৃত ছিল ও তুচ্ছের দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। তখন মনের উপর কাম জন্মিল, কামই জগতের বীজ হইল, কারণে জগতের সৃষ্টিগতিনির্ণায়ক বন্ধন বর্ত্তমান ছিল। সূর্য্যরশ্মির ন্যায় চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া ভোক্তা, ভোগ্য ও আকাশাদি সৃষ্ট হইল। দেবতারা সৃষ্ট হইলেন।

এখন ঋক্‌সংহিতার পুরুষসূক্ত আলোচিত হউক।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ ১ ॥
পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২ ॥
এতাবানস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩ ॥
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ৬ ॥

তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষৎ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ,—(১) সহস্রমস্তক, সহস্রচক্ষু, সহস্রপাদ পুরুষ, তিনি ভূমিকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া বাহিরেও (দশাঙ্গুলপরিমিত স্থানে) জ্যোতি পাইতেছেন। (২) যাহা কিছু হইয়াছে, যাহা কিছু হইবে, তাহা সমস্তই সেই পুরুষ। তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, যাহা অন্নের নিমিত্ত নিজকে অতিরোহণ করে। (৩) ইহাঁর এতই মহিমা, ইহাতে তিনি আরও শ্রেষ্ঠ; বিশ্বভূত তাঁহার এক পাদ মাত্র, আর তিন পাদ স্বর্গে অমৃত। (৪) সেই ত্রিপাদ পুরুষ ঊর্দ্ধে অত্যুৎকৃষ্ট ভাবে আছেন। আর ইহাঁর পাদমাত্র ইহলোকে পুনঃ পুনঃ আসিতেছে। তাহা হইতে সাশন ও অনশনরূপে (ভোক্তা ও ভোগ্যরূপে) সমস্ত আক্রান্ত করিয়াছেন। (৫) তাঁহা হইতে বিরাট্ জাত হইল, বিরাটেতে পুরুষ হইলেন। তিনি জন্মিয়া নিজ হইতে অতিরিক্ত হইলেন। পশ্চাৎ ভূমি, তারপর পুর হইল। (৬) সেই পুরুষরূপ হবির্দ্বারা দেবতারা যজ্ঞ বিস্তার করিলেন, বসন্ত তাঁর আজ্য, গ্রীষ্ম ইধ্ম ও শরৎ হবিঃ হইল। (৭) সেই অগ্রে জাত যজ্ঞপুরুষকে মানসযজ্ঞে প্রোক্ষণ করিলেন, তদ্দ্বারা দেবতারা যজ্ঞ করিলেন—যাঁহারা সাধ্য ও ঋষিগণ।

আবার অথর্ব্বসংহিতায় ১০মে ২য় সূক্তও পুরুষবিষয়ক; তাহাতে পুরুষকে—

কতি দেবাঃ কতমে তে আসন্ যে উরো গ্রীবাঃ চিক্যুঃ পুরুষস্য।
কতি স্তনৌ ব্যদধুঃ কাঃ কফোড়ৌ কতি স্কন্ধান্ কতি পৃষ্ঠীঃ অচিন্বন্ ॥ ৪ ॥
কো অস্মিন্ রূপং অদধাৎ কো মহ্মানং চ নাম চ।
গাতুং কো অস্মিন্ কো কেতুং কাঃ চরিত্রাণি পুরুষে ॥ ১২ ॥
ঊর্দ্ধ নু সৃষ্টাঃ তির্য্যন্ নু সৃষ্টাঃ সর্ব্বাঃ দিশঃ পুরুষঃ আবভূব ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ,—কত দেবতা, তাহারা কি প্রকার, যাহা পুরুষের গ্রীবা উরঃ হইয়াছেন, কত দেবতা স্তনদ্বয় করেন, কাহারা কফোণি, কাহারা স্কন্ধ, কাহারা পৃষ্ঠ চিহ্নিত করিয়াছেন? কে ইহাতে রূপ ধারণ করেন, কে মহত্ত্ব, কেই বা নাম, কে গতি, কে চিহ্ন, কে বা পুরুষের চরিত্র ধারণ করেন? ঊর্দ্ধ,সৃষ্টি করিয়াছেন, মধ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদয় দিক্ হইয়াছেন।

সুতরাং এই দুই সূক্তোক্ত পুরুষই এক বিশ্বরূপ পুরুষ, নিখিল জগৎ যাঁহার শরীর। ঋক্-সূক্তে দেখা যাইতেছে, নিখিল জীবের ইন্দ্রিয় তাঁহার ইন্দ্রিয়, নিখিল জীবের মন তাঁহার মন, এজন্যই তিনি বিশ্বরূপ পুরুষ। তিনি নিখিল জগতের ভূত ভবিষ্যৎ সবই। তিনি স্বরূপে অমৃতের ঈশ্বর, কিন্তু অন্নের জন্য অর্থাৎ ভোগ্যের জন্য তিনি নিজকে অতিক্রম করিয়া মহিমাতে আরও শ্রেষ্ঠ হন। তাঁহার এক পাদ হইতে ভোক্তা ভোগ্য সব জাত হয়। তাঁহা হইতে বিরাট্ জাত হয়, বিরাটেতেও এক পুরুষ হন—ইনিই প্রথমজাত পুরুষ। সেই বিরাট্ পুরুষও আবার নিজ হইতে অতিরিক্ত হন ও ভূমি এবং শরীর সৃষ্টি করেন। পরে ঋষি ও

সাধ্যগণ যজ্ঞদ্বারা তাঁহার শরীর হইতে মানুষ, পশু ইত্যাদি সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে ঋগ্বেদ-সংহিতায় আর কি পাওয়া যায়, দেখা যাউক।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥
আপো হ যদ্বৃহতীর্বিশ্বমায়নগর্ভং দধানা জনয়ন্তী রশ্মিম্।
ততো দেবানাং সমবর্ততাসুরেকঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্দক্ষং দধানা জনয়ন্তীর্যজ্ঞম্।
যো দেবেষধি দেব এক আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

ঋক্‌সংহিতা—১০মে ১২০তমে

অনুবাদ,—(১) হিরণ্যগর্ভ অগ্রে জন্মিলেন, জাতমাত্র তিনি ভূতের একমাত্র পতি হইলেন। তিনিই পৃথিবী ও দ্যুলোককে ধারণ করিলেন। কোন্ দেবতাকে আমরা হবির্দ্বারা পরিচর্য্যা করিব ? (৭) মহৎ আপঃ (জলরাশি) অগ্নিকে জন্মাইবার জন্য গর্ভ-ধারণ করিয়া বিশ্বকে প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে দেবগণের একমাত্র প্রাণ জন্মিল। কোন্ দেবতাকে ইত্যাদি। (৮) যিনি যজ্ঞ জন্মাইবার জন্য দক্ষকে ধারণ করিয়া মহিমাসহ আপঃএর উপর দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিলেন। যিনি দেবতাদের দেবতা অদ্বিতীয় ছিলেন। কোন্ দেবতাকে ইত্যাদি।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, হিরণ্যগর্ভই প্রথমে জাত, তদভিমানী দেবতাই দেবতাদের দেবতা—আদিদেবতা। এই সূক্তেই শেষ মন্ত্রে এই দেবতাকে প্রজাপতি বলিয়াছেন। আপঃ এই হিরণ্যগর্ভকে ধারণ করিয়া বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছে। এই প্রজাপতিই আপ হইতে দক্ষ সৃষ্টি করেন—দক্ষ যজ্ঞ সৃষ্টি করেন।

ঋক্‌সংহিতায় আরও আছে,—

পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে ॥ ৫ ॥
তমিদং গর্ভং প্রথমং দধ্র আপো যত্র দেবা সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যে কমর্পিতং যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ ॥ ৬ ॥

—১০ম, ৮২তম সূক্ত

অর্থাৎ দিবার পর, এই পৃথিবীর পর, দেবতা অসুরদিগের পর যাহা আছে, সেই কোন্ গর্ভ আপঃ ধারণ করিল, যাহাতে দেবতাগণ দেখিয়া রহিয়াছিলেন। ৫। আপঃ প্রথম সেই গর্ভই ধারণ করিয়াছিল, যাহাতে দেবতাগণ একত্র ছিলেন। অজের নাভিতে তাহা অর্পিত ছিল, যাহাতে বিশ্বভুবন রহিয়াছিল। ৬।

দেখা যায়, অজের নাভির মধ্যে প্রথম গর্ভ ছিল। আপ সে গর্ভ ধারণ করিয়াছিল, সে গর্ভে দেবতাগণ একত্র এবং বিশ্বভুবন ছিল।

সম্প্রতি একবার আর বাক্যাদি উদ্ধৃত না করিয়া, ইহাতে কি পাওয়া গেল, দেখা যাউক। প্রথমতঃ নাসদীয় সূক্তের "সলিল" ও অন্যান্য সূক্তের "আপঃ" এক ধরিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষসূক্তে দেখা যাইতেছে, বিশ্বরূপ পুরুষের একপাদে, যাহা কিছু আছে সব হইয়াছে, (পুরুষসূক্ত—২য় মন্ত্র) এবং তাহা পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে (৪র্থ মন্ত্র)। বিরাট শরীর তাহা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহাতে এক পুরুষ হইলেন, তাঁহার শরীরে সব সৃষ্টি হইল (৫ম মন্ত্র)। তৃতীয়তঃ হিরণ্যগর্ভ, পুরুষই প্রথম পুরুষ (হিরণ্যগর্ভসূক্ত ১ম)। সুতরাং উপরের লিখিত মন্ত্রাদি হইতে এই পাওয়া যাইতেছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ যে কারণ-সলিলে অব্যক্ত ছিল (নাসদীয় সূক্ত), তাহাতে এক হিরণ্য (জ্যোতির্ম্ময়) গর্ভ জাত হইল, সেই গর্ভ হইতে প্রজাপতি জাত হইলেন, অন্যান্য দেবতারাও জাত হইলেন (হিরণ্য-গর্ভসূক্ত ও ৮২তম সূক্ত) এই হিরণ্যগর্ভ অজের নাভিতে ও কারণ-সলিলে ছিল (৮২তম সূক্ত), প্রজাপতি আপের মহিমাতে দক্ষকে সৃষ্টি করিলেন, দক্ষ দেবতাদের পিতা। ইহা পৌরাণিক ভাবের সৃষ্টিকাহিনী। ইহার অন্য দিক্ দেখা যাক্। পুরুষ অতি মহান্, তাঁহার এক পাদেই কত সৃষ্টি হইতেছে, ইহা হইতে বিরাট শরীর জাত হইয়া বিরাট পুরুষ হন, তাঁহার শরীরেই এই দৃশ্যমান নামরূপাত্মক সৃষ্টি আছে (অথর্ব্ব পুঃ সূক্ত)। পুরুষের শ্রেষ্ঠ তিন পাদ সর্গে, সেই ত্রিপাৎ পুরুষ সৃষ্টিতে আসেন না। সেই ত্রিপাৎ পুরুষ কি তবে নির্গুণ ব্রহ্ম ? আলঙ্কারিক ভাষায় কি এরূপ লিখিত হইয়াছে ? নাসদীয় সূক্তে যিনি এক অদ্বিতীয় স্বধার সহিত বর্ত্তমান, তিনিই কি এই পুরুষ ? অথবা এই পুরুষ রামানুজ ও হিগেলের জগতের অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর ?

মীমাংসা ;—এই পুরুষ কেবলমাত্র অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর নহেন। বিশ্বসংসার পরমেশ্বরের শরীর, এই পুরুষের একপাদে যত বিশ্বসংসার, (সুধু বিরাট নহে, বিরাট হইতে অনেক বেশি—পু-সূ ২।৩।৪ মন্ত্রে ইঙ্গিত আছে।) সুতরাং সম্ভবতঃ বিশ্বরূপ পুরুষে মায়িক জগৎ ও পরব্রহ্ম এই ভাবদ্বয় একত্রে সমাবিষ্ট আছে। এই বিশ্বরূপ পুরুষ হইতে মায়িক অংশ বাদ দিলেই সেই পরব্রহ্ম থাকিবে, যাহা এখানে "ত্রিপাৎ অমৃত" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরব্রহ্মকে সর্ব্বদাই ক্লীবলিঙ্গে নির্দ্দেশ করা হয় ; কারণ, তাঁহাতে কোন গুণ নাই, তিনি ভোক্তা নহেন। সাধারণতঃ শরীরী ভোক্তাকে পুংলিঙ্গ ও ভোগ্যকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। পুরুষ শরীরী বলিয়া পুংলিঙ্গ, ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া নাসদীয় সূক্তে "একং অবাতং" ক্লীবলিঙ্গ।

এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পরব্রহ্মে এরূপ ভাগাভাগি সম্ভব নহে, তবে বুঝাইবার জন্য এরূপে "ত্রিপাৎ" লিখিত হইয়াছে। সুতরাং 'পুরুষ' বলিতে সকলীভূত পরমেশ্বর-চৈতন্য এবং ব্রহ্মচৈতন্য একযোগে। সুতরাং এই পুরুষসূক্ত হইতেই পাওয়া যাইতেছে যে (১) সেই ত্রিপাৎ পুরুষ, তারপর (২) একপাৎ পুরুষ, যাহাতে বিশ্বজগৎ স্থিত এবং (৩) বিরাট্ পুরুষ, যাহাতে মানুষ, পশু ইত্যাদি স্থিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বেদান্তোক্ত (১) চিৎ, (২) পরমেশ্বর (অন্তর্য্যামী), (৩) বিরাট্ এই তিন মাত্র পাওয়া যাইতেছে। লিঙ্গ-

শরীরী হিরণ্যগর্ভ ইহাতে উল্লিখিত হয় নাই। অনেক সূক্তে হিরণ্যগর্ভ নাম পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু ইনি সম্ভবতঃ লিঙ্গশরীরী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ নহেন। বোধ হয়, সে সময়ে মনোবিজ্ঞানীয় লিঙ্গশরীরের ধারণা স্ফুট হইয়াছিল না। যাহা হউক, ইহাতে বেদান্তোক্ত সৃষ্টিস্তর রীতিমতই পাওয়া গেল। তবে লিঙ্গশরীরের ভাব স্ফুট হয় নাই, এই মাত্র।

অন্য দিকে পৌরাণিক সৃষ্টিক্রম বেদসংহিতাতে দৃষ্ট হইতেছে, ইহা কি তবে দার্শনিক সৃষ্টিক্রমের বিরুদ্ধ? কতক আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উপরের উদ্ধৃত মন্ত্রাদি হইতে এই পাওয়া যায়,—কারণ-সলিলে জগৎ অব্যক্ত ছিল, তপস্যার মহিমাতে জগৎ জাত হইল, প্রথমে মনের উপর কাম হইল, সেই কামই সৃষ্টির বীজ। কারণ-সলিল হইতে হিরণ্যগর্ভ জাত হইল। হিরণ্যগর্ভদেবতা হইতে দক্ষ হইলেন, দক্ষ হইতে দেবতা। হিরণ্যগর্ভ আবার অজের নাভিতে অবস্থিত। এখন, পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে, তপ অর্থে জ্ঞানবিশেষ এবং সলিল বা আপঃ সৃষ্টির অব্যক্ত কারণ। উহা গমনশীল, চলৎ, এই জন্য 'সল' ধাতু হইতে সিদ্ধ। এই মূল কারণ নিত্য চলনশীল, চলনোন্মুখ। এখন দেখা যাইতেছে, ব্রহ্ম (এক) স্বধা বা মায়াশক্তিতে আবৃত হইলে ভাবি জগতের অব্যক্ত কারণ (সলিল) সৃষ্ট হইল, তাহাতে ব্রহ্মের জ্ঞানশক্তিবিশেষ (তপঃ) মিশিয়া মনের মত কোন বস্তু প্রস্তুত হইল, (এই মনের সদসদনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে) তাহা ইচ্ছাশক্তিতে (কামে) পরিণত হইল। তখনও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় কারণভূত জ্ঞানাত্মক ইচ্ছাশক্তি চলিতে লাগিল। প্রথমে হিরণ্যগর্ভ-শরীর, তাহাতে জ্ঞান সফলীভূত হইয়া প্রজাপতি হইলেন, তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি চলিতে লাগিল। (হিগেলের মতের সঙ্গে মিলাইলে পরিষ্কার হইবে) সুতরাং দার্শনিক ভাষায় অনুবাদ করিলে এই পৌরাণিক সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গত অর্থই হয়। এ সম্বন্ধে আরও কিছু সমালোচনা করা যাইবে। এখন হিরণ্যগর্ভ হইতে সৃষ্টি সম্বন্ধে বেদসংহিতায় কি পাওয়া যায়, দেখা আবশ্যক।

হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টি

বাজসনের সংহিতায় আছে ;—

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তর্ অজায়মানো বহুধা বিজায়তে।

তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ তস্মিন্ হ তস্থুঃ ভুবনানি বিশ্বা॥ বাজ সং—৩১, ১৯

অর্থাৎ প্রজাপতি গর্ভের ভিতরে জন্মগ্রহণ না করিয়া চরিতেছিলেন। পরে বহুভাবে জন্মিলেন। ধীরেরা তাঁহার জন্মস্থান দেখেন, তাহাতে দেবতারাও ছিলেন।

যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিঞ্চ নৈব। যঃ আবভূব ভুবনানি বিশ্বা।

প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবরণে ত্রীণি জ্যোতীংষি সচতে স ষোড়শী। বাজ সং—৩২, ৫

অর্থাৎ যাঁহার পূর্ব্বে আর কিছুই জন্মিয়াছিল না। যিনি বিশ্বভুবন (ব্যাপিয়া) হইলেন।

সেই প্রজাপতি প্রজাদ্বারা তিন জ্যোতিষ্ক আনন্দপূর্ণ করিলেন। তিনি ষোড়শীও (যজ্ঞবিশেষ) হইলেন।

তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে ;—

যজ্ঞেন বৈ প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তৈ সং—৬

প্রজাপতি যজ্ঞদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিলেন।

বর্হিষোঽহং দেবযজ্যয়া প্রজাবান্ ভূয়াসং ইত্যাহ।
বর্হিষা বৈ প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত তেনৈব প্রজাঃ সৃজতে ॥

তৈ সং—১ম কা, প্র ৭

অর্থাৎ দেবযজ্ঞে যজ্ঞদ্বারা আমি প্রজাবান্ হইব, ইহা বলিলেন। যজ্ঞের দ্বারাই প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করেন। তাঁহার দ্বারা প্রজা সৃষ্ট হয়।

অথর্ব্বসংহিতায় আছে ;—

এতস্মাদ্ বৈ ওদনাৎ ত্রয়স্ত্রিংশতং লোকান্ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ।

অং সং—১১, ৩।৫২

অর্থাৎ এই ওদন (খাদ্য) হইতে প্রজাপতি তেত্রিশ দেবতা ও লোক সব সৃষ্টি করেন।

এ সম্বন্ধে আর বাক্য উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন। পুরুষসূক্তেও দেখা গিয়াছে, ঋষি ও সাধ্যেরা বিরাটের যজ্ঞ দ্বারা শরীর হইতে ব্রাহ্মণাদি মনুষ্য, পশু ইত্যাদি সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু ভূমি ও পুর (শরীর) পূর্ব্বেই বিরাট্ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল (৫ম মন্ত্র)। ইহাতে দেখা যায়, দেবতারা এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেন না। বোধ হয়, কেবল মানুষাদি জীবের কর্ম্মফলানুসারে জন্ম-মৃত্যু নিয়মিত করেন। এজন্যই ইহাঁদিগকে কার্ম্মিক দেবতা বলে। বিরাটেতেই নামরূপবিশিষ্ট জগৎ-সৃষ্টি সমাপ্ত হয়।

এখন আমাদের পূর্ব্বালোচনা অনুসারে যদি 'যজ্ঞ' ও 'ওদনের' অর্থ ভোগ্য object বা matter হয়, তবে যজ্ঞদ্বারা প্রজাসৃষ্টি অতি সহজেই বুঝা যাইতেছে। প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে এই দৃশ্যমান নামরূপবিশিষ্ট জগৎ সৃষ্টি হয়, তৎসম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতায় আছে ;—

ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোধ্যজায়ত
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥ ১ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥ ২ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ ॥ ৩ ॥—১০মে, ১৯০, ১।২।৩

অনুবাদ ;—অভিতপ্ত তপঃ হইতে ঋত ও সত্য জন্মিল। তারপর রাত্রি জন্মিল, ততঃ অর্ণব সমুদ্র। অর্ণব সমুদ্রের পর সম্বৎসর জন্মিল। বিশ্বের প্রাণিবর্গের স্বামী অহোরাত্র বিধান

করিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্যকে ধাতা পূর্ব্বের ন্যায় কল্পনা করিলেন, দ্যুলোক পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও তৎপর স্বর্লোক।

ইহা বিধাতা ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্ণ তালিকা। কিন্তু এখানে একটি বিশেষ কথা লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা "যথাপূর্ব্বং অকল্পয়ৎ", পূর্ব্বের ন্যায় এবারও করিলেন; এতদ্দ্বারা দেখা যাইতেছে, পূর্ব্বেও ব্রহ্মার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাহা নষ্ট হইয়া পুনঃ সৃষ্টির আবশ্যক হইয়াছে। এই নাশ প্রলয়। আর ইহাতে সৃষ্টি যে বার বার হয়, তজ্জন্য অনাদি, তাহাও লক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে আরও আছে ;—

সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমিরজায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎ পয়স্তদন্যো নানুজায়তে॥—ঋ সং, ৬, ৪৮, ২২

অর্থাৎ দ্যুলোক, ভূর্লোক একবার জন্মিয়াছে, মরুদ্গণের মাতার দুগ্ধ একবার জন্মিয়াছে, ইহারা অন্যরূপ হইয়া আবার জন্মগ্রহণ করে না। অর্থাৎ এগুলি পরসৃষ্টিতে পূর্ব্বসৃষ্টির মতনই হয়। প্রলয়ে যে থাকে, তাহা নহে।

দেবতা সৃষ্টি

এখন দেবতা-সৃষ্টি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতে হইবে। পূর্ব্বোদ্ধৃত হিরণ্যগর্ভ সূক্তে আছে, প্রজাপতি দক্ষকে যজ্ঞ সৃজন মানসে ধারণ করিলেন। আবার উদ্ধৃত (ঋ-সং—১০, ৮২, ৬) মন্ত্রে আছে, দেবতারাও হিরণ্যগর্ভে ছিলেন। আবার—

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদদিতিঃ পরি॥ ৩॥
অদিতি হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥ ৪॥ ঋ-সং—১০, ১৭২

অর্থাৎ অদিতি হইতে দক্ষ, দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। দক্ষ তাঁহার দুহিতা অদিতিকে জন্মাইলেন। ভদ্র, অমৃতবন্ধু দেবগণ অদিতি হইতে জন্মিলেন। আবার—

"দক্ষপিতৃদেবতা" (ঋ-সং—৬, ৫০, ২, এবং ৩, ৬৬, ২) আবার, 'সূনু দক্ষস্য সুক্রতু' (ঋ-সং—৮, ২৫, ৫) "যে দেবাঃ মনোজাতাঃ মনোযুজঃ সুদক্ষঃ দক্ষপিতরঃ তে নঃ পান্তু।" তৈত্তিরীয়-সংহিতা—(১, ২, ৩, ১)

যে সকল দেবতা মন হইতে জাত, মনকে যোজনা করেন, সুদক্ষ দক্ষপুত্র তাঁহারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। ইত্যাদি মন্ত্রে একবার দক্ষ অদিতি হইতে উৎপন্ন অদিতি আবার দক্ষদুহিতা ও দেবমাতা, দক্ষ আবার দেবপিতা ইত্যাদি। অদিতি আবার বিষ্ণুপত্নী (বাজ-সং—২৯, ৬০)। এই সকল সম্বন্ধের অর্থ কি? আবার হিগেল-দর্শনের সাহায্য লইতে হইবে। শতপথ-ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত বাক্য অনুসারে মন জাতীয় বস্তু অন্য কিছু সৃষ্টি করিয়া আত্মবান্ হয়। চৈতন্য পদার্থ তাহার বিষয় বা বিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ জড় সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আত্মবান্ (সকল) হয়। তাহা হইলে যে সৃষ্ট (projected), সে যদি

সৃজক হইতে উৎপন্ন বলিয়া সৃজকের (subjectএর) কন্যা হয়, তবে আবার ভোগ্যা (object) বলিয়া পত্নী হইবে, পরে আবার তৃতীয় (synthesis) অবস্থায় আত্মবান্ হইয়া নিজেই আবার নিজের বা কন্যার বা স্ত্রীর পুত্র হইবে। পৌরাণিক এ সব সমস্যা সমাধানের দার্শনিক কৌশলই এই। তাহাতে অনেক সমস্যার ব্যাখ্যা হইবে এবং ইহা সর্ব্বথা বেদান্ত-সম্মত ও সত্য।

কর্ম্মবাদ

এখন জীবের কর্ম্মফল ও জন্মাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, বেদান্তের কর্ম্মবাদ বেদসংহিতার বাহিরে বা বিপরীত নয়। প্রেতকে বলা হইতেছে ;—

সূর্য্যং চক্ষু গচ্ছতু বাতমাত্মা দ্যাং গচ্ছ পৃথিবীং চ ধর্ম্মণা।
আপো বা গচ্ছ যদি তত্র তে হিতং ঔষধিষু প্রতিতিষ্ঠা শরীরৈঃ ॥ ৩॥
অজো ভাগস্তপসা তং তপস্ব তং তে শোচিস্তপতু তং তে অর্চিঃ।
যাস্তে শিবাস্তন্বো জাতবেদস্তাভির্বহৈনং সুকৃতামু লোকং ॥ ৪।

—ঋ-সং—১০, ১৬, ৩।৪

অবসৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্য যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ।
আয়ুর্বসান উপবেতু শেষঃ সং গচ্ছতাং তন্বা জাতবেদ ॥—ঋ-সং—১০, ১৬, ৫
অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোং মর্ত্যো মর্ত্যেন সযোনিঃ।
তা শশ্বন্তা বিষূচীনা বিষতান্যংন্যং চিক্যুর্ণনি চিক্যবন্যং।—ঋ-সং—১, ১৬৪, ৩৮

অনুবাদ ;—(প্রেতের প্রতি বলা হইতেছে) চক্ষু সূর্য্যেতে যাক্, প্রাণ বায়ুতে, ধর্ম্ম (প্রকৃতি) অনুসারে পৃথিবী বা স্বর্গে যাও। যদি তাতে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও, শরীর দ্বারা ঔষধিতে বা থাক। ৩। (হে অগ্নে) তাহার অজ ভাগকে তপদ্বারা তপোযুক্ত কর, তাহাকে তুমি, তোমার অর্চি শুচি কর। হে জাতবেদ, তোমার যে মঙ্গলময় শরীর, তাহাতে তাহাকে সুকৃতকারীদের লোকে নিয়ে যাও। ৪। যে আহুত মন্ত্রেতে স্বধার সহিত আছে, তাহাকে পিতৃগণের সহিত সৃজন কর। হে জাতবেদ! আয়ুর অবসান হইলে তাহার অবশেষকে তনুদ্বারা প্রাপ্ত করাও।৩। মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যতে মিশ্রিত (জীবশরীর) স্বধা গ্রহণ করিয়া উর্দ্ধ বা অধঃ যায়। সেই শাশ্বত দুই ভাগ স্বর্গে ও মর্ত্তে গমনশীল। সেই দুই ভাগকে কেহ কেহ জানে, কেহ নাও জানে।

ইহাতে দেখা যাইতেছে, জীব-শরীরে মরণশীল ভাগ ও নিত্যভাগ স্বীকৃত আছে। যে কোন লোকে মৃতাত্মা যাইতে পারে, তাহারও ধারণা আছে। সুকৃতকারিগণের স্থান বলিতে পাপ পুণ্যে অধঃ বা উর্দ্ধগতি স্বীকৃত। পিতৃলোকে ভোগাবসানের পর অন্য শরীরগ্রহণের কথাও দেখা যায়। সুতরাং কর্ম্মফল সম্বন্ধে হিন্দুদের চিরপ্রচলিত ভাব স্ফুট অবস্থায়ই আছে।

তবে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ কথাটা উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে না। এ বিষয়ে আমাদের অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহাতেই বেদান্তের কর্ম্মবাদের যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মতত্ত্ব

এখন বেদান্তের ব্রহ্ম সম্বন্ধে বেদসংহিতায় কি পাওয়া যায়, দেখিতে হইবে। ঋক্‌সংহিতার প্রথমেই দেখা যায়,—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।

যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।—ঋ-সং—১, ১৬৪, ৩৯

অর্থাৎ ঋক্ অক্ষর পরমনির্ম্মল আকাশে আছে, তাহাতে সমস্ত দেবতারাও থাকেন, যে তাহা জানে না, তাহাকে ঋক্ কি করিবে? যাহারা তাহাকে জানে, তাহারা তাহাতে সমাসীন হয়। এখানে নির্গুণ ব্রহ্মভাবই বোধ হয় 'অক্ষর পরম আকাশ' এই বস্তুবাচক ভাষায় বলা হইয়াছে। তাহা যাহাই হউক, মানুষের যে বিশেষ একটা জানিবার বিষয় আছে এবং তাহা ঋক্ দ্বারা জানা যায়, এ কথা স্পষ্টই বলা হইয়াছে। ঋক্ বলিতে বেদজ্ঞান (শঙ্করের ঔপনিষদ্‌জ্ঞান) বুঝিতে হইবে। আবার—

ধ্রুবং জ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কং মনো জবিষ্ঠং পতয়ৎস্বংত।

বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতা একং ক্রতুমভিবিযংতি সাধু ॥৫॥

বি মে কর্ণা পতয়তো বি চক্ষুর্বীদং জ্যোতির্হৃদয়ে আহিতং যৎ।

বি মে মনশ্চরতি দূর আধীঃ কিং স্বিদ্‌বক্ষ্যামি কিমুনু মনিষ্যে ॥৬॥—ঋ-সং—৬, ৯, ৫।৬

অর্থাৎ দর্শনের জন্যে ধ্রুবজ্যোতি নিহিত আছে, অতিশয় বেগবান্ মনের অন্ত কি? সমুদয় দেবতারা সমানমন সমানজ্ঞান হইয়া সেই এক ক্রতুর অভিমুখে সম্যক্ চলিতেছেন। আমার কর্ণদ্বয় হৃদয়ের নিহিত জ্যোতি হইতে বিপথে পড়িতেছে, মনও অনেক দূর রাস্তা বলিয়া বিদিগে চরিতেছে। কিই বা বলিব? কিই বা মনে করিব?

ইহাতে অন্তর্নিহিত স্থির জ্যোতি দর্শনের জন্য গভীর আকাঙ্ক্ষা ও নিরাশার দুঃখ ব্যক্তিত হইতেছে। সেই হৃদয়নিহিত স্থির জ্যোতি কি? বেদান্তোক্ত ব্রহ্মদর্শন নহে কি? আবার—

জ্যোতিরজস্রং যস্মিল্লোঁকে স্বর্হিতং।

তস্মিন্মাং ধেহি পবমানা মতে লোকে অক্ষিত ইন্দ্রায়েংদো পরিস্রব:—ঋ-সং—১০।১১৩।৭

যেখানে অজস্র জ্যোতি, যেখানে স্বর্গ নিহিত, সেই অক্ষয়, মরণরহিত লোকে আমাকে ধারণ কর, হে ইন্দ্রোদ্দেশে দত্ত সোম পরিস্রব!

আবার বাজসনেয়-সংহিতায় আছে ;—

কিং স্বিৎ সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ কিং সমুদ্রসমং সরঃ ॥৪৭॥

ব্রহ্ম সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ দ্যৌঃ সমুদ্রসমং সরঃ ॥ ৪৮ ॥—বাজ-সং—২৩, ৪৭

অর্থাৎ সূর্য্যের সমান জ্যোতি কি? সমুদ্রের সমান কোন্ সরোবর? ব্রহ্ম সূর্য্যসমান জ্যোতি, দ্যৌঃ সমুদ্রসমান সরোবর।

ঋক্‌সংহিতায় যে জ্যোতিকে অক্ষর, আকাশবৎ বলিতেছেন, যজুর্ব্বেদ তাঁহাকে ব্রহ্ম নামই দিয়াছেন। সেই জ্যোতিঃদর্শনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছেন। তাহা কি, ঋক্‌সংহিতা হইতেই দেখুন।

অপাম সোমমমৃতা অভূমাগন্ম জ্যোতিরবিদাম্ দেবান্।
কিং নূনমস্মাৎ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য।—৮ম মণ্ডলে।

অর্থাৎ আমরা সোমপান করিয়াছি, অমর হইয়াছি, জ্যোতি দর্শন করিয়াছি। দেবতাদিগকে জানিয়াছি। শত্রুরা আর আমাদের কি করিবে? হে অমৃত, মর্ত্ত্য লোকের আর কি ভয়? সেই অবস্থাতে দেবতাদিগকে জানা যায়, অভয় ও অমর হওয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ কি? অথর্ব্ব পুরুষসূক্ত (১০মে ২য়) পুরুষ সম্বন্ধে বলিয়াই লিখিতেছেন;—

পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ যস্যাঃ পুরুষঃ উচ্যতে ॥২৮॥
যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ অমৃতেনাবৃতং পুরং।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজান্দধুঃ ॥২৯॥
অষ্টচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পুরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়াঃ কোশা স্বর্গঃ জ্যোতিষাবৃতঃ ॥৩১॥
তস্মিন্ হিরণ্ময়ে কোশে ত্র্যরে ত্রিপ্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যাক্ষং আত্মন্বৎ তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদঃ বিদুঃ ॥৩২॥
প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সম্পরিবৃতম্।
পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্ম আবিবেশাপরাজিতম্ ॥৩৮॥

অনুবাদ;—২৮। ব্রহ্মের পুর যে জানে, যেই পুর হইতে পুরুষ নাম হইয়াছে; ২৯। যিনি সেই ব্রহ্মের অমৃতময় পুরকে জানেন, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাহাকে চক্ষু, প্রাণ ও প্রজা দিয়া থাকেন; ৩১। সেই পুর অষ্টচক্রবিশিষ্ট, নবদ্বারযুক্ত, দেবতাসম্বন্ধীয় ও তাহার সঙ্গে যুদ্ধ চলে না, তাহার জ্যোতির্ম্ময় কোশ স্বর্গ ও জ্যোতিরাবৃত; ৩২। সেই ত্র্যর, ত্রিপ্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্ম্ময় কোশে যে আত্মবান্ মহাজীব বাস করেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে জানেন; ৩৮। দীপ্তিময়, হরিদ্বর্ণ, যশের দ্বারা আবৃত, অপরাজিত হিরণ্ময় পুরে ব্রহ্ম আবিষ্ট আছেন।

সুতরাং এতদ্দ্বারা পাওয়া যাইতেছে যে, ব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় পুরেতে বাস করিয়া পুরুষ হইয়াছেন। পুর শব্দের অর্থ শরীর। সুতরাং এখানে পুরুষ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করা হইতেছে। ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্মশব্দ থাকাতে বুঝা যাইতেছে, ব্রহ্ম ভোক্তা নহেন, তিনি তাহার পুর হইতে পৃথক্। পুরে আত্মবান্ এক জীব (যাক্ষং=খাদক) আছেন। তিনি কে? ব্রহ্ম

নিজের পুরে প্রবিষ্ট মাত্র আছেন। তাহার পর অথর্ব্বসংহিতায় (১০ মে, ৭ সূক্ত) স্কম্ভ ও ব্রহ্মসূক্ত হইতে দেখা যাউক্। ইহাতে ব্রহ্মকে 'জ্যেষ্ঠ' বলা হইয়াছে। যথা.—

যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো লোকান্ সর্ব্বান্ সমানশে।
সোমং যশ্চক্রে কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥৩৬॥
যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং য চাধি তিষ্ঠতি।
স্বঃ যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ ॥—অ-সং—১১, ৮, ১

অর্থাৎ যিনি তপস্যার শ্রম হইতে জাত হইয়াছেন, যিনি কেবল সোম করিয়াছেন, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ সমস্তই অধিষ্ঠান করিয়া আছেন, স্বর্গ যাঁহার কেবল, সেই জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মকে নমস্কার। সোম ও স্বর্গ কেবল ব্রহ্মের। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সোম পান করিয়া ব্রহ্মদর্শনের কথা কহিতেছেন। সুতরাং এই সোম ও স্বর্গ ব্রহ্মদর্শনসম্বন্ধীয় বস্তুবিশেষ। বোধ হয়, সোম=উপায়, স্বর্গ=অবস্থা। এখানে যদি তপঃকে জ্ঞান ধরিয়া লই, তাহা হইলে প্রথম ছত্রে দেখা যায়, ব্রহ্ম জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভুবনে বিস্তৃত হইয়াছেন। ব্রহ্ম হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্রহ্ম জ্ঞান নহেন, এজন্য ব্রহ্মকে জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই। এই অথর্ব্ব-সংহিতাসূক্তদ্বয়ে (১০ মে, ৭ম ও ৮ম) ব্রহ্ম সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাঁহাকে পুরুষের উপরে স্থান দিয়াছেন। শুদ্ধ নির্গুণ আকারেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কর্ত্তা বলিয়া যথায় যথায় নির্দ্দেশ আছে, তাহা একটু বিবেচনা করিলেই আলঙ্কারিক ভাষা মাত্র বুঝা যাইবে। ঋক্‌সংহিতায় ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বুঝাইত। কিন্তু এখানে স্পষ্টতঃ জগতের মূল জ্যোতিকে বুঝাইতেছে। বোধ হয়, ব্রহ্ম শব্দে প্রথমতঃ স্তোত্র ও জ্ঞানকে বুঝাইত, পরে যখন জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইল, তখন ব্রহ্মশব্দকে জ্ঞানার্থক বলিয়া সেই অক্ষর-জ্ঞান অর্থে ব্যবহার হইল। সেই জ্ঞান ভূমা, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া এখন ব্রহ্মশব্দ ভূমার্থক জগৎমূলকে বুঝায়।

সম্প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠাসূচক অম্ভৃন নামক ঋষির দুহিতা বাক্‌নাম্নী ব্রহ্মবিদুষীর পরমাত্মসূক্তের কয়েকটি মন্ত্র দেখাইতেছি ;—

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহং ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥১॥
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্ ॥৩॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মানং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥৫॥
অহং বাত ইব প্র বাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব ॥৮॥

—ঋক্-সং—১০-১২৫ সূক্ত

অনুবাদ ;—১। আমি রুদ্রভাবে চরিতেছি, আমি আদিত্য, বিশ্বদেবভাবে চরিতেছি। আমি

মিত্রাবরুণকে ধারণ করিতেছি, আমি ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীদ্বয়কে ধারণ করিতেছি।৩। আমি ঈশ্বরী, ধনের প্রাপণকারিণী, জ্ঞানিনী, যজ্ঞার্হাদের মুখ্যা। ভূরি স্থানে স্থিতা ভূরিবেশধারিণী আমাকে দেবতারা বহুরূপে বিধান করিতেছেন।৪। আমি স্বয়ং ইহা বলিতেছি, দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ আমাকে স্তুতি করেন, যে কামনা করে, আমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা, ঋষি ও সুমেধা করি।৮। আমি বিশ্বভুবন উৎপাদন করিতে আরম্ভমানা হইয়া বাতের ন্যায় বহিতেছি। দিবার পর, এই পৃথিবীর পর আমি এত মহিমা দ্বারা রহিয়াছি।

ইহা এক—ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। ইনি "একমেব অদ্বিতীয়ং" হইয়াছেন। ভাষা পৃথক্ পৃথক্ অশ্বিনী, বরুণ বলিতেছে, কারণ, সে জ্ঞান ভাষায় আসে না, ভাষায় আসিলে, এইই একত্বের ভাষা হয়। বেদসংহিতা এই একত্বজ্ঞানের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অদ্বৈতবাদের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। আমরা এতক্ষণ দ্বৈতাত্মক বহুত্বাত্মক জগতের বাধিতাবস্থা পাই নাই। এই ব্রহ্মবিদুষী দেখাইলেন,—'এক' ;—দ্বি, বহু নাই। মায়া বাধিত হইয়াছে। জগৎ মায়া, বহুত্ব মায়ার কার্য্য।

আমরা ইতিপূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের এই শেষ চিহ্ন বেদসংহিতায় ভালরূপে পাই নাই। আমার বিবেচনায় দার্শনিক বহু ব্যাখ্যা হইতে এই অদ্বৈত সাধনার দৃষ্টান্ত শ্রেষ্ঠ। মায়াজগৎ তুচ্ছ, নাসদীয় সূক্তে বলা হইয়াছিল। মায়ার সব লক্ষণ আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছিলাম। এখন মায়ার বাধিতস্বরূপ শেষ লক্ষণ দেখাইলাম।

রামানুজাদির বিশিষ্টাদ্বৈতবাদে কোন লোকের এক অদ্বৈত জ্ঞান হইতে পারে না। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন মাত্র তাঁহাদের সাধনের শেষ অবস্থা। অদ্বৈতবাদ ভিন্ন অন্য কোন মতবাদে এই বাক্সূক্তের ব্যাখ্যা হইবার নয়।

বেদান্তের পরিভাষা

এখন আমরা দেখাইব, বেদান্তমতের প্রধান শব্দগুলিও বেদসংহিতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। বেদান্তে একং, অদ্বিতীয়ং, মায়া, নামরূপ, ব্রহ্ম, এ সকল শব্দের ব্যবহারই প্রধান। আমাদের ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত মন্ত্রসমূহেই এ সকল শব্দ বেদান্তের অর্থেই ব্যবহৃত দেখান হইয়াছে। নাসদীয় ও অন্যান্য মন্ত্রে "একং" ও "অদ্বিতীয়ং" (যাহার পর নাই, অন্য নাই, এ প্রকার) আছে। অথর্ব্ববেদীয় স্কম্ভ, ব্রহ্ম ও পুরুষসূক্তে "ব্রহ্ম" শব্দ একতত্ত্বের অর্থে দেখান হইয়াছে। মায়াশব্দ

১। রূপং রূপং মঘবা বোভবীতি মায়াঃ কৃণ্বানাস্তন্বং পরিস্বাং। ঋ-সং—৩, ৫৩, ২

২। ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে। ঋ-সং—৬, ৪৭, ১৮

৩। যত্র দেবাশ্চ মনুষ্যাশ্চ ··· ··· যত্র তন্মায়য়া হিতং। অ-সং—১০, ৮, ৩৪

এই সমস্ত মন্ত্রেই আছে। অথর্ব্বোক্ত তৃতীয় মন্ত্রে মায়া শব্দ স্পষ্টতই বেদান্তের অর্থে। দ্বিতীয় মন্ত্রে মায়া বহুবচনে আছে বলিয়া মায়া শক্তি অর্থে ব্যবহৃত নহে বলিয়া অনেকে বলেন।

বাস্তবিক প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রে মায়া-শব্দ বেদান্তের মায়া শক্তির প্রতিশব্দ নহে। তবে এখানে মায়া শব্দের অর্থ বেদান্তোক্ত মায়ার অর্থ হইতে তত বিভিন্ন নহে। এই দ্বিতীয় মন্ত্রে বহু হইবার উপায়কেই মায়া বলা হইয়াছে, বেদান্তের মায়াতে এই ভাবও আছে। প্রকৃত কথা এই যে, এ সকল শব্দ হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া পরিবর্ত্তিকালে বৈদান্তিকেরা মায়া শব্দকে পরিভাষাস্বরূপ করিয়াছেন। 'নাম-রূপ' শব্দের 'রূপ' শব্দ ঋগ্বেদে পরবর্ত্তী অর্থে ব্যবহৃত আছে। "রূপং রূপং প্রতিরূপো" ইত্যাদি। অথর্ব্বসংহিতার ১০, ২, ১২ মন্ত্রে নামরূপ-শব্দের একত্র ব্যবহার আছে; যথা,—"কো অস্মিন্ রূপং অদধাৎ…চ নাম চ"। এখানে নাম-রূপ শব্দ কতকটা পরিভাষাবদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। বৈদান্তিকেরা তাহা রীতিমতভাবে পরিভাষামধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এখানে উদ্ধৃত মন্ত্রাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আর দেওয়া হইল না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বেদসংহিতায় যদি কোন দর্শন-বাদ থাকে, তবে তাহা অদ্বৈত-বাদই। অদ্বৈতবাদ ভারতের সনাতন তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত। তবে বহু পরিবর্ত্তিকালে শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির সময়ে ইহা দর্শনাকারে যুক্তিতর্ক-সমেত উপস্থিত হইয়াছিল। স্বভাবতই তখনকার সমস্ত ভাব বৈদিক-সংহিতার সেই সুদূর অতীত সময়ে স্ফুট হইবার কথা নহে। কিন্তু ব্রহ্ম-দর্শন নামক জ্ঞান থাকাতেই বোধ হয়, বেদসংহিতাতেও অদ্বৈতবাদ-সম্মত দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভাষা তখন স্ফুট ও বিচিত্র ভাব ধারণ না করায় ঋষিদের ভাবরাশি প্রকাশে বাধা জন্মিয়াছে, এরূপ আভাস যথেষ্ট আছে। পরন্তু ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শঙ্করাচার্য্যাদির সময়ের অদ্বৈতবাদ-জাতীয় চিন্তাপ্রণালী বেদসংহিতার কালেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং তাহা অল্লাধিক পরিস্ফুট অবস্থায়ই বেদের সংহিতাভাগে বিদ্যমান আছে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

অতীতে ল ও ভবিষ্যতে ব-প্রত্যয়

করিল, খাইল, যাইল, হাসিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ল-প্রত্যয় ও করিব, খাইব, যাইব, হাসিব প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ব-প্রত্যয়ের উৎপত্তি-নির্ণয় বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপপাদ্য বিষয়। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন যে, অতীত কালের 'আসীৎ'এর অপভ্রংশ আছিল এবং এই 'আছিল' অন্য ক্রিয়ার সহিত যুক্ত হইয়া বঙ্গভাষায় অতীত কালের ক্রিয়াপদের গঠন করে। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেনও এইরূপে সংস্কৃতভাষা হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইলে প্রাচীন সাহিত্য-ভাণ্ডারের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কীটবৎ বিচরণ করিয়া উদাহরণ সংগ্রহ করিতে হইবে এবং সংগৃহীত উদাহরণসমূহের উপর দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন পূর্ব্বক ভাষাতত্ত্বের প্রতি সূত্র প্রণীত হইলে তাহাতে ভ্রম-প্রমাদ অধিক থাকিবে না, এ কথা বলা যায়। নতুবা কল্পনার উর্ব্বরতায় আগাছার উৎপত্তি-বাহুল্য ঘটিলে প্রকৃত শস্যোৎপাদনের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন ;—"শব্দের রূপান্তরাবলম্বনের পদ্ধতি অতি বিচিত্র। শুধু অনুকরণপ্রিয়তাবশতঃ সময়ে সময়ে কোনও ব্যাপক পদ্ধতি প্রচলিত হয়। চল, খেল ইত্যাদির ল অন্যান্য ক্রিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যেখানে র-কারের সংশ্রব আছে, সেখানে ল-কারের পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বলিয়া ধরা যাইতে পারে—"ডলয়োরভেদঃ" ; কিন্তু তদ্ভিন্নও অনেক স্থলে ল প্রচলিত আছে। চলিলাম (চলামঃ), খেলিলাম (খেলামঃ) প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে হাসিলাম, দেখিলাম ইত্যাদিতে ল প্রযুক্ত হইয়াছে। সংস্কৃত ভ্রমঃ স্থানে প্রাকৃতে "বোল্লামঃ" দৃষ্ট হয়।"

'চলামঃ' পদের 'চলিলাম' রূপে পরিবর্ত্তনের পদ্ধতি যে 'অতি বিচিত্র', তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবার 'চলামঃ' পদের বর্ত্তমান-কালতার 'চলিলাম' পদে ভূতত্বে পরিণতির পদ্ধতি অধিকতর বিচিত্র। ফলতঃ এরূপ যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন।

সাহিত্যের ভাণ্ডারে বিচরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই, সংস্কৃত কৃত, গত, হসিত, ভূত প্রভৃতি ক্ত-প্রত্যয়ান্ত পদ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে কঅ, গঅ, হসিঅ, হুঅ প্রভৃতি রূপ প্রাপ্ত হয় এবং শৌরসেন-প্রাকৃতে ইহাদের তকার দকারে পরিণত হয়। যথা,—হসিদ, কধিদ, গদ ইত্যাদি। শৌরসেনীপ্রকৃতিকা মাগধী ভাষায় কোনও কোনও স্থানে এই দকারের ড়কারে পরিণতি হইয়াছে।* যথা ;—

হগে ণ গামস্তলং ণ ণ গলস্তলং বা গড়ে। মৃচ্ছকটিক—১ম।
জধা দহি পুল্লি পলিলুদ্ধাএ মজ্জালীএ শল পলিবত্তে
হোদি তধা দাশীএ ধীএ শলপলিবত্তে কড়ে। মৃঃ কঃ—১ম।

---

* অস্মৎসম্পাদিত "প্রাকৃত-প্রকাশ"—মাগধী পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গড়ে কৃখু ভাবে অভাবং। মৃঃ কঃ—১ম।

গড়ে শচ্চকং জ্জেব ভাবে। মৃঃ কঃ—১।

দলিদ্দ চালুদত্তাকে শহ আলুপাদবে কড়ে হগ্‌গে

উণ পলাশে ভণিদে কিংশুকে বি ণ কড়ে। মৃঃ কঃ—৮।

তুমং কদমাএ দিশাএ গড়ে? মৃঃ কঃ—৮।

শাবি দক্‌খিণাএ গড়া। মৃঃ কঃ—৮।

কীলিশে মএ কড়ে? মৃঃ কঃ—৮।

ভট্টকে মহন্তে অকজ্জে কড়ে। মৃঃ কঃ—৮।

কিং ভণাসি অকজ্জং কড়েত্তি। মৃঃ কঃ—৮।

ভট্টালকা এশে কে আগড়ে? মৃঃ কঃ—১০।

উত্তরকালে এই ড়-কারের লকারে পরিণতি মাগধী ভাষাতেই পরিদৃষ্ট হয়। যথা;—

অজ্জএ কলে নিচ্চএ। মৃঃ কঃ—২।

ণ ছিন্ন গোণা? ণ মলা লজ্জা? তুমং পি ণ মলে? মৃঃ কঃ—৮।

প্রাচীন বঙ্গভাষায় এই ল-কার সংক্রমিত হইয়া পড়ে এবং বহু লকারান্ত পদ অতীত কালে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়। ইহাদের উত্তর লিঙ্গ, বচন ও কারক-বিভক্তির চিহ্নও যুক্ত হইত। যথা;—

আয়িখিল হঅাঁ মোক পাঠাইল কাহ্নে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—২৭৪ পৃঃ

হেনয়ি সন্তেদে বুঢ়া মেলিলী আসিঅাঁ।

রাধা লঅাঁ গেলী ঘর প্রবোধ করিঅাঁ॥ „ —২৬৬ পৃঃ

তরাসে পড়িলী রাধা কাঁটাবন মাঝে। „ „

তোহ্মার বচনে জিলী পদুমার ঝী। „ „

দধির পসার লঅাঁ মথুরা চলিলী। „ —২৭১ পৃঃ

ধীরে বড়ায়ি মেলিলী তার ঠাঁই। „ „

তাহাক করিল আহ্মে আনেক যতনে। „ —২৭৩ পৃঃ

পুরুবেঁ তাহাক আহ্মে পাঠায়িল পান। „ „

তাহাক সহিল আহ্মে দেব বনমালী। „ „

কালী দলিল আহ্মে শলিল শোধিল।

কংস মারিবারে আহ্মে আবতার কৈল॥ „ —২৭৯ পৃঃ

পড়িলী হালিঅাঁ রাধা ফুলের শরে। „ —২৮০ পৃঃ

পুরুব যুগতি যত তোহ্মে আহ্মে কৈল।
তেকারণে বড়ায়ি রাধিকা প্রাণে মায়িল ॥ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন—২৮১ পৃঃ
জগতের ভালী রাধা এখন মৈলী।
দিনে পুণমীর চাঁদ যেহ্ন আথ গেলী ॥　　„　　—২৮৩ পৃঃ
না পাইল চুম কোল না পাইল শৃঙ্গার।
রাধার কারণে ভৈল এতেক খাঁখার ॥　　„　　—২৮৫ পৃঃ
কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আয়িল তাহার ॥　　„　　—২৮৯ পৃঃ
কথা এড়ি গেলায় পভু বুড়াও হৃদয়।
অভাগিনী নিসেদ দিলু দেখিয়া সংশয় ॥
বিনা অপরাধে তুমা মারিলয় রাম।
মর বাক্য না শুনিলায় তেজিলায় প্রাণ ॥
কথা এড়ি গেলায় প্রভু তারা হেন নারি।
কোথা এড়ি গেলায় প্রভু কিষ্কিন্ধ্যা নগরী ॥
রামকে ধার্ম্মিক্য বলি প্রবেশিলায় রণে।
মুই অভাগিনীর বাক্য না শুনিলায় কাণে ॥
তারাবিলাপ—সা-প-প—১৯১৪ সং, ১৮৬ পৃঃ

উল্লিখিত উদাহরণসমূহের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সংস্কৃত 'ক্ত', শৌরসেনী 'দ', মাগধী 'ড়' বা 'ল' প্রত্যয় হইতে বঙ্গভাষায় অতীত-চিহ্ন লকারের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই ল-প্রত্যয়ান্ত পদসমূহ সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ন্যায় ক্রিয়া ও বিশেষণ উভয়-ধর্ম্মাক্রান্ত। সেই জন্য প্রাচীন বাঙ্গালায় ইহাদের উত্তর লিঙ্গ ও বিভক্তি-চিহ্ন যোগ হইত। সংস্কৃত ভাষায় এই ক্ত-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর "ভাবে সপ্তমী"র প্রয়োগ সুবিদিত। এই ভাবে সপ্তমীর অনুকরণে বঙ্গভাষায় 'হইলে', 'যাইলে' প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়াপদের উৎপত্তি হইয়াছে। "চন্দ্রে উদিতে যাস্যামি" স্থানে বঙ্গভাষায় 'চাঁদ উঠিলে যাইব' হয়। সংস্কৃতের অনুকরণে বঙ্গভাষায়ও 'উঠিল' এই ল-কারান্ত পদের উত্তর অধিকরণ-চিহ্ন একারের যোগে 'উঠিলে' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

উত্তর-বেহারের মৈথিলী ভাষায়ও এই লকারান্ত পদের বিশেষণবৎ প্রয়োগের উদাহরণ অবিরল। অতীতজ্ঞাপক লকারান্ত পদের সহিত বর্ত্তমানতা-জ্ঞাপক 'ছে' যোগ করিয়া মৈথিলী ভাষায় অদ্যতন অতীত (Present Perfect) হয়। যথা,—কর্‌লছে,

জানল্‌ছে ইত্যাদি। বীরভূমজেলার প্রাদেশিক ভাষায়ও এইরূপ হল্‌ছে, গেল্‌ছে ও মল্‌ছে পদের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

মারাঠী ভাষায়ও এই প্রকার ল-প্রত্যয়ের বহুল প্রয়োগ হয়। যথা,—

ঠেবিলা (স্থাপিত)	ছাপীলা (মুদ্রিত)
কেলা (কৃত)	লিহিলা (লিখিত)
দাখবিলা (প্রদর্শিত)	পাহিলা (দৃষ্ট)
মাতলা (রক্ষিত)	লাবিলা (যুক্ত)
আনিলা (আনীত)	আলা (আগত)
দিলা (দত্ত)	ম্হটলা (ভণিত)

এই সমস্ত পদ মারাঠী ভাষায় বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয় এবং তিন লিঙ্গে ত্রিবিধ রূপ প্রাপ্ত হয়। বচন-ভেদেও ইহাদের রূপভেদ হয়।

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন—	লিহিলা	লিহিলী	লিহিলেঁ
বহুবচন—	লিহিলে	লিহিল্যা	লিহিলীঁ

গুজরাতী ভাষায়ও ল-প্রত্যয়ের প্রয়োগ মারাঠীর অনুরূপ। যথা ;—

	পুং	স্ত্রী°	ক্লী°
একবচন—	ছোড়েলো	ছোড়েলী	ছোড়েলুঁ
বহুবচন—	ছোড়েলা	ছোড়েলো	ছোড়েলাঁ

উৎকলীয় ভাষায়ও বঙ্গভাষার ন্যায় গলা, করিলা, দিলা প্রভৃতি পদে এই ল-প্রত্যয়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। হিন্দী ভাষায় এই ল-প্রত্যয়ের প্রয়োগ না থাকিলেও হিন্দী অতীত কালের আ-প্রত্যয় বঙ্গভাষার ন্যায় সংস্কৃত ক্ত-প্রত্যয় হইতে আগত। সংস্কৃত ভূত স্থানে মহারাষ্ট্রী হুঅ, হিন্দী—হুআ।

বর্ত্তমান 'আছে' ক্রিয়ার অতীতে 'ছিল' হয়। 'আছিল' পদও বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হইয়া থাকে ; যথা,—'আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন।' 'আছিল মায়ের কাছে পরম আদরে।'—ইত্যাদি। উত্তম পুরুষের চিহ্ন ম-কারের যোগে 'ছিলাম' এবং মধ্যম পুরুষের চিহ্ন এ-কারের যোগে 'ছিলে' পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'আইলা হো', 'আইলাঙ্' প্রভৃতি পদও পরিদৃষ্ট হয়।

শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন যে, 'কুর্ব্বঃ' হইতে 'করিব' উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু ঈদৃশ যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না।

সংস্কৃত ভাষায় ভবিষ্যতে তব্য প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইত। প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে পদ-মধ্যবর্ত্তী ত-কারের লোপে এই 'তব্য' 'অব্ব' বা 'এব্ব'তে পরিণত হয়।* এই 'অব্ব' প্রত্যয়

---

* অস্মৎসম্পাদিত প্রাকৃত-প্রকাশ, ২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধ্বন্যপচয় (phonetic decay) বশতঃ 'অব' বা 'য়ব'রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মিথিলার লেয়ব্, যায়ব্, খায়ব্, দেখব্ ইত্যাদি পদ এই প্রকারেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই 'য়'কার-স্থানে ইকারের প্রয়োগে 'করিব', 'যাইব', 'খাইব' প্রভৃতি বাঙ্গালা পদের উৎপত্তি হইয়াছে। 'করিল', 'খাইল' প্রভৃতির ন্যায় 'করিব', 'খাইব' প্রভৃতি পদও প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় পুরুষ-নির্ব্বিশেষে ব্যবহৃত হইত এবং ইহাদের উত্তর মাগধী কর্ত্তৃকারকের চিহ্ন আ-কার এবং অপভ্রংশ উ-কারের যোগ হইত। যথা ;—

> পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার।
> ধেয়ানেত জানিলাঞ্ পরভু উল্লূক বারতা।
> আহার দেখন্তি নহি জল পাব কুথা॥
> আত্মা শক্তি বলে মোর কুথা হব থিত।
> বিস মধু খাইলে তুহ্মি তেজিব জীবন।
> জে রূপে করিব তুহ্মি ছিস্‌টির স্বজন।
> আইট থানে লইবু ফোটা ধর্ম্ম পূজার কালে।
> সুক্রবার দিনে গো ঝিয়ে করিব হবিস্য।
> ভাজা পোড়া পরপাক না খাব আমিস্য॥
> সনিবার দিনে আসিব ধরম দেউলে।
> আসা পুরে বর দিব ভকত বৎসলে॥—শূন্যপুরাণ
> তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
> রাঙ্গা চরণ বেঁড়িয়া লমু পালাইয়া যাবু কোথা॥
>
> —বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭৪ পৃঃ।
>
> নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন।
> পালঙ্গে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন॥—ঐ, ৭৩ পৃঃ
> এহি দেউলে পড়িব জঅ জঅকার।—ঐ, ৬৪ পৃঃ
> শিখণ্ডীক দেখিয়া পাইবা অনুতাপ।—ঐ, ৪৪ পৃঃ

উত্তরকালে এই ব-কারান্ত পদের উত্তর উত্তম পুরুষের চিহ্ন ম-কার যোগে 'আইবাম', 'যাইবাম' প্রভৃতি পদ প্রচলিত হয়। স্থানবিশেষের ভাষায় তাহা 'আইবাঙ্', 'যাইবাঙ্' ইত্যাদিতে পরিণত হইয়াছিল। মধ্যম পুরুষে একার বা আকারের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল। পরে প্রথম পুরুষেও একারের প্রয়োগ প্রচলিত হইয়াছে এবং উত্তম পুরুষে মকারের প্রয়োগ অপ্রচলিত হইয়াছে। কোনও কোনও জেলার ভাষায় ম-কারের প্রয়োগ প্রচলিত ও বকারের লোপ হইয়াছে; যথা,—রাজবংশী—করিম্ ?।

বঙ্গভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষায় এই ব-প্রত্যয়ের প্রয়োগের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

	মৈথিলী	সিন্ধী	গুজরাতী	মারাঠী	উড়িয়া
একবচন					
উত্তম পুরুষ—	দেখব্	ছড়িবুসি	ছোড়বো	সুটাবা	দেখিবি
মধ্যম পুরুষ—	দেখব	ছড়িবেঁ	„	সুটাবাস	দেখিবু
প্রথম পুরুষ—	দেখব	ছড়িবো		সুটাবা	দেখিব
বহুবচন					
উত্তম পুরুষ—	দেখব্	ছড়িবাসী	ছোড়বানো	সুটাবে	দেখিবু
মধ্যম পুরুষ—	দেখব	ছড়িবউ	„	সুটবেত	দেখিব
প্রথম পুরুষ—	দেখব	ছড়িবা	„	সুটাবে	দেখিবে

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শঙ্করকৃত পাষণ্ডমৰ্দ্দন

এই পুথিখানি বক্কলে লিখিত। ১ হইতে ২২ পত্র। শেষ নাই। সপ্তম পত্রের পূর্ব্বার্দ্ধে গ্রন্থের নাম পাওয়া গেল। যথা ;—

সমস্ত সাস্ত্রত করিয়া সার।
পাসণ্ডমৰ্দ্দন নাম ইহার ॥

গ্রন্থের ভণিতায় ;—

কৃষ্ণর কিঙ্করে সঙ্করে ভণে।
বোলা হরি হরি সমস্ত জনে ॥

শঙ্কর এই গ্রন্থে পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ড, ভাগবতের দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ ও বৃহৎ সহস্রনাম, এই গ্রন্থগুলির নাম করিয়াছেন।

গ্রন্থারম্ভে 'ঘোষা' যথা ;—

জয় জয় গোবিন্দ নারায়ণ রাম কেশব হরি হরি।
রাম রাম কেশব হরি ॥

যে নাম ঘুষিতে হয়, তাহাই ঘোষা। স্থানান্তরে গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—

সদায়ে ডাকিয়া ঘোষিয়ো হরি।

তৎপরে ঘোষা,—

রাম সে জিবন রাম সে প্রান।
রাম বিনে নাই বান্ধব আন ॥

প্রথমোক্ত ঘোষার পরপদ এই,—

প্রথমে প্রণামো ব্রহ্মারূপে সোনাতন।
সর্ব্ব অবতার কারণ নারায়ণ ॥
তযু নাভিকমলত ব্রহ্মা ভৈলা জাত।
যুগে জুগে অবতার ধরা অসংখাত ॥
মস্য রূপে অবতার ভৈলা প্রথমত।
উদ্ধারিলা বেদ প্রভু প্রলয় জলত ॥

ভগবানের চতুর্ব্বিংশতি অবতার-বর্ণনান্তে চারি যুগের মধ্যে কলির শ্রেষ্ঠতা, হরিনামের মাহাত্ম্য, হিংসা-ধর্ম্মের অকর্ত্তব্যতা নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার উপদেশ প্রভৃতি আছে।

শঙ্কর বেদনিন্দককে পাষণ্ড বলিয়া তাহার সঙ্গ করিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যথা,—

পাসণ্ডে সে নিন্দে বেদর বাণি।
তাক সম্ভাষণ এড়িবা জানি ॥

সে কালে অনেকে বৈষ্ণব দেখিয়া হাসিত ও কীর্ত্তন শুনিয়া 'সম্যকে' মরিত। যথা,—

বিষ্ণু ভকতক দেখিয়া হাষে।
আপুনিও নষ্ট আনকো নাষে ॥
কিত্তন শুনিয়া সম্যকে মরে।
জানিবা নিতে মহাপাপ করে ॥

তৎপরে বৈকুণ্ঠের বর্ণনা, সেখানে নারায়ণ, তাঁহার উরুস্থলে লক্ষ্মী।

হেন মন্দিরের সুসিংহাসনে।
আছন্ত বসি প্রভু নারায়ণে ॥

প্রভু নারায়ণ ভক্তের বন্ধু ও জগতের বাপ। যথা,—

ভকত বন্ধু জগত বাপ।
বোলা হরি হরি হরোক পাপ ॥

তৎপরে অজামিল-চরিত্র, প্রহ্লাদ-চরিত্র, পরীক্ষিৎ-শুক-সংবাদ, ক্ষীরসাগরের মধ্যস্থিত ত্রিকূট পর্ব্বতের বর্ণনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম না করিলে শঙ্কর বড়ই ক্রুদ্ধ হইতেন,—

জি জনর সিরে : ন করে প্রণাম : কৃষ্ণর পদকমলে।
তাতে মোর দায় : নেড়িবি সদায় : বান্ধিমু নেহাতে গলে ॥

অসমদেশে শঙ্করদেব বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। এই গ্রন্থকার শঙ্কর সেই শঙ্করদেব হইতে পারেন মনে করিয়া আলোচনার্থ পুথিখানির সংবাদ পরিষদের গোচর করিতেছি। অসমদেশে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে কি না, জানি না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত করিলে "গৌহাটী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা"র মনোযোগ এই পুথির প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে এবং তাঁহাদের দ্বারা সমগ্র পুথির উদ্ধার হওয়া অসম্ভব নয়।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

চিনির স্ফুটন হইতে সুরার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান

(১) কাংস্যপাত্রে নারিকেল-জল

আমাদের দেশে অনেকেই জানেন, কাংস্যপাত্রে ডাবের জল পান করা নিষিদ্ধ। অন্ধ-বিশ্বাস এই যে, ইহা মদ্যপানের সমান হয়। কোন কোন পূজার সময়েও মদ্যের পরিবর্ত্তে কাংস্যপাত্রে ডাবের জল দেওয়া হয়। এই অনুসন্ধানের ইতিহাস Collegian (Nov. 1912, page 108) পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত করিয়াছি। এ স্থলে এ বিষয়ে মৌলিক পরীক্ষার বিবরণ বলিতেছি। প্রবন্ধটি বঙ্গভাষায় লিখিত হইল বলিয়া সম্যক্ বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রসঙ্গ করিতে পারিলাম না।

পরীক্ষা

দুইটি পরিষ্কার কাঁচের ও কাংস্যের সমান ঘটি লইয়া উত্তমরূপে আবদ্ধ করত কাঁচ ও রবারের নল দ্বারা দুটি উল্টান buretteএর সহিত সংলগ্ন করা হইল। Burette দুইটি পূর্ব্বেই নারিকেল তৈলের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং দুইটি অর্দ্ধতৈলপূর্ণ পাত্রের উপর ছিল। একটি ডাবের জল হইতে ৫০ সি সি (c. c.) করিয়া দুইটি পাত্রেই দেওয়া হইল ও তৎক্ষণাৎ ছিপি দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, নলের দ্বারা buretteএর সহিত সংলগ্ন করা হইল। কাঁচ ও কাংস্যের পাত্র দুইটিকে বেশ করিয়া শুষ্ক করাতের গুঁড়া দিয়া আবৃত করিয়া একটি কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে বসাইয়া রাখা হইল—যাহাতে দুইটি পাত্রের তাঁপের কোনরূপ পার্থক্য না হয়। এক্ষণে ডাবের জলের যে চিনি আছে, তাহা উৎসেচিত হইয়া মদিরায় ও কার্ব্বন-দ্বি-অক্সিদে (অঙ্গার অম্লজানে) পরিণত হইবে। বায়ু-নির্গমনের ধারা হইতেই বুঝা যাইবে যে, কোন্‌টিতে কি পরিমাণে মদ্য প্রস্তুত হইতেছে। এ পরীক্ষাটি অতি আবদ্ধ স্থানে করা হইয়াছিল বলিয়া দৈনিক তাপের পরিবর্ত্তনে বস্তুতঃ কোন ক্ষতি হয় নাই। নিম্নে এই পরীক্ষাটির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। (পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রথম অবস্থায় কাংস্যপাত্রে অতি শীঘ্রই স্ফুটন আরম্ভ হয় এবং অধিকতর বেগে চলিতে থাকে। মোটের উপর কাচের পাত্রে বেশী মদ্য প্রস্তুত হয়। তাহার কারণ, ডাবের জলে কতকটা অম্ল থাকে এবং আরও জানা আছে যে, উৎস্ফেচনের দ্বারাও কতকটা অম্ল প্রস্তুত হয়। এই অম্লসকল কাঁসার মূল ধাতুগুলিকে ক্ষয় করিয়া দ্রাবণে পরিণত করে। যত স্ফুটন চলিতে থাকে, তত জলীয়াংশে এই বিষাক্ত ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং অবশেষে সকল বীজাণুগুলিকে মারিয়া ফেলে।

সময়		১ম পরীক্ষা		২য় পরীক্ষা	
		কাংস্যপাত্র	কাঁচপাত্র	কাংস্যপাত্র	কাঁচপাত্র
অপরাহ্ণ	২—৩ ঘটিকা	২ঘ. সেমি *	১মঘ. সেমি	১'৯ ঘ. সেমি	১'০ ঘ সেমি
„	৩—৪ „	৫'৮ „	১'৮ „	৫'৭ „	১'৯ „
„	৪—৫ „	৫'৫ „	৫'৪ „	৫'৮ „	৫'৩ „
„	৫—৬ „	১১'৯ „	১০'৭ „	১১'৮ „	১০'৮ „
„	৬—৭ „	৮'৬ „	২৭'৪ „	৮'৯ „	২৮'০ „
„	৭টা হইতে পরদিন প্রাঃ ৭	০'০ „	২৮'০ „	১'০ „	২৭'০ „
	৭টা—অপ ২	৬'০ „	২'০ „	২'০ „	২'৪ „
	অপ ২—পরদিন অপ ২	০'০ „	০'০ „	০'০ „	০'০ „
		৩৯'৮	৭৬'৩	৩৭'১	৭৬'৪

(২) মৃতসঞ্জীবনী সুধা

মৃতসঞ্জীবনী সুধা বা সুরা আয়ুর্ব্বেদ-মতে একটি প্রধান প্রয়োজনীয় ঔষধ। ডাক্তারগণ যে যে স্থলে ব্র্যাণ্ডি ব্যবহার করেন, সেই সেই স্থলে কবিরাজগণ এই সুরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপস্থিত আলোচ্য বিষয়ে যদিও আমাদের পূর্ব্ববৈজ্ঞানিকগণ বর্ত্তমান পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া প্রত্যক্ষ মীমাংসা বা প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিব না, তবে তাঁহাদের প্রস্তাবিত প্রথাগুলি আধুনিক বিজ্ঞানমতে কত দূর শুদ্ধ বা অশুদ্ধ, তাহাই বলিব। আমি মূল সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিবার সুবিধা পাই নাই। তথাপি যে সমস্ত আধুনিক গ্রন্থের মত এখন চিকিৎসক-সমাজে আদৃত হয় তাহার উপর আমাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে। কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থে ৪১৪ পৃষ্ঠায় ৩২ সের গুড়ের সহিত

* ঘ সেমি=Cubic Centemetre

২৫৩ সের জল মিশাইতে বলিয়াছেন। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের System of Ayurvedic Medicine vol. 11 ১৩১ পৃষ্ঠায় ৩২ সের গুড়ের সহিত ২৫৩ সের জল মিশাইতে বলিয়াছেন। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্তের Materia medica of the Hindus নামক পুস্তকের ২৭৪ পৃষ্ঠায় দুই প্রকার প্রকরণের তালিকা আছে;—একটি ইংরাজিতে অনুবাদিত, আর একটি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুবিধার জন্য প্রক্রিয়াগুলি যথাক্রমে ক, খ, গ, ঘ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে। মদিরা প্রস্তুতকরণে নিম্নলিখিতগুলির বিশেষ প্রয়োজন,—চিনি স্ফুটনকারী বীজাণু (yeast) ও তাহাদের খাদ্য (yeast food)।

মদিরা স্ফুটনে কতটা চিনির সহিত কতটা জল মিশাইতে হইবে, ইহাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। সচরাচর গুড়ের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ চিনি থাকে। সেইরূপ হিসাব করিয়া এই তালিকাটি প্রস্তুত হইয়াছে।

	ক	খ	গ	ঘ
চিনির ভাগ	৯'৪	৯'৪	২'৫	৯'৪
জলের ভাগ	৯৪	৯৪	৯৪	৯৪

এখন দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন শাস্ত্রকারেরা ৯'৪ এর সহিত ৯৪ ভাগ জল মিশাইতে বলিয়াছেন। কেবল ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত যাঁহার পুস্তক হইতে ইংরাজি অনুবাদ করিয়াছেন, তিনি ২'৫ এর সহিত ৯৪ ভাগ জল মিশাইতে বলিয়াছেন। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও ঐরূপ অধিক জল মিশ্রণের পক্ষপাতী ছিলেন। এমন কি, ডাক্তার James Bell * চিনির সম্পূর্ণ মদিরায় পরিণতি জন্য শতকরা অর্দ্ধ ভাগ চিনি ব্যবহার করা ঠিক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে ইহা বাস্তবিক অসুবিধাজনক বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ কাল ১০ ভাগ চিনির সহিত ৯৪ ভাগ জল মিশাইয়া স্ফুটন করাই সকল বৈজ্ঞানিকেরা প্রশস্ত বলিয়া মনে করেন। অবশ্য ১০এর সহিত ৯'৪ এর পার্থক্য সামান্য বলিয়া ধরিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বশাস্ত্রকারেরা ঔষধার্থে যে সুরা প্রস্তুত করিবার বিধি দিয়াছেন, তাহার এই অংশটুকু আধুনিক উন্নত বিজ্ঞানসম্মত। তাহার পর স্ফুটনকারী বীজাণু (yeast) সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। চিনি হইতে মদ্য প্রস্তুতকরণে এই প্রকার জীবাণুর কি কার্য্যকারিতা, তাহা এ স্থানে বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে কতটা চিনির স্ফুটনের জন্য কতটা বাকর (yeast) দেওয়া উচিত, তৎসম্বন্ধে অনেক বিভিন্ন মত আছে; সুতরাং পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করা ঠিক মনে করিতেছি না। মৃতসঞ্জীবনী সুধা প্রস্তুতকরণে কিছু স্বতন্ত্র বাকর ব্যবহার করা হয় না। তবে বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষের ছাল

* Allen's Commercial Organic Analysis, vol I, 3rd Edition, page 275.

প্রথম হইতে ব্যবহার করিতে হয়। হ্যানসেন ১৮৮০-৮১ খৃঃ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত বৃক্ষের বঙ্কলে যথেষ্ট পরিমাণে বাকর আছে এবং এই সমস্ত বঙ্কলের সত্ব হইতে এই বীজাণুগণ খাদ্য প্রাপ্ত হয়। আধুনিক বিজ্ঞান-মতে ইহাদের খাদ্যের জন্য Ammonium Sulphate ব্যবহার করা প্রশস্ত বলিয়া মনে করা হয়। মৃতসঞ্জীবনী সুধার চিনি উৎসেচন করিতে প্রায় ২০ দিন অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু আজকাল প্রায় অত অধিক দিন রাখা প্রয়োজন হয় না। উপস্থিত এ বিষয়ে আমি ঠিক বৈজ্ঞানিক ভাবে মতামত দিতে পারিলাম না। পরে রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া বলিব। মোটামুটি বাহ্যিক অনুমানে বোধ হয় যে, উৎসেচন-ক্রিয়ার সম্যক্‌রূপে আরম্ভ হইতে এ স্থলে একটু বিলম্ব হয়; সেই জন্য কিছু অধিক সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে। আর তা ছাড়া এরূপ আবদ্ধ স্থানে রাখাতেও কিছু বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। আমি নমুনাস্বরূপ একটি মৃতসঞ্জীবনীর রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহার অম্লত্ব (acidity) প্রভৃতি অনেকটা Brandyর মত।

এই মদিরা প্রস্তুত করিতে অনেক মশলা ও গন্ধদ্রব্য ব্যবহৃত হয়, তাহাদের সকলগুলির রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পর্কে কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তবে এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ ডাক্তারের মতামতই অবশ্য গ্রাহ্য।

উপসংহার

অনেকে হয় ত মনে করিতে পারেন যে, মৃতসঞ্জীবনীর ঔষধত্ব কেবল মদ্যের জন্য; অতএব আজকালকার কবিরাজগণ কেন ইহার পরিবর্ত্তে rectified spirit বা alcohol ব্যবহার করেন না। কিন্তু সেরূপ যে হইতে পারে না, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানেই তাহার প্রভূত প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ স্থলে অবশ্য সে সমস্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমার একান্ত ইচ্ছা যে, হঠাৎ যেন কেহ এরূপ একটা পরিবর্ত্তন না করেন। এই প্রকার পরিবর্ত্তন ও নূতন প্রথার প্রচলন করিতে গেলে গভীর গবেষণা ও প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানে ও শরীর-বিধান-তত্ত্বের বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা একান্ত প্রয়োজন।

এই সকল বিষয় অনুশীলন ও তত্ত্বানুসন্ধান করিতে গেলে অনেক প্রথায় হয় ত বৈজ্ঞানিক ভুল ও অসংলগ্নতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কৃত হইতে পারে। আবার যে কারণে সামান্য রসায়নবিৎ দ্বারা প্যাষ্টুরের কোন ভ্রম বাহির হইলেও কেহ সেই মহাত্মার বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন না, সেইরূপ এই অনুসন্ধানের ফলে এমন অনেক তত্ত্বও আবিষ্কৃত হইতে পারে, যাহা দ্বারা অনেক অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও প্রাচীন পণ্ডিতগণের প্রতি প্রভূত ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দিবে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বঙ্গের চন্দ্ররাজগণের
পূর্ব্বতন রাজপাট ও বংশসম্বন্ধে মন্তব্য

১৩২০ ভাদ্র মাসের "সাহিত্যে" "শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন" প্রবন্ধে তাম্রশাসনের প্রশস্তি-পাঠ ও ছায়াচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রশস্তির দ্বিতীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

"চন্দ্রাণামিহ রোহিতা [ ] খি (?) ভুজাম্বংশে বিশালশ্রিয়া
স্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ্ণচন্দ্রসদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ।"

পাঠোদ্ধারকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন,—"এই শ্লোকের প্রথম পাদে 'রোহিতা' অক্ষরত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই এবং তাহার পরবর্ত্তী যে অক্ষরটি পরিদৃষ্ট হয়, তাহা 'খি' বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটি অক্ষর 'ভুজাং' অক্ষরদ্বয়ের সঙ্গে সমাসবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং' পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। "রোহিতাবনিভুজাং অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ কর্ম্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।"

রাধাগোবিন্দ বাবু "রোহিতা"র পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই মনে করিয়া, সেই স্থানে [ ] এইরূপ বন্ধনি-চিহ্ন দিয়াছেন। আমি বিবেচনা করি, তাম্রফলকে "রোহিতা"র পরের অক্ষরটিই উৎকীর্ণ হইয়াছে। যে অক্ষরটির পর রাধাগোবিন্দবাবু (?) এই প্রশ্নচিহ্ন দিয়াছেন, তাহাই সেই অক্ষর। এই অক্ষর—যাহাকে তিনি 'খি' মনে করিয়াছেন, তাহাই "গি"। এই "গি"র পরের অক্ষরটি শিল্পীর প্রমাদে উৎকীর্ণ হয় নাই, সে অক্ষরটি হইবে "রি"। অতএব আমার মতে প্রথম চরণের শোধিত পাঠ এইরূপ হইতেছে,—

চন্দ্রাণামিহ রোহিতাগিরিভুজাং বংশে বিশালশ্রিয়াম্

"রোহিতাগিরি"র ব্যুৎপত্তি ও সংস্থানের প্রমাণাদি আমার "গৌড়ে সুবর্ণবণিক্" পুস্তকে সবিস্তর দৃষ্ট হইবে। 'রোহিতাগিরি' শোণনদ-তটে বর্ত্তমান আছে। অধুনা লোকে উহাকে রোহিতস্‌গড়, রোতাস্‌গড় ও রোহিত বলে। মানচিত্রে উহাই Rotas Hill.

নিম্নে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইতেছে, এই শ্লোকটি হইতে রাধাগোবিন্দ বাবু সুবর্ণচন্দ্রকে 'চন্দ্রকুলজাত' মনে করিয়াছেন,—

"বুদ্ধস্য যঃ শশকজাতকমঙ্কসংস্থং
ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতাকরাংশুঃ।
চন্দ্রস্য তস্য কুলজাত ইতীব বৌদ্ধ [:]
পুত্রঃ শ্রুতো জগতি তস্য সুবর্ণ্ণচন্দ্রঃ॥"

ভাবার্থ এই,—চন্দ্র শশক-শিশু-রূপ বুদ্ধকে বক্ষে ধারণ করিয়া বৌদ্ধ হইয়াছেন। সুবর্ণচন্দ্রও কিঞ্চিৎ চন্দ্রত্বহেতু যেন চন্দ্রের কুলে (তস্য চন্দ্রস্য কুলে জাত ইব) যেন উৎপন্ন, তাই বৌদ্ধ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন।

সুবর্ণচন্দ্রের চন্দ্রত্ব, যথা ;—শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের ঊর্দ্ধভাগস্থিত ধর্ম্মচক্রমুদ্রার ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে দুইটি মৃগশিশু অঙ্কিত আছে। অতএব বোধ হয়, শ্রীচন্দ্রের পিতামহ সুবর্ণচন্দ্রের সময়ে মৃগ প্রথমে রাজচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতেই চন্দ্র যেমন মৃগলাঞ্ছন, সুবর্ণচন্দ্রও তদ্রূপ মৃগলাঞ্ছন ছিলেন। আরও চন্দ্রত্বের কারণ এই যে, সুবর্ণচন্দ্রের পিতা পূর্ণচন্দ্র, "পূর্ণচন্দ্রসদৃশ" ছিলেন। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"; অতএব সুবর্ণচন্দ্রও চন্দ্রের সমান ছিলেন। আবার সুবর্ণচন্দ্রের মাতা অন্তঃসত্বা অবস্থায় স্পৃহাহেতু অমাবস্যা তিথিতে "উদয়িচন্দ্রবিম্ব" দেখিতে ইচ্ছা করায় সুবর্ণময় চন্দ্রদ্বারা তোষিতা হইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার পুত্রকে লোকে সুবর্ণচন্দ্র বলিত। আবার সুবর্ণচন্দ্রের পিতা পূর্ণচন্দ্র 'চন্দ্রাণাং' চন্দ্রদিগের যেমন এক চন্দ্র ছিলেন, তদ্রূপ সুবর্ণচন্দ্রও চন্দ্রদিগের এক চন্দ্র ছিলেন।

উপরে ধৃত শ্লোক হইতে সুবর্ণচন্দ্রকে চন্দ্রের কুলে জাত, এরূপ বলা আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয়। তিনি যদি চন্দ্রবংশীয় হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতা পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রবংশে উৎপত্তি অগ্রেই কথিত হইত।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উক্ত শ্লোক হইতে সুবর্ণচন্দ্রের চন্দ্রবংশীয়ত্ব প্রমাণ হয় কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীশিবচন্দ্র শীল

কৃত্তিবাসের জন্ম-শক

সন ১৩১৮ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমি কৃত্তিবাসের জন্মশক আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিলাম। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে আছে,—

আদিত্য বার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

ইহা হইতে জ্যোতিষ-গণনাদ্বারা চারিটি সম্ভাব্য শক পাইয়াছিলাম; কিন্তু লিখিয়াছিলাম, শক ১২৫০ হইতে ১৪৫০ মধ্যে এক বৎসরেও উল্লিখিত যোগ ঘটে নাই।

গত বৎসর "ঢাকা রিভিউ" পত্রে এই বিষয়ে এক অলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন এই বিষয়ে পুনরালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। গত মাসে আমার "বাঙ্গালা শব্দ-কোষে" 'শ্রীপঞ্চমী' শব্দ লিখিবার সময় আমাকে রঘুনন্দন দেখিতে হইয়াছিল। তাহাতে আছে,—"অথ পঞ্চমী। সা চ চতুর্থীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ পঞ্চমী চ প্রকর্ত্তব্যা চতুর্থীসহিতা বিভো। ইতি ব্রহ্মপুরাণাচ্চ।" ইত্যাদি।

ইহা পাইয়া পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দেখি। দেখি, একটি 'না' স্থানভ্রষ্ট হওয়াতে বিচার দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। আমি স্বীকার করিয়াছিলাম, শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা হয় না, ষষ্ঠীযুক্তা হইতে পারে। এখানে হইবে, চতুর্থীযুক্তা হয়, ষষ্ঠীযুক্তা হইতে পারে না। আমার মূল প্রবন্ধ হারাইয়া গিয়াছিল। এক অসম্পূর্ণ প্রতিলিপি দেখিয়া প্রকাশিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বোধ হয়, প্রতিলিপিতে ভুল ছিল। আর এক কথা। শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজার দিন এক মনে করিয়াছিলাম। কলিকাতা সংস্কৃতকালেজের অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার এই ভ্রম দূর করিয়াছেন। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন, তিনি শ্রীপঞ্চমীতে জন্মিয়াছিলেন; লেখেন নাই যে, তিনি সরস্বতী পূজার দিন জন্মিয়াছিলেন। শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতীপূজা যে একই দিনে হইবে, এমন বিধি নাই। "মাঘে মাসি সিতে পক্ষে পঞ্চমী যা শ্রিয়ঃ প্রিয়া। তস্যাঃ পূর্ব্বাহ্ণ এবেহ কার্য্যঃ সারস্বতোৎসবঃ॥"—রঘুনন্দন। শ্রীপঞ্চমী চতুর্থীযুক্তা গ্রাহ্য। যদি পঞ্চমী উভয় দিন পূর্ব্বাহ্ণ-মুহূর্ত্তব্যাপিনী হয়, তবে পূর্ব্বদিনে সরস্বতীপূজা বিহিত। যে স্থলে পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্ণের পর কিংবা পূর্ব্বদিনে পূর্ব্বাহ্ণে মুহূর্ত্তভঙ্গ হইয়া পঞ্চমী লাগিয়াছে, সে স্থলে সরস্বতীপূজা ষষ্ঠীযুক্ত পরদিনে হইবে। কৃত্তিবাস শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। ১২৫০ শক হইতে ১৪৫০ শকের মধ্যে ১২৫৯ শকে ৩০ মাঘ রবিবার চতুর্থী ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ মাঘ রবিবার চতুর্থী ২৮ দণ্ড ছিল। অতএব এই দুই দিনের মধ্যে একদিন কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল।

১২৫৯ শকে ভোরে এবং ১৩৫৪ শকে রাত্রে এক সময়ে জন্ম হইলে, কৃত্তিবাসের লিখিত যোগ মেলে। ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে মাঘ মাস শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে শেষ। 'পূর্ণ মাঘ মাস' বলিলে দুই-ই বুঝায়; ইহাদ্বারা ৩০ দিনে শেষ হইয়াছিল, এমন বুঝায় না

বস্তুতঃ মাঘ মাসের পরিমাণ ২৯ দিন। বর্ষ-প্রবৃত্তির দণ্ডানুসারে কুম্ভসংক্রমণ ৩০ দিনে ঘটে। পণ্ডিতবংশে শ্রীপঞ্চমী একটা স্মরণার্হ দিন। পণ্ডিতবংশ না হইলেও পরদিন সরস্বতীপূজা বলিয়া জননী পুত্রের জন্মদিন অনায়াসে স্মরণ রাখেন।

আত্মবিবরণের ভাষা দেখিলে কৃত্তিবাসের বলিতে সন্দেহ হয় না। 'বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল', 'খুঁজে খুঁজে বুলে', 'আচম্বিতে', 'জগতে বাখানি', 'ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি', 'হৈল তার নাম যে ভৈরব', 'ভুঞ্জে', 'ভাই উপজিলাম', 'বাপের সোসর', 'নিবড়ে' ইত্যাদি কৃত্তিবাসের। 'শুতিল' (শুইল অর্থে) বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসে আছে। স্মরণ হইতেছে, প্রাচীন আসামীতেও শুত ধাতু পাইয়াছি। মহান্ত—মহান্ অর্থ লইয়া ওড়িয়া জাতিবাচক নাম 'মহান্তি' হইয়াছে। 'ঠাকুরালী' শব্দের পরিবর্তে 'ঠাকুরাল' প্রাচীন বাঙ্গালাতে আছে। 'নির্বড়' ধাতু এখন বাঙ্গালায় অপ্রচলিত, কিন্তু ওড়িয়া হিন্দীতে আছে, কবিকঙ্কণেও আছে। অদ্যাপি বাঙ্গালায় 'নিবড়ে' শব্দ চলিত আছে। 'উগ্রাকার' শব্দটি একটু নূতন; উগ্র+আকার= ক্রোধমূর্ত্তি। আত্তাস—(সং) আবাস—ওড়িয়াতে রাজবাটী অর্থে আছে। 'নেতের পাছড়া', 'পাটের পাছড়া' পূর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ ছিল। 'খরা' রৌদ্র অর্থে কবিকঙ্কণে ও ওড়িয়ায় আছে, পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। 'হাতসানি' এখনও অপ্রচলিত নহে। "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক। রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥" এখানে 'সন্তোক' ও 'অনুরোধে' মিল ধরা হইয়াছে। হিন্দী সন্তোখ, অপভ্রংশে সন্তোক, সং সন্তোষ হইতে আসিয়াছে; কিন্তু 'রাজা দিলেন সন্তোষ'—যেন সন্তোষসূচক পুরস্কার বুঝাইতেছে। এই অর্থে হিন্দীতে সন্তোখ, সন্তোক নাই। ওড়িয়াতে 'সন্তক' শব্দ বহু প্রচলিত আছে। ইহার ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিতে পারি নাই। অর্থে, জাতি কিংবা ব্যবসায়-চিহ্ন, যেমন ব্রাহ্মণের কুশাঙ্গুরীয় ও (কুশবটু), ক্ষত্রিয়ের কাটারী কিংবা ধনুক, লেখক জাতির লেখনী, বৈষ্ণবের মাল্য, কৃষকের লাঙ্গল ইত্যাদি। যে লিখিতে জানে না, সে দলিল-পত্রে নিজের 'সন্তক' লিখিয়া দেয়। বঙ্গদেশে যেমন ঢেরা-চিহ্ন, ওড়িশায় তেমন সন্তক। কিন্তু ঢেরা-চিহ্ন (অর্থাৎ বজ্র) সকল জাতির চিহ্ন, 'সন্তক' জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন। "সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক"—মুদ্রাঙ্কিত নিদর্শন-পত্র ? অতএব আত্ম-বিবরণের ভাষা পুরাতন এবং যে-সে হঠাৎ জানিতে পারিত না। হুগলী জেলার অন্তর্গত বদনগঞ্জের ৺হারাধন দত্তের বাড়ীর পুথি যদিও পুরাতন পুথির প্রতিলিপি, তথাপি বোধ হয়, মূল ১৪২৩ শকে লিখিত হইয়াছিল। (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩১৮ সন)।

আত্মবিবরণে আছে;—

এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গা পার॥

৮। কৃত্তিবাস দ্বাদশবর্ষারম্ভে উত্তর-দেশে পড়িতে গিয়াছিলেন। বৃহস্পতি বার রাত্রিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কবে? মনে করি, তিনি ১৩৫৪ শকে (রেবতী নক্ষত্রে) জন্মিয়াছিলেন। ১৩৬৫ শকের ২৮ মাঘ শনিবার তাঁহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ২৯ মাঘ রবিবার ষষ্ঠী; ১ ফাল্গুন সোমবার অগস্ত্যদোষ; ২ ফাল্গুন মঙ্গলবার নক্ষত্রাদি-দোষ; ৩ ফাল্গুন বুধবার নবমী—রিক্তা-দোষ; ৪ ফাল্গুন বৃহস্পতি বার দশমী ৩১ দং, মৃগশিরা নক্ষত্র ৪৩ দং, বিষ্কুম্ভযোগ ৪৯ দং। দশমী গতে একাদশী তিথিতে মৃগশিরানক্ষত্রে চন্দ্রতারা-শুদ্ধ বৃহস্পতিবার রাত্রিতে উত্তরে বিশেষতঃ পাঠার্থ যাত্রা শুভ ছিল। পরদিন শুক্রবারও বিদ্যায় শুভ তিথি, নন্দা, প্রীতিযোগ। কৃত্তিবাস পাঠার্থ নিশ্চয় শুভদিনে যাত্রা করিয়াছিলেন। আত্মবিবরণ কৃত্রিম হইলে এখানে একটা অশুভ দিনের উল্লেখ থাকিতে পারিত।

৯। এখন ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকের মধ্যে একটি ধরিতে হইবে। ১২৫৯ শক=খ্রীষ্টাব্দ ১৩৩৭, ১৩৫৪ শক=খ্রীষ্টাব্দ ১৪৩২। দীনেশ বাবু ঐতিহাসিক প্রমাণে খৃষ্টাব্দ ১৪৪০ মনে করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণের মধ্যে একটি প্রধান। "কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র মালাধর খানকে লইয়া ১৪৮০ খৃঃ অব্দে [খৃষ্টাব্দে] মালাধরী মেল প্রবর্ত্তিত হয়, এই সময়ে কৃত্তিবাসের বিদ্যমান থাকা সম্ভব।" কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—"ভাই মৃত্যুঞ্জয়।" ইহাতে ঠিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুঝায় না। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে কৃত্তিবাসের বয়স ৪৮ বৎসর। সে সময়ে তিনি জীবিত থাকিলে, তাঁহাকে ছাড়িয়া ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে মেলের নাম কেন হইয়াছিল? হয় ত মালাধর রাজসরকারে থাকিয়া খাঁ উপাধি পাইয়া সমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন কিংবা কৃত্তিবাস নিঃসন্তান ছিলেন। সে যাহা হউক, এই প্রমাণের দ্বারা ১২৫৯ শক নিরাকৃত হইতেছে। অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে, কৃত্তিবাস ১৩৫৪ শকে, ২৯ মাঘ, (১৪৩২ খৃষ্টাব্দে ১১ই ফেব্রুআরি) রবিবারের রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রেবতী-নক্ষত্রে

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

গঙ্গোত্রী-পথে*

গত ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমার কতিপয় ছাত্রবন্ধু-সহ গঙ্গোত্রীতে গিয়াছিলাম। আমরা কোটডোয়ার হইতে পাতুরি যাই এবং পরে পাতুরি হইতে তিরিতে উপস্থিত হই। তিরি হইতে রওয়ানা হইয়া পথিমধ্যে মৌসুরী হইতে গঙ্গোত্রীর রাস্তা প্রাপ্ত হই। এই রাস্তা অবলম্বন করিয়া গোমুখী অভিমুখে যাত্রা করি। কিন্তু প্রধানতঃ কুলীদের অনিচ্ছাহেতু এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে গঙ্গোত্রী পর্য্যন্ত আসিয়াই আমাদিগকে ফিরিতে হয়। তৎপর আমরা ভৈরবঘাটির সেতু পর্য্যন্ত আসিয়া নিলাং যাত্রা করি এবং ভারতবর্ষের এক প্রান্ত সীমানাতে আসিয়া উপস্থিত হই। নিলাং গ্রাম তিব্বতের অন্তর্গত; এই স্থানে যাইতে হইলে জাহ্নবী নদীর কূল দিয়া যাইতে হয়।

এই প্রদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত সি, এল, গ্রীস্‌বেক† মহোদয় এ প্রদেশ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার পর ডাক্তার হেডেন ও জেনারেল বাড়ার্ড‡ ব্যতীত আর কেহই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রকাশ করেন নাই। মৃত গ্রীস্‌বেক মহোদয়ের বিবরণীতে তৎপূর্ব্ব-প্রকাশিত সমস্ত সদৃশসাহিত্য-সূচী (bibliography) দেওয়া হইয়াছে। ডাক্তার হেডেন ও জেনারেল বাড়ার্ড যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহাতে এই প্রদেশের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নূতন সংবাদ নাই এবং এই গ্রন্থে যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মিঃ গ্রীস্‌বেক মহোদয়ের মানচিত্রের অনুলিপি ভিন্ন আর কিছু নহে।

আমরা যে পথে গিয়াছিলাম, সেই পথে অনেক বিচিত্র শৈলমালা আছে। তন্মধ্যে আদিমযুগান্তর্গত শৈলগুলিই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। ইতিপূর্ব্বে যে মানচিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আদিমযুগান্তর্গত ও তদূর্দ্ধ প্রস্তর—এতদুভয়ের মধ্যে সীমানা কোথায়, তাহা দেখান হয় নাই। সাধারণ রাস্তা দিয়া চলিতে চলিতে মনেরি নামক স্থানের পরেই এই দুই সময়ের প্রস্তর একত্র মিশিয়াছে, ইহা দেখা যায়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে সমস্ত প্রস্তরের উল্লেখ করা হইল, সেগুলি মনেরি ও গঙ্গোত্রী এতদুভয় স্থানমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঠিক কোন্ স্থানে কোন্ প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, দুই একটি প্রস্তর ব্যতীত আর কোনও স্থলে তাহা নিঃসন্দেহভাবে বলা যায় না; কারণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ কুলীদের অসাবধানতাতে স্থানবিজ্ঞাপক কাগজের টুকরাগুলি নষ্ট হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বে এই স্থানসম্বন্ধে যে সমস্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, সে সমস্ত আলোচনা করিলে দেখা যায়, এই প্রদেশের আদিমযুগান্তর্গত পরিবর্ত্তিত প্রস্তরাবলী (Archæan gneiss) সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কেহই কিছু প্রকাশিত করেন নাই। এই প্রস্তরগুলি প্রেসি-

---

* চট্টগ্রাম—বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে পঠিত।

† Mem. Geol. Surv. India, Vol. XXII.

‡ A Geography & Geology of the Himalaya Mountains and Tibet.

ডেন্সি কলেজে ভূতত্ত্ববিভাগে রক্ষিত আছে। এই প্রস্তরগুলির বিস্তৃত বর্ণনা ভবিষ্যতে প্রদত্ত হইবে। কিন্তু এইগুলি পরীক্ষাদ্বারা প্রস্তরগুলির উপাদান প্রভৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া সেইগুলি এই স্থানে বিবৃত করিলাম।

এই প্রস্তরগুলির মধ্যে একটিতে (৯৫৬)* লিথিয়নিট (lithionite) নামক অভ্রের অস্তিত্ব দেখিতে পাইয়াছি। রাসায়নিক বিশ্লেষণ বা বর্ণবিশ্লেষণ ব্যতীত লিথিওনাইট নামক অভ্রের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহভাবে ধরা যাইতে পারে না বটে, কিন্তু এই প্রস্তরের দ্বিবর্ণত্ব (diohroism) প্রভৃতি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে এই খনিজ যে লিথিয়নিট, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করার কিছুই থাকে না। লিথিওনেট অভ্র খুব প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না ও আমার যতদূর জানা আছে, এই অভ্র ভারতবর্ষে ইতিপূর্ব্বে কোনও স্থানে পাওয়া যায় নাই।

অনেকগুলি প্রস্তরে গার্ণেট (garnet) বিদ্যমান আছে। এই খনিজ মৌলিক, কি অপর কোনও খনিজ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। কিন্তু ইহা মৌলিকই হউক বা অপর কোন খনিজ হইতে উদ্ভূতই হউক, ইহা যে অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ গার্ণেটে যেরূপ ফাট থাকে, এই খনিজেও সেরূপ অনেক ফাট আছে এবং এই ফাটের মধ্যে নূতন খনিজের উৎপত্তি হইয়াছে। গার্ণেট পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক নূতন খনিজের উৎপাদন করে। Van Hise তদীয় পুস্তকে সেই সমস্ত খনিজের এক তালিকা প্রদান করিয়াছেন।† এই তালিকাতে অভ্রের কোনও উল্লেখ নাই। কিন্তু গঙ্গোত্রী-পথ হইতে যে সমস্ত গার্ণেটবাহী প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটিতে অভ্র উৎপন্ন হইয়াছে। Van Hise-এর পুস্তকে এই অভ্রপরিণতির উল্লেখ না থাকিলেও Hintze গার্ণেটের এই ভাবে পরিণতির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বোধ হয়, এই ভাবে পরিণতির দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অল্প। সেই হিসাবে গঙ্গোত্রী-পথে প্রাপ্ত গার্ণেটের অভ্রে পরিণতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোনও প্রস্তরে শ্বেত অভ্র ও কৃষ্ণাভ্র এক সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা যেরূপ বিজড়িতভাবে আছে, তাহা উল্লেখযোগ্য। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করিলে এই শ্বেতাভ্র যে মৌলিক নহে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। আরও দেখা যায় যে, অনেক স্থানে শ্বেতাভ্র ও কৃষ্ণাভ্র ঠিক এক সময়ে অন্ধকারাবৃত হয়। যে স্থানে এই দুই অভ্র একত্র আছে, অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, এই প্রস্তরে প্রাপ্ত কৃষ্ণাভ্রের বর্ণ কৃষ্ণাভ্রের সাধারণ বর্ণ অপেক্ষা অনেক গাঢ় এবং অবস্থাদৃষ্টে যদি মনে করা যায় যে, কৃষ্ণাভ্র মাঝে মাঝে চাপ তাপ প্রভৃতি হেতু শুক্লীকৃত হইয়া শ্বেতাভ্রে পরিণত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না বলিয়া মনে হয়।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশগুপ্ত

---

* প্রেসিডেন্সি কলেজ দৃশ্যাগারে রক্ষিত প্রস্তরের ক্রমিক সংখ্যা।

† A treatise on metamorphism.